KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫০৮/২, যোধপুর পার্ক, কল-৬৮
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভাব (BIVAV)	Size : 5.5" x 8.5"
Vol. & Number : 21/2 21/3 22/1 23/1	Year of Publication : Oct - Dec 1999 Jan - March 2000 July - Sep _ 2000 Oct - 2001 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

৮০

বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা/১৪০৭

বিভাব

বিভাব

সম্পাদক/সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

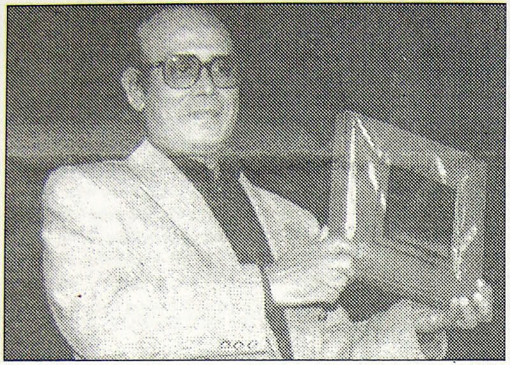

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত'র সাম্প্রতিক সম্মান

২০০০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সাম্প্রতিকতম চলচ্চিত্র 'উত্তরা'র সূত্রে ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অর্জন করলেন শ্রেষ্ঠ পরিচালকের সম্মান। ভেনিসের সময়ানুযায়ী রাত এগারোটায় এই পুরস্কার তাঁর হাতে তুলে দিলেন উৎসব কর্তৃপক্ষ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'উত্তরা' আমন্ত্রিত হয়েছে টরেন্টো, ভ্যাঙ্কুভার, পুসান, লন্ডন, নান্তেস্, অস্‌লো, সাওপাওলো ইত্যাদি বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে।

তাঁর এই সাফল্যে আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

অনেকে তাঁকে প্রশ্ন করেন আপনি কবিতা থেকে সিনেমায় এলেন কেন?
আমরা কিন্তু মনে করি তিনি এখনও কবিতাই লেখেন, মাধ্যম বদলেছে মাত্র।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
* কলিকাতা-৭০০ ০০৯ *

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ শরৎকালীন সংখ্যা
১৪০৭

সূচি

সম্পাদকীয়

স্মরণ

অরুণ মিত্র — কবিতাগুচ্ছ ও প্রবন্ধ (বিভাব-পুনর্মুদ্রণ) ৪
মণীন্দ্র রায় — কবিতাগুচ্ছ ১৯

দিনলিপি

জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত ডায়েরি ও তাঁর আঁকা একটি স্কেচ ২৭
টীকা: ভূমেন্দ্র গুহ ও গৌতম মিত্র ৩২
সঙ্গীত সম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার গানের খাতা
এবং ডায়েরি থেকে কয়েকটি পৃষ্ঠা (মুখবন্ধ) — বাঁধন সেনগুপ্ত ৬৩
ইন্দুবালা দেবীর অপ্রকাশিত ডায়েরি : (টীকা : বাঁধন সেনগুপ্ত) ৭০

কবিতা

অপ্রকাশিত কবিতাগুচ্ছ — সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ৪১

সাক্ষাৎকার

কবি অমিয় চক্রবর্তী (মুখবন্ধ) — স্বপনকুমার ঘোষ ৪৫
অমিয় চক্রবর্তী-র অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার ৪৯

চিঠিপত্র

বিদ্যাসাগরের দু'টি অপ্রকাশিত চাকরির আবেদনপত্র (টীকা : অরবিন্দ গুহ) ৫২
শান্তিদেব ঘোষের অপ্রকাশিত চিঠি (অমিতাভ চৌধুরীকে লেখা) ১৩৫

ভাষণ

ম্যাগসেসে পুরস্কার গ্রহণকালে প্রদত্ত — সত্যজিৎ রায় ও শম্ভু মিত্র ৫৫

প্রবন্ধ

হিন্দুত্ব কী? — নিত্যপ্রিয় ঘোষ ৭৭

বিশেষ রচনা

প্রেম-অপ্রেমে চার গন্ধর্ব — অশেষ চট্টোপাধ্যায় ৮৭

পুরাতনী

অধিকার হরণ — কল্যাণী দত্ত (বিভাব পুনর্মুদ্রণ) ১১০

ব্যক্তিগত রচনা

পাখির সঙ্গে — উৎপলকুমার বসু ১১৩

বিদেশি সাহিত্য

জোব্বার নীচে এক হৃদয় : এক শিক্ষার্থী যাজকের আত্মবিশ্বাস
(মূল- জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো) — কমলেশ চক্রবর্তী ১১৯

ক্রোড়পত্র-১ : উপেন্দ্রকিশোর

ঠাকুরদা-স্মৃতি : **অগ্রন্থিত ভাষণ** — সত্যজিৎ রায় ৩
উপেন্দ্রকিশোর - প্রতিচ্ছবি মুদ্রণে অনন্য শিল্পী — সিদ্ধার্থ ঘোষ ৫
হাফ্‌টোন্ ছবি - উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (পুনর্মুদ্রণ) ১৩
'Multiple Stops' সংক্রান্ত দু'টি খসড়া
— উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (পুনর্মুদ্রণ) ১৯
'Multiple Stops' - 'Penrose' পত্রিকা থেকে (পুনর্মুদ্রণ) ২৫

ক্রোড়পত্র-২ : উপন্যাসিকা

কোন বাড়ি কার দেশ — কল্যাণ মজুমদার ৩৯

ক্রোড়পত্র-৩ : কৃত্তিবাস (নির্বাচিত প্রবন্ধ)

কাব্যলোক — সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী ৬৭
রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান — আবু সয়ীদ আইয়ুব ৭১
রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তাঁর গান : ভূমিকা — বুদ্ধদেব বসু ৯২
রেখো মা দাসেরে মনে — কমলকুমার মজুমদার ৯৫

সম্পাদকীয় নিবেদন

বিভাব ছাব্বিশ বছরে পড়ল। এই সংখ্যা ধরে মোট আশিটি সংখ্যা প্রকাশিত হল। এই বিশেষ সংখ্যাটি পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা বিশেষ গর্ব ও শ্লাঘা অনুভব করছি। বিগত পঁচিশ বছরের ইতিহাসে এমন সংরক্ষণযোগ্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রকাশিত লেখাই ব্যপ্ত বিবরণ দাবি করে। কিন্তু এখানে তার সুযোগ নেই। তাছাড়া প্রায় প্রতিটি লেখার সঙ্গে প্রয়োজনবোধে আমরা অতি সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য ও সূত্রনির্দেশ যুক্ত করেছি।

এই অতীব মূল্যবান সংখ্যাটির পরিকল্পনা ও রচনাসংগ্রহকর্ম আমার হলেও এর সামগ্রিক সম্পাদনা ও সন্নিবেশ একা অতি দক্ষ হাতে করেছেন নির্বাহী সম্পাদক রাহুল সেন। বিভাবের বিগত তিনটি সংখ্যায়ও তার দক্ষতার নির্ভুল চিহ্ন ছিল।

বিভাবে আমরা মূলত পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি স্বীকৃত বানানবিধিই ব্যবহার করি। এ সংখ্যায় সদ্যতন ও প্রাচীন বহু নামিদামি লেখকের রচনা আছে। পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমরা তাঁদের বানানরীতিই বজায় রেখেছি। ফলে একই বানানের সংস্কৃত ও অসংস্কৃত দু'রকম বানানই আছে।

আমাদের আপ্রাণ প্রয়াস সত্ত্বেও দু-এক জায়গায় অনভিপ্রেত ও নিয়ন্ত্রণঅসাধ্য ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যদিও আমরা সবরকম মানুষসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করেছি।

সুচরিতা দাশ 'কাছের জীবনানন্দ' স্মৃতিচারণে লিখেছিলেন 'তখন তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল, আলতো পেন্সিলে মৃদু চঞ্চলতায় অস্ফুট আলো-ছায়াময় কতই না ছবি ফুটে উঠতো'। এই প্রথম জীবনানন্দর অপ্রকাশিত একটি স্কেচ তাঁর প্রথম লিখিত ডায়েরির সঙ্গে আমরা ছাপলাম একমাত্র ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য। ছবির নৈয়ায়িক বিশ্লেষণ অনভিপ্রেত। বলাই বাহুল্য ভূমেন্দ্র গুহ ও অমিতানন্দ দাশের অকৃপণ ও প্রবহমান সহযোগিতা ছাড়া এই মুদ্রণ সম্ভব হত না। জীবনানন্দ দাশ জন্মশতবর্ষ সংখ্যাটির কিছু কপি এখনও আমাদের কার্যালয়ে পাওয়া যাচ্ছে। যারা সংগ্রহ করে উঠতে পারেননি তাঁরা এই সংখ্যাটি আমাদের সম্পাদকীয় দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

আমাদের পরমপ্রিয় অরুণ মিত্র সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। এ সংখ্যা তাঁকেই উৎসর্গ করলাম। প্রয়াত মণীন্দ্র রায়কেও বিশেষভাবে স্মরণ করেছি এ সংখ্যায়।

মানুষ ও তার পরিবেশ আজ হিংসা হানাহানিতে যতই দূষিত হোক না কেন সে দূষণ পুরোপুরি আকাশ অবধি পৌঁছয় না বলেই শরৎ আকাশ এখনও এত নীল, আমরাও নীলিমানিমগ্ন।

পরিশেষে সবাইকে জানাই শারদ শুভেচ্ছা।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী :

পবিত্র সরকার । প্রদীপ দাশগুপ্ত

শান্তিনিকেতন

অরুণ মুখোপাধ্যায় । অনাথনাথ দাশ । স্বপনকুমার ঘোষ

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

নির্বাহী সম্পাদক

রাহুল সেন

প্রধান যোগাযোগ কেন্দ্র ও লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সম্পাদকীয় দপ্তর

'বিভাব'

৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক (দ্বিতল) । কলকাতা -৬৮ । দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

শান্তিনিকেতনে যোগাযোগ কেন্দ্র

অরুণ মুখোপাধ্যায়

এ্যানড্রুজপল্লী (পশ্চিম) পো: শান্তিনিকেতন । পিন: ৭৩১২৩৫

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ

বাঁধাই : গৌরাঙ্গ বাইন্ডার্স, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান : *পাতিরাম*

দে'জ

ইষ্টার্ন বুক এজেন্সি

৮/সি, টেমার লেন

কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক, কলকাতা -৭০০ ০৬৮ থেকে প্রকাশিত।
বর্ণনা, ৬/৭ বিজয়গড়, কলকাতা - ৭০০ ০৩২ ফোন : ৪১২ ১১৩৩ হইতে অক্ষর বিন্যস্ত
এবং চিত্রিত ও সময় পাবলিকেশন প্রা. লি. কলকাতা - ৭০০ ০৪৭ হইতে মুদ্রিত।

স্মরণ

(অরুণ মিত্র ও মণীন্দ্র রায়)

স্মরণ

অরুণ মিত্র

বিভিন্ন সময়ে বিভাবে প্রকাশিত
অরুণ মিত্রের রচনার এক সুনির্বাচিত
সংকলন আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশ
করলাম। এই বিশেষ শারদীয় সংখ্যা
তাঁর স্মরণে উৎসর্গীকৃত।

আমার মৃত্যুর পর আট ঘণ্টার মধ্যে আমার মৃতদেহ ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের অথবা নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমি বিভাগে পৌঁছে দিতে হবে। বিজ্ঞানের চর্চায় ব্যবহারের জন্যে আমার মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্র এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র আমি প্রস্তুত করে রেখেছি। তার সঙ্গে মৃত্যুর ডাক্তারি সার্টিফিকেট যুক্ত করে দিলে আর কোনও সমস্যা থাকবে না।

আমি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করি না এবং প্রচলিত কোনও ধর্ম মানিও না। আমার দৃষ্টিতে মানুষের মঙ্গলসাধনই একমাত্র প্রকৃত ধর্ম। ঈশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর ইত্যাদির অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি না। সুতরাং প্রথাগত ক্রিয়াকর্মের কোনও প্রশ্ন আমার ক্ষেত্রে ওঠে না। আমার মৃত্যুর পর এ-সব অনুষ্ঠান আমি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করছি।

অরুণ মিত্র
১.৬.৯৮

পুরোনো নতুনের টানে গদ্য পদ্য

প্রথমেই সবিনয় নিবেদনে বলা ভালো
অনেক বছর ধ’রে পাথরে পাথরে
স্মৃতি বেশ ক্ষ’য়ে গেছে, ফলে
পুরোনো নতুনে প্রায়ই জট লাগে
আমি নিশ্চিত বুঝি না
তারা কোন্ সীমান্তে পৃথক হয়েছে,
এই যেমন আকাশের জবাকুসুমসঙ্কাশ যদি
মনে জাগে অগ্নি আমি পূর্বাচলে
নিশান ওড়াতে চেয়ে হাত মুঠো করি,
অথচ তা কোনো আদিম ঊষার রঙ
আব্ছা কোণে লেগে আছে এখনো মোছেনি
কিম্বা হয়তো মনে হল কারো দু’চোখের পাতা
খুলে গিয়ে সংসারের স্নেহ ছড়িয়ে দিয়েছে,
কিন্তু একটু ঠাহর ক’রেই বুঝি আশেপাশে
টুক্‌রো টুক্‌রো ঘরবাড়ি প্রাচীন কীর্তিতে লট্‌কে আছে,
ভিটের ভ্যারেণ্ডা কন্টিকারি প্রেমের সবুজ নিয়ে খেলে।
এই রকম। কোনো কিছুই নির্ণীত হয় না।

*

আমার অনেক জানাবার কথা থাকে। জানানো। কাকে জানানো? আমাকে, না, অন্য যারা ওখানে দাঁড়িয়ে প্রত্যাশায় রয়েছে তাদের, না, একসঙ্গে আমাদের? সে যাই হোক, বলাটাই আসল। শুরু থেকে বলতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কে আমার ভার নেবে? গদ্য? তা গদ্যকে স্বচ্ছন্দে ডাকা যায়। দেখেছি ডাকাডাকিতে সে বেশ সাড়া দেয়। তার প্রশ্রয়ে এক এক সময়, কি যে আশ্চর্য, ধমনীর রক্ত চল্‌কে ওঠে, চোখমুখ ঢেউয়ের ভিতরে প্রক্ষালিত হতে থাকে। অবিশ্যি হাড়ের ঠকঠকানিও ওঠে। তবু তার পেছনে প্রকাণ্ড দরজা খোলার শব্দ ফ্রেম ভেঙে সমস্ত শরীরটাকে ভুবনডাঙায় চারিয়ে দেয়।

অথবা পদ্যও ভিড়তে পারে, আমার ঐ নিবেদনের মতো। এমনকি তার চেয়েও বেশি করে। পদ্য। মেঝের ফাটল, সিঁড়ির নীচে পেল্লায় গর্ত আর সাবধানে পা টিপে টিপে একটা পল্‌কা সেতুর এধারে আমি অথবা তুমি কাছাকাছি আসবার জন্যে তুমি এবং আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের ঘুর লাগিয়ে দেখবে ব’লে সে মুখিয়ে থাকে। আমি বলতে পারি :

কোন্ রাস্তা যে কোথায় যায় এখন
বোঝা যায় না, কিসের আশায় আশায়

মাচায় পোড়ে হলুদ ফুল, উঠোন
টেমির আলোয় ছায়ার মেলা বসায়।

নয়ানজুলি ছাড়িয়ে গেলে ভাঙন
পায়ের আগে ক্রমেই মাটি খসায়,
কতই বা দূর জলঘূর্ণির লগন,
তোমার জাগা তেরাত্তিরের বাসায়।

এভাবে বলতে পারি। কিন্তু আরো যে বলবার থাকে। এভাবে সব সময় আমার
বুকের রক্ত সেখানে জোগায় না যেখানটায় কোনো কপাল কি গাল কি এক রাশ চুল
নয়তো খোয়া ইঁট ধুলো ঝুড়ি কি জোড়করা হাত কি ফাটা কৌটো কি একমুঠ চাল
নয়তো শব্দ গলা থেকে ফুটপাথ থেকে খামের গা থেকে হঠাৎ বা অনেকক্ষণ ধ’রে
আমার বুকের উপরে বা কাছে উষ্ণতায় থাকবার জন্যে, যেখানটায়।

*

শুরুর কথাই ভাবি। কোথায় শুরু? সে কি সকালের জল ছপছপ ঘাসে আর বিকেলের মাঠে যেখানে ছেলেরা প্রজাপতির সঙ্গে উড়ছে অথবা পা থেকে পায়ে পৃথিবীটাকে ছুঁড়ে দিচ্ছে? নাকি সন্ধের আড়ালে যেখানে আর কিছু নেই শুধু ক্ষুদে দুটো চোখের উপর গুনগুন ক’রে ঝরছে পাপড়ি পালক ছবির রঙ? পুকুরপাড় থেকেও শুরু হতে পারে। খোলামকুচির চক্কর কিম্বা শাপলার দোলা লাগিয়ে জল দুপুরের মধ্যে ছড়ানো কলাপাতা ধুয়ে ভাত নেওয়ার পালা জুড়ে, ঝিমঝিম।

*

এঁটো কলাপাতার একেবারে ঢালাও নেমন্তন্ন। পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ থেকে আবালবৃদ্ধবনিতা ধেয়ে আসে। তাদের গায়ের ঘষায় বাতাস দাউদাউ করে। পাতে হাত দেওয়ার আগে পর্যন্ত কুরুক্ষেত্রের আগুন গদা ভল্ল পাশুপত অর্ধচন্দ্র হারেরেরে তুড়ুংঠুকে ব’সে ক’টা গেরাস মুখে দিতে অঙ্গ জুড়িয়ে শেতল, তখন কুকুরদের গলা জড়িয়ে দিল্‌লেগি আতুতুতু ভালোবাসায় কলকল গলি ঘুঁজি নর্দমা। বাঁচার খুব জোশ আছে।

ঐ ভালোবাসার শহরপানে হাঁটো। আমি অনেককাল আগে বলেছিলাম শহরে প্রথম পা ফেলার কথা। কড়া রোদ্দুর ছিল এবং কার যেন মুখের পদ্ম ফুটেছিল। পুকুরের আর ক্ষেতের কাদা পোঁটলাপুঁটলি জাব্‌ড়ে ইস্টিশানের ছ্যাকরাগাড়ির চাকা বরাবর পুরোনো বাড়ির বাগানে বড় শিমুলগাছের তলায় থিতিয়ে রহস্যজনক গোল হয়েছিল। কিন্তু কোনো চারা জন্মায় নি। তবে পদ্ম ফোটার কথা এসেছিল কেন? তা আসতে পারে, তোমাকে আমার একদিন সেরকম বলতে ইচ্ছে হয়েছিল। তখন শিউলি কুড়োবার সকাল। অঘ্রাণে শীতের রাতে সেই তোমাকে কাঁচের পর্দার সামনে দেখলাম, রাস্তার বাতিগুলো জ্বলছে না বা জ্বললেও নিভে যাচ্ছে, কিন্তু কাঁচের ওধারে খুব রোশনাই আর এধারে আমরা পরস্পরকে দেখবার চেষ্টায় কাঁচের উপর সেঁটে আছি যদি আলো আসে, যদি আয়নার

মতো দেখা যায় উল্টোদিকের তার এক আয়নায় আলো ঠিক্‌রে অনেক দূর পর্যন্ত বাঁশির মতো একের পর এক ঘর গাছপালা জল ফুল তোমার মুখ বেড় ক'রে আমাদের চোখের সামনে ছড়িয়ে যায় যদি, তাহলে পাপড়ি মেলার কথা ভাবতে পারি। কিন্তু কই, জ্বলজ্বলে আলো দেখছি ভিতরে, অথচ তা ফিরে আসছে না অন্ধকারে যেখানে আমরা ফুটপাথের ধসের ঠিক পাশে আমাদের দাঁড় করিয়ে রেখেছি, চুপচাপ একেবারে চুপচাপ।

*

অপেক্ষা করার কথা মনে হয়, কতবার করেছি তো।
গোরুর গাড়িতে একটা লম্ফ দুলতে দুলতে
রাতের ভিতরে ঢুকল, আমি দাওয়ার উপর থেকে
চেয়ে আছি, কে আমাকে দেখেছে স্থাপিত
এইখানে, কে কখন ফিরে আসবে,
হাজারটা আবিষ্কার সম্ভাষণে খুলে যাবে;
প্রত্যেক শীষের দানা পেকে উঠলে
চোখের ঝিলিক খেলবে সমস্ত হাওয়ায়।
অনেক অপেক্ষা থাকে।
অবশেষে ট্রেন থামল প্রকাণ্ড শহরে
প্ল্যাটফর্মের ওধারে আরেক ট্রেন ছাড়ো-ছাড়ো,
এত খোঁজাখুঁজি এই কেন্দ্রে থিতোয় না,
একটা জ্বলন্ত ভাঁটা হন্যে হ'য়ে ছোটে সামনে,
এদিকে সবুজ গাছগুলো একে একে মরে যেতে থাকে।

*

তোমার সঙ্গে দেখা হল। কই দেখা হল? আমাদের মুখ আমরা দেখতে পেলাম না। চকচকে কাঁচে, চামড়ার জেল্লায় চোখ কেবলই পিছলে পায়ে পায়ে এদিক থেকে ওদিক ওদিক থেকে এদিক যেমন লঙ্কা নাচে কিম্বা জন্তুর সামনে হ'টে স'রে ঘুরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোথায় কোন্ খোড়লে নামছে ওদিকটা কি কে জানে। শুরু আর শেষ কোথায়? সেই জন্যে গদ্য হোক পদ্য হোক এইখানটায় খুব আতান্তরে প'ড়ে যায়, আমাকে এমন কোথাও নিতে পারে না যেখানে আমি তোমায় ডাকতে পারি বুকে হাওয়া টেনে একটা ঘরমুখো রাস্তায় অভিযাত্রীর মতো পা বাড়াবার জন্যে ঠিক্‌রোনো এলোপাথাড়ি রঙ মেখে ভূত হ'য়ে সূর্য ওঠার বা ডোবার সময়ে যখন আর একটা রঙের ফোয়ারা খুলবার দিনক্ষণ বেশ স্পষ্ট আঁচ করা যায়। তাই অনিশ্চয়তার মধ্যে ভিজে মাঠ বিকেল ভোর ধানের ছড়া ফোটা পদ্মর সঙ্গে অপেক্ষার কথা এসে যায়। কিন্তু শুক্‌নো গেঁয়ো মাটি ঝেড়ে ফেলে এক জায়গায় উসখুস না ক'রে চেয়ে থাকতে থাকতে গা-গতর কেমন শক্ত লাগে আর রক্ত থম্‌কে গিয়ে ইচ্ছেগুলোকে এমন জমিয়ে দেয় যে কাঁচঘরের সামনে যেন প্রাচীন মূর্তি খাড়া হয় যা তুলে

নিয়ে কোনো সময় হয়তো ভিতরে বসানো হবে। আমরা পাথর হতে এসেছি নাকি? কখন এসেছি, এখন, না, অনেককাল আগে? তাহলে এখান থেকেও শুরু হতে পারে যখন আমি ফুটপাথের ছ ইঞ্চি কিনারা ধ'রে সরতে সরতে বাঁক ঘুরে পেছন দিককার রঙছুট এলাকায় গিয়ে অন্য কোনো আলো পাওয়া যায় কিনা ভাবছি।

বিভাব - ৪র্থ সংখ্যা
শরৎ ১৩৮৪/
জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৭৭

ছন্নছাড়া

ছন্নছাড়া কথাটা আমাকে আমি আকাশী ফ্ল্যাটে
গোছগাছ ক'রে বসতেই দরজা জানলা সোফা পর্দা আমাকে
ঠেলতে থাকে বেরোও আর খাওয়ার জন্যে তৈরি হতেই
কাঁটা চামচ প্লেট বাটি ছত্রভঙ্গ চাওমিন বিরিয়ানি
আইসক্রীম উড়ে যায় পোড়া ক্ষেত ধসা চালের ওপর
দিয়ে ওই ওই যে, দুটো প্রেমকাঙাল চোখ আমার দিকে
চাইতেই লোডশেডিং আমিও অন্ধ, ছন্নছাড়া ছন্নছাড়া
কথাটা আমাকে তাড়া করে যেন পাগলা কুকুর।
বেরিয়ে আমাকে পড়তেই হয়। কিন্তু আমি যাব
কোথায়? কোন্ মাটি আমার আশ্রয় আমার
ভাতকাপড় দেবার মা? এই ফাটলে আমার পা
আট্‌কায় তো ওই পাথরে আমি হোঁচট খাই,
ছন্নছাড়া ছায়া ফেটে ফেটে হাজার টুকরো ফিসফিস
হাজার গলা, উচ্ছন্ন মিছিলে আমি চলি চলো চলো
পেটবুকের আগুনে জ্ব'লে খাক হই জ্বলতে জ্বলতে
খুঁজি কোথায় আমাদের সর্বস্বান্ত হাপুস ভিটে।

প্রাতঃভ্রমণ

আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরোই
দু'তিন দিন অন্তর
একটু বেলায়,
দেখেছি বেলায় বাজারটা বেশ জমে।

আমি ফুটপাথ ধরে চলি
তখন গাছে গাছে পাখি ডাকে
(সত্যি ডাকে কিনা জানি না তবে আমি শুনতে পাই)
তখন মাঠময়দান ফুলে ফুলে ছয়লাপ
(সত্যি ফুটে আছে কিনা জানি না তবে আমি দেখতে পাই),
আমার পকেটের পয়সাগুলো টুংটাং বাজে
আমি সুরে সুরে বুঁদ হয়ে চলি।
অবিশ্যি রোজ এমন হলে আমি সুখস্বর্গে উঠে যেতাম,
সেটা আর হয় না,
দু'তিন দিনের অন্তরটাই বহাল রাখি
রাখতেই হয়,
আমার পকেটের পোষা পয়সাগুলো
বাজারের মধ্যে ডানা মেলে উড়ে যায়।

সে যাই হোক, কিছু সুখ তো পাই-ই।
এবং আপনজনের সঙ্গে কুশল বিনিময়,
সে-ও কি কম সুখের?
আশপাশের জঙ্গল থেকে এসে পড়ে
বাঘমামা শেয়ালকাকু বেড়ালমাসী,
কুকুরবাঁদর ভামখাটাস ছুঁচো-ইঁদুর ভাইবেরাদার।
চলতে চলতে কত কথা
চলতে চলতে শেষকালে সেই বাজার,
সেখানে দেখি কুমিরভায়ার দেঁতো হাসি,
সেখানে অনেক সাপসাপিনী ভাইভগিনী,
দু'তিন দিন পর দেখা পেয়ে তারা বেজায় খুশী
আমার জন্যে তাদের কী যে আকুল পথচাওয়া,
আমি ভালোবাসায় ভেঙেচুরে একাকার,
ভুলে যাই জিগ্যেস করতে তারা কেমন ক'রে
আমার অজান্তে সেখানে পৌঁছে গেল।
ভাগ্যিস ভুলে যাই
নইলে ফাটা রেকর্ড বেজেই চলত:
"আমরা তো এমন ক'রেই চলি,
আমাদের স্বভাবের অলিগলি চেনো না তুমি,
এই কি ভালোবাসা....?"

যাকগে, দু'তিন দিনের অন্তরটা ভালোই,
ক্ষিদে বাড়ে,
আমি প্রাতঃভ্রমণে বেরোই
মাছমাংস তরিতরকারি কিনি
বাড়ি ফিরি রাঁধিবাড়ি খাইদাই ঘুমোই,
দু'তিন দিন তো টিঁকে থাকি,
আবার প্রাতঃভ্রমণ
পাখির গান ফুলের মেলা আপনজনের প্রাণের আলাপ।

বিভাব - ৫২তম সংখ্যা
বর্ষা ১৩৯৮/
জানুয়ারি-মার্চ ১৯৯১

জাহান্নম থেকে

আমি গিয়েছিলাম এক পার্টিতে। তবে বোফর্স পার্টি নয়। সেটা দেবস্থান। সেখানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবিশ্যি অমন জায়গার কাছাকাছি না যাওয়া এক দিক থেকে ভালোই। দেবতারা বড্ড জ্বালাতন করেন। অনবরত মঙ্গল করার চেষ্টা : মিথ্যে কথা বোলো না, চুরি কোরো না, পুরো পেট খেয়ো না, আধপেটা খেলে শরীর সুস্থ থাকে এবং দেশেরও অগ্রগতি হয়; এবং মেয়েমানুষ ছুঁয়ো না, এক যাকে ছানাছুনি করার জন্যে তোমার হাতে দেওয়া হয়েছে তাকে ছাড়া আর কাউকে না, পরপুরুষের গায়ে ভুলেও গা লাগিয়ো না; তবু যদি প্রাণ আইঢাই করে, তাহলে....দেবতাদের নিয়ে এই এক মুশকিল। ওঁরা কাজের বেলায় ভীম মাস্তান, কিন্তু কথার বেলায় ভীতুর ডিম। কথাটা নিঃশব্দে বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু সে কাঁহাতক পারা যায় আর তাতে কোনো স্থায়ী সমাধানও হয় না। তখন দৈব অভিশাপ : তবে জাহান্নমে যাও।

তা জাহান্নমেই গিয়েছিলাম আমি। মানে ওই পার্টিতে। গিয়ে দেখি কবিতা পড়া আর শোনার, গান গাওয়া আর শোনার হৈহল্লা। একেবারে নরক গুলজার। যত ওঁছা মানুষ একসঙ্গে জড়ো হলে যা হয়। কারো জিবের কোনো লাগাম নেই, যার যা ইচ্ছে বলছে। তবে কাব্যি ক'রে এর নাম দেওয়া যেতে পারে 'হৃদয়ের উন্মোচন'। এই হৃদয় উন্মোচনের ফলে অনেকের একটা বিশেষ ইচ্ছে প্রকাশ পেল দেবতাদের কাঁচকলা দেখানোর। কিন্তু কী করে দেখানো যাবে? তাহলে তো নরক থেকে উপরে উঠতে উঠতে স্বর্গ ছাড়িয়ে দেবতাদের নাগালের বাইরে যেতে হয়।

এমন সময় হঠাৎ টের পেলাম আমরা যেখানে রয়েছি সেটা এক উঁচু জায়গা, পেল্লায় উঁচু। দেবতাদের দেখা যাচ্ছে নিচে। কেমন করে এটা ঘটল? তাহলে কবিতা আর গান ডানা মেলেছিল নিশ্চয় এবং ডানার ওপর বসিয়ে আমাদের উড়িয়ে নিয়ে এসেছে এত

উঁচুতে। আমরা বুঝতেও পারিনি।

কিন্তু সমস্যারও সৃষ্টি হয়েছে। ওঁদের যে আমরা কাঁচকলা দেখাতে চেয়েছিলাম। অত নিচু থেকে বুড়ো আঙুল নাড়া কি ওঁরা দেখতে পাবেন?

বিভাব - ৬৮ তম সংখ্যা
আত্তঃ কবিতা সংখ্যা ১৪০৪
জানুয়ারি-জুন ১৯৯৭

সামনের লাইন নিয়ে ভাবনা

সামনে একটা লাইন পাতা আছে, তার ওপর
দিয়েই আমার চলা, বলা যায় জীবন-পর্যটন। কিন্তু
কোন্ দিকে আমি যাচ্ছি ঠিক ঠাহর করতে পারি না।
বার বার নিজেকে জিগ্যেস করি, কোথায় চলেছি, আমার
গন্তব্য তো এদিকে নয়। আমি সময়ের যে স্বপ্নের
জায়গাটা ছুঁতে চাই তা আমার নাগালের বাইরেই
থেকে যায়। পাশে তাকিয়ে দেখি জঙ্গল আর জলা
আর ঘাড়ভাঙা খাদ। তবে কি ওই সবের ঝুঁকি
নিয়েই আমায় ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে? তারপর কী
ঘটবে তা নিয়ে ভেবে কোনও লাভ নেই।
স্বপ্নসময়ে পৌঁছাবার ওটাই তো একমাত্র পথ।
পাতা লাইন কেবলই আমায় একটার পর একটা
রাতের ভেতরে নিয়ে যায়, আর ভোর হলেই
দেখি সামনে সেই লাইন। তার ওপর দিয়ে আবার
চলা। চোখ বাঁধা বলদের মতো।
মা, তুমি কিন্তু আমায় এমন হাঁটা শেখাওনি।
তুমি যতদিন ছিলে অন্য পথে যাওয়ার ঘুমপাড়ানি
গান গেয়েছো। তাহলে এভাবে আমায় কে
ঘোরায়, কারা ঘোরায়? সে কি ওই ভুল
লাইন, ভুল পথের গোলকধাঁধা?
নিশানা?

বিভাব - ৭৬ তম সংখ্যা
আত্তঃ কবিতা সংখ্যা ১৪০৬
জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯

আলোকচিত্র : কাজল চক্রবর্তী

গ্রহণ বর্জন পালা

(প্রবন্ধ)

সাহিত্যে, শিল্পে ও সংগীতে খ্যাতি আর খ্যাতিহীনতার অথবা কখনো অখ্যাতির যে-রদবদল চলতে থাকে, তা প্রায় ম্যাজিক-দৃশ্যের মতো। আমীর হয়ে যান ফকির এবং ফকির আমীর। কিন্তু 'কী মজা' বলতে গিয়ে আমরা থম্‌কে যাই, বুঝতে পারি কৌতুকের মধ্যে মিশে রয়েছে ট্র্যাজিডি। কেননা খেলাটা অযথা সমাদর এবং অযথা অবহেলা দিয়ে তৈরি। খ্যাতি লাভ ক'রে যাঁরা বিস্মৃতি-সমুদ্রে তলিয়ে যান, ধীরে ধীরে অথবা দ্রুত, তাঁরাই অবশ্য সংখ্যাধিক, কিন্তু অবহেলা থেকে সমাদরে যাঁরা উঠে আসেন, তারা সংখ্যায় অল্প হলেও অবস্থার তীব্রতা তাঁদের ক্ষেত্রেই বেশি, অনেক বেশি। তবে উভয় ক্ষেত্রেই নিহিত থাকে ভাগ্যবিড়ম্বনা। আবার ব্যতিক্রমের মতো গ্রহণ-বর্জন-পুনর্গ্রহণ, এমন এক চক্রও কোনো বিরল মুহূর্তে ঘুরে যায়। এই মজাদার শোচনীয় পালাটা চলে সময়ের মঞ্চে, যা আয়তনে কখনো ছোট হয়, কখনো বা বড়।

যে-সব দেশে সাহিত্য, শিল্প ও সংগীতের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে ব'য়ে এসেছে, সেখানেই এই ওলট পালটটা স্পষ্ট ধরা যায়। মোৎসার্ট আজ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতস্রষ্টা হিসেবে বন্দিত। পঁয়ত্রিশ বছরের জীবনে তাঁর সৃষ্টি পরিমাণে ও স্বকীয়তায় বিস্ময়কর। কিন্তু যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন তিনি ক্রমাগত বাধাই পেয়েছেন, কোনো স্থায়ী কাজ পান নি এবং শরীর ভেঙে পড়ায় যখন তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে তখন তাঁকে মাটি চাপা দেওয়া হয় বিত্তহীনের কবরে। আর সেজান? আধুনিক চিত্রকলার বিরাট পুরুষ, নতুন শিল্পভাবনার অসাধারণ রূপকার সেজান? সারা জীবন তিনি কেবল বিড়ম্বিতই হয়েছেন। সরকারী প্রদর্শনকক্ষে ছবি রাখার অনুমতি তাঁকে কখনো দেওয়া হয় নি, যদিও আজ তাঁর ছবি লুভর্ মিউজিয়মের এক সম্পদ; তাঁর ছবির ক্রেতা জোটে নি কখনো, শেষ পর্যন্ত দোকানীর নীলামে তাঁর ছয়খানি ছবির দামের অঙ্ক হয়েছিল ৯৫ থেকে ২১৫ ফ্রাঁ পর্যন্ত যাদের প্রত্যেকটির মূল্য এখন লক্ষ লক্ষ ডলার। এই অবস্থার কথা ভাবলে বিমূঢ় হতে হয়।

এই গ্রহণ বর্জনের ব্যাপারটা সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক সাহিত্যের রাজ্যে। কীট্‌স্-এর অদৃষ্টে তাঁর জীবনকালে যে-ঔদাসীন্য ও বিরুদ্ধতা হয়েছিল তা অনেকেই অবগত আছেন। কেউ কেউ বলেন সেইজন্যেই তাঁর অকালমৃত্যু হয়। তা হয়তো ঠিক নয়, কিন্তু সেই সংবেদনশীল মন ঐ আঘাতে যে ক্লিষ্ট হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। অথচ এই কীট্‌স্‌কে পরে ইংরেজীকাব্যে সমসাময়িক মহৎদের মধ্যে মহত্তম বলে স্বীকার করা হয়েছে। কীট্‌স-এর কবিতা Ode to Melancholy-র মধ্যে যে ফরাসী কবির কাব্যের কিছু পূর্বস্বাদ পাওয়া যায় সেই বোদলেরই বা কতটা গৃহীত হন তাঁর সময়ে? এটা ঠিক যে তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, কিন্তু তা তাঁর কাব্যসংক্রান্ত অন্য কারণে। তাঁর উপর সকলের নজর পড়েছিল যেহেতু তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ Les Fleurs du Mal-এর জন্যে অশ্লীলতার দায়ে

আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। সাধারণভাবে প্রকাশকরা তাঁর প্রতি বিমুখ ছিলেন। একমাত্র পুলে-মালাসিস, যিনি ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় অবিচল ছিলেন। অবশ্য ঐ আদর্শবাদী প্রকাশকের ব্যবসা শেষ পর্যন্ত লাটে উঠেছিল এবং তিনি আত্মগোপন করেছিলেন বেলজিয়ামে। ভিকতর য়ুগো এবং আরো কোনো কোনো কবি তাঁর প্রতিভা স্বীকার করলেও বোদলের যে বেশি পাঠক পান নি তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। পৃথিবীর সর্বত্র আজ তাঁর কাব্যের অগণিত পাঠক, কিন্তু তাঁর সমকালে তাঁর স্বদেশে ছিল কতজন? এ সম্বন্ধে বোদলের নিজে যে শ্লেষোক্তি করেছেন তার উল্লেখ করা যেতে পারে। আদালত তার রায়ে বোদলের ও পুলে মালাসিসকে জরিমানা করেছিল এবং Les Fleurs du Mal-এর কিছু কবিতা বাতিল করার হুকুম দিয়েছিল। সেই বর্জিত কবিতা কয়টির (সংখ্যায় ছয়) সঙ্গে আরো কিছু কবিতা যোগ ক'রে পুলে মালাসিস গোপনে বেলজিয়ামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন Les Epaves নামে। তাতে প্রকাশকের ক্ষুদ্র নিবেদনটি লিখে দেন স্বয়ং বোদলের। তার শেষাংশটি এই : ‘‘এই প্রকাশনার সংবাদ গ্রন্থকারকে জানানো হবে এবং সেই সঙ্গে জানানো হবে সম্ভাব্য দুই শ যাটজন পাঠককে। যখন থেকে জন্তুরা সন্দেহাতীতভাবে মানুষের বাক্য আত্মসাৎ করেছে তখন থেকে ফ্রান্সে সাহিত্যানুরাগী জনসাধারণ বলতে মোটামুটি ঐ দুই'শ যাট জনকেই বোঝায়।’’ মালার্মের পাঠক সংখ্যা খুবই সীমিত ছিল। মনে হয়, শেষ পর্যন্ত প্যারিসের রোম সরণিতে তাঁর বাসগৃহে মঙ্গলবারের সাপ্তাহিক বৈঠকে যে গুণমুগ্ধরা জড়ো হতেন, তাঁরাই ছিলেন তাঁর প্রধান পাঠক। তাঁদের বাদ দিলে তাঁর কবিতা পড়বার লোক আর কতজন ছিল তা অনুবীক্ষণ-পরীক্ষার বিষয়। এই প্রসঙ্গে মালার্মের রচনা প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য। তাঁর কবি জীবনের প্রথম দিকে Le Panasse contemporain নামে তখনকার নব কাব্যের সংকলন বের হয় ক্রমান্বয়ে তিনটি। প্রথম দুটি সংকলনে মালার্মের কবিতা ছিল, কিন্তু তৃতীয় সংকলনে তাঁকে বর্জন করা হয়। এ সংকলনটি সম্পাদনা করেছিলেন আনাতল ফ্রাঁস। আবার অন্য দিকের এক বিশেষ দৃষ্টান্ত স্যুলি-প্রুদম। তাঁর কাব্যের জন্যে ১৯০১ সালে নোবেল প্রাইজ পান এই ফরাসী ভদ্রলোক — সাহিত্যে প্রথম নোবেল লরিয়েট। তাঁর কবিতা পড়া দূরে থাক, তাঁর নামটাই বা কজন জানে আজ? হায় নোবেল!

আমীর-ফকির নাটকের সবচেয়ে বিস্ময়কর নায়ক বোধ হয় পিয়ের দ্য রঁ সার। ষোড়শ শতকে ‘প্লেইয়াদ’ গোষ্ঠীর নেতা এই ফরাসী কবি তাঁর জীবনকালে অতুল খ্যাতি ও সম্মান অর্জন করেন। শুধু ফ্রান্স নয়, সারা ইয়োরোপ তাঁকে কবিশ্রেষ্ঠ রূপে বরণ করে। কিন্তু সপ্তদশ শতকের আরম্ভেই তাঁর প্রতি সবাই বিরূপ হয়ে যায়। এবং দুই শতাব্দীর অধিককাল তিনি বিস্মৃত হয়ে থাকেন। মাত্র গত শতাব্দীতে প্রভাবশালী রোমান্টিক লেখকরা সেই বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে তাঁকে উদ্ধার করে আবার তাঁর সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সমাদর ও অবহেলার এই অন্তহীন পালা আমাদের আরো আশ্চর্য করে এই কারণে যে, এরই সঙ্গে দেখা যায় বহু মহৎ প্রতিভা স্বকালেই স্বীকৃত হয়েছেন এবং সে স্বীকৃতি আর প্রত্যাহৃত হয় নি। তাহলে ওলটপালটটা কেন ঘটে? আমার বিশ্বাস, সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও পর্যালোচনাই শুধু এ রহস্যের কিনারা করতে পারে। রঁ সারের ক্ষেত্রে সেটা নির্ণয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বলা যায়, সতেরো ও আঠারো শতকের ক্লাসিক আদর্শ, সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান, নৈর্ব্যক্তিক সত্যসন্ধান এবং যুক্তিবাদ রঁ সার-যুগের ব্যক্তিগত আবেগ ও নিসর্গ-অনুভূতি থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে দিয়েছিল এবং উনিশ শতকে রোমান্টিকরা আবার তা ফিরিয়ে আনেন। তাই এই উত্থান পতন পুনরুত্থান। মহত্ত্বের সুস্থির স্বীকৃতির ক্ষেত্রে হয়তো একথা বলা যায় যে, কোনো কোনো প্রতিভার বহুকোণ বিকিরণে এমন কিছু রশ্মি থাকে যা মানুষের গতানুগতিক মনকেও স্পর্শ করে, সুতরাং সে প্রতিভার পূর্ণ উপলব্ধি ভবিষ্যতের জন্যে জমা থাকলেও সমসাময়িক কাল তাকে স্বীকার করে নেয়। এ ছাড়া, সাধারণভাবে বোধ হয় এটুকু বলা যায় যে,নতুন ভাব বা ভাবনা এবং নতুন বাক্‌ভঙ্গি সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ সমসাময়িক অভ্যাসে ঠিকমতো ধরা পড়ে না, ফলে স্বীকৃতির জন্যে তাদের অপেক্ষা করতে হয়। সমসাময়িক সমাদরের ঘটা এই মানসিক অবস্থারই আর এক দিক। যে রীতিপদ্ধতি এবং চিন্তার গতির সঙ্গে মানুষ পরিচিত, এমন কি তা যদি যান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায় তবুও, তাকে অভ্যর্থনা করতে তার বাধে না, যে কারণে তুচ্ছও মহতের মর্যাদা পেয়ে যায়। বর্তমানকালে এই শোচনীয়তা আরো বিস্তৃত হয়েছে, কেননা মানুষের সাহিত্য-কৌতুহলী মনের পরিচালনায় নেমেছে প্রচারযন্ত্রের ক্ষমতা। এই বিভ্রান্তির আর এক উৎস শিল্পবোধহীন পণ্ডিতী আলোচনা, যা সাধারণত গতানুগতিকতারই এক গুরুগম্ভীর প্রকাশ। এ বিষয়ে নতুন করে কিছু না বললেও চলে। ইতিপূর্বে, বিশেষত উনিশ শতকের ফ্রান্সে তুমুল বাদানুবাদ হয়েছে এ নিয়ে। বোদলের প্রমুখ অনেক কবি-সাহিত্যিক, প্রধানত নব কাব্যের যাঁরা শরিক তাঁরা, এই সাহিত্য-সমালোচনার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ জানিয়ে গিয়েছেন। এ সব বলার পরও কিন্তু রহস্য কিছু থেকেই যায়। গ্রহণ বর্জনের আসল কারণ সব ক্ষেত্রে সঠিক বোঝা যায় না। সেজন্যে বোধ হয় আরো গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। নাকি আমার এক কবি-বন্ধুর মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে শেষ পর্যন্ত বলতে হবে : ‘‘সবই কপাল, বুঝলেন, কপাল’’।

এই অবস্থার হাস্যকরতা উপলব্ধি করেই, মনে হয়, বহু প্রতিভাবান স্রষ্টা খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে মুখ একেবারে ঘুরিয়ে নেন। বিশেষ করে ফ্রান্সের লেখকদের মধ্যে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত রয়েছে, যেমন বোদলের, মালার্মে, ভালেরি, সার্ত্র এবং আরো অনেকে। তাঁদের এই মনোভাব বিশদ আলোচনার যোগ্য। এ প্রসঙ্গে আমার শুধু বারবার মনে ভেসে ওঠে র‍্যাঁবোর এক চলমান ছবি। মা'র বাড়ি রশ থেকে তিনি চলেছেন মার্সেইতে। অনেক বছর ধরে আফ্রিকা ও এশিয়া পর্যটনের পর এ তাঁর অন্তিম ভ্রমণ। মার্সেই-এর হাসপাতাল তাঁর গন্তব্য। প্যারিসের এক স্টেশনে নেমে শহরের মাঝখান দিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে তিনি চলেছেন আর এক স্টেশনে ট্রেন ধরতে। গাড়ির জানলা দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে ছিলেন সেই রোগজর্জর সাঁইত্রিশ বছরের যুবক, যিনি উনিশ বছর বয়সে কবিতাকে বিসর্জন দিয়েছেন। সেদিন প্যারিসের কেউ জানতে পারে নি কে গেল রাস্তা দিয়ে, অথচ সেই মুহূর্তে প্যারিসের তথা ফ্রান্সের সমগ্র সাহিত্য জগৎ তাঁর নামে আলোড়িত, তাঁর প্রতিভার কীর্তনে মুখর, তাঁকে অভ্যর্থনা করার জন্যে উদ্‌গ্রীব। তাঁর নিঃশব্দ অলক্ষিত

গমনের পথে তার মৃদুতম রেশও তিনি শোনেন নি, শুনতে চানও নি। তিনি তার আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছেন শুধু খ্যাতির দিক থেকেই নয়, কাব্যসাহিত্যের দিক থেকেও। অবশ্য এ বিদায় অন্য এক স্তরে, তবু সাহিত্যের সঙ্গে জড়ানো খ্যাতি সমাদরের বন্ধন ছিন্ন করা তো বটে।

তবে এইসব লেখক ব্যক্তিগত গৌরবের প্রতি উদাসীন হয়েও অবশেষে গৌরবের শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। কী বৈপরীত্য! কী অপরূপতা!

প্রথম প্রকাশ
বিভাব - ১৮তম সংখ্যা,
গ্রীষ্ম ১৩৮৯/জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৮২

গদ্য, পদ্য এবং কবিতা

অরুণ মিত্র

বোদলের যেমন খ্যাতিমান তাঁর ছন্দমিলের কবিতার জন্যে, তেমনই তাঁর গদ্যকবিতার জন্যে। ''ল্য স্প্‌লীন দ্য পারি'' নামে গদ্যকবিতার যে-সঙ্কলন তাঁর মৃত্যুর দু-বছর পরে ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়, তার মুখবন্ধ হিসেবে তাঁর একটি চিঠি ছাপা হয়। বন্ধু আরসেন উসে-কে লেখা এই চিঠিতে বোদলের বলেন : ''আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তার উচ্চাশার দিনে ভাবেনি এক কাব্যিক গদ্যের জাদুর কথা, যে-গদ্য হবে ছন্দমিলহীন সুরেলা, যথেষ্ট নমনীয় এবং যথেষ্ট অমসৃণ, যেজন্যে তা হৃদয়ের লিরিক আন্দোলন, স্বপ্নের তরঙ্গ এবং চেতনার উল্লম্ফনের উপযোগী মাধ্যম হবে?'' বোদলের-এর এই সব কবিতা ক্রমেই কবি ও পাঠকদের এক নতুন আকর্ষণ হয়ে ওঠে। বোদলেরই যেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ, এমন এক শ্রদ্ধার ভাবও কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায়। কিন্তু ফরাসীতে (এবং আমার ধারণা আধুনিক সমস্ত ভাষার মধ্যেই) যিনি গদ্যকবিতা সর্বপ্রথম লেখেন, তিনি বোদলের নন। অবশ্য বোদলের নিজেই সে-কথা ঐ চিঠিতে জানিয়ে দেন। তিনি লেখেন : ''তোমার কাছে একটা ছোট্ট স্বীকারোক্তি করব। আলোয়াজিয়্যুস বেরত্রাঁ-র 'গাসপার দ্য লা ন্যুই' অন্তত কুড়ি বারের বার চোখ বুলিয়ে দেখতে গিয়ে আমার মাথায় আইডিয়া এল যে, আমি অনুরূপ কিছু করার চেষ্টা করব এবং তিনি যে পদ্ধতি এক অদ্ভুত চিত্রল প্রাচীন জীবনের বর্ণনায় প্রয়োগ করেছেন, আমি তা আধুনিক জীবনের, বরং বলি এক আধুনিক ও আরো বিমূর্ত জীবনের বর্ণনায় প্রয়োগ করার চেষ্টা করব।''

কে এই আলোয়াজিয়্যুস বেরত্রাঁ, যিনি আধুনিক গদ্যকবিতার জনক? তাঁর প্রকৃত নাম লুই বেরত্রাঁ, দিঝঁ শহরে তাঁর বাড়ি, জন্ম ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে। দিঝঁ-র সাহিত্যসভায় তিনি তাঁর প্রথম গদ্যকবিতা পড়েন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে (ছন্দমিলের কবিতাও অবশ্য তিনি লিখেছেন তার আগে)। প্যারিসে গিয়ে তাঁর রচনা তিনি শোনান ভিক্তর য়্যুগো এবং অন্যান্য খ্যাতনামা কবি সাহিত্যিকদের, তাঁদের প্রশংসাও পান। দিঝঁ শহরে একাধিক পত্রিকার সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট হন, পত্রিকা পরিচালনাও করেন। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের জন্যে ১৮৩০-এ যে-বিপ্লব হয়, তাতে তিনি বিপ্লবী পক্ষকে সমর্থন করেন। পরে তিনি স্থায়ীভাবে প্যারিসের বাসিন্দা হন, কিন্তু বেশি দিনের জন্যে নয়। কারণ নিদারুণ দারিদ্র্যে তাঁর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে এসেছিল, তাঁকে ধরেছিল যক্ষ্মারোগ, তাতেই তিনি মারা যান ১৮৪১ সালে।

বাক্যের ধ্বনি এবং গতিভঙ্গি বেরত্রাঁর গদ্যকাব্যকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল যে, সাধারণ গদ্যের সঙ্গে তাঁর সে-গদ্যকে এক শ্রেণীভুক্ত ক'রে ভাবা সম্ভব ছিল না। তাঁর অদ্ভুত চিত্রকল্প এবং কোনো কোনো রচনার প্রচ্ছন্ন অনুরণন এক শতাব্দী পরে তাঁকে সুররেয়ালিজ্‌মের অগ্রদূতরূপে প্রতিষ্ঠিত করে।

সেই সময় থেকে আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে গদ্যকবিতার প্রচলন। বহু প্রখ্যাত কবির অবদানে ক্রমে এই ধারা পুষ্ট হয়েছে। বোদলের তো আছেনই, তারপর আরো কতজন :

র‍্যাঁবো, লোত্রেয়ামঁ, স্যাঁ-ঝন পের্স, পল ক্লোদেল, মাক্স ঝাকব, এল্যুয়ার, আরাগঁ, ফ্রাঁসিস পঁঝ ইত্যাদি। এদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু গদ্যেই লিখেছেন কবিতা। বর্তমানে তো গদ্যকবিতার সীমাসংখ্যা নেই।

কিন্তু গদ্যকবিতার উৎপত্তির এক পশ্চাৎভূমি আছে যা হয়তো সকলের জানা নেই। সেটা খুব কৌতূহলের। আমার বিশ্বাস, সেখান থেকেই আহরিত হয়েছিল গদ্যকবিতার বীজ। এ-কবিতার ভাবনা অলক্ষ্যে প্রবেশ করেছিল সাহিত্য-মননে। সে-পশ্চাৎভূমি আর কিছু নয়, আঠারো শতকের এক মহাবিতর্ক। গদ্য বনাম পদ্য, এই ছিল দ্বন্দ্বের বিষয়। মোটামুটি আঠারো শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ষষ্ঠ দশক পর্যন্ত চলে এই বাদবিতণ্ডা। গদ্য অথবা পদ্যের পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এসেছিলেন তৎকালীন ফ্রান্সের খ্যাতনামা লেখক ও মনীষীরা। তাঁদের মধ্যে কারো কারো নাম আজও উজ্জ্বল। যেমন, ভলতের, দিদরো, মঁতেসকিয়্যো, ফেনলঁ, ফঁতলেন, দালাঁবের, ভোভনার্‌গ্‌, মারমঁতেল।

সেটা ছিল যুক্তিবাদের প্রাধান্য-কাল। দেকার্তীয় দর্শনের উত্তরাধিকারকে জনসাধারণের কাছে সরলীকরণে বিকৃতও করা হয়েছিল যথেষ্ট। সুতরাং প্রথম থেকেই কল্পনা ও ভাবাবেগের বিরুদ্ধে এক আক্রমণাত্মক মনোভাব আত্মপ্রকাশ করেছিল। কেউ কেউ তো কবিতাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন। একজনের উক্তি এই : ''পদ্যশিল্প এক চপল শিল্প। লোকে যদি তা নিষিদ্ধ করতে সম্মত হয়, তাহলে আমাদের কোনো ক্ষতি তো হবেই না, বরং অনেক লাভ হবে।'' অভিযোগটা ছিল এই যে, কবিরা যুক্তির ধার ধারে না, মনগড়া কথা বলে যার সঙ্গে বাস্তবের কোনো সম্পর্ক নেই এবং কবিতায় তারা যে-আবেগ প্রকাশ করে তা মানুষের মৌল আবেগ নয়। এক অভিযোক্তা তাই বলেছিলেন : ''সুখী শান্ত প্রেম যদি কবিতার ভাষা আশ্রয় করতে চায় তো করুক। কিন্তু কোনো মানুষ ঈর্ষায় পাগল হয়ে কিংবা যন্ত্রণায় মরণাপন্ন হয়ে যদি সে-বিষয়ে একশ চরণের এক পদ্য লিখতে শুরু করে, তাহলে তার চেয়ে অস্বাভাবিক আর কী হতে পারে?'' এর ওপর আবার আছে কবিদের অহমিকা, যেন কত শ্রেষ্ঠ তাঁরা অন্যদের তুলনায়। সৃজনশীল যুক্তিবাদের উদ্গাতা, সমাজতাত্ত্বিক ও আইনবিদ চিন্তানায়ক মঁতেসকিয়্যো তাঁর ''লেত্‌র্‌ পেরসান'' (পারস্য পত্রাবলী) গ্রন্থে কবিদের এক হাত নেন যুক্তিবিরোধী ব'লে। ফ্রান্সপ্রবাসী ইরানীর কাছে প্যারিসবাসী এই বর্ণনা দেন কবির : ''সেই সব গ্রন্থকার যাঁদের পেশা হল সহজ কাণ্ডজ্ঞানে বাধা সৃষ্টি করা এবং ভাষার অলঙ্কার দিয়ে যুক্তিকে চাপা দেওয়া।''

যাঁরা পদ্যের পক্ষে ছিলেন তাঁরা অবশ্যই আত্মসমর্পণ করেননি। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবলকণ্ঠ ভলতের। দিদরো এবং দালাঁবেরও কবিতার সমর্থনে দাঁড়ান।

তত্ত্বের দিক থেকে কবিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ যা ছিল তার সারমর্ম প্রকাশ পায় যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও মনীষী ফঁতনেল-এর বক্তব্যে। তিনি বলেন, মানুষের চেতনাকে কোনো কিছুতে নিয়োজিত না ক'রে অজ্ঞাত শক্তির উপর নির্ভর করা তো ''পশুর প্রবৃত্তির অনুরূপ। কারণ এই উদ্দীপনা ও এই উত্তেজনা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করলে প্রবৃত্তি ব'লেই প্রতিভাত হবে।'' এবং কবিতার সমর্থকদের মধ্যে তাত্ত্বিক প্রবক্তা হিসেবে, মনে হয়, গণিতবিদ্ প্রাজ্ঞ দালাঁবের-ই শ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন : ''কোনো কাব্যরচনার ভিতরে

কথা বলতে হয় কখনো কল্পনার কাছে, কখনো অনুভূতির কাছে, কখনো যুক্তির কাছে, কিন্তু সব সময়ই ইন্দ্রিয়ের কাছে। কবিতা এক ধরনের গান, যার উপর কানের দাবি এত বেশি যে, কোনো কোনো সময় যুক্তিকে তার কাছে অল্পস্বল্প আত্মোৎসর্গ করতেই হয়। সুতরাং কোনো দার্শনিকের অন্য সব কিছু থাকা সত্ত্বেও যদি ইন্দ্রিয় না থাকে তাহলে তিনি কাব্যবিষয় বিচারের অনুপযুক্ত।''

ভলতের-এর বক্তব্য ছিল প্রধানত বহিরঙ্গ নিয়ে। তাঁর মতে ছন্দ ও মিল কাব্যরচনায় অপরিহার্য। এমনকি তিনি ফতোয়া দিয়ে দেন:''গদ্যে কোনো কবিতা হয় না।'' তাঁর জীবনকালে চিন্তা-রাজ্যে ও সাহিত্য-জগতে তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা, এমনকি কবি হিসেবে তাঁর প্রাধান্য প্রতিপক্ষকে বিপর্যস্ত করে, যদিও তাঁর নিজের কাব্যিক দৃষ্টান্ত কবিতার মর্যাদার বিষয়ে আজ আমাদের কাছে গুরুত্বহীন, কেননা তিনি গতানুগতিক পথেরই যাত্রী ছিলেন এবং আমাদের স্পর্শ করবার মতো অসামান্যতা আমরা তাতে আবিষ্কার করি না। অবশ্য ছন্দমিল কাব্যকে যে-নিগড় পরায়, তার প্রয়োজনের কথা ভলতের বলেন। শিল্পে আঙ্গিকগত বন্ধনের গুরুত্ব পরবর্তী শতকে পার্নাসিয়ান কবি-গোষ্ঠী স্বীকার করেন এবং প্রচারও করেন। বিশ শতকে পল ভালেরিও তার সমর্থনে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মতে এই বন্ধনকে স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে তাকে ছাড়িয়ে ওঠার মধ্যেই কাব্যের সাফল্য নিহিত।

ভলতের এবং তাঁর সহযাত্রীরা আপাতত জয়ী হলেও অভিযোগটা কিন্তু তলে তলে থেকেই যায়। বহিরঙ্গ বিচারে প্রধান আক্রমণ ছিল ছন্দ ও মিলের বিরুদ্ধে। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, কারণ যে-কোনো ভাষাতেই ছন্দমিলের ছকে একটা যান্ত্রিকতা আসার সুযোগ থাকে, আর ফরাসী ভাষার কাব্যে প্রথাগত মিলের নিয়ম তো অসম্ভব যান্ত্রিক। বারো মাত্রার আলেক্‌সাঁদ্র্যাঁ ছন্দের আধিপত্য ছাড়াও মিলের ক্ষেত্রে 'পুং-মিল' 'স্ত্রী-মিল' আর 'সমৃদ্ধ মিল' 'দীন মিল' ইত্যাদি নির্দেশ কবিতার প্রথাগত ফর্মকে অত্যন্ত কৃত্রিম ক'রে তুলেছিল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ ধর্মতত্ত্ববিদ মনীষী ফেনলঁ লেখেন : ''মিলের কারণে আমাদের কাব্যরচনা লাভ যতটা করে, তার চেয়ে খোয়ায় বেশি : অনেক বৈচিত্র্য, অনেক সৌকর্য ও সুস্বনতা সে খোয়ায়। সমৃদ্ধ মিল ব্যবহার করা সম্বন্ধে লেখক খুব নিষ্ঠা দেখান, কিন্তু চিন্তা ও অনুভূতির স্বরূপ সম্বন্ধে কিংবা অভিধা সম্বন্ধে কিংবা স্বাভাবিক বাচন সম্বন্ধে কিংবা প্রকাশভঙ্গির মর্যাদা সম্বন্ধে সে-নিষ্ঠা তিনি দেখান না।'' তবে ফেনলঁ মিলকে বর্জন করতে বলেননি, মিলপদ্ধতিকে আরো নমনীয় করতে বলেন। সমালোচকেরা মিলের বিরুদ্ধে একঘেয়েমি সৃষ্টির অভিযোগও করেন। একজন বলেন : ''একই মাত্রায় এবং একই অন্তধ্বনির ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি আমাদের কাছে আজ এক বিরক্তির উৎস।'' লেখককে তাঁর কল্পনা ও অনুভূতির ক্ষমতা ঠিকমতো ব্যবহার করতে তা বাধা দেয়। ''চলাফেরায় বাধামুক্ত মানুষের অঙ্গভঙ্গির সহজতা, নমনীয়তা এবং বৈচিত্র্য কি বাধায় বেষ্টিত কোনো মানুষ পেতে পারে? টানদড়ির উপরে যে নাচে সে কি কখনো রঙ্গালয়ের নর্তকের মতো নিখুঁত শিল্পরূপ এবং উপভোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারে?''

হিসেব-করা মাত্রানির্ভর ছন্দ এবং নিয়মিত মিলের প্রতি এই বিরুদ্ধতার পাশাপাশি চলে গদ্যের গুণকীর্তন। প্রায়ই উল্লেখিত হতে থাকে সতেরো শতকের শেষে ফেনলঁ-র

লেখা উপন্যাস "লেজাভাঁত্যুর দ্য তেলেমাক"। ফেনলঁ এই উপন্যাস লিখেছিলেন তাঁর রাজবংশীয় ছাত্রকে শিক্ষাদানের জন্যে। কিন্তু এই গ্রন্থ এক অসাধারণ সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত হয়। কোনো কঠোর যুক্তিবাদীর এবং তাত্ত্বিক বিতর্কবিদের মূর্তি এতে প্রকাশ পায়নি, এতে আত্মপ্রকাশ করেছেন এক কবি, যিনি আগের কথা টেনে আনেন কথার স্রোতে, যিনি বলা কথা আবার বলেন আরেক অনুষঙ্গে, যিনি কোনো ভাবকে জাগিয়ে তোলেন নানা ইঙ্গিতে। ছন্দেমিলে না লিখলেও কবিতার সৌন্দর্য যে ফোটানো যায় তারই দৃষ্টান্ত রূপে "তেলেমাক"-এর নাম বার বার উচ্চারিত হয়। গদ্য যে পদ্যের চেয়ে মহৎ তা প্রমাণের জন্যে গদ্যের কাব্যগুণ দেখানোই ছিল এ-নামোল্লেখের উদ্দেশ্য। যুক্তিতর্ক ও উদাহরণ দিয়ে লোককে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, ছন্দমিল থাকলেই কবিতা হয় না,কবিতা হতে হলে এক শক্তিশালী কল্পনা, এক সমুন্নত হৃদয়াবেগ এবং এক সামগ্রিক সুস্বনতা তাতে থাকা দরকার। গদ্যে এ-গুণাবলী পদ্যের মতোই থাকা সম্ভব। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক মারমঁতেল বলেন যে, গদ্যে সুস্বনতা উৎপন্ন হতে পারে "সহজ, পূর্ণ এবং ধ্বনিকম্প্র সিলেব্‌ল্ সমূহের এক বৈচিত্র্যময় মিশ্রণের দ্বারা, যা শ্রবণ-রুচি অনুযায়ী কখনো মন্থর, কখনো দ্রুত," এবং এই নির্বাধ সুস্বনতা পদ্যের সুস্বনতার চেয়ে শ্রবণের পক্ষে অনেক বেশি সুখকর। নিয়মিতভাবে আবর্তিত পদ্যধ্বনি অনুভূতির অথবা ভাবের বৈচিত্র্য অনুযায়ী অতটা পরিবর্তিত হয় না। সুতরাং মারমঁতেল-এর মতে কবিতার পক্ষে উচিত এই একঘেঁয়ে দোলানি ভেঙে দিয়ে নিজেকে বাঁচানো।

ফরাসী মনীষার ব্যাপক ও গভীর উপলব্ধি এবং ফরাসী মননের অশ্রান্ত সক্রিয়তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে সাহিত্য-ইতিহাসের এই বিবরণে। এ-সব তথ্য ও ঘটনা অনুধাবন ক'রে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, গদ্য-পদ্যের ঐ আঠারো শতকী বিতর্কই পরের শতকে গদ্যকবিতা রচনার মানসিকতা প্রস্তুত করে এবং যে-প্রবণতা সুপ্ত ছিল তার জাগরণ ত্বরান্বিত করে। একদিকে প্রথাগত ছন্দ-মিলের গুরুত্ব অস্বীকার আর অন্যদিকে গদ্যের মধ্যে কাব্যসৌন্দর্যের উৎসনির্দেশ, এই ছিল পদ্যসমালোচকদের বক্তব্যের দুই প্রধান দিক। এর ফলে লেখকদের চিন্তায় যে-আলোড়নের সৃষ্টি হয়, ভলতের-এর মতো প্রবল সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব তাকে স্তিমিত করে বটে, কিন্তু তাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। বরং বলা যায়, তার ক্রিয়া আরো গূঢ়ভাবে সৃজনী মননে সঞ্চারিত হতে থাকে। পরবর্তী শতকের প্রথমভাগেই তার প্রমাণ আমরা পেয়ে যাই। ঐ বিতর্ককাল থেকে আলোয়াজিয়্যুস বেরত্রাঁ-র দূরত্ব তো বেশি নয়। তারপরই গদ্যকবিতা লিখলেন বোদলের। তারপর আরো কত রথী মহারথী। গদ্যকবিতার এক অব্যাহত ধারা দেখছি তখন থেকে আজকের দিন পর্যন্ত। এবং তার অবলুপ্ত হবার কোনো লক্ষণ কোথাও দেখছি না।

প্রথম প্রকাশ
বিভাব - ৩৫তম বিশেষ
ফরাসি সাহিত্য সংখ্যা
শীত ১৩৯৩/ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

স্মরণ

মণীন্দ্র রায়

মৃত্যুঞ্জয় সেন প্রকাশিত মণীন্দ্র রায়ের
শেষ কাব্যগ্রন্থ, ১৯৯৯-তে প্রকাশিত
'ভালো থেকো' থেকে কয়েকটি কবিতা
আমরা পুনর্মুদ্রণ করলাম। বাংলা কবিতার
জগতে তাঁর অবদান আমরা
সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি।

দিনপঞ্জির টুকরো

আমার মৃত্যুর দিনে চোখে জল আসবে না কারো।
আমি কারো প্রিয় নই, প্রেমিক দূরের কথা, শিরঃপীড়াও নই।
যদি কেউ কাছে থাকো গন্ধফুল দিও না প্রগাঢ়।
হালকা ওডিকোলন দিও, আর দীর্ঘ নীরবতা, আধি-বই।
আমিও মৃত্যুর পরে চলে যাব হাঁ-মুখ চুল্লির অগ্নি মাঝে।

যদি একবার

তুমি আজ কাছে নেই তবুও আমার
মনের জানালা খুলে অন্ধকারের দূরের হাওয়ায়
পাই স্নিগ্ধ তোমারই সুরভি।
একটি অস্তিত্ব তুমি, তবুও স্মৃতির চোখে চোখে
ঢেউয়ের জ্যোৎস্নার মতো হাজার হিরায়
কত চেনা রূপেরূপে ভেসে ওঠ, মৌন চলচ্ছবি!

আমার সমস্ত স্বপ্নে তোমারই নামের
বৃষ্টি ঝরে! সব ধূলিকণা
মেলে ধরে অভীপ্সার ময়ূর কলাপ।

আর তুমি উদাসীন, এ দিগন্ত ছেড়ে
কোথায় চলেছ? কোন্ অরণ্যের টানে
বাষ্পনীল তোমার উত্তাপ!
আমাকে চাও না, জানি। তবু একবার
যদি দেখে যেতে তুমি, পরিত্যক্ত তোমারই এ ঘরে
কত ভাঙাচোরা কথা, অশ্রু, হাসি, চোখের চাওয়ায়
কী তীব্র আবেগে বেঁধে গড়ে তুলি মূর্তি কবিতার।
একবার যদি তাকে বুকে নিতে, হয়ত তখনি
স্নায়ুর বিদ্যুতে, রক্তে, মেনে নিতে — কী তুমি আমার!

আমাকে পাবে না আর

আমার মাথা কি তবে ঘুরে গেছে পেছনের দিকে
কেবলই স্মৃতির কথা বলি
না আমি শ্মশানস্তবক রাখি না নিজের মৃতদেহে,
চেয়ে আছি আগামীর দিকে
লেনিনগ্রাদে সেই শ্বেত রাত্রে আধো আলো অন্ধকারে,
জোড়ায় জোড়ায় কত যুবক যুবতী ঘোরে উপবনে
প্রেম করে চুমু খায়
বুকের ওপরে নেই কোন পিরামিড
বাখ-এর অর্গানে নড়ে ওঠে রিড
সেই শুরু, তারপর ভ্যানগগ মোৎসার্ট আব্দুল করিম
আছেন সত্যেন বোস ঋত্বিক ঘটক....ততঃ কিম
ভবিষ্যৎ রিল খুলে যাবে কতদূর জানি না তা
মজ্জাগত এ বিশ্বাস মানুষের বিবর্তন থামবে না,
কিছুই যাবে না বৃথা
দিগন্তের পরে আরো উন্মোচিত নতুন দিগন্তে
নতুন প্রজন্ম থেকে আরো কত নতুন প্রজন্ম এসে,
ঘর বেঁধে ঘর ভেঙে
জেনেটিক কোডে কথা অবাক বিস্ময় নাই আদি অন্ত

আমাদের গোলা পায়রা নীল রং
যা আমি দেখেছি, বাংলার মাঠে ঘাটে গাছে ও প্রান্তরে
সবুজ টিয়ার সঙ্গে চরে

তাই দেখি মস্কোর ক্রেমলিনে বিখ্যাত সে লাল চত্বরে
লন্ডনেও একই দৃশ্য ট্রাফালগার স্কোয়ারে
এই সব সৌন্দর্যই সব নয়
দেখেছি মিউনিখে ব্যাভেরিয়া ভেদ করে আল্পসে চড়ে
ওভার অ্যামার গায়ে দিয়ে প্যাশান প্লের চত্বরে ঘুরে
মুগ্ধ আমি হয়েছি একদিন
সেখানেই আমি গির্জার গেটের ভেতরে ঢুকে
বীভৎস কৌতুক মৃত সব কার্ডিনাল
জমকালো পোশাক পরে কাচের আড়ালে দু'চার শতাব্দীর প্রাচীন কঙ্কালে
নাকহীন চক্ষুহীন বিকশিত দাঁতে শুয়ে আছে
প্রজন্ম প্রজন্ম ধরে মানুষ চমকাতে।
সেদিন ফেরার পথে নীচু সিলিং-এর এক রেঁস্তরায় ঢুকে
সুস্বাদু খাদ্য খেতে আর পারিনি আমি
কী এক মানসোসুখে।
বন্ধুগণ পাঠক আমার বোম্বাইয়ের মালাবার পাহাড়ে উঠেছ কি?
দেখেছ কি নীচে সমুদ্রের বাঁকে সন্ধ্যা হলে লাল নীল সাদা
—ঝকঝকে রানীর নেকলেস
কী বিরাট আমাদের দেশ
গিয়েছ কি সারনাথে কোভালাম বিচে
যাওনি তো? থাকো ঘরে। হঠাৎ নবাব হয়ে
প্রাতরাশ সেরে নিও সাহেবি বনেদি পরিজে।

আমি এক সামান্য লেখক
রাজগীর পাহাড়ের কোনো কুরুবক
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে
প্রিয়ার বিরহবশে
কোনো মেঘদূত আর লিখতে পারি না
ক্ষমা করো বন্ধুগণ
আমার কলমে নেই জাদু
কোনো লেখা হয় না তত স্বাদু।
দুদিন সবই এ জীবনে কোনো কিছু করতে না পেরে
শেষমেশ হয়ে গেছি কবি

মহতের জুতো পেয়ে, পা গলিয়ে উঠে গেছি কালপুরুষের দিকে
আমাকে পাবে না আর, বাকিটা তোমরা নিও লিখে।।

নির্বাসিতের গান

আবার দুচোখে এস পরিপূর্ণ স্মৃতির ভূগোলে
সীমায় সীমায় বাঁধা হে আমার শরীর প্রতিমা!
ঝড়ে-বাঁকা নারিকেল পল্লবে তোমারই খোঁপা খোলে
পদ্মার দুরন্ত বাঁকে স্বপ্নজয়ী গ্রীবার মহিমা।

তোমার ও-মুখ আজ দ্বিতীয়ার চাঁদের পাণ্ডুর
জ্যোৎস্নায় ধানক্ষেত — যেন রং মোছা কবেকার
পূর্বপুরুষের ছবি — বিষণ্ণ, বিস্মৃত, কতদূর !
পূর্ণিমার ঢেউ তুলে এস স্বচ্ছ দু'চোখে আবার।

তুমি কি জানো না মেয়ে যৌবনের উদ্দাম নিঃশ্বাস
কাঁপায় তোমার বুকে তীরলগ্ন নৌকার গলুই!
আধারের হীরাকষে রুদ্ধ এক জলজ উচ্ছ্বাস
তোমার শরীর ঘিরে কাঁদে, তুমি বোঝো না কিছুই?

কতো রাতে হাটফেরা দেখেছি মাঠের পথে দূরে
আঁধার গ্রামের কোলে অগ্নিবিন্দু তোমার প্রদীপ
প্রতীক্ষায় স্থির; কতো রাত্রিশেষে সোনার মুকুরে
দেখেছি কপালে আঁকো নবারুণ হিঙ্গুলের টিপ।

তোমার তুলনা নাই, কোমলে কঠোর প্রিয়তমা!
বাংলার মাটির মতো কিছু পলি কিছুটা খোয়াই;
কোথাও শিশুর মতো পুতুলের খেলা কর জমা;
আঘাতে জীবন গড়ে, কোথাও বা তুমি সে নেহাই।

তোমাকে দু'চোখে চাই। এস তুমি, হৃদয়ে কাঙাল
কাটে না স্মৃতির স্বপ্নে। খুলে ফেল ও অবগুণ্ঠন।
ছিঁড়ে যাক ক্লান্ত সুর, ভেঙে যাক সানাইয়ের তাল,
দুহাতে হৃদয় দাও—দাও জলমাটির বন্ধন।

আলোকচিত্র : কাজল চক্রবর্তী

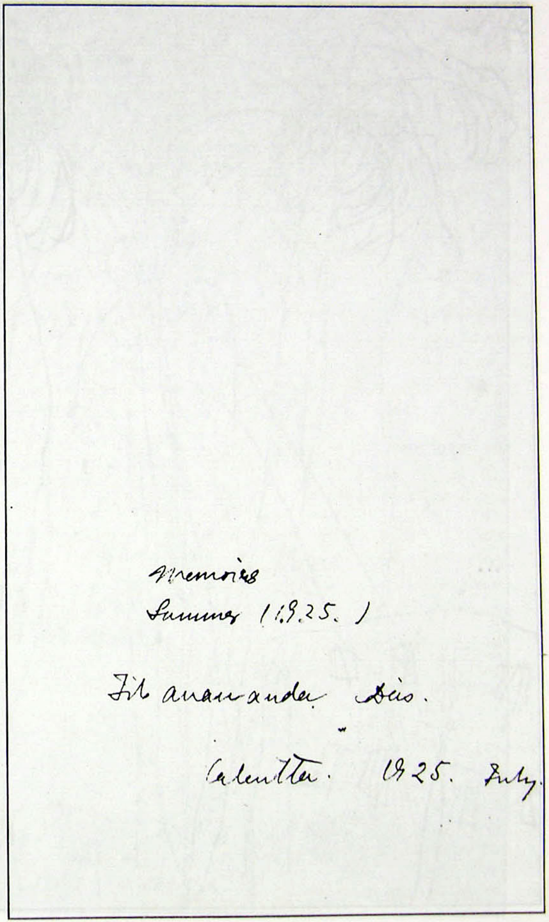

Memoirs
Summer (1.9.25.)

Jibanananda Das.

Calcutta. 1925. July.

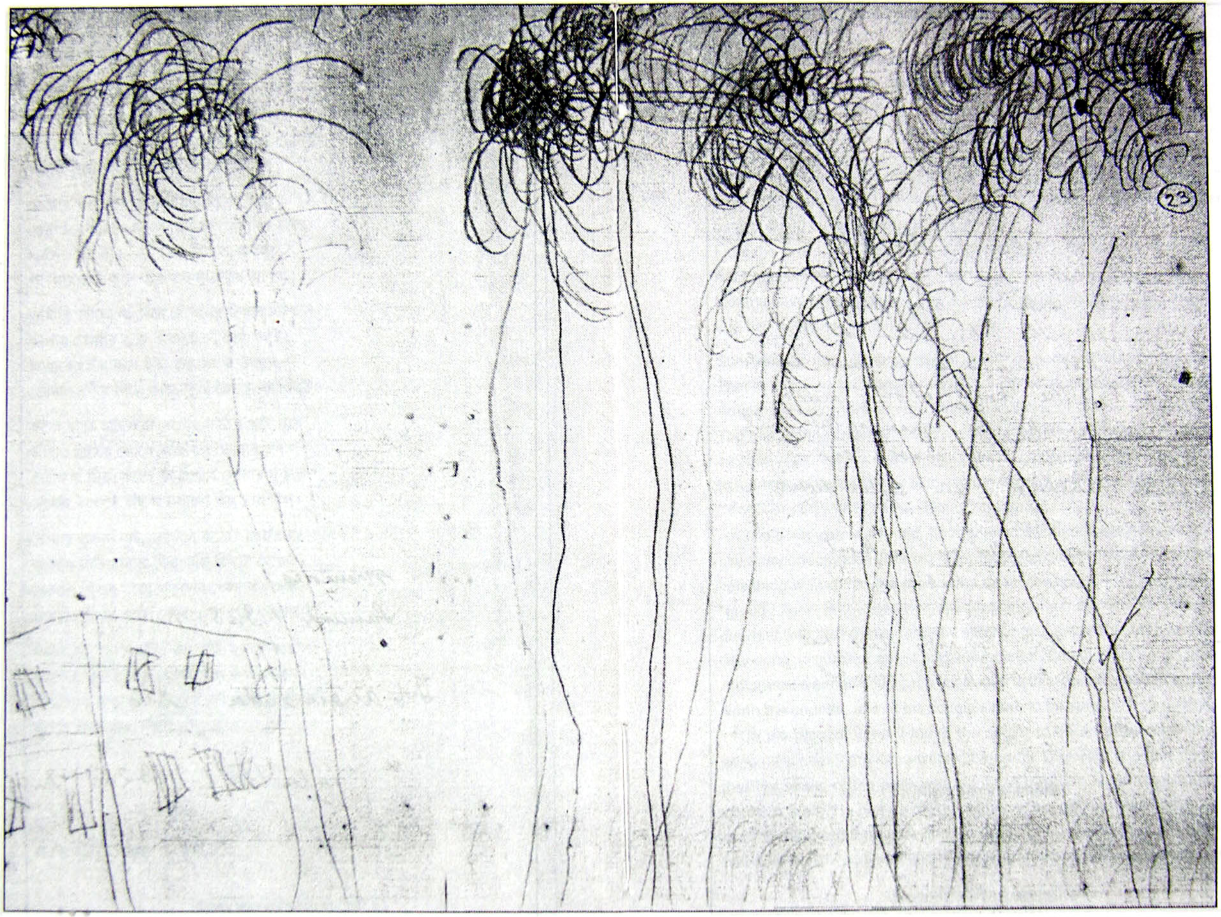
㉓

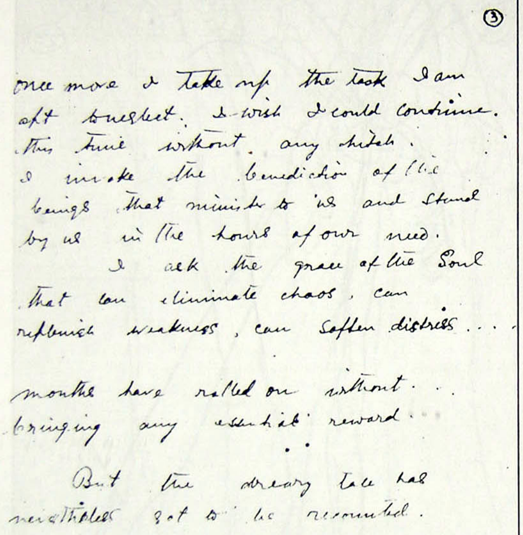

③

once more I take up the task I am apt to neglect. I wish I could continue. this time without any hitch. I invoke the benediction of the beings that minister to us and stand by us in the hours of our need.

I ask the grace of the Soul that can eliminate chaos, can replenish weakness, can soften distress...

months have rolled on without bringing any essential reward...

But the dreary tale has nevertheless got to be recounted.

জীবনানন্দ দাশের হস্তলিপি।

জীবনানন্দের অপ্রকাশিত দিনলিপি

Memoirs Summer (1925) July

Jibanananda Das

Calcutta

1925 July

Once more I take up the task I am apt to neglect. I wish I could continue this time without any hitch. I invoke the benediction of the beings that minister to us and stand by us in the hours of our need.

I ask the grace of the Soul that can eliminate chaos, can replenish weakness, can soften distress.....

Months have rolled on without bringing any essential reward. But the dreary tale has nevertheless got to be recounted.

Summer vacation. College closes. Start for home. Vebul III, myself Inter. That is rather to be regretted. I can not yet account why I did it. Seat rush. Amulya Ghosh in the steamer. Vairagi in the Inter class — my goggles — The mahomedan youths — quite a fix at Khulna — sorry affair — The devil catches me in the hip — Inter-class almost packed up — Amulya invites me to tea — A jolly exterior the fellow has — Don't know interiors — He sang — ''বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে'' — etc. of Atul Sen

The song was well tuned. Though actually there were no rains, and the sky was perfectly clear, the big revolving wheels of the steamer churned the splashing waves into the music of a deep downpour. For, we were on the "ground floor" of the steamer, standing very near the wheels and at close quarters with the open air and the overhanging sky....The song was repeatedly sung, discussed about and appreciated. Bits of other songs followed. Atulprasad's songs have got a fair vogue in this country. And in any majlish worth the counter, one of his songs is sure to be sung.

In the present case, I found the singer to be an awful partisan of A's songs. Partisans the song-writer has many. Dilip Roy is one. I don't think that the songs of the particular author in question have any great ring of poetry in them. He has no big message; — but I shall not talk of messages in connection with any writer who wields the pen....Again, this particular writer has no extensive mastery over metre and rhythm. One should say that the writer is careless in the techniques of rhythm & metre. His rhymings are too often defective.

His thoughts are, of course, commonplace. His sentiments are not fresh.

But they are a bit freshly expressed. And he has replenished Bengali songs with Hindusthani conventions. Thus he has widened the mode of our native singing and released the tedium of narrowness that might oppress our singers and the audience of our songs. All are belong to a very different sphere, and, personally I have very little to do with them.

On the whole, Atulprasad's songs appeal. But to say that he is a great poet or even a good poet proceeds from the inherent ignorance of the unpoetical.

What is poetry?....

I have no mind to define it here. I shall only say that the poet with his instrument of expression touches depths deeper than any other plummet can sound. Very rarely Atulprasad does it. Just read what he has written, unbiassed by the way in which they are sung, and you have got into the very core of the matter.... But the songs, — specially the song of the "Birahi" of a rainy night in a lone corner of a village in Bengal, will have a wide hold on the mind because of its essential human note.

Steamer — Interclass. Totally packed up. A student of the City College, perhaps, popped in, and had the good talk of an hour with a Sir Might-have-been, who is consequently a Sir Despondent. Sir M. talked of the Hindu Hostel of remote days, the rarity of tea-shops in those days, the theatre or theatres of that period, of his play going nights, of card-playing, logic-chopping, scanty reading and long spells of idleness and gossip....

From the student he began to amass information of some of the latter's contemporaries and juniors and was evidently depressed when he found that some of them had possessed the field while he himself was surely an out-played uncle William!

The students whispers were louder than drum-taps. And he discharged batteries of nonsense. I would rather hug a shivering wintry hearth pested with mosquitoes than stand a jabberer of the above type. But I had to. Strange bedfellows are never rarities....

Down. Prof. H — of Calcutta University fame suddenly nervous in class III. He seemed jovial and jaunty to a degree. My common experience is that

men who chose nothing but class I in internal exams of our depleted universities will have nothing but Class III in the final selection of the amenities of life.

They will have nothing of the orange-juice if the orange-pips are cheaper. They have set a premium on cheapness and a discount on enjoyment. They are bent on having dull men and drab surroundings hanging about them. It is not, of course, known whether they have got a different standard for measuring the true art and the false art of living, whether they have revalued and are given to revalue all the so-called values of existence and have found them essentially wanting.

Only one thing is clear. They will have no facilities. They insist on incommodity with a neophyte's zeal.

To me they seem to be a race of bunglers. The whole nation is bungling Economy is a sound thing no doubt. But economics has never been studied in our country and very rarely practised by our countrymen. To set a premium on cheapness is the last thing that Economics demands. It is a gross abuse of the science and an insult to human intelligence.

It is because we have been always degrading our judgement and have been always carried away by any amount of cooked-up sentiments that we stand where we stand, that we are what we are.

It is not because Prof. H. and many others of the profession with sufficient incomes travel IIIrd class that they are to be blamed. But the dammit insistence of these men and many others of their Ilk on the bad sour dishes of life and nothing but sour and bad dishes — Has practically given the whole nation nothing but sour and bad dishes.

We have no taste for enjoyment. We care little for amenities. Nor have we any instinct for aesthetics. We are content with fourth-hand men & materials. We have no complaints if the chair is bug-ridden and creaking if we can just manage to sit on it somehow. We don't mind of the roof is leaky if we can just manage to scramble a safe nook in the odd hours of the rains. We don't mind if the lamp is broken, if the ink is wooden, if the pencil is hazy, if the knife is blunt, if the servant is a loon and the master a tyrant, the order disorderly, and the law illegal in case they somehow save our inefficient ends. The same inanity and fatalism which have taught us to stand a Draco, or a dragon, with total absence of ruffle in the bigger games of our life have also allowed us bugs and mosquitoes, rickety chairs and dusty rooms.

Pass away uncomplained in the homely chambers of domesticity....

We say that we are no worshippers of matter, that we are not materialists. Might be. But, certainly we are not spiritual. As a matter of course spiritual grace is impossible of attainment in an allocation of moths, mosquitoes, and moles. And we have enough of the last. (No,— we are not spritual). It is not a fact that we hate matter or material splender. We grind our daily rounds of topics on nothing but matter; material prosperity is the vision of our brains; matter and materialism are not dead in our scheme of life. They are only moribund. They lie hid in the subconscious regions of the mind. Time and oft, the placid millponds of our consciousness set disturbed by big boulders from outside — v.z. — a friend's worldly success, or a nation's grand achievement in the realm of matter. We gesticulate and get turbid. But we cannot flow. We cannot "bricker down a valley" as the fact would have it. We have not the varve of a stream in us. Our nation is no better than a dead pool. We are barricaded on all sides. We have lost the Iconoclast's spirit. An iconoclast in embryo sets no response from his surroundings in our country. He droops. It is nobody's business to look after him. He dies. None notices. An iconoclast is an anathema. Thus, we have piled up heaps of Pantheons & Puranas, and set them as nucleii for a sickening multitude of rites & ceremonies to cluster round, and clog each particular pore of the nation's body so that it might die a natural death of suffocation.

Whatever accretes is welcome. Time, & accretion in time, are the only criterious of genuineness. We never probe the men and thing that we once get accustomed to regard as holy and infallible. We are far more formal than the Persians and the Medes of bygon days. And we forget that in our craze for religion and spirituality we are only playing hide-and-seek with Truth.

Truth is a very exacting mistress. She never allows via media. She strikes with one hand and blesses with the other. But we who have raised a thousand sanctuaries to nameless hosts have yet not an eel of space to set Truth upon.

So the flitting falsehoods are noiselessly poisoning the flood gates of our lives. There is none to strike them down. Whole systems are getting corrupt.

Where can we get the master-builders unless the Iconoclasts precede them? In our enthusiasms for construction and upkeep, we have disregarded the basis. But the superstructure is useless unless it is well-founded. The bases of our national life are full of wrong ideas, mistaken values, and false sentiments.

চারিদিকে ধূ ধূ রাতি — সৃজনের অন্ধকাররাশি
লক্ষ্যহারা জোনাকীর মত প্রাণ তার মাঝে যায় কোথা ভাসি!
পত্রগুচ্ছে যেটুকু নিশীথ
যে খণ্ড আঁধারটুকু — যে তুষারশীত
তারি বুকে ঢালি তাপ, — জ্বালি আমি শিখা
অনন্ত শর্ব্বরী দূরে ছড়ায়েছে ব্যথা বিভীষিকা
কোথায় কে জানে
কোন দূর স্পন্দহীন শোকের শ্মশানে
মূক তরুচ্ছায়াতলে — নিঃশব্দ গহ্বরে
কলহীন তটিনীর তরঙ্গের পরে
ছুটিয়া যেতেছে এই স্তব্ধ অভিযান

সৌজন্য :

অমিতানন্দ দাশ

পরিচিতি : ভূমেন্দ্র গুহ ও গৌতম মিত্র

টীকা :

অতুল সেন, অতুলপ্রসাদ : অতুলপ্রসাদ সেন (খ্রি. ১৮৭১-১৯৩৪)। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত ছিলেন ঈশ্বরনিবেদিত পুরুষ, ভক্তিসংগীত-রচয়িতা এবং সুকণ্ঠ গায়ক; সেই সব গুণের অধিকারী হয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ। ব্যবহারিক জীবনে ছিলেন ব্যারিস্টার, লখনউ শহরে তিনি শেষ পর্যন্ত সার্থক আইনব্যবসায়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এই শহরের সংস্কৃতি এবং জীবনধারণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে এতটাই জড়িয়ে গিয়েছিলেন তিনি, যে তাঁর জীবিতকালেই তাঁর নামে শহরের রাস্তার নামকরণ হয়েছিল। উপার্জিত অর্থের বৃহদংশ, নিজের আবাসগৃহ ও গ্রন্থসত্ত্ব তিনি জনহিতে ব্যয় করেছেন বা উৎসর্গ করেছেন। বাংলাভাষীদের কাছে তিনি স্মরণীয় সংগীতরচনাকার ও সুরকার হিসাবে। তাঁর সংগীত বিশেষ ভাবে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনাভিজ্ঞতার বেদনাসম্পৃক্ত। তিন ধরনের গান লিখেছেন তিনি : স্বাদেশিকতাপ্রাণীত সংগীত, ভক্তিমূলক গান, এবং প্রেমগীতি। হিন্দুস্থানী ধ্রুপদী সংগীতের সুর ও চাল, বাউলাঙ্গ ও কীর্তনাঙ্গ সুর যোগ ক'রে তিনি বাংলা গানে এক বিশিষ্ট, মূলত রবীন্দ্রানুসারী, সংগীতরীতির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর বহুল-প্রচারিত ও স্মৃত গান হচ্ছে : 'কে আবার বাজায় বাঁশি', 'বঁধূ, এমন বাদলে তুমি কোথা', 'হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর', 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'বল বল বল সবে শতবীণাবেণুরবে', 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' ইত্যাদি। গান লিখেছেন প্রায় দু'শোটি। সংকলনগ্রন্থ : 'কয়েকটি গান', 'গীতিগুঞ্জ'; স্বরলিপির বই : 'কাকলি'- গ্রন্থমালা। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

অমূল্য ঘোষ : এখন জানা যাচ্ছে, তিনি জীবনানন্দর বিশেষ পরিচিত বরিশালবাসী কোনও যুবক; যেহেতু তিনিও দেশে ফিরছেন জীবনানন্দর সঙ্গে একসঙ্গে গরমের ছুটি কাটাতে, তিনিও জীবনানন্দর মতো শিক্ষকতার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন কলকাতায়, সম্ভবত কোনও কলেজে, ধরে নেওয়া যায়।

ইনটার : সেকালে ট্রেনে-স্টিমারে যাতায়াত করার জন্য যাত্রীরা চারটি শ্রেণীর টিকিট কাটতে পারতেন : প্রথম শ্রেণী (সবচেয়ে বেশি দামের), দ্বিতীয় শ্রেণী, ইনটারক্লাস, এবং তৃতীয় শ্রেণী (সবচেয়ে কম দামের)। ছোটভাই অশোকানন্দ রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে গরমের ছুটিতে দেশে ফিরছিলেন, যখন জীবনানন্দ ফিরছিলেন ইনটারক্লাসে।

কলেজ : সিটি কলেজ, কলকাতা। খ্রি. ১৯৭৯-র, ৬ জানুয়ারি সিটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আনন্দমোহন বসু; তাঁর একাত্মসুহৃৎ শিবনাথ শাস্ত্রী হয়েছিলেন স্কুলটির প্রথম প্রধানশিক্ষক। খ্রি. ১৮৭৮-র মে মাসে এঁরাই (এবং উমেশচন্দ্র দত্ত ও বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী) জন্ম দিয়েছিলেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের, যখন কেশবচন্দ্র সেন তাঁর কন্যার বিবাহ দিয়েছিলেন কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে, এবং তার ফলে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে (খ্রি. ১৮৬৯) সাধারণভাবে বিক্ষোভ সঞ্চারিত হয়েছিল। ইস্কুলটির শিক্ষা-উদ্যোগ নানা বিবর্তনের পথ মাড়িয়ে পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রসারিত হয়েছিল সিটি কলেজ প্রতিষ্ঠায়, ১৩ মির্জাপুর স্ট্রিটের নতুন বাড়িতে। — ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় ১৫ সেপ্টেম্বর খ্রি. ১৮৮৩-তে, এবং দ্বারোদঘাটন হয় ১০ ডিসেম্বর খ্রি. ১৮৮৪-তে। জাত-পাত নির্বিশেষে ধনী-দরিদ্র সব শ্রেণীর ছাত্রদের শিক্ষালাভের সুযোগ ক'রে দেবার পাশাপাশি ব্রাহ্ম ধর্মানুগত চিন্তাধারা এবং সামাজিক সচেতনতা প্রসারও উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষায়তনটির; ফলত কালক্রমে, এক ধরনের ধর্মীয় ও নৈতিক মৌলবাদিতাও সূক্ষ্মভাবে শিক্ষায়তনটির শিক্ষাদর্শের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল, যা আর তেমনভাবে প্রচ্ছন্ন থাকতে পারছিল না। সে-যুগের বাংলার অনেক প্রথিতযশা মনীষী ও শিক্ষাবিদ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

জীবনানন্দ খ্রি. ১৯২১-এ ইংরেজি-সাহিত্যে এম.এ পাস করেন, এবং খ্রি. ১৯২২-এ সিটি কলেজের ইংরেজি-সাহিত্য বিভাগে 'টিউটর' হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। চাকরি করতে পেরেছিলেন খ্রি. ১৯২৮ পর্যন্ত; এই বছর তাঁর চাকরি চলে যায়। তিনি যে ইতিমধ্যে অনৈতিক কবিতার লেখক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন, তা জীবনানন্দ পরবর্তী কালে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে জানতে দিয়েছিলেন। এই ডায়েরি যখন লেখা হয়, তখন তিনি সিটি কলেজে চাকরি করছেন।

ক্লাস থ্রি, থার্ড ক্লাস : 'ইনটার' শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

খুলনা : খুলনা জেলার (এখন বাংলাদেশে) জেলা-শহর। কলকাতা থেকে বরিশাল যাওয়ার পথে খুলনা শহরে গিয়ে প্রথমে নামতে হত রেলগাড়ি থেকে; তারপর স্টিমার-যাত্রা বরিশাল পর্যন্ত।

Draco : উত্তর গোলার্ধের মেরু-অক্ষবর্তী এক বিশেষ নক্ষত্রপুঞ্জ। অন্য নাম ড্রাগন। ল্যাটিন ড্রেইকো এবং ড্রাগন সমার্থক।

দিলীপ রায় : দিলীপকুমার রায় (খ্রি. ১৮৯৭-১৯৮০)। পিতা প্রখ্যাত কবি, লেখক, সংগীতকার, সুরকার ও গায়ক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (অথবা, যে-নামে বেশি জ্ঞাত, ডি.এল. রায়)। বাল্যে মাতৃবিয়োগ হলে পিতার যত্নে মানুষ হন, এবং তাঁর কাছে বেদ পুরাণ পাঠ করেন। পিতৃবিয়োগ হয় যখন বয়েস ১৬ বছর। খ্রি. ১৯১৮-তে সসম্মানে অঙ্কশাস্ত্রে বি.এ পাস করে পড়তে যান কেমব্রিজে। যুগপৎ পাস করেন অঙ্কশাস্ত্রে ট্রাইপসের প্রথম ভাগ, এবং পাশ্চাত্য সংগীতবিদ্যার প্রথম ভাগ। জার্মান ও ইতালিয় সংগীত শেখেন বার্লিনে। চার বছর পরে দেশে ফিরে ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত শেখেন আব্দুল করিম খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, ভাতখণ্ডের কাছে। খ্রি. ১৯২৭-এ সংগীত সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন ইউরোপে। পণ্ডিচেরির অরবিন্দ-আশ্রমিক হন খ্রি. ১৯২৮-১৯৫০। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীতের পাঠ্যসূচির জন্য লেখেন 'গীতসাগর' ও 'সাঙ্গীতিকী', খ্রি. ১৯৩৮-এ। খ্রি. ১৯৫৩-তে ভারত সরকারের সংগীত মিশনের সদস্য হিসাবে ভ্রমণ করেন ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও মিশর। কোনও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হননি কখনও; বন্ধু জি.ভি. মেহতার আমন্ত্রণে পুণায় তাঁর গৃহে বসবাস করেন, এবং গড়ে তোলেন 'শ্রীহরিকৃষ্ণ মন্দির' এবং সন্ন্যাসীর জীবনযাপন করেন। সুভাষচন্দ্র ও জওহরলালের বন্ধু ছিলেন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন রবীন্দ্রনাথ, গান্ধি, রম্যাঁ রলাঁ, রাসেল প্রভৃতি জ্ঞানমার্গীর। তাঁর রেকর্ড-করা

গানের সংখ্যা প্রায় একশো। রচিত গ্রন্থ:'দুধারা', 'দোলা', 'তরঙ্গ রোধিবে কে', 'দ্বিচারিণী', 'তীর্থঙ্কর', 'ভিখারিণী রাজকন্যা', 'অঘটনের শোভাযাত্রা', 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রভৃতি।

প্রফ. এইচ : অধ্যাপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (খ্রি. ১৮৯২-১৯৫৭)। আদি নিবাস ছিল বরিশালের পোনাবালিয়া। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। খ্রি.১৯০৭-এ বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন থেকে এনট্রান্স পাস করেন; খ্রি. ১৯১১-তে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে 'ঈশান স্কলার' হন। ধারাবাহিক ভাবে উজ্জ্বল ছিল তাঁর অধ্যয়নের ও কর্মের জীবন : খ্রি ১৯১৩-তে এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম; খ্রি. ১৯১৯-এ 'গ্রিফিথ' পুরস্কার, এবং খ্রি. ১৯২১-এ, পি.এইচ.ডি উপাধি লাভ। কর্মজীবনের শুরুতে পড়িয়েছেন বঙ্গবাসী কলেজে, চাটগাঁর সরকারি কলেজে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে; তারপর খ্রি. ১৯১৭ থেকে দশ বছর স্যার আশুতোষের আমন্ত্রণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে; তারপর এক বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটিয়ে পুনরায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কারমাইকেল-প্রফেসর এবং বিভাগীয় প্রধান হিসাবে খ্রি. ১৯৫২ পর্যন্ত। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ইতিহাসের সংস্থা থেকে সম্মান পেয়েছেন অবিমিশ্র। রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : 'Political History of Ancient India', 'Studies in Indian Antiquities', 'Early History of the Deccan', 'History of Bengal', 'Materials for the study of the Early Vaishnaba set' প্রভৃতি।

জীবনানন্দর এই ডায়েরি লেখার সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্রুত শিক্ষক, এবং প্রথিতযশা ঐতিহাসিক; তিনি গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশে ফিরছেন তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হিসাবে।

বৈরাগী : বৈরাগী পদবিধারী বা ডাকনামধারী কোনও যুবক, যিনি জীবনানন্দর বেশ পরিচিত, হয়তো প্রতিবেশী, এবং বরিশালবাসীও।

ভেবুল : ছোটভাই অশোকানন্দ দাশ। তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র, এবং দাদা জীবনানন্দ সিটি কলেজের ইংরেজির 'টিউটর'। এই সময়ে তাঁরা দুই ভাই ১৮/২/এ, বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

ভেবুল : 'ইনটার' এবং 'ভেবুল' শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

স্যর. এম (স্যর মাইট-হ্যাভ-বীন) : জীবনানন্দ নিজে। তিনি 'স্যর' (সম্মাননীয় শিক্ষক) হলেও হতে পারতেন, কিন্তু এখনও হয়ে উঠতে পারেননি সিটি কলেজে তাঁর ছাত্রদের কাছে; তিনি তো 'টিউটর' মাত্র, এবং অবশ্যই কম গুরুভার বিষয়গুলি পড়িয়ে থাকেন।

সিটি কলেজ : 'কলেজ' শীর্ষক টীকা দ্রষ্টব্য।

হিন্দু হসটেল : রামমোহন রায়ের বাড়িতে এক ঘরোয়া আড্ডায় একদিন ডেভিড হেয়ার পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে হিন্দু ছাত্রদের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে উন্নত ধরনের একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কথা পাড়েন। কথাটা গড়াতে গড়াতে বেশ ওজন পেয়ে যায়, এবং খ্রি. ১৮১৬-র ১৪ মে সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের বাড়িতে বিশিষ্ট হিন্দু ও ইউরোপীয় ভদ্রজনের সভায় বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়; ২১ মে এক সভায় প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় 'হিন্দু কলেজ'। ২০ জন ভারতীয় এবং ১০ জন ইউরোপীয় বিদ্যোৎসাহীর একটি কমিটির তত্ত্বাবধানে খ্রি. ১৮১৭-র ২০ জানুয়ারি গোরাচাঁদ বসাকের ৩০৪ চিৎপুর রোডের বাড়িটি ভাড়া নিয়ে ২০ জন ছাত্রের 'হিন্দু কলেজ' আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রি. ১৮৫২-র ২৭ নভেম্বর ধর্ম ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ছাত্রের জন্য 'হিন্দু কলেজ'কে 'সরকারি কলেজে' পরিণত করার প্রস্তাব আসে, এবং খ্রি. ১৮৫৩-র ২১ অক্টোবর সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, কলকাতায় এই উদ্দেশ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজ নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবে। ফল দাঁড়ায় এই যে, খ্রি. ১৮৫৪-র ১১ জানুয়ারি হিন্দু কলেজ কমিটি তাঁদের শেষ সভায় হিন্দু কলেজের পরিচালনাভার সরকারের হাতে দিয়ে দেন, এবং খ্রি. ১৮৫৪-র ১৯ সেপ্টেম্বর সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে 'হিন্দু কলেজ' 'প্রেসিডেন্সি কলেজ'-এ নামান্তরিত হয়, এবং 'হিন্দু কলেজে'র জুনিয়ার ডিপার্টমেন্ট 'হিন্দু স্কুল' নামে কলেজ থেকে আলাদা হয়ে যায় ও শুধু হিন্দু ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হয়। খ্রি. ১৮৫৫-র ১৫ এপ্রিল এই সব ডামাডোল উত্তীর্ণ হয়ে পাকাপাকি ভাবে 'হিন্দু কলেজ' বন্ধ হয়ে যায়, আর খ্রি. ১৮৫৫-র ১৫ জুন 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' চালু হয়।

খ্রি. ১৮১৭-তে 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হবার সময় থেকেই কলেজের ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস তৈরির কথা ভাবা হচ্ছিল; খ্রি. ১৮৫৫-তে 'হিন্দু কলেজ', 'প্রেসিডেন্সি কলেজ' হয়ে যাবার পরে ভাবনাটা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। কিন্তু কলেজের নিজেরই তখন কোনও বাড়ি নেই, ছাত্রাবাসের সম্ভাব্যতা পিছনে পড়ে যায়; প্রেসিডেন্সির এখনকার বাড়িটি তৈরি হয় খ্রি. ১৮৭৪-এ। এই সময় নিজের চেষ্টায় প্যারীচরণ সরকার একটি বোর্ডিং-বাড়ি পরিচালনা করতেন, তাতে ছাত্রাবাসের প্রয়োজন কিছুটা মিটত। সে-সময়ের লেফটেনেন্ট গভর্নর স্যার অ্যাশলে ইডেন, খ্রি. ১৮৭৯-তে ছাত্রাবাস তৈরির একটি প্রস্তাব অনুমোদন করেন যদিও, ছাত্রাবাসের কাজ শুরু হতে-হতে দু'বছর লেগে যায়; স্টুয়ার্ট বেইলি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন খ্রি. '১৮৮১-তে। নির্মাণকার্য শেষ হয় খ্রি. ১৮৮৬-তে। ৯১টি বেড নিয়ে ছাত্রাবাসটি চালু হয় খ্রি. ১৮৮৭-তে। স্যার ইডেনের নামানুসারে ছাত্রাবাসটির নামকরণ হয় — 'ইডেন হিন্দু হসটেল', সামনের রাস্তার নাম হয় প্যারীচরণ সরকার স্ট্রিট। খ্রি. ১৮৮৯ থেকে খ্রি. ১৮৯৬— এই সময়ের ভিতরেই ছাত্রাবাসের বেডের সংখ্যা বেড়ে হয় ২৪০; খ্রি. ১৯২২-এ হসটেলে বিজলি আলোর ব্যবস্থা হয়। সে-সময় পূর্বভারতে কলকাতা শিক্ষাদীক্ষার পীঠস্থান ছিল, ফলত হসটেলের ছাত্রদের মধ্যে বেশির-ভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা এবং পূর্ব-উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত। হসটেলের এখনকার নাম —'গভর্নমেন্ট ইডেন হিন্দু হসটেল'; ঠিকানা : ৩ পি. সি. সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭৩। খ্রি. ১৯৯৬-এ নতুন ওয়ার্ডের সংযোজনের ফলে বড় হলে হসটেলের আবাসিক ছাত্রসংখ্যা দাঁড়ায় ২৮০; প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়াও অন্যান্য সরকারি কলেজের ছাত্ররা থাকেন তখন এখানে। এই হসটেলে থেকে পড়াশোনা করেছেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মেঘনাদ সাহা ইত্যাদি স্মরণীয় ব্যক্তিরা।

খ্রি. ১৯১৭-তে বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই.এ পাস করে জীবনানন্দ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ. পড়তে আসেন, তখন তিনি থাকতেন অক্সফোর্ড মিশন হসটেলে। তাঁর সতীর্থ বন্ধুরা অনেকেই থাকতেন হিন্দু হসটেলে। সেই সুবাদে হিন্দু হসটেল নানা ভাবেই তাঁর প্রথম যৌবনের সুখ-স্মৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ার কথা।

ডায়েরির শেষের কবিতাটা : এই ডায়েরির একেবারে শেষে এগারো লাইনের যে একটি কবিতা আছে, সেটি একটি বড় কবিতার প্রথমাংশ। ডায়েরির খাতাটির শেষের দিকের দিনলিপি-বিহীন পাতাগুলিতে এই কবিতাংশটি পুরো বা আরও আংশিক ভাবে আরও তিনবার লেখা আছে, এবং পাশাপাশি আছে পেনসিলের স্কেচে নিসর্গ চিত্র, বাংলা বর্ণমালা, গাণিতিক সংখ্যাবলি।

যে-কবিতাটির অংশ এই কবিতাটি, তা 'আঁধারের যাত্রী' শিরোনামে 'কল্লোল'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩, অর্থাৎ খ্রি. ১৯২৬-এ, ডায়েরি লেখার মোটামুটি একবছর পরে। কোনও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি কবিতাটি।

আঁধারের যাত্রী

চারিদিকে ধু ধু রাতি — সৃজনের অন্ধকাররাশি
জোনাকীর মতো প্রাণ তার মাঝে চলিছে উদাসী!
পত্রগুচ্ছে যেটুকু নিশীথ
যে খণ্ড আঁধারটুকু, যে তুষার শীত
তারই বুকে ঢালি তাপ, জ্বালি আমি শিখা,
অনন্ত শর্বরী দূরে ছড়ায়েছে ব্যথা-বিভীষিকা!
কোন্ দূর অলক্ষ্যের পানে
স্পন্দহীন প্রেতপুরে — শোকের শ্মশানে,
মূক তরুচ্ছায়াতলে, নিঃশব্দ গহ্বরে
কলহীন তটিনীর তরঙ্গের 'পরে
ছুটিয়া যেতেছে মোর সচকিত প্রাণ,
মৌন অভিযান!
আমার এ কম্প্রবক্ষে তৃপ্তিহীন বিচ্ছুরণ জ্বলে;
দূরে দূরে দিগন্তের তলে
ছুটে যাই দিশাহারা, আকুল, চঞ্চল,
কেঁদে ওঠে বিটপীর ভগ্নশাখা, বনানীর পল্লব-অঞ্চল!

বালুকাসৈকতে বাজে তটিনীর গান
ক্ষুব্ধ ম্রিয়মাণ!
সৃজন-পুলিনে বসি মায়াবীর বেশে
অন্তহীন ইন্দ্রজাল রচিতেছে কে সে!
কোথা তব গুপ্ত কক্ষ — রহস্যের দ্বার
ওগো অন্ধকার!
হে অচল রুদ্ধ আয়তন,
বিজন গোপন!
তমিস্রার ঊর্মিরাশি — দুশ্চর, দুস্তর,
চির রাত্রি — তার মাঝে আমি নিশাচর!
নিষ্প্রভ এ চোখে মোর পশে নাকো নক্ষত্রের শিখা,
দীপহীন অমাতটে নাচে একা প্রাণ খদ্যোতিকা!
প্রান্তরের পারে জ্বলে অলীক আলেয়া,
তার মাঝে মোর এই নিশীথের খেয়া
চলে একা ভেসে,
স্বপ্নাবিষ্ট মৌন অভিসারিকার বেশে!

পাণ্ডুলিপি পরিচয় : (এক্সারসাইজ খাতা)

সামনের মলাট :

The Universal Exercise Book

Name
College
Roll No.

A.C. Paul

Wholesale and Retail Paper Dealer Stationer
Exercise Books, Note Books Account
Books Manufacturer

34, Cornwallis Street, Calcutta

পিছনের মলাট :

Calender for 1925
[ক্যালেন্ডার - ছোট হরফে]

Public Holidays in 1925
[ছুটির দিনের লিস্টি — ছোট হরফে]

Popular Press
Fine Art Printers
27, Simla Street, Calcutta

Routine
[সোমবার থেকে রবিবারের ক্লাস রুটিনের ছ'ঘণ্টার খোপ-কাটা ছক]

খাতায় মোট পৃষ্ঠার সংখ্যা : ৪৮

পৃষ্ঠার ধরন : সাদা, সাধারণত তাঁর পাণ্ডুলিপির এক্সারসাইজ খাতার পৃষ্ঠাগুলি যেমন লাইন টানা হয়, তেমন নয়।

খাতার ধরন : সুতোয় সেলাই-করা খাতা, কিন্তু সুতো এখন পচে গেছে বলে পাতাগুলি আলগা। মোট ৪৮ পৃষ্ঠার ১৬ পৃষ্ঠায় টান ইংরেজিতে ডায়েরি লেখা — কলমে-কালিতে। প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা আছে :

Memoirs
Summer (1925)
Jibanananda Das
Calcutta. 1925. July

তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে ডায়েরি শুরু হয়েছে। তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে আঠারো পৃষ্ঠা অবধি ডায়েরি প্রথমে মুদ্রিত হল।

ডায়েরির পৃষ্ঠা নং ১৯ থেকে পৃষ্ঠা নং ৪৮-এ, যা আছে। (বিস্তৃত পরিচয়)

পৃষ্ঠা ১৯ : অ আ ই ঈ
এ পেনসিল স্কেচ

পৃষ্ঠা ২০ : পেনসিল স্কেচ — তিনটি উলটো করে আঁকা — পাতাজোড়া— নারকেল গাছ — ফল এবং শিকড় শুদ্ধ

পৃষ্ঠা ২১ : ন জ

পৃষ্ঠা ২২: পেনসিলে স্কেচ — বাড়ি, নারকেল গাছ , খেজুর গাছ ইত্যাদি — অনেক গাছ;
ও একটি বাড়ি, দোতলা — দশটি জানালা
পৃষ্ঠা ২৩

পৃষ্ঠা ২৪, : অব্যবহৃত

পৃষ্ঠা ২৫ : অব্যবহৃত

পৃষ্ঠা ২৬ : ২৭ পৃষ্ঠায় এগারো লাইনের কবিতাটির কালির হরফের ছাপ

পৃষ্ঠা ২৭ : এগারো লাইনের কবিতাটি মোটা নিবের হরফে — কালিতে

পৃষ্ঠা ২৮ : ২৭ পৃষ্ঠার কবিতাটির পাতা ফুঁড়ে বেরোনো কালির হরফের ছাপ

পৃষ্ঠা ২৯ : পেনসিল-স্কেচে দু'টো উলটো করে আঁকা খেজুর বা নারকেল গাছ — পাতাজোড়া

পৃষ্ঠা ৩০ : ৩১ পৃষ্ঠায় একইভাবে লেখা এগারো লাইন কবিতাটির প্রথম দু' লাইন — তার ছাপ

পৃষ্ঠা ৩১ : উপরে বর্ণিত

পৃষ্ঠা ৩২ : ৩৩ পৃষ্ঠায় একই ভাবে লেখা এগারো লাইন কবিতাটির প্রথম আট লাইন — তার ছাপ

পৃষ্ঠা ৩৩ : উপরে বর্ণিত

পৃষ্ঠা ৩৪ : ৩৩ পৃষ্ঠার আট লাইন কবিতার ফুঁড়ে বেরোনো কালির হরফের ছাপ

পৃষ্ঠা ৩৫ : সাপের আকারের একটি পেনসিলের দাগ, পৃষ্ঠাটির ডান পাশ ঘেঁযে

পৃষ্ঠা ৩৬ : পৃষ্ঠার তিন-চতুর্থাংশ জুড়ে দু'টি পেনসিলের-লাইনে একটি এক ঠেঙে গাছের কাণ্ড

পৃষ্ঠা ৩৭ : পেনসিল স্কেচে দু'টি ফল—ও শিকড়-শুদ্ধ নারকেল গাছ — পাতাজোড়া

পৃষ্ঠা ৩৮ : একই বিন্দু থেকে উঠে আসা তিনটি সরু ও কমসরু নারকেল গাছ, যারা গোড়া থেকে বেরিয়েই আলাদা হয়ে গেছে শীর্ষের দিকে, উলটো করে আঁকা — পাতাজোড়া

পৃষ্ঠা ৩৯ : পাতাজোড়া অনেক সমান্তরাল আঁকাবাঁকা রেখায় পেনসিলে আঁকা একটা প্যাটার্ন

পৃষ্ঠা ৪০ : বেশ ধৈর্য ধরে আঁকা — পেনসিলে — পাশাপাশি একটা মোটা ও আরেকটা তুলনামূলক ভাবে সরু নারকেল গাছ — শিকড়-শুদ্ধ; উলটো করে আঁকা — পাতাজোড়া; গাছের গোড়ার পাশে অন্য দু'টি দুর্বল গাছের ইঙ্গিত আছে।

পৃষ্ঠা ৪১ : দু'টি লাইনে আঁকা গাছের কাণ্ড কী? পৃষ্ঠাটির উপর দিকে বেশ মোটা — নীচের দিকে অস্বাভাবিক ভাবে সরু হয়ে এসেছে; প্রায় পাতাজোড়া

পৃষ্ঠা ৪২ : অবহেলায় আঁকা দু'লাইনে কাণ্ড, মাথায় ঝাঁকড়া পাতার ভিড় — দু'টি নারকেল বা তালগাছ — পাশাপাশি — পাতাজোড়া — উলটো ভাবে

পৃষ্ঠা ৪৩ : পাতাজোড়া উলটো ভাবে আঁকা — কাণ্ডের ছোট শীর্ষভাগের উপরে স্থাপিত পাতা ফুল-ফলের বিশাল সমাহার — পেনসিলে আঁকা।

পৃষ্ঠা ৪৪ : অ আ ই ঈ
হ্ উ ঊ ঋ ঌ
এ ঐ ও ঔ
ক খ গ ঘ ঙ
ক খ গ ঘ ঙ

পৃষ্ঠা ৪৫ : চ ছ জ ঝ ঞ
ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
প ফ ব ভ ম
য র ল ব শ
য র ল ব শ
পৃষ্ঠা ৪৬ : ষ স হ ড় ঢ়
ড় ঢ়
য় ৎ ং ঃ ঁ
য় ৎ ং ঃ ঁ
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

পৃষ্ঠা ৪৭ : পেনসিলের দু'লাইনে একটি ন্যাড়া বৃক্ষকাণ্ড
পৃষ্ঠা ৪৮ : শাদা, অব্যবহৃত

পুরানো লেখা থেকে

সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য.

(অপ্রকাশিত কবিতা)

[রচনার তারিখ দেখে বোঝা যাচ্ছে কবিতাগুলি কবির মৃত্যুর এক বছর আগে ১৯৬৮ সালে রচিত। পাণ্ডুলিপিতে কবি কয়েকটি কবিতার নামকরণ করেছিলেন। বাকি কবিতার কোনও নামকরণ করেননি। মুদ্রণে মূল পাণ্ডুলিপির পর্যায়ক্রম ও নিজস্ব বানানরীতি বজায় রাখা হয়েছে। আমরা অপ্রকাশিত রচনাগুলি পেয়েছি কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী **ইরা ভট্টাচার্যের** সৌজন্যে এবং কবি **ভূমেন্দ্র গুহর** সহযোগিতায়।
— **সম্পাদক**]

অন্ধকারে মিশে গেছ ব'লে
কোনো কোনো অন্ধকারে মনে হয় তুমি যেন আছো :
সেই সব অন্ধকারে বাতাবিফুলের গন্ধ আসে
কিম্বা আসে চৈত্রের বাতাস।
সব ভুলে-যাওয়া ভালো লাগা
যেন সেই সব অন্ধকার হয়ে আছে ॥

*

সাহস হ'ল না।
বস্তুত সাহসী নই রৌদ্রের মতন
খুব অন্ধকারে চলে যেতে।
যতো কাছে এলে তুমি তত যেন বেশি অন্ধকার।
স্বচ্ছ করে দিয়ে যাবো তোমাকে, তেমন
সাহস হ'ল না।
ভীরু দীপ নিবে যাবে, ভয়ে
চোখ অন্ধ হয়ে যাবে, ভয়ে
একটি মুহূর্ত্ত স্থির হয়ে যাবে, ভয়ে
তোমাকে ছুঁতেই আর সাহস হ'ল না ॥

*

এত কাছে তবু — তবু দূর!
থাকা, যথাযথ পুরোপুরি থাকা এই।
পাওয়া-না পাওয়ার ভুল হিসেব থাকে না।
শান্তির মতন হাওয়া! আছো!
কাজের বাইরে থেকে কাজে

ছুটির বাইরে থেকে ছুটির ভেতর
মনের বাইরে চারপাশে
কী নির্ভার থাকা!
এতো কাছে তবু এতো দূরে ।।

*

গাছে গাছে সবুজ দোলা ছিল
তোমার দোলা ছিল আমার মনে
সেসব দিনে হঠাৎ ভুলে মন
দাঁড়াত কেউ হয়তো বাতায়নে।

মুছিয়ে দেয়া যেতো চোখের জল
সেসব দিনে হাতের সমাদরে
স্মৃতির ভেতর সে-জল অবিরত
পড়ত বুঝি বৃষ্টি হয়ে ঝ'রে।

পড়ত মনে সিক্ত ফুলের নাম
সেসব দিনে রৌদ্রঝরা পথে
এসব দিনের ধূলোয় ধূসরিত
হারিয়ে যারা গেল শতে-শতে ।।

*

স্বপ্ন

মার কান্না শুনলুম :
আর চারদিক অরণ্য হয়ে গেল!
সেই ভয়ঙ্কর ছায়ায় মার কান্না!
কেন যে আমি এখানে, জানি নে।
শুধু মার কান্না!
কী ক'রে পৌঁছুব সে-কান্নার কাছে?
তারপরই ধাপ-ধাপ পাথর, পৌঁছুবার সঙ্কেত।
আর আমি ভূমিষ্ঠ হলুম।।

*

মন্টিকে : গ্রীষ্মের দুপুরে

কী অসহ্য ছিল সেই গ্রীষ্মের দুপুর!
তুমি ভিজে চুলে এসে সহিষ্ণুতা দিলে!
ইচ্ছে হল বৃষ্টি ছুঁই তোমাকেই ছুঁয়ে।
মনে হল পাওয়া যাবে ভেজা বেল-যূঁই
শরীরে কোথাও।
গ্রীষ্মের দুপুর হতে থাকে বর্ষারাত ।।

*

হঠাৎ ফুলের গন্ধে

হঠাৎ ফুলের গন্ধে যেন সব ভুলে যেতে হয় :
টেবিলের খুঁটিনাটি কাজ,
অমনি দু'কথা বলে মেয়েটিকে খুশী করে দে'য়া,
টেলিফোনে জরুরি বাজনা
সব পড়ে থাকে।
ফুলদানিতেও কিন্তু ফুল নেই তেমন সময়ে।।

*

সিঁড়ি বিষয়ে

সুখী রৌদ্র তোমার সিঁড়িতে
পাশে ছায়া নিয়ে শুয়ে আছে
সিঁড়ির ধাপেই ওঠা-নামার ইশারা।
তুমি কি অসুখী ছিলে রোদের রাস্তায়
বয়স্ক বৃক্ষের কাছে এসে
এবং ছায়াতে ছায়া হয়ে।।

*

দ্রুত ট্রেন চলে যায়, রোজ শব্দ শুনি
উড়ন্ত পানকৌড়ি ঝাঁক দেখি রোজ রোজ
জানালা খুললেই এক স্রোতস্বিনী হাওয়া।
মনে হয়, আমি
শৈশবের থেকে আর এক পা যাই নি।
জানালা খুললেই বুঝি দুরন্ত হাওয়া যে করে খোঁজ।।

*

কিছুই থাকে না, সব গড়ে নিতে হয়।
যেমন প্রণয় ঠিক তেম্নি সময়।
আজ কিম্বা কাল কিছু নেই।
সব আজ হতে পারে কিম্বা সব কাল।
এখন-তখন নিরাকার।
যখন হয়েছ তীব্র তখনই সময়।।

*

এ সব বিকেল বড়ো ভালোবাসা দ্যায় —
গ্রীষ্মের বিকেল।
বড়ো বেশি ভালোবাসা গ্রীষ্মের বিকেলে
মেয়েদের আঁকাবাঁকা চোখে
বড়ো বেশি মেয়ে আসে বারান্দায়, ছাদে
এ সব বিকেল হয়ে যেতে।।

*

এই কোলাহল কী যে ভীষণ স্তব্ধতা!
নিহত শব্দের কোলাহল!
কোনো কথা বলতে পারো না,
শুনতে পাও না কোনো কথা:
আকাশের মতো
শুধু শববাহী হয়ে থাকা।।

কবি অমিয় চক্রবর্তী

স্বপনকুমার ঘোষ

রবীন্দ্রজীবনের শেষপর্বে বাংলা কবিতায় অমিয় চক্রবর্তী একটি বিশিষ্ট নাম। স্বকীয় শৈলী ও স্বাতন্ত্রে আধুনিক বাংলা কাব্যধারায় তিনি বিশিষ্ট। অমিয় চক্রবর্তী-র জীবনের বহু মুহূর্ত কেটেছে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সান্নিধ্যে।

বিশ্বপথিক মানবসন্ধানী কবি অমিয় চক্রবর্তী মানবতার মন্ত্র নিয়ে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন। এই ভ্রমণে তিনি শুধু ভৌগোলিক পৃথিবীর পরিচয় নেননি। পৃথিবীর যে-কোনও দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে তাঁর উৎসাহ ছিল অপরিসীম। আবার যে কোনও বিশ্বসংকট, তা সামাজিক বা রাজনৈতিক যাই হোক না কেন সেই সংকটকে নিজের কবিমানসের অন্তর্গত করে সবসময়ই বিচলিত বোধ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও মহাত্মা গান্ধি'র ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গান্ধিজি'র শান্তি-মিছিলে তিনি যুক্ত থেকেছেন নিবিড়ভাবে। তাঁর লেখা কবিতা ও নানাবিধ রচনায় প্রায়ই গান্ধিজি'র আদর্শের কথা উল্লেখ করেছেন।

আবার কখনও গান্ধিজির কোনও কাজকে স্পষ্টভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে সমালোচনাও করেছেন। যা এক অর্থে বিরোধিতারই নামান্তর। রবীন্দ্রনাথ'কে লেখা অমিয় চক্রবর্তী'র চিঠিতে আমরা তা দেখতে পাই। বিশ্বমানবের সমস্যা উৎকণ্ঠা ও সংকটকে উপযুক্ত বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবার জন্যে তিনি রবীন্দ্রনাথকেও প্রাণিত করেছিলেন।

সাহিত্য-সচিব হিসাবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জার্মানি, রাশিয়া, আমেরিকা, পারস্য ও মধ্যপ্রাচ্য, প্রশান্ত এবং আটলান্টিক মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ, দূরপ্রাচ্য, পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়া, আফ্রিকা, জাপান, কোরিয়া সহ পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজি বা অরবিন্দ'র মতো শুধু স্বদেশেই নয় — অমিয় চক্রবর্তী তামাম বিশ্বের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ, জ্ঞানী-গুণী মানুষদের নিবিড় সান্নিধ্য ও সঙ্গ পেয়েছেন।

১৯৫৪-তে আফ্রিকার 'সন্ত মানুষ' অ্যালবার্ট শোয়াইটজার-এর সেবাকেন্দ্র, গ্যাবোন অঞ্চলের লমবারেনে থেকেছেন। তাঁরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন আফ্রিকার 'ETERNAL TRIBE' নিয়ে কবিতাটি। এই কবিতার অনুবাদ আফ্রিকার বিধ্বস্ত মানুষের মনকে শান্ত করেছে। আইনস্টাইনের মতো বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

এজরা পাউন্ড, ইয়েটস, জয়েস, পাস্টেরনাক-এর মতো দিকপাল সাহিত্যিকদের সঙ্গে তাঁর সখ্য গড়ে উঠেছিল। এইসব উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সাহিত্য ও কাব্য এবং জীবন সংকট নিয়ে তিনি নিয়মিত আলোচনা ও পত্রমাধ্যমে নিয়মিত যোগযোগ রাখতেন। আবার জাপানের বৌদ্ধ মনীষী, জেন সুজুকি'র সঙ্গেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

১৯০১-এর ১০ এপ্রিল শ্রীরামপুরের মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম। তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয়। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল ওপার বাংলার পাবনার ভারেদাঁ গ্রামে। পিতা দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্তী অসমের গৌরীপুর স্টেটের দেওয়ান ছিলেন। মাতা অনিন্দিতা

দেবী খুব ভাল সংস্কৃত জানতেন, বেদ, উপনিষদ, ষড়্‌দর্শন এবং প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে তাঁর অগাধ অধিকার ছিল।' শৈশবে তিনি মায়ের কাছে পেয়েছিলেন উপনিষদের শিক্ষা।

ছেলেবেলায় পড়াশোনার ক্ষেত্রে তাঁর মায়ের প্রভাব ছিল অনেকখানি। অনিন্দিতা দেবী নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন প্রবন্ধ লিখেছেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নারীমুক্তি ও নারীশিক্ষা বিষয়ে চিঠির আদানপ্রদান ছিল। অনিন্দিতা দেবীর সংকলনটির নাম 'আগমনী'। তিনি 'বঙ্গনারী' নামে লিখতেন।

অমিয় চক্রবর্তীর ছোটবেলার রঙিন দিনগুলো কেটেছে অসমের গৌরীপুরে নদীঘেরা স্নিগ্ধ সবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশে। গৌরীপুর প্রতাপচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে পড়াশোনা শুরু। কলকাতায় এসে ভর্তি হন হেয়ার স্কুলে। কলকাতায় থাকবার সময় 'সবুজপত্র'র সাহিত্য গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। সেই সুবাদে প্রমথ চৌধুরী'র সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ঘটল।

১৯১৭-র কোনও এক সময়ে প্রমথ চৌধুরী, অমিয় চক্রবর্তীকে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে যান। সেবার তিনি দিনদুয়েক ছিলেন শান্তিনিকেতনে। ছায়া সুনিবিড় শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ তাঁর মনে এক স্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর যৌবনের একেবারে প্রথম দিকেই ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত সংকটে রবীন্দ্রনাথের পরম আন্তরিকতায় আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

১৯২১-এ হাজারিবাগের আইরিশ মিশনের সেন্ট কলম্বাস কলেজ থেকে ইংরেজি-সাহিত্য, দর্শন ও উদ্ভিদবিদ্যায় স্নাতক হন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার বছরেই তিনি শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা ও গবেষণার কাজে যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসচিব হিসেবে যোগ দেন ১৯২৬ সালে। সাত বছর তিনি এই কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ করেন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলিয়ল কলেজ থেকে টমাস হার্ডির 'দ্য ডাইনাস্টস' কাব্যনাট্যের ওপর তিনি স্নাতকোত্তর গবেষণা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান পাঠ্যবিষয় ছিল — দর্শন। তুলনামূলক ধর্ম নিয়েও গবেষণা করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন এই বিষয়ে।

১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ডেনমার্কের কন্যা হিওডিস সিগো-র সঙ্গে শান্তিনিকেতনে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই বিবাহের উদ্যোক্তা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কবির দেওয়া নাম হৈমন্তী। বিয়ের অনুষ্ঠানে সি. এফ. এন্ডরুজ কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন।

তাঁর কর্মজীবন ছিল বহুধাবিস্তৃত। বার্মিংহামে কোয়েকারদের পরিচালিত উডব্রুক কলেজে ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি ছিলেন ফেলোশিপ-লেকচারার। লাহোরে আমেরিকান মেথডিস্টদের পরিচালিত ফর্মান ক্রিশ্চিয়ান কলেজে সাম্মানিক অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ অবধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪৮ থেকেই তিনি মার্কিন মুলুকে প্রবাসী ছিলেন।

ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইংরেজি সাহিত্যের অতিথি অধ্যাপক, আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিজিটিং ফেলো এবং ইংরেজি কাব্য বিষয়ে ট্রুমবল অধ্যাপক, জাতি পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সরকারি উপদেষ্টা, কানসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, বস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক প্রাচ্যধর্ম ও ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক এবং পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস অধ্যাপক ছিলেন তিনি।

স্মিথ কলেজে ভারতীয় ও প্রাচ্য ধর্মের অধ্যাপক, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম রবীন্দ্র অধ্যাপক, ন্যুইয়র্ক স্টেট ইউনিভারসিটির অধ্যাপক এবং অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক থাকাকালীন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়, নোয়াখালি বিহার ও অন্যান্য জায়গায় গান্ধিজির পরিচালনায় তিনি শান্তি-পদযাত্রায় যোগ দেন।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর অবদানের জন্য নানা সম্মান, সংবর্ধনা ও পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি গবেষণার জন্য রকফেলার ফাউন্ডেশান বৃত্তি পান। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন এবং রবার্ট ওপেনহাইমারের আমন্ত্রণে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অফ অ্যাডভান্সড স্টাডিস-এর ফেলো নির্বাচিত হন। আমেরিকার ফাই-বিটা-কাপ্পা সংস্থারও সম্মানিত সদস্য হন। অ্যালবার্ট শোয়াইটজার পদকও তাঁর সংগ্রহ করবার সুযোগ হয়েছিল।

ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ উপাধি দেন। ১৯৬৩-তে বিশ্বভারতী তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন সম্মানসূচক ডি লিট। 'চলো যাই' গদ্যগ্রন্থের জন্য তিনি পেয়েছেন ইউনেস্কো পুরস্কার। তিনি সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন — 'ঘরে ফেরার দিন' কাব্যগ্রন্থের জন্য। ওয়াটমল ফাউন্ডেশন পুরস্কার পেয়েছেন। মার্কিন প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে বিশিষ্ট নাগরিক অভ্যর্থনা, অভিনন্দন পেয়েছেন। ১৯৭৭-এ বিশ্বভারতীর আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথি-অধ্যাপক হিসাবে তিনি শান্তিনিকেতন আসেন।

অমিয় চক্রবর্তী তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে মূলত মানবিক মূল্যবোধের শিক্ষা বিচ্ছুরণ করতে চেয়েছিলেন। কবিতার মধ্য দিয়ে ধর্মান্ধতা এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ বার বার ধ্বনিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ও মনুষ্যত্বের অবমাননা তাঁকে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর খুবই সজীব সম্পর্ক ছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব হিসাবে যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোনওরকম ভক্তির অন্ধতা ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের পথে' বইটি অমিয় চক্রবর্তীকে উৎসর্গ করেছেন। রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত শান্তিনিকেতন অমিয় চক্রবর্তী'র কাছে ছিল 'প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি'। তাঁর জীবনের শেষ শয্যাও পাতা হয়েছিল ১৯৮৬-তে শান্তিনিকেতনের মাটিতেই। অমিয় চক্রবর্তীর 'কবিতা' বহু আলোচিত। আধুনিক বাংলা কবিতার ইতিহাসে তাঁর স্থান চিরস্মরণীয়। শুধু তাঁর বহিরঙ্গের দিকটি ও কর্মজীবনের প্রেক্ষিতটি নতুন করে স্মরণ করা হল। কেননা এই সাক্ষাৎকারে তা প্রাসঙ্গিক।

[এই নিবন্ধটি লেখার জন্য নরেশ গুহ সম্পাদিত অমিয় চক্রবর্তী'র 'কবিতা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড এবং সুমিতা চক্রবর্তী'র 'কবি অমিয় চক্রবর্তী' — এই দুটি বই থেকে সাহায্য নিয়েছি।]

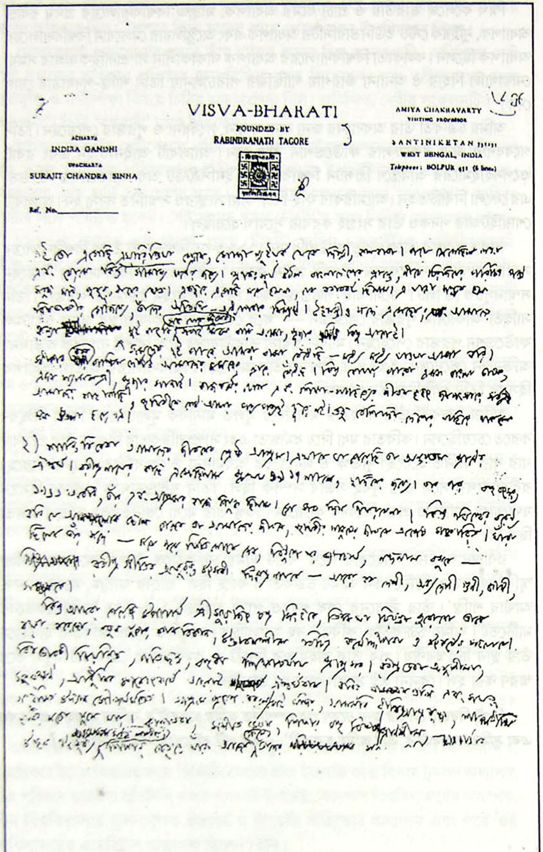

VISVA-BHARATI
FOUNDED BY
RABINDRANATH TAGORE

ACHARYA
INDIRA GANDHI
UPACHARYA
SURAJIT CHANDRA SINHA

AMIYA CHAKRAVARTY
VISITING PROFESSOR

SANTINIKETAN 731235
WEST BENGAL, INDIA
Telephone: BOLPUR 451 (6 lines)

Ref. No.

অমিয় চক্রবর্তীর হস্তলিপি

অমিয় চক্রবর্তী-র অপ্রকাশিত সাক্ষাৎকার

স্বপনকুমার ঘোষ

১৯৭৭-এ অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বভারতী'র আমন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অতিথি-অধ্যাপক' হিসাবে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনের 'রাস্কা' (সুখ-সাঁওতালি ভাষা) বাড়িতে কবির এই দুর্লভ সাক্ষাৎকার নেবার সুযোগ আমার হয়েছিল। বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য ড. সুরজিৎ চন্দ্র সিংহ, অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাকে নিবিড়ভাবে পরিচয় করিয়ে দেন। সেই সূত্রে সেদিন এই দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়েছিল। আমার প্রশ্নগুলির উত্তর কবি স্বহস্তে লিখে দিয়েছেন। এ আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। যেহেতু প্রশ্নের উত্তর কবির লিখিতভাবে দেওয়া তাই মূল বানান অক্ষুণ্ণ রাখা হল।

প্রশ্ন: আপনি কখন, কীভাবে, কেমন করে শান্তিনিকেতনে এলেন?

উত্তর: এই তো এসেছি এয়ারিণ্ডিয়া প্লেনে, সোজা ন্যুইয়র্ক থেকে দিল্লী, কলকাতা। পথে নেমেছিলাম লণ্ডনে এবং রোমে কিন্তু সামান্য ক্ষণের জন্যে। প্রাতঃসূর্য উঠল বাংলাদেশের প্রান্তে, নীচে চিরদিনের পরিচিত পল্লী, সবুজ মাঠ, পুকুর, ধানের ক্ষেত। এতদূরে এসেছি মনে হল না, যেন বরাবরই ছিলাম। এ যাত্রা সম্ভব হল বিশ্বভারতীর সৌজন্যে, তাঁদের অতিথি-অধ্যাপনার নিমন্ত্রণে। হৈমন্তীও সঙ্গে এসেছেন; আমাদের কন্যা সেমন্তী দুই নাতনি সহযোগে ছিলেন। সবাই মিলে বাড়ি আসা, পূজার কিছু আগেই।

সমুদ্রের দুই পারে আমরা বাসা বেঁধেছি — মধ্যে মধ্যে যাওয়া-আসা করি। স্বীকার করব পশ্চিম দেশও আমাদের মমত্বের ডোরে বেঁধেছে। কিন্তু কোথায় পাবো এমন বাংলা ভাষা, এমন শ্যামলশ্রী, পূজার সানাই। কাজকর্মের যোগ এবং শিক্ষা-সাহিত্যের জীবন বৃহৎ জনসংসারে সর্বত্রই আমাদের কাছাকাছি, পৃথিবীতে কেউ আমরা সত্যসত্যই দূরে নই। তবু বেশিদিন দেশের বাহিরে থাকলে মন উতলা হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন: শান্তিনিকেতনের আশ্রমজীবনে আপনি মাঝে মাঝেই আসেন। কী পান আপনি আশ্রমজীবনের পরিবেশে? — বলুন।

উত্তর: শান্তিনিকেতন আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ আশ্রম। এখানে যা পেয়েছি তা অন্তরতম প্রাণের ঐশ্বর্য। রবীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলাম প্রথম ১৯১৭ সালে, দুদিনের জন্যে। তারপর বহু বৎসর, ১৯৬৩ অবধি, তাঁর এবং আশ্রমের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। সে সব দিন ফিরবে না। কিন্তু বিশ্বের বরেণ্য কবি যে আনন্দালোক জ্বেলে গেছেন তা আমাদের জীবনে, পৃথিবীর মানুষের জীবনে অশেষ সঞ্চারিত। যাঁরা ছিলেন তাঁর সঙ্গে — মনে পড়ে ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, নন্দলাল বসুকে — রবীন্দ্রগীতির অফুরন্ত উৎসবী দিনেন্দ্রনাথকে — আরো কত দেশী অন্যদেশী গুণী, জ্ঞানী, সজ্জনকে।

প্রশ্ন : অতীতের আশ্রমজীবনের সঙ্গে এখনকার কোনও পার্থক্য আপনার বিশেষ নজরে পড়ে? — জানতে চাই।

উত্তর : আমরা পেয়েছি উপাচার্য শ্রী সুরজিৎ চন্দ্র সিংহকে, তিনি যা চিরন্তন পুরোনো তাকে রক্ষা করেছেন, নতুন যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান, উদ্ভাবনশীল বিচিত্র কর্মোদ্দীপনা ও উৎকর্ষের সহযোগে। বিশ্বভারতী নিয়ন্ত্রিত, পরিচ্ছন্ন, বহুধা শিক্ষাচর্যায় প্রাগ্রসর। রবীন্দ্রভবন অনুশীলন, সংরক্ষণ, আধুনিক জ্ঞানোৎকর্ষে আরোই ঐশ্বর্যবান। কবির বাসভবনগুলি এবং সযত্ন সংরক্ষিত উদ্যান সৌন্দর্যমণ্ডিত। আশ্রমে প্রবেশ করলে সেই মন্দির, আমলকি বীথি, আম্রকুঞ্জ, শালবীথি ছবির মতো খুলে যায়। কলাভবন, সংগীতভবন, শিক্ষার বহু বিভাগ। প্রাণশীল-ছাত্রছাত্রীর উজ্জ্বল ঔৎসুক্য সর্বত্র লক্ষণীয়; শিক্ষার নেতৃত্বে যাঁরা আছেন ক্রমে তাদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছি। হঠাৎ মনে হয় আশ্রমে বাড়িঘর, লোকজনের আধিক্য। কিন্তু এই বৃদ্ধির বর্হিলক্ষণ আশ্রমের চতুর্দিকে, কেন্দ্রে নয়। হয়তো পরে দেখব শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতনের মধ্যে বেশি ফাঁক নেই, সবটাই ভরে উঠছে। পূর্বপল্লী, দক্ষিণপল্লীর মতো আরও পল্লী ক্রমাগতই যোগ হয়েছে। একদিক থেকে লোকসংখ্যা, বাড়ির সংখ্যা আশ্রমের গভীরতম জীবনের অনুকূল না হতে পারে কিন্তু যে গাছ আপনিই বড় হয়ে উঠছে তার বিকাশের রূপকেও তো গ্রহণ করতে হবে। কর্মব্যবস্থা অনেকদিক থেকে আজ আরো উন্নত, শিক্ষার বিবিধ অনুপ্রেরণা জ্ঞানে বিজ্ঞানে বহু শাখায়িত। যাঁরা এই আশ্রম বিদ্যালয়, এবং বিশ্বভারতীর সামগ্রিক রূপ নূতন ক'রে প্রকাশ করছেন, উদ্যোগ অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন তাঁদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধায় আমরা প্রত্যেকেই সহযোগী।

প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথের কোন দিকটি আপনাকে সবচেয়ে আকর্ষণ করেছে?

উত্তর : রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছুই বলবার অবকাশ নেই — যা তাঁর কাছে পেয়েছি, শুধু আশ্রমে স্বদেশে নয়, অন্য দেশেও সকলের প্রেরণা এবং স্নেহের দান জীবনে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার আলোচনা নানাভাবেই করব। এই জন্যেই কয়েক মাসের নিমন্ত্রণ নিয়ে এখানে এসেছি। কবি, দ্রষ্টা, মানবহিতৈষী, বিরাট চারিত্রপ্রতিভা নিয়ে যিনি এই শিক্ষাসত্র গড়ে তুলেছিলেন তাঁর দান আমার জীবনের পর্যায়ে পর্যায়ে আশ্চর্য উপলব্ধির যোগে প্রত্যহ আবিষ্কার করছি। আমাদের দেশে ''কবি'' কথাটার মধ্যে রবীন্দ্র মানসের পূর্ণতা বিধৃত — সেই আখ্যার চৈতন্য দিয়েই তাঁকে জেনেছি, জানব।

প্রশ্ন : রবীন্দ্র আদর্শ বলতে কী বোঝা যেতে পারে? সেটা কি অবিচল বা অপরিবর্তনীয়? বা যুগে যুগে কিছু পরিবর্তন সম্ভব? আজকের বিশ্বভারতীতে তার কোনও পরিবর্তন ঘটেছে কি? যদি পরিবর্তন ঘটে থাকে তাহলে কী করা উচিত বলে মনে করেন?

উত্তর : আদর্শের ঠিক পরিবর্তন হতে পারে না, কবি যে আদর্শকে ভারতবর্ষে এবং বিশ্বজনীন কর্মে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন তার ক্রিয়া ধারাবাহী নদীর মতোই চলেছে। পরিস্থিতি, পরিবেশ, বিশেষ কর্মপ্রবর্তনার অধ্যায় কীভাবে ইতিহাসে প্রকাশ পাবে তা বলা যায় না। কিন্তু আজকের জগৎ যথার্থই আন্তর্জাতিক। সেই আন্তর্জাতিক ধর্ম রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধির সঞ্জীবন মন্ত্রে নিত্য অনুপ্রাণিত।

রবীন্দ্রনাথ সেই আন্তর্জাতিক চৈতন্যে এবং কর্মপ্রবর্তনাকে নব বিশ্বরূপে রূপান্বিত করেছেন। এই আন্তর্জাতিক আদর্শ কেবল ভারতবর্ষে নয়, এশিয়ায়, আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়া, য়ুরোপে এবং দূরতম পূর্বদেশগুলিতে আজ জাগ্রত হচ্ছে। ভ্রমণের যোগে তা দেখার সুযোগ হয়েছে।

প্রশ্ন : বিশ্বভারতীতে যে আন্তর্জাতিকতার চরিত্র — তা মনে হয় মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ন হয়েছে। সেই আন্তর্জাতিকতার চরিত্র ও ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারে এই বিশ্ববিদ্যাতীর্থপ্রাঙ্গনে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত? এ সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মন্তব্য জানতে চাই।

উত্তর : পৃথিবীর সর্বত্র রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের কিছু কিছু নূতন দায়িত্বভার তুলে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র ইংরেজি রচনার সংগ্রহ বিশ্বভারতীর তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হওয়া বিশেষ দরকার। দেশী বিদেশী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে দু'চারজনকে এখানে নিমন্ত্রণ করে নতুন তর্জমা, আলোচনা এবং তাঁর ভাবের বিস্তৃতির জন্যে যোগ্য বৃত্তি দিয়ে নিমন্ত্রণ করা আবশ্যিক মনে হয়, সহযোগী বা নামী সাহিত্যিকের সঙ্গে তারা কাজ করবেন।

এখানে অনুশীলন, আলোচনা, সম্মেলনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের এবং অন্য দেশীয় সৃষ্টিশীল জ্ঞানী শিল্পীদের জ্ঞান এবং ধ্যানের পরিচয় একত্র করার ভার আমাদের। কর্মজ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের রাজ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ তাঁদের বিষয়ে আমরা যেন ঐতিহাসিক এবং সমকালীন দৃষ্টি নিয়ে প্রশস্ততর অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই। তা না হলে রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং জীবনকর্মও বিশ্বের কাছে যথার্থভাবে পৌঁছবে না।

আজকের দিনে — এবং পূর্বেও তাই ছিল — ধর্মসাধনার জন্যে বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা আবশ্যিক, — বিজ্ঞানের অনুপ্রেরণা না থাকলে ধর্ম ক্রিয়াকাণ্ডে পর্যবসিত হয়। রবীন্দ্রনাথ যে মানবধর্মের নিত্যপূজারী ছিলেন সেখানে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে বিরোধ দেখা দেয়নি।

মনে রাখা চাই যে আশ্রমেও রবীন্দ্রনাথের রচনার পুনরুক্তি তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে না — অন্যান্য প্রতিভার চর্চা না থাকলে আমরা তাঁকে হারাব। আইনস্টাইন, শোয়াইটজার, টোমাস মান, কবি ইয়েটস আমাদেরই লোক, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথের নিকটবন্ধু ছিলেন। পাস্টেরনাক, এলিয়ট, এজরা পাউন্ড বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই তীর্থের সহযাত্রী।

রাষ্ট্রিক নেতৃত্ব যে দিকেই যাক, পুরাতনের মরীচিকায় তাঁদের অনুসরণ আমরা করব না, সামনের দিগন্ত ক্রমাগতই খুলে যাচ্ছে। এদেশে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, নতুন বৈজ্ঞানিক এবং উদ্ভাবনী বিদ্বানময় বীরের দল জওহরলালজি ও সুভাষচন্দ্র, স্বাধীনতন্ত্রী সাধক বাহির বিশ্বলোকে ডাক দিয়ে গেছেন। বাংলার তরুণ সাহিত্যিক এঁদের জ্ঞানও আমরা তুলে নেব, সাহিত্যে শিল্পে তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন।

UNPUBLISHED LETTERS OF VIDYASAGAR

ARABINDA GUHA

Vidyasagar, in his student life, wrote two letters on 14 September 1840 and 2 August 1841 seeking employment as a teacher.

Vidyasagar, in his letter dated 14 September 1840 to T.A. Wise, Secretary to the government Sanskrit College, stated :

"With due deference I beg to submit that since the date of Hurry Prosaud Turkopanchanan's illness (Professor of the first Grammar Class) I have been discharging with your permission the duties of his office. That I have acquitted myself creditably well, I hope, on enquiries being made to the Assistant Secretary, be amply testified by him. Now I regret to inform you that the worthy Professor has departed this life 3 days since. So I beg to offer myself a candidate for the situation. As to my qualifications and conduct I herewith annex a copy of the certificate granted to me by the Law Committee after having passed the ordeal of a scrutinizing examination.

I further beg to observe that I have undergone the ordeal and obtained the certificate 3 years prior to the prescribed term of 12 years which the Regulations of the college allow for the acquisition of a knowledge in the different branches taught there. With respect to my knowledge of general literature a reference to the annual reports of the college will satisfy you. In conclusion I beg to observe that as I have received my education at the college I have a right in preference to others to obtain patronage from you and to lay pretensions to my situation that may occur in the Institution".

"Hindoo Law Committee of Examination

We hereby certify that at an Examination held at the Presidency of Fort William on the 22nd twenty-second April 1839 by the Committee appointed under the provisions of Regulation XI 1826 Issur Chunder Vidyasagur was found and declared to be qualified by his eminent knowledge of the Hindoo Law to hold the office of Hindoo Law Offices in any of the Established Courts of Judicature.

H. T. Prinsep — President
J.W. J. Ouseley — Members of the Committee of Examination

This certificate has been granted to the said Issur Chunder Vidyasagur under the seal of the Committee this 16th Sixteenth day of May in the year 1839 corresponding with the 3rd Third Joistha 1761 Shukavda.

J. C. C. Sutherland
Secretary to the Committee

N. B. Said Issur Chunder Vidyasagur aged 22 years son of Thakurdas Bundopadhya."

[General Committee of Public Instruction,
Misc Vol No. 2,
Part IV,
1835 - 1841,
pp. 719-22]

Vidyasagar, a student of Logic in the Sanskrit College of Calcutta, in his letter dated 2 August 1841 to T. A. Wise, Secretary to the General Committee of Public Instruction, stated:

"Hearing that another Professor of Literature in the Sanscrit College at Benares in requisition owing to some new arrangement I beg with due deference to submit myself a candidate for the same. With regard to my qualifications I will say no further than annex the certificates which the Law Committee and our late Secretary Capt G.T. Marshall have been pleased to grant me after I had been subjected to severe scrutinizing examination. I have studied all the branches of Sanscrit Literature and am willing to undergo any ordeal in any branch of the same if you deem it expedient. But I had ample opportunities of testing my qualifications in all the branches off Literature and Science which are taught in our Sanscrit College. From the reports of the annual examination and particularly you will recollect I had once been deputed by you to take charge of the Grammar Department of our college during which time the pupils under my care had creditably progressed in their studies so much so that you were pleased to confer on me a handsome compensation and also a promise of obtaining a situation at any next best opportunity that would present itself and now that there is a situation at your disposal I request you will be pleased not to overlook my claim to it,"

Certificate dated 4 February 1841 given by G.T.Marshall :

"Certified that the bearer Ishwar Chundra Vidyasagara, was a student in the Sanscrit College while I was Secretary and is still attached to that Institution, having studied there, during his eleven years residence, Grammar, Poetry, Rhetoric, Vedanta, Smriti or Law, Mathematics and Nyaya or Logic — all with great success. He is now studying the last named branch of learning. He obtained prizes in Law and for prose and poetical composition, during my time and was remarkable for intelligence, industry and attention. He holds a certificate from the Hindoo Law Committee and will no doubt obtain one from this college for general acquirements, when his fixed time of study (12 years) shall be complete. I have much pleasure in giving him this certificate according to his own earnest request, as he is an amiable and well-disposed young man, as well as a very distinguished pupil of the college."

[General Committee of Public Instruction,
Misc Vol No. 2,
Part IV,
1835-1841,
pp. 858-61]

At the bottom of each of the letters dated 14 September 1840 and 2 August 1841 Vidyasagar signed in Bengali.

It may not be out of place to mention here that J. C. C. Sutherland, officiating Secretary, Law Examination Committee, Sanskrit Department, gave on 16 May 1839 the following information on vidyasagar :

"Age — 22 years; Birth place — Village Beershingha, Pergunnah Buroda, Zillah Hooghly ; Present residence - Burobazar."

[Judicial (Civil) Department Proceedings No. 11, 28 May 1839]

It is interesting to note that the age of Vidyasagar in 1839, according to his autobiography, was 19 years and not 22 years as mentioned by the Hindoo Law Committee.

ম্যাগসেসে পুরস্কার

সত্যজিৎ রায় ও শম্ভু মিত্রের প্রত্যাভিভাষণ

(রামন ম্যাগসেসের নামাঙ্কিত ম্যাগসেসে পুরস্কারের নাম এদেশেও বিদিত। ভারতের অনেক গুণীজন এই পুরস্কার পেয়েছেন যার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা অপ্রতুল নয়। ১৯৬৭ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯৭৬ সালে শম্ভু মিত্র।

অন্যান্য আন্তর্জাতিক পুরস্কারের মতো, এই পুরস্কার প্রদানের আগে Citation বা অভিজ্ঞানপত্র পাঠ করা হয়, যার উত্তরে প্রাপক তার সংক্ষিপ্ত নিবেদন জানান। ম্যাগসেসে পুরস্কার গ্রহণকালে সত্যজিৎ রায় ও শম্ভু মিত্র তাদের লিখিত, যে বক্তব্য পাঠ করেছিলেন তা এই দেশে এর আগে প্রকাশিত হয়নি। বিভাবেই প্রথম প্রকাশিত হল। মূল ইংরেজি ভাষায় নিবেদিত সেই বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ অপ্রয়োজনীয়।

বিখ্যাত সাংবাদিক ও লেখক, অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ), তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে এই দুটি অপ্রকাশিত প্রতিবেদন আমাদের মুদ্রণের জন্য দিয়েছেন। তিনি নিজেও ম্যাগসেসে পুরস্কার জয়ী। তার কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা। এ দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্যই প্রকাশ। — **সম্পাদক**।

(ফিলিপাইনসে ব্যবহৃত ইংরেজি বানান অবিকৃত রাখা হল)

THE 1967 RAMON MAGSAYSAY AWARD FOR JOURNALISM, LITERATURE AND CREATIVE COMMUNICATION ARTS

SATYAJIT RAY

Citation read by the Honorable Manuel P. Manahan, Trustee, Ramon Magsaysay Award Foundation

Millions in India could not in their lifetime know the richness of their literary heritage because they are illiterate or too poor to buy books. To them and the world outside, **SATYAJIT RAY** is bringing films with a fidelity to this heritage and to life. Unlike the vast majority of Indian films which are escapist, he strives for emotional integrity on relationships. With a disciplined sensitivity and a painter's sense for the visual he probes the "Struggles of an ordinary man trying to be good".

The cultural rebirth of Bengal has long been a family concern. His grandfather, Upendra Kisore Ray Chauduri, recorded folklore pioneered in engraving and color printing and was a leader of the potent intellectual Brahmo Movement. His father, Sukumar Ray, gifted cartoonist, wrote verse, especially for children with buoyancy and humor and remains the most popular Bengali poet after Rabindranath Tagore.

Raised in this environment and schooled at Viswa-Bharati University at Santiniketan under Nandalal Bose, father of revivalist Bengali art, Ray first turned his talent to commercial art. His performance for a Calcutta advertising firm won him a trip to Europe. In London, seeing *Bicycle Thieves, Louisiana Story and Earth*, he "discovered" the visual potential of the film. Back home in Bengal, watching Jean Renoir make *The River*, gave him a feel for production in this media.

"The time came when I felt I must make a film", Ray recalls. He remembered the novel *Pather Panchali* (Ballad of the Road), a popular classic for which he had done illustrations. In October 1952, joined by eight technicians and actors, most of whom were amateurs, Ray began filming on weekends and holidays. Halfway through, they were forced to halt for lack of money. Financial assistance from the West Bengal State Government finally permitted completion three years later.

Hardly a commercial success in India outside of Bengal, this film went on to win the *Cannes Film Festival* special award for "best human document" in 1956. A second production, *Aparajito* (Undefeated), in 1957, won the Grand Prix at Venice. The trilogy, later completed with *Apur Sansar* (The World of Apu), telling a story of childhood, youth and manhood in Bengal, won altogether 16 international awards — a singular achievement in world cinema.

In the Apu trilogy and his 11 other films and one documentary, Ray has striven for realism and a genuine expression of India. Aware of his medium's potential and a director's responsibility as he chronicles transition in his society, he emphasizes positive values. His protagonists have faith. Their poverty is not of the human spirit but of circumstance. Sadness of life is there, and so is sheer joy of living. The boy Apu recites poetry in the night. In *Jalsaghar* (The Music Room), a selfish feudal lord, resisting the new industrial age amidst the ruins of his crumbling estate with a solitary aging elephant, is redeemed by his love for music.

Equipment often has been inadequate, the budget stringent and the actors amateurs. But talent compensates. Writing his own scripts and sometimes composing the score, Ray, at the age of 45, has become India's poet of the cinema. With an artist's true concern for enduring human dimensions of life, he has deepened his people's understanding of themselves and elevated their horizons of what the individual can accomplish.

By this election, the Board of Trustees recognizes *Satyajit Ray's* uncompromising use of the film as an art, drawing themes from his native Bengali Literature to depict a true image of India.

RESPONSE by SATYAJIT RAY

In my country, in the days of my boyhood, the cinema was apt to be looked upon by the elderly and the conservative with a certain distaste. This applied more to the profession than to the films themselves. One could enjoy going to the movies, but that didn't necessarily imply that one would approve of a member of one's family joining the film profession.

When I decided, some 15 years ago, to plunge into this very profession, such prejudices were already on the way out, but I made at least one person unhappy and that was my mother.

When my first film won a festival prize my mother was pleasantly surprised. From that time onwards, until her death some years ago, she grew to be proud of my work, and of the prizes which came to me from all parts of the world.

For myself, I have never ceased to be surprised at the fact that my films have been able to reach audiences beyond the limits of my own country. I am surprised because my films are stories about people who form a tiny segment, not only of humanity as a whole, but of India itself.

I feel particularly honored and gratified by the Magsaysay Award because it relates not only to the craftsmanship of my films, but to their content as well. Unlike some other arts such as music and painting, cinema, by its very nature, makes concrete statements about people and society. If through my films I have been able to make statements which have been found illuminating, and therefore worthy of recognition, and if through them I have been able to convey some of the joys and sorrows of my people, as well as some of the unique flavor of my country, I would feel more than compensated for my efforts, and more than hopeful about the work that lies ahead.

Once again, may I express my sincere gratitude to the Magsaysay Award Foundation for the great honor they have bestowed on me.

THE 1976 RAMON MAGSAYSAY AWARD FOR JOURNALISM, LITERATURE AND CREATIVE COMMUNICATION ART

SOMBHU MITRA

Citation read by the Honorable Guillermo S. Santos, former Trustee, Ramon Magsaysay Award Foundation

Theater at its best is a most difficult and demanding art form. As mimed fable, the play laughs at fools and praises heroes while probing their emotional and ethical dilemmas amid the adventures of life. Yet the serious dramatist goes far beyond telling tales. He mirrors and illuminates the realities of his society. None are spared in this remorseless scrutiny. Ideological persuasions are seen as incomplete and often shallow. Candor of inquiry and presentation distinguish the genuine artist from the propagandist. And his actors portray the timelessness and universality of the essential human character that with its flaws, fallacies and fortitude must shape our destinies.

SOMBHU MITRA qualifies with gifted versatility as a complete man of such theater. A Bengali, he is heir to the rich cultural tradition that also produced Rabindranath Tagore. Joining the professional stage in 1939 when 24 years old, he quickly earned repute as a fine actor with notably eloquent voice and gesture, but quit three companies out of dissatisfaction with stereotyped dramas. In association with wartime anti-fascist writers and artists in 1943, his staging of a protest play won theatrical acclaim. This relationship ended in 1948 with his refusal to sacrifice art to doctrine. That same year he organized a non-commercial dramatic troupe. Bohurupee, with 15 artists for whom the theater was not a livelihood but a dedication.

Bohurupee's initial years were marked by artistic integrity achieved through hard struggle. The troupe was shunned by commercial theaters, alarmed by the success of its startling departures from familiar sentimentality and melodrama, and accused of distortion by the political right and left. MITRA and his wife, Tripti—herself an accomplished actress, subsisted on tea and boiled vegetables until tided through each crisis by film roles. By preference, MITRA today receives income only as Head of the Drama Department of Rabindra Bharati University in Calcutta.

Overcoming meager costuming and sets with masterful acting and stagecraft, MITRA produced for Indian audiences some of the world's great classics. His adaptations of Henrik Ibsen's *An Enemy of the People* and *A Doll's House*, and his sensitive translation of Sophocles' *Oedipus Rex*, made dramatically meaningful in Bengali their moral concern with truth and self-realization. His production of *Raktakarabi* (Red Oleanders), Tagore's never-before staged poetic allegory of the spirit triumphing over materialism, was a cultural milestone. Portrayal of such philosophical implications with convincing reality in this and other powerful plays by Tagore has allowed Bengalis to discover themselves in drama. Bohurupee's repertoire, also received with critical enthusiasm in Delhi, Bombay and Madras, includes modern comedies and social satires by MITRA and hitherto unknown Indian playwrights.

An exacting disciplinarian with himself and colleagues, MITRA, trains his troupe in voice culture, body movement and all other aspects of acting, and in stage organization, lighting and decor. His insistence upon minute examination of plays encourages reflection and interpretation. In 28 years Bohurupee's artistic teamwork has fostered other lively drama groups throughout India, while MITRA has shaped the literary taste of an intellectual generation.

In electing SOMBHU MITRA to receive the 1976 Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts, the Board of Trustees recognizes his creating a relevant theater movement in India by superb production, acting and writing.

RESPONSE by SOMBHU MITRA

Here tonight I rise, in humility and gratitude, to accept this honor on behalf of all those around the world who have joined the search for a meaningful theater. At the core of this search is man, in his relationship with society and with his own self. Only when this dual relationship finds its harmony does man achieve his completeness.

Man, perhaps, laid the foundations of society out of a sense of necessity. But it is the nature of man that he is compulsively driven to overcome the dictates of mere convenience. In the early days of civilization, as he needed to draw water, he invented the urn. The urn was filled, but not his heart. So he began now to decorate it with color, geometric patterns, and his imagination. What an incomprehensible and strange craving!

Thus, too, in the sensual urge, he had to establish the innate presence of love. Thus again, the necessity of having to live together had to find expressions in relations that are sacred between the son and the mother, the brother and the sister. Why so? We do not know yet, nor can we fully perceive the nature of the intimate man who is in us. Nor can we fathom the depth where he resides. Who knows how far back he stretches out into our membrane of consciousness?

That is, perhaps, why we are threatened by inevitable disequilibria — a loss of sense of balance—as society is increasingly rigidly organized and shaken by the explosion of technology. Man finds himself unable to satisfy his creative and human faculties within the limits of the organized society which he structures around himself. As the mechanism of creature comforts piles up, he is restless. He is alienated. And he is seized by hopeless greed and violence.

It is now clear that personal religion which prompts in us the finer sensibilities — the craving for love, the touch of affection and the persuasion of compassion — all spring from the valley of our ancient pastoral world. These sensibilities are daily eroded as we crowd ourselves in the dehumanized metropolises of the world. And yet, there is no road by which to return. This is today's drama. The afflictions of today's man and his tragic efforts to find his bearings with his social self are at the very center of the contemporary theater movement.

Every age throws up its own peculiar fundamental questions, and it must come up with an answer relevant to the times. A relevant theater is one that plunges into the deepest recesses of these issues, where man is ever seeking to come to peace with himself.

In this search of man for man, we are all partners, wherever we are and whatever we do. On behalf of all I pay my homage to the undying ideals of the late Ramon Magsaysay, in whose name we are gathered here tonight.

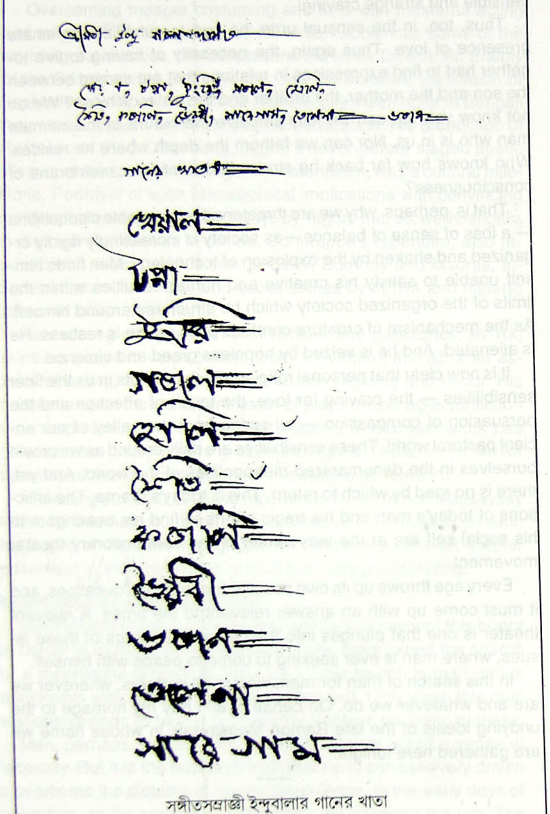
খেয়াল
টপ্পা
ঠুংরি

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার গানের খাতা

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার গানের খাতা ও ডায়েরি থেকে কয়েকটি পৃষ্ঠা

বাঁধন সেনগুপ্ত

পাঞ্জাবের অমৃতসরে, শতাব্দীর সমবয়সি সঙ্গীতশিল্পী, চলচ্চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী ইন্দুবালা দেবীর জন্ম ১৯শে কার্তিক ১৩০৫ বঙ্গাব্দ, বুধবার। কিছুকাল আগে প্রায় নীরবে এই কিংবদন্তি শিল্পীর জন্মশতবর্ষ অতিবাহিত হয়। তাঁর পরিবার ও শুভার্থীজনের আয়োজনে একটি স্মরণসভা ছাড়া জাতির পক্ষ থেকে বৃহৎ আর কোনও উদ্যোগ বা আয়োজন নজরে পড়েনি। ইন্দুবালার প্রয়াণ তারিখ ছিল ৩১শে আগষ্ট ১৯৮৪। বাঙালির সংগীতের ইতিহাস বলতে গেলে, ঐতিহাসিক তিন কন্যার, অর্থাৎ ইন্দুবালা-আঙুরবালা-কমলা ঝরিয়ার অবদানই সকলকে স্মরণ করতে হয়। এঁরাই ছিলেন এই শতাব্দীর বাংলা তথা বাঙালির সফল গানের সেই উষাকালের প্রতীক। পিতা মতিলাল বসু আর মাতা রাজবালাও ছিলেন স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। মতিলাল ছিলেন সাহিত্যমোদী ও সংগীতরসিক। তিনি 'চারিচিত্র' নামে একটি উপন্যাস রচনা করে সেকালে খুবই সুনাম অর্জন করেছিলেন। এছাড়া 'গান ও গল্প' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকারও তিনি ছিলেন সম্পাদক। গত শতাব্দীর শেষ দশকে যোগীন পালের কাছ থেকে একটি সার্কাসের দল কিনে মতিলাল তার নাম দেন 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস'। মা রাজবালা সেই সার্কাসেই খেলা দেখাতেন। পরে তিনি পেশাদারি থিয়েটারে যোগ দেন। মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকে প্রথম অভিনয় করেছিলেন (১৯০৯)। তাঁর অভিনীত পেশাদার মঞ্চের দ্বিতীয় জনপ্রিয় নাটক 'তপোবল' (১৯১১)।

ইন্দুবালার সঙ্গীতশিক্ষা তাঁর বাবার কাছে, ছোটবেলায় কোলে বসে। তখন তাঁর বয়স পাঁচ-ছয় বছর। প্রথম শেখা গানটি ছিল একটি ব্রহ্মসংগীত। মুখে মুখে বাবার কাছ থেকে শেখা সেই গানটির প্রথম চরণ — 'নাদ ব্রহ্ম জীবন্ত প্রমাণ/গানরূপী হরি হরিরূপী গান।' মতিলালের সঙ্গে রাজবালার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর রাজবালার কাছেই ইন্দুবালার হাতেখড়ি হয় রামবাগানের বাড়িতে। পরে তাঁর অভিভাবক স্বরূপ জীবনকৃষ্ণ ঘোষ ইন্দুবালাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অন্যত্র গান শেখানর ব্যবস্থা করে দেন। রাজবালার ঘরে গানের আসরে আসতেন ওস্তাদ লছমী মিশ্র। তাঁর ভাই গৌরীশঙ্কর মিশ্রের কাছে ১৯১২ সালে শুরু হয়েছিল ইন্দুবালার আনুষ্ঠানিকভাবে সঙ্গীতশিক্ষার পালা। ইন্দুবালার বয়স তখন তেরো-চোদ্দো। গৌরীশঙ্কর আর কালীপ্রসাদ এই দুই ভাই থাকতেন ১৫৮ বলরাম দে স্ট্রিটে। গৌরীশঙ্করের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, শেতাঙ্গিনী, কৃষ্ণভামিনী, অনাথনাথ বসু এবং স্বয়ং ইন্দুবালা। গৌরীশঙ্কর ভাল সারেঙ্গিবাদক ছিলেন। গহরজানের সঙ্গে তিনি একদা সারেঙ্গি বাজাতেন। এই গহরজান ছিলেন সেকালের বিখ্যাত শিল্পী। কিংবদন্তিস্বরূপা এই শিল্পীর (জন্ম ১৮৭৩) কাছে ইন্দুবালা নাড়া বেঁধেছিলেন। পরে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁর কাছে ক্লাসিকাল গান শেখার পাশাপাশি ইন্দুবালা বাংলা গান শেখায় মন দেন। গ্রামাফোন কোম্পানির আমন্ত্রণে ১৯১৬ সালে প্রথম ইন্দুবালার রেকর্ড বের হয় (পি ৪৩৯০)। গান দুটি হল, 'ওরে মাঝি তরী হেথা' এবং 'তুমি এসো হে'। গান দুটি অত্যন্ত

জনপ্রিয় হওয়ায় তা 'রি-টেক' করা হয়েছিল। কোম্পানি বলেছিলেন, In 1916 she was approached by the Gramophone Company Limited, and she made some very successful records, which soon increased her fame as singer. Since then she has been continuously in the service of "His Master's Voice" and she holds a high place in the estimation of gramophone 'fans'. She was the first Indian lady singer to make records as an amateur...

১৯২৬ সালে কলকাতায় রেডিয়ো সেন্টার (Indian Broadcasting Corporation) চালু হবার পর ইন্দুবালা দ্বিতীয় দিন থেকেই গান শুরু করে একটানা প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর রেডিয়োতে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গ্রামাফোন কোম্পানিতে তাঁর ট্রেনার ছিলেন প্রথমে উস্তাদ জমীরুদ্দীন খান। মাত্র ৩২ বছর বয়সে তাঁর অকালপ্রয়াণের পর (২৯শে নভেম্বর ১৯২২) স্বয়ং কাজী নজরুল ইসলামের পরিচালনায় ইন্দুবালার ট্রেনিং শুরু হয়। কাজী নজরুল ছিলেন প্রায় ইন্দুবালারই সমবয়সি। কোম্পানিতে ইন্দুবালা ছিলেন কাজী নজরুলের চেয়ে সিনিয়র। তা সত্ত্বেও দীর্ঘ প্রায় আট বছর ইন্দুবালা নজরুলের ট্রেনিং-এ রেকর্ডে অসংখ্য গান গেয়েছিলেন। কাজী নজরুল আদর করে ইন্দুবালাকে 'নানী' বলে ডাকতেন। ইন্দুবালাও বাধ্য ছাত্রীর মতোই কাজী সাহেবকে মেনে চলতেন, ভালবাসতেন ও সম্মান জানাতেন। নজরুলের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ইন্দুবালার মোট পঁচিশটি গানের রেকর্ড বেরোয়। নজরুলের কাছে তিনি বেশ কিছু ভজন গানও শিখেছিলেন। নজরুলের কাছে শেখা ও রেকর্ড করা প্রথম দুটি গান ছিল, 'রুমু ঝুমু ঝুম' ও 'চেয়োনা সুনয়না আর চেয়োনা' (রেকর্ড নং পি, ১১৬৬১)।

সেকালে রেডিয়োতে মূলত ইন্দুবালা বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও গজল গানই বেশি গাইতেন। পাশাপাশি গেয়েছেন কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও অসংখ্য পুরাতনী গান। বাঙালি গায়িকাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই সেকালে স্বচ্ছন্দে হিন্দি ভজন ও উর্দু গজল গাইতে পারতেন। ইন্দুবালাই একমাত্র শিল্পী যিনি গ্রামাফোন ও রেডিয়োর পাশাপাশি অসংখ্য চলচ্চিত্র ও নাটকে, মঞ্চ অভিনয়ে অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। এছাড়া বেতার নাটকেও তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করতেন। পেশাদার মঞ্চে তাঁর অভিনীত নাটকের সংখ্যা ৫৫টি। ইন্দুবালার অভিনীত চলচ্চিত্রের সংখ্যা বাংলা, হিন্দি, উর্দু ও তামিল ভাষা নিয়ে মোট ৫০।

গানের জগতে ইন্দুবালা একদা ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর গাওয়া গানের রেকর্ডের সংখ্যা বাংলায় ১৩৪ এবং উর্দু, হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষায় মোট ১১৪। এছাড়াও আরও ৩৫টি গান ইন্দুবালা রেকর্ড করেছিলেন। অথচ সেকালের কিংবদন্তিপ্রায় ইন্দুবালার কোনও ঘরানা তৈরি হয়নি। সেকালের মহীশূরের এই সভাগায়িকার কাছে পরবর্তী কালের খ্যাতনামা শিল্পীরা অনেকেই তালিম নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর স্টাইল কেউ তেমনভাবে রপ্ত করতে পারেননি। দীর্ঘকাল কঠোর অনুশীলন ও শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কাছে গান শিখে এই প্রতিভাময়ী শিল্পী একদা শ্রেষ্ঠত্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তুলনায় অন্যান্য শিক্ষার্থী শিল্পীদের, তাঁর কাছ থেকে সবকিছু নেবার সামর্থ্য ছিল কম। যে কারণে তাঁর যথাযোগ্য ঘরানা বাংলা গানের জগতে অনুপস্থিত। অবাঙালি বহু শিল্পী অন্যান্য প্রদেশে তাঁর অননুকরণীয় স্টাইল গ্রহণ করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সম্প্রতি পুরোনো দিনের গান ও সেকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সম্পর্কে সঙ্গীতরসিক সমাজের একাংশের মধ্যে আগ্রহের সঞ্চরণ লক্ষ করা যাচ্ছে। সংগীতের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহে স্বাস্থ্যের লক্ষণ। এঁরা নতুন নতুন সংস্থা গঠন করে সেকালের সংগীতের ইতিহাস উদ্ধার ও সংরক্ষণের কর্মে এখন নিয়োজিত। বাংলা ও বাঙালির অতীত ঐতিহ্য ও ধারাবাহিকতার উৎস সন্ধানী এই রসিকসমাজ নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধাভাজন। ইন্দুবালা দেবীর প্রতিও শতবর্ষে সে আগ্রহ দেখা যায়নি। আজ তা নতুন করে শুরু হয়েছে। সম্প্রতি ইন্দুবালা দেবীর একটি সম্পূর্ণ গানের খাতার সন্ধান পাওয়া গেছে। 'শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী' নামাঙ্কিত শিল্পীর স্বহস্তলিখিত ৮০ পৃষ্ঠার ফুলস্কেপ সাইজের সেই গানের খাতায় দেড় শতাধিক খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল, হোলি, চৈতি, কাজরি, তেলেনা ও ভজন গানের কথা ও স্বরলিপি সযত্নে সংরক্ষিত। এগুলি ইন্দুবালা শিখেছিলেন উস্তাদ ইলাহী বক্স, উস্তাদ কালীপ্রসাদ মিশ্র সহ সেকালের খ্যাতনামা শিল্পীদের কাছে। রসিক সমাজের অবগতির জন্য ইন্দুবালার গানের খাতা থেকে তাঁর শেখা কয়েকটি গানের কথা প্রকাশিত হল।

গায়িকা ইন্দুবালা বহুবছর ধরে নিজের জীবনের বহুকথা তাঁর ব্যক্তিগত ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছেন। সেকালে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিটি দিনের কথা বছরের পর বছর আর কেউ লিখে রাখতেন কিনা জানা যায়নি। তবে অভিনেত্রী বিনোদিনীর লেখা আত্মজীবনীর কথা অনেকেরই স্মরণে আছে। কিন্তু গায়িকা, অভিনেত্রী ইন্দুবালার ব্যস্ত জীবনে দীর্ঘকালীন দিনলিপি লেখার এমন উদাহরণ সম্ভবত আর নেই। শিল্পীর প্রয়াণের পর সেসব ডায়েরিগুলো কোথায় আছে অথবা হারিয়ে গেছে কিনা তা জানা যায় না। শোনা যায়, উৎসাহী সংগ্রাহকদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর পরিবারের লোকেরা হয়তো আলোকপাত করতে পারবেন। একদা ইন্দুবালার কাছে যাতায়াত ও নিয়মিত যোগাযোগের ফলে এবং তাঁর জীবনী প্রণয়ন পর্বে সত্তর ও আশির দশকের প্রথমার্ধে সেই সব ডায়েরির কথা এই কিংবদন্তি সঙ্গীতসম্রাজ্ঞীর মুখে বহুবার শুনেছি। তাঁর আশঙ্কা ছিল, এই দিনলিপিগুলির কি পরিণতি হবে ভবিষ্যতে তাঁর অনুপস্থিতকালে। তাঁর সেই আশঙ্কা হয়ত অমূলক ছিল না। তাঁর বেশ কিছু ডায়েরি উৎসাহী সংগ্রাহকদের হস্তগত হয়েছে বলে শুনেছি। সেগুলি তাঁরা একত্রে প্রকাশ করতে চান যাতে এই প্রজন্মের মানুষজন তা পড়তে বা জানতে পারেন।

ইন্দুবালার একটি ডায়েরি অর্থাৎ কেবলমাত্র ১৯৬৯ সালের ডায়েরিটি আমার সম্পূর্ণ দেখবার সুযোগ হয়েছিল। জীবনী লেখার সময় তা খুব কাজেও লেগেছিল। শিল্পীর মেজাজ, মানসিকতা ও চরিত্র অনুসন্ধানের প্রশ্নে এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনের প্রাত্যহিক অভ্যাস ডায়েরিতে দিনপঞ্জির আকারে স্থান পেয়েছিল। ছিল সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত। এগুলি সবই এখন বলতে গেলে ইতিহাসের অঙ্গীভূত। ভাবীকালের উৎসুক গবেষক বা ইতিহাসমনস্ক মানুষের কাছে মূল্য অপরিসীম বিবেচনা করে সেই ডায়েরির কয়েকটি পৃষ্ঠার প্রতিলিপি এই রচনার শেষে সংযোজিত হল। ইতিপূর্বে ইন্দুবালার অপ্রকাশিত একটি আকর্ষণীয়, অসমাপ্ত ভ্রমণকাহিনী 'বিভাব' পত্রিকায় কয়েকবছর আগে প্রকাশিত হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট মহলে যে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার গানের খাতা এবং ডায়েরির পৃষ্ঠা থেকে উৎসাহী পাঠক হয়তো সেকালের শিল্পীদের বরণীয় মনন ও ভাবনার কিছু ইঙ্গিত পেতে পারেন এই প্রত্যাশায় বর্তমান প্রকাশ পরিকল্পনা।

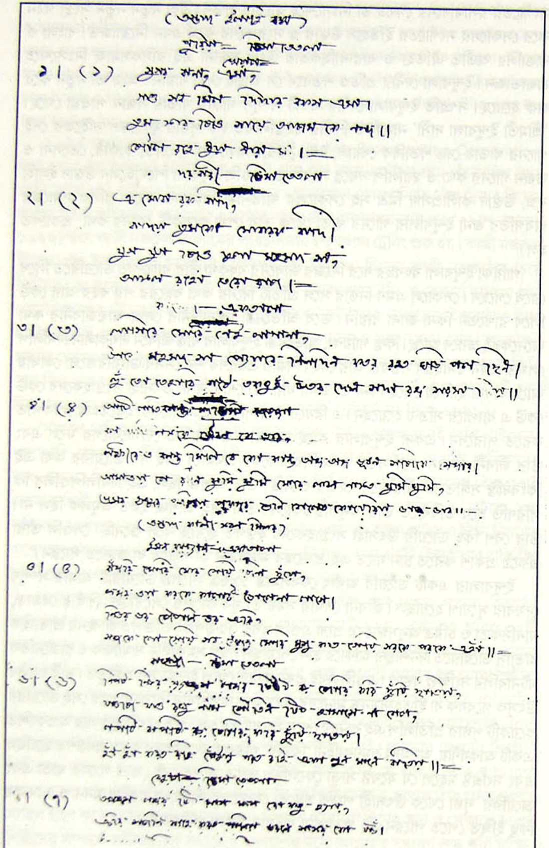

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার গানের খাতা

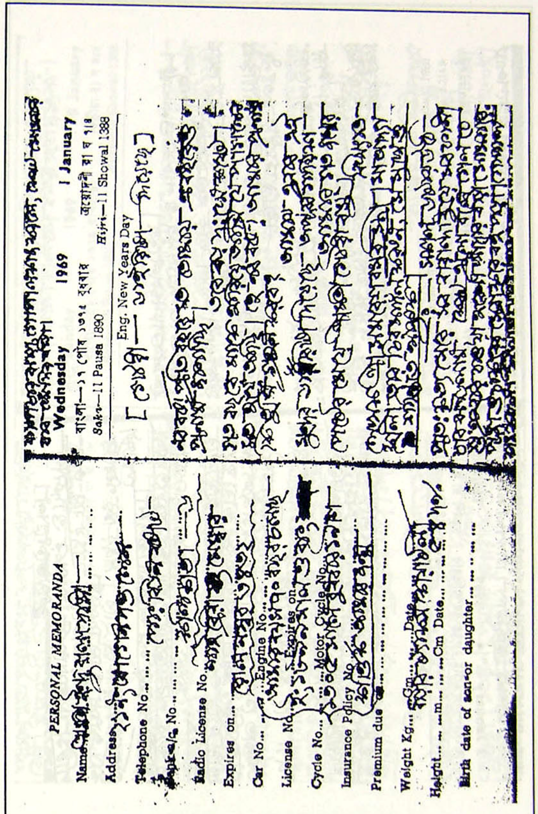

PERSONAL MEMORANDA

Name… … … … …

Address… … … … …

Telephone No… … … … …

Bank a/c. No… … … … …

Radio License No… … … … …

Expires on… … … … …

Car No… … … Engine No… … …

License No… … … Expires on… … …

Cycle No… … … Motor Cycle No… … …

Insurance Policy No… … … … …

Premium due on… … … … …

Weight Kg… … … Gm… … … Date… … …

Height… … … m… … … Cm Date… … …

Birth date of son or daughter… … … … …

Wednesday 1969 1 January

বাংলা—১৭ পৌষ ১৩৭৫ বুধবার

Saka—11 Pausa 1890

Hijri—11 Showal 1388

Eng. New Years Day

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার ডায়েরি

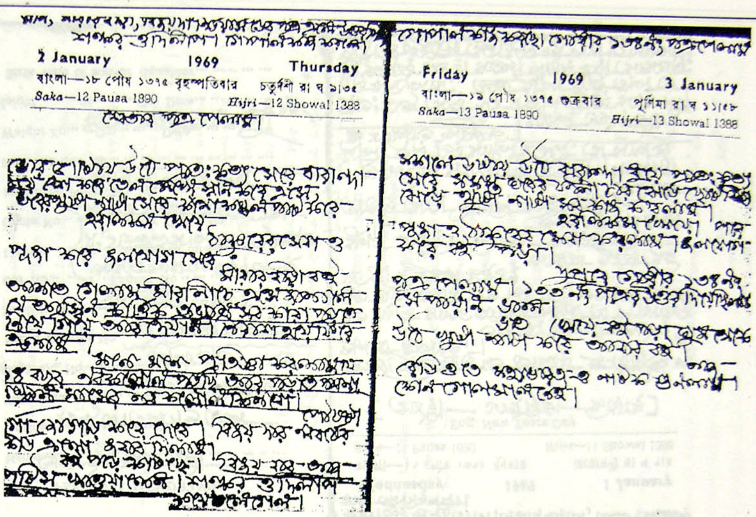

2 January 1969 Thursday
বাংলা—১৮ পৌষ ১৩৭৫ বৃহস্পতিবার চতুর্দশী রা ঘ ৯।৩৫
Saka—12 Pausa 1890 Hijri—12 Showal 1388

Friday 1969 3 January
বাংলা—১৯ পৌষ ১৩৭৫ শুক্রবার পূর্ণিমা রা ঘ ১১।৫৮
Saka—13 Pausa 1890 Hijri—13 Showal 1388

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার ডায়েরি

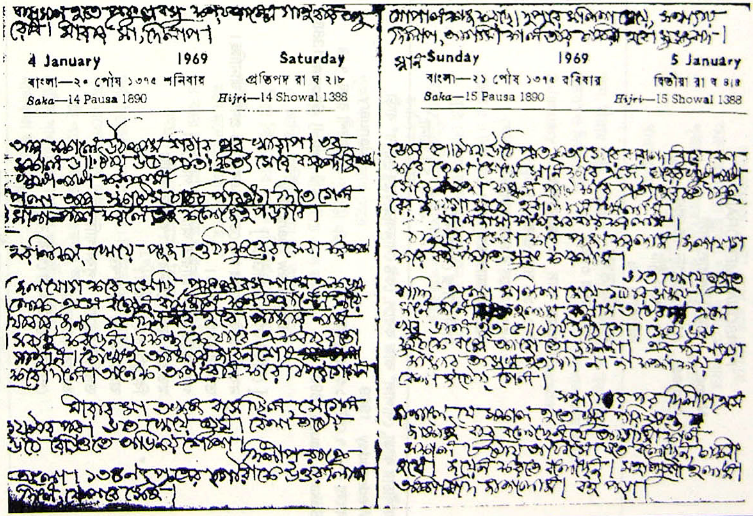

4 January 1969 Saturday
বাংলা—২০ পৌষ ১৩৭৫ শনিবার প্রতিপদ রা ঘ ২।৮
Saka—14 Pausa 1890 Hijri—14 Showal 1388

Sunday 1969 5 January
বাংলা—২১ পৌষ ১৩৭৫ রবিবার দ্বিতীয়া রা ঘ ৪।৪
Saka—15 Pausa 1890 Hijri—15 Showal 1388

সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার ডায়েরি

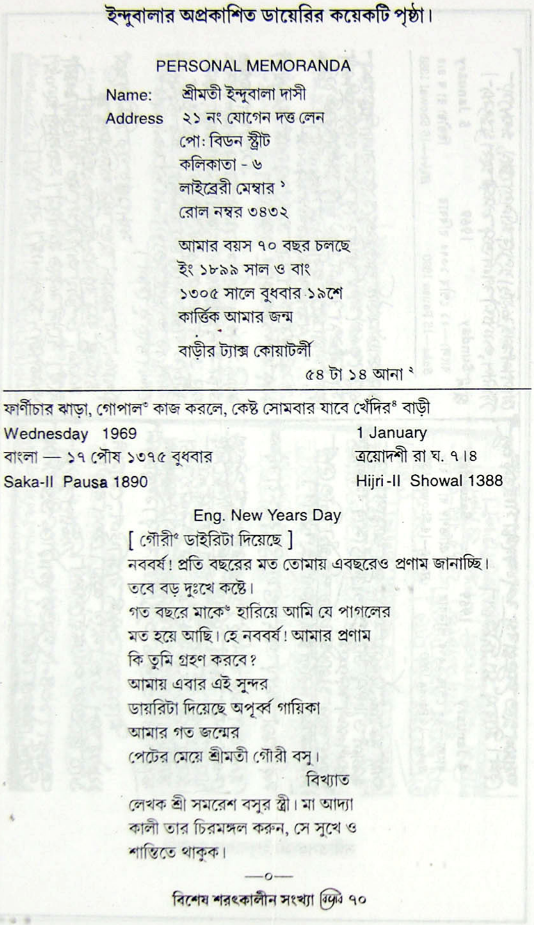

ইন্দুবালার অপ্রকাশিত ডায়েরির কয়েকটি পৃষ্ঠা।

PERSONAL MEMORANDA

Name: শ্রীমতী ইন্দুবালা দাসী
Address ২১ নং যোগেন দত্ত লেন
পো: বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা - ৬
লাইব্রেরী মেম্বার [১]
রোল নম্বর ৩৪৩২

আমার বয়স ৭০ বছর চলছে
ইং ১৮৯৯ সাল ও বাং
১৩০৫ সালে বুধবার ১৯শে
কার্ত্তিক আমার জন্ম

বাড়ীর ট্যাক্স কোয়াটর্লী
৫৪ টা ১৪ আনা [২]

ফার্ণীচার ঝাড়া, গোপাল[৩] কাজ করলে, কেষ্ট সোমবার যাবে খেঁদির[৪] বাড়ী

Wednesday 1969 1 January
বাংলা — ১৭ পৌষ ১৩৭৫ বুধবার ত্রয়োদশী রা ঘ. ৭।৪
Saka-II Pausa 1890 Hijri-II Showal 1388

Eng. New Years Day
[গৌরী[৫] ডাইরিটা দিয়েছে]
নববর্ষ! প্রতি বছরের মত তোমায় এবছরেও প্রণাম জানাচ্ছি।
তবে বড় দুঃখে কষ্টে।
গত বছরে মাকে[৬] হারিয়ে আমি যে পাগলের
মত হয়ে আছি। হে নববর্ষ! আমার প্রণাম
কি তুমি গ্রহণ করবে?
আমায় এবার এই সুন্দর
ডায়রিটা দিয়েছে অপূর্ব্ব গায়িকা
আমার গত জন্মের
পেটের মেয়ে শ্রীমতী গৌরী বসু।
বিখ্যাত
লেখক শ্রী সমরেশ বসুর স্ত্রী। মা আদ্যা
কালী তার চিরমঙ্গল করুন, সে সুখে ও
শান্তিতে থাকুক।

—o—

সকাল ৬টায় উঠে
প্রাতঃকৃত্য সেরে সব বারান্দা ধুয়ে সব ফার্নীচার ঝাড়লাম। কেষ্ট[৭] এলো বলে গেল যে
শুক্রবার যাওয়া হবেনা খাঁদার বাড়ী সোমবারে,
পূজা ও ঠাকুরের সেবা করে বইপড়া। গোপাল
কাজ করলো। নিউয়ার্স ডে বিজয়বাবু[৮] চপ ও কেক
খাওয়ালো।

স্নান, মীরার বাড়ী, বিজয়দা নিউয়ার্সডের পত্র এলে উত্তর দি।
শঙ্কর[৯] ও দিলীপ।[১০] গোপাল কাজ করলে।

2 January 1969 Thursday
বৃহস্পতিবার
শ্বেতার পত্র পেলাম।
ভোর ৫।। টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দা
ধুয়ে বেশ করে তেল মেখে স্নান করে এসে,
ঘরের খুটীনাটী সেরে কাঁথাকম্বল পাট করে
হরলিকস খেয়ে
ঠাকুরের সেবা ও
পূজা করে জলযোগ সেরে
মীরার[১১] বাড়ী বই
আনতে গেলাম। মীরা নীচে এসে জানাল
যে আশ্বিন কার্ত্তিক অঘ্রান সব কারা পড়তে
নিয়ে গিয়ে আর দেয়নি। নিরাশ হয়ে ফিরে
এলাম।
মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে
১৪ বছর নবকল্লোল পড়ছি আর পড়তে পাবনা,
অঘ্রান মাসের নবকল্লোল কিনবো।
পৌষটা
দুর্গা[১২] জোগাড় করে দেবে। বিজয়দার নববর্ষের
কার্ড এলো জবাব দিলাম।
বই পড়ে কাটছে। বিজয়বাবু আজ
পেটিস খাওয়ালেন। শঙ্কর ও দিলীপ এলো।
নানাকথা কয়ে চলে গেল।

গোপাল কাজ করছে। গৌরীর ১৩৪ নং পত্র পেলাম।

Friday 1969 3 January
শুক্রবার

সকালে ৬টায় উঠে বারান্দা ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য
সেরে সমস্ত ঘরের ফার্নীচার ঝেড়ে ছোট বিছানা
ঝেড়ে খুটী নাটী সব কাজ করলাম।
হরলিকস খেয়ে। পরে
পূজা ও ঠাকুরের সেবা করলাম। জলযোগ
করে বই পড়া।
দুপুরে গৌরীর ১৩৪ নং
পত্র পেলাম। ১৩৩ নং পত্রের উত্তর দিয়েছিলাম
সে পায়নি ভাল।
ভাত খেয়ে বই পড়া ঘুম থেকে
উঠে খুটী নাটী করে আবার বই।
আজ
রেডিওতে মহাভারত নাটক শুনলাম।
কোন গোলমাল নেই।

বর্দ্ধমান হতে প্রফুল্ল বসু[১৩] কন্‌ফারেন্সে গাইবার অনুরোধ।
মীরার মা, দিলীপ।

4 January 1969 Saturday
শনিবার

আজ সকালে উঠলাম শরীর খুব খারাপ। তবু সকাল ৬।। টায় উঠে
প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দা ধুলাম
খুটী নাটী করলাম।
পলা[১৪] আজ স্কটিস চার্চ্চে পরিক্ষা দিতে গেল
মানা[১৫] পাশ করলে ওই কলেজেই পড়াবে।
হরলিকস খেয়ে পূজা ও ঠাকুরের সেবা করলাম।
জলযোগ করে বসেছি, প্রফুল্ল বসু নামে এক ভদ্রলোক
এসে বল্লেন বর্দ্ধমান কন্‌ফারেন্সে নিয়ে যাবার জন্য
১৫ দিন ধরে হবে। আমার নাম সবাই করছেন। কিন্তু কে যাবে
এক বছর তো গাইনি। চোখই আমার জীবন শেষ করে দিলে।
অনেক অনুরোধ করে ফিরে গেলেন।
মীরার মা তখন বসেছিল, সে গেল ১২টার পর।
ভাত খেয়ে ঘুম। বেলা ৩টেয় উঠে রেডিওতে অভিনয় শোনা।
দিলীপ রাত্রে এলো। ১৩৪ নং পত্রের গৌরীকে
উত্তর লিখে দিলে, ফেলবে সেই।

গোপাল কাজ করছে। দুপুরে মলিনা মেয়ে, সন্ধ্যায়
দিলীপ, আগামীকাল তার চাকরী হবে। সুসংবাদ।

Sunday 1969 5 January
রবিবার

স্নান
ভোর ৫।। টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দা ধুয়ে বেশ করে
তেল মেখে স্নান করে এসে, ঘরের খুটী নাটী সেরে
কাঁথা কম্বল পাট করে প্রত্যহের মত ঠাকুরের জায়গা
মুছে হরলিকস খেলাম।
শাল জামা কাপড় সব বার করলাম।
ঠাকুরের সেবা করে পূজা করলাম। জলযোগ করে
বই পড়তে সুরু করলাম।
ভাত খেয়ে ঘুমুতে যাচ্ছি এলো
মলিনা[১৬] মেয়ে ১টার সময়। মনে মনে বিরক্ত হলাম,
বল্লাম ৩টের পর এলে খুব ভাল হত ৫।। টায় উঠি তো!
সেও ভুরু কুঁচকে বল্লে আগে তো জানিনা। এর পর
ন্যাড়া মামার অসুখ ইত্যাদি নানা কথা কয়ে
বেলা ৪টেয় গেল।
সন্ধ্যার পর দিলীপ এসে জানালে
যে সকাল হতে খুব পরিশ্রান্ত জামাইবাবু বলেছেন যে
আগামীকাল সকাল ৮টায় অফিসে যেতে
বলেছেন, চাকরী হবে। জয়েন করতে বলেছেন। মহাখুশী হলাম।
আশীর্ব্বাদ জানালাম। বই পড়া।

খাঁদার[১৭] বাড়ি, "কালীপুর - ডানকুনী"। গোপাল কাজ করলে।
দীপূ[১৮] আজ স্কটিসে[১৯] ক্লাস টুয়ে পরীক্ষা দিলে।

6 January 1969 Monday
সোমবার

(স্কটিস্ চার্চ হতে পলার রেজাল্ট বেড়িয়েছে। ১৪৪ জন ছেলের
মধ্যে ১৯ জন পাস করেছে। পলার নাম নেই। পলা
বিদ্যানিকেতনে[২০] ক্লাশ ফাইপে ভর্ত্তি হল।)

সকালে ভোর ৫।।টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দা
ধুয়ে সব খুটীনাটী সেরে হরলিকস খেয়ে পূজা ঠাকুরের
সেবা করে জলযোগ সেরে সব গুছিয়ে নিয়ে২, সন্দেশ
নিয়ে ১০।। টায় কেষ্টর[২১] বাড়ী। তার কাজ বাকী ছিল ১১।। টায়
কোং বাগান হ'তে বাসে চড়ে হাওড়ায়[২২] নামলাম সেখান

হতে অন্য বাসে কালীপুর[২৩] রওনা হতে হবে। একবার বড় রাস্তা
একবার গঙ্গার পোলের [২৪] দিকে ছুটোছুটী করে অনেক দূর
গিয়ে তবে ৩৬বি বাস পেলাম। কেষ্ট খুব পরিশ্রম করেছে।
খানিকটা যেতেই বাসওয়ালা ভুল হয়েছে বলে নামিয়ে
দিলে আবার অন্য বাস, কালীপুরের মুখে গিয়ে বল্লে
এটা ভুল, আবার বাস বেলা ২টায় খাঁদার দরজায় নামলাম,
বেশ বড় রাস্তা পিচ ঢালা, সেখানেই বাড়ী করেছে। বড়
রাস্তার ওপর ৩খানা ঘর টালীর ছাদ। ভেতর দিকে বড় ঘর
করেছে কড়ি বরগার ছাদ। পেছনে বাগান ফল ও ফুলের
বাগানের সামনে সরস্বতী নদী বয়ে যাচ্ছে। বর্ষার সময়
দারুণ মাছ আসে, বড় ঘর খাট আলমারী দিয়ে গ্রীণ রং
দিয়ে সাজিয়েছে। সামনের ঘরের দিকে এক লাইন
রেল যাচ্ছে মার্টিন কোংনীরা।[২৫] বাসও যাচ্ছে। কুয়ো কাটিয়েছে।
দেখে খুব খুশী হলাম, তার নাতী নাতনী দুটো সঙ্গে ২
ঘুড়ছে বাচ্ছা তারা, বড় ছেলে সেখানে, ছোটোটা কেষ্টর কাছে।
খেতে বসালে বড় ঘরে। বল্লে দিদিমণি আজ তোমায় নিয়ে
আমার গৃহপ্রবেশ হল। রান্না করেছে একা হাতে সব।
আলু বেগুণভাজা পালংশাক চচ্চড়ী তেল পটকা দিয়ে,
আলুকপি কড়াইসুটী বড়ি দিয়ে নিরামিষ ঝোল
বড় বড় মুড়োর ঝাল, ইলিশ মাছের সর্ষে পাথুরি, মাংস,
চুনো মাছ দিয়ে টোমাটোর টক, দই অপূর্ব্ব, রসগোল্লা।
আমায় সন্দেশ দিয়েছে এই ৯/১০ রকম রেঁধে খাইয়েছে।
খুব তৃপ্ত হয়েছি। কেষ্ট তো দারুণ খেলে। পান খেয়ে
নানা কথা। এক ভদ্রলোক পটেছে। ঘর দেখেই বুঝলাম
বেলা ৫টায় রওনা হবার আগে অনেক আশীর্ব্বাদ করলাম,
সে এক কাঁদি কলা, ১ টা বড় নাড়িকেল কিছু কলাপাতা
দিলে বাড়ীর সামনেই বাগান হতে গাঁদাফুল অনেক দিলে
বাসে করে হাওড়া এসে ১ ঘন্টা দাঁড়িয়ে ট্রাক উল্টেছে আবার
বাসে করে কোং বাগান, রিক্সা করে বাড়ী এলাম কেষ্টর
সঙ্গে। বৌমাকে সব দিলাম। ফুল পলাকে দিলাম। কেষ্ট
বাড়ি গেল।

বই পড়ে কাটিছে। গোপাল কাজ করলে। শঙ্কর, কাপড় জামা তোলা মুষলমান
রাধা। দীপূ ফেল করেছে; পলার স্কুলে টুয়েতে ভর্ত্তি হল।

Tuesday 1969 7 January

মঙ্গলবার

আজ : গতকাল জামা কাপড় ছেড়ে বিশ্রাম নিয়ে

বই পড়া. রাত ১১টায় খেয়ে আবার বই পড়া ১২।। টায় ঘুমই।
ভোর ৫।। টায় উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে বারান্দা ধুয়ে
সব ঘরে ফার্নীচার ঝাড়লাম, খুটীনাটী সেরে হরলিকস
খেয়ে পূজা ও ঠাকুরের সেবা করে জলযোগ সারলাম।
জামা ও কাপড় শাল সব তুললাম। ২/১টাতে সাবান
দেওয়া ও কাচা, ভাত খেয়ে ঘুম। শঙ্কর এলো। কুমার বাড়ীর
রাধা এলো।

স্নান গোপাল কাজ করলে।

8 January 1969 Wesnesday

বুধবার

‘‘দীপূ পলার স্কুলে টু’য়েতে ভর্ত্তি হল
শ্রী বিদ্যানিকেতন’’

ভোর ৬টায় উঠলাম বারান্দা ধুয়ে তেল মেখে
স্নান করে এলাম;
ঘরের খুটী নাটী সব সেরে হরলিকস
খেয়ে ঠাকুর সেবা ও পূজা করে জলযোগ সেরে
নিয়ে বই পড়া।
আজ দীপূ পলার জুনিয়ারী শ্রী বিদ্যানিকেতনে
ক্লাস টুয়ে ভর্ত্তি হল।
স্কটিস চার্চ্চে দীপূও ফেল করেছে। তাই হ’ল না।

টীকা :

১. পাড়ার পাঠাগার (জনকল্যাণ সমিতি) রামবাগান ছাড়াও তিনি ছিলেন চৈতন্য লাইব্রেরি, বিডন স্ট্রিট (রোল নম্বর ৩৪৩২) এর সদস্যা।
২. কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের সেকালের হিসাব মত ৫৪ টাকা ১৪ আনা।
৩. রামবাগান এলাকার ছেলে।
৪. প্রতিবেশিনী, পরে আত্মীয়তার সম্পর্ক।
৫. গৌরী (বসু) সুগায়িকা। বিখ্যাত লেখক সমরেশ বসুর স্ত্রী। নৈহাটি ১৯নং ঋষি বঙ্কিম রোডের বাসিন্দা।
৬. রাজবালা দেবী (ইন্দুবালার জন্মদাত্রী) ওরফে রাজুবালা।
৭. প্রতিবেশী যুবক।
৮. বিখ্যাত চিত্র পরিচালক শ্রী বিজয় বসু।
৯. ইন্দুবালার কাছে আসা পুত্রবৎ যুবক।
১০. দিলীপ কাশীপুর শীল বাগানের যুবক। তিনি বহুকাল ইন্দুবালা দেবীর বিপদে আপদে সাহায্য করেছিলেন। সে গানও শিখত।
১১. প্রতিবেশিনী মহিলা।

১২. দুর্গা প্রতিবেশী মেয়ে।
১৩. বর্ধমান শহরের বিখ্যাত সঙ্গীত সংগঠক।
১৪. ইন্দুবালার নাতি পল্লব। পালিত পুত্র প্রণব বসুর পুত্র।
১৫. পালিত পুত্র প্রণবের ডাক নাম।
১৬. ইন্দুবালার পরিচিত জনৈকা মহিলা।
১৭. কালীপুর হাওড়া-আমতা পূর্বতন রেলওয়ে লাইনের একটি গ্রাম।
১৮. ইন্দুবালার আর এক নাতি (ছোট) দীপু অর্থাৎ প্রদীপ।
১৯. স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের প্রাথমিক বিভাগ।
২০. স্থানীয় প্রাইভেট স্কুল শ্রী বিদ্যানিকেতন, উত্তর কলকাতা।
২১. ইন্দুবালার স্নেহভাজন প্রতিবেশী, অদূরে বসবাসকারী যুবক।
২২. হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন বাস স্ট্যান্ড।
২৩. হাওড়-আমতা লাইনের বাস পথের মাঝে একটি গ্রাম।
২৪. হাওড়া সেতু যা কলকাতা ও হাওড়া স্টেশনকে যুক্ত করেছে।
২৫. পুরনো মার্টিন লাইট রেলওয়ে, ছোট ইঞ্জিনযুক্ত ছোট্ট রেলপথ — তাঁর কর্তৃপক্ষ।

দিনপঞ্জিতে, সংগীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালা দেবী ব্যবহৃত বানানরীতি হুবহু রক্ষিত হল। — সম্পাদক

হিন্দুত্ব কী?

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

রবীন্দ্রনাথের অনেক উক্তি আমাদের চমকে দেয়, মনে হয়, সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথ এ-কথা বলেছেন। বললে, কবে, কোথায়, কী প্রসঙ্গে, এবং কেন? যেটা আকস্মিক মনে হয়, সেটা অবশ্যই আকস্মিক নয়, তারও পূর্বাপর আছে। এরকম দুটো উক্তি দিয়ে শুরু করা যাক।

১। 'সেইজন্য কিছুকাল থেকেই কেবলই দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে। এরকম চললে ক্রমে এ দেশ মুসলমান-প্রধান হয়ে উঠবে, তখন একে হিন্দুস্থান বলাই অন্যায় হবে।'

২। 'বাংলাদেশে হাজার হাজার মুসলমান আছে, হিন্দুরা অহর্নিশি তাহাদিগকে হিন্দু নও হিন্দু নও বলিয়াছে এবং তাহারাও নিজদিগকে হিন্দু নই হিন্দু নই শুনাইয়া আসিয়াছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহারা প্রকৃতই হিন্দুমুসলমান।.... হিন্দু শব্দ এবং মুসলমান শব্দ একই পর্যায়ের পরিচয়কে বুঝায় না। মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।'

প্রথম সংখ্যা উক্তিটি গোরা উপন্যাসের পরেশবাবুর। পরেশবাবু রবীন্দ্রকল্পিত একটি চরিত্রমাত্র, কল্পিত চরিত্র আর লেখক এক নন, এইসব তর্ক আমরা আপাতত অগ্রাহ্য করছি, শুধুমাত্র এই কারণে, গোরা উপন্যাসে পরেশবাবু সুচরিতার গুরুদেব প্রথম থেকেই, গোরাও উপন্যাসের শেষে তাঁকে গুরু বলে মেনে নিয়েছে, উপন্যাসের সমস্ত চাঞ্চল্যের স্থির বিন্দু পরেশবাবু, যদিও মধ্যেমধ্যেই তিনি আক্রমণের উপলক্ষ হয়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন,—তিনি স্থিতধী, বিচারশীল এবং সকলের প্রতিই সহানুভূতিশীল, সুতরাং আক্ষরিক অর্থে না হলেও, পরেশবাবুর উক্তি রবীন্দ্রনাথের উক্তি বলে আমরা মনে করছি।

পরেশবাবু উক্তিটি করছেন গোরা উপন্যাসের শেষের দিকে। গোরা লেখা হয়েছে আড়াই বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী মাসিকপত্রে, শেষ হয়েছে ১৩১৬-এর ফাল্গুনে, ১৯০৯-এর ডিসেম্বরে। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন এই অংশটি ১৯০৯-এর শেষের দিকে। আর উপন্যাসের আধারিত কাল হচ্ছে ১৮৮০-এর দশকের মাঝামাঝি। গোরার জন্ম ১৮৫৭ সালে, সিপাহি বিদ্রোহের সময়, তারপর কলেজ-শিক্ষা সাঙ্গ হয়েছে কিছুকাল, অর্থাৎ গোরার যখন বয়স কুড়ি-পঁচিশের মধ্যে।

এই উক্তিটি উপন্যাসের কোন পর্যায়ে বলা হয়েছিল? ব্রাহ্ম পরেশবাবু হিন্দু মেয়ে রাধারাণীকে বড় করেছেন, নাম দিয়েছেন সুচরিতা। ব্রাহ্ম হারাণবাবুর উৎপাতে উত্ত্যক্ত হয়ে সুচরিতা আবার রাধারাণী হয়ে হিন্দু হওয়ার চেষ্টা করছে, 'নিষ্ঠাবতী' পিসিমার বিরক্তিকর হিঁদুয়ানি এবং প্রবল দেশপ্রেমিক কিন্তু গোঁড়া হিন্দু হওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত গোরার আগ্রাসী হিন্দুত্ব সত্ত্বেও। হিন্দুসমাজে জন্মেছি, অতএব আমি হিন্দুই, হিন্দুত্বের প্রাণহীন আচার-বিচার অগ্রাহ্য করেও। হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা করে যেতে হবে, রাধারাণীর এই আকুতিকে গ্রাহ্য না করে পরেশবাবু হিন্দুত্বের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে সন্দেহ করে ওই উক্তিটি করেছিলেন।

২ সংখ্যক উক্তিটি নেওয়া হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধ থেকে। ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়, ব্রাহ্মদের এই দাবি নস্যাৎ করে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৯১২ সালে।

অর্থাৎ দুটো উক্তির প্রাসঙ্গিকতা একই : হিন্দু কারা, ব্রাহ্ম কারা, হিন্দুত্বের অর্থ কী, এই প্রশ্ন। সময়ের বিচারেও দুটো উক্তির ব্যবধান তিন বছরের মাত্র।

হিন্দুত্ব কী, এই গণ্ডগোলের প্রশ্ন তীক্ষ্ণ হয়ে আজ ভারতে সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে ভারতীয় জনজীবনে। মুম্বাইতে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর মুম্বই স্টক মার্কেট উড়িয়ে দেওয়ার পর হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পর একজন নেতৃস্থানীয় হিন্দুর আচরণ সাম্প্রদায়িক কিনা এই প্রশ্ন আদালতে উঠলে সুপ্রিমকোর্ট রায় দিয়েছে, হিন্দু কোনও সম্প্রদায় নয়, হিন্দুত্ব সাম্প্রদায়িকতা নয়, হিন্দুত্ব একটি জীবনধারা—way of life । রামকৃষ্ণ মিশন তার বিদ্যালয়গুলোকে সরকারি আইনকানুনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য রামকৃষ্ণ-ভক্তরা হিন্দু নন বলার চেষ্টা করেছিল, সুপ্রিমকোর্ট সেটাকে পাত্তা দেয়নি। এসব অবশ্য সর্বোচ্চ সমীক্ষার ক্ষেত্র। সাধারণ লোকে হিন্দু বললে কী বোঝে? একটি আধুনিক উপন্যাস লক্ষ করা মন্দ কী?

অমিতাভ ঘোষের In an Antique Land উপন্যাসের নায়ক এক তরুণ। এটাকে উপন্যাস না বলে ইতিহাস আর পর্যটনের মিশ্রণ বলা উচিত। অমিতাভ (জন্ম ১৯৫৬, সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলজির ছাত্র, ১৯৮০ সালে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে এক গ্রামে গিয়েছিলেন ইতিহাসের উপকরণ খুঁজতে) যে গ্রামীণ পরিবারের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাদের প্রশ্ন ছিল, হিন্দু মানে কী। প্রশ্নটা তত্ত্বগত হলেও, ধরনটা কৌতুককর। তাই ওই অংশের অনুবাদ:

'আচ্ছা, তুমি কি মুসলমান?'

'না', আমি বললাম, অবশ্য ওর জবাব শোনার প্রয়োজন ছিল না, গাঁয়ের সবাই জানত আমি মুসলমান নই।

'তাহলে তুমি কী?'

'আমি হিন্দু হয়ে জন্মেছি,' ইচ্ছা না থাকলেও বললাম, আমার যে কোনও ধর্মগত পরিচয় আছে, সেটা নেহাতই অন্য ধর্মগত পরিচয় নেই বলেই। সবাই চুপচাপ। আমি খুব চেষ্টা করছি অন্য কোনও গ্রাম্য, চাষবাসের প্রসঙ্গ তুলে জোরদার একটা কিছু বলতে, যাতে কথাবার্তার গতি অন্য দিকে মোড় নেয়। কিন্তু সেই মুহূর্তে কোনও কথা খুঁজে না-পাওয়ায় উস্তাজ মুস্তাফা সন্দেহদীর্ণ স্বরে বলল,

'আচ্ছা এই হিন্দুত্ব ব্যাপারটা কী? আমি আগেও কথাটা শুনেছি, কিন্তু মানে বুঝতে পারিনি। যদি এটা খ্রিস্টিয়ানিটি নয়, জুডাইজম নয়, ইসলামও নয়, তাহলে এটা কী হতে পারে? তোমাদের পয়গম্বর কারা?'

'ওরকম নয়,' আমি বলার চেষ্টা করলাম, 'হিন্দুদের পয়গম্বর নেই।'

'ও, তাহলে তোমরা মেজাইদের মতো?' চোখে যেন দীপ্তি এল তার, 'তোমরা তাহলে আগুন পুজো করো?'

আবছাভাবে আপত্তি করার আগেই সে তর্জনী দিয়ে আমার হাতে খোঁচা মেরে বলল, আহ্লাদিভাবে, 'না, আমি জানি তোমরা গোরু পুজো করো, তাই না?'

এটা শোনার পর দেখা গেল জাবীর আর অন্যান্য ছেলেরা আঁতকে উঠে দমবন্ধ করল। ফিসফিস করে তারা ঈশ্বরকে ডেকে উঠল, শয়তানের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য।

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বলার চেষ্টা করলাম। অনেক কিছু নির্ভর করছে আমার উত্তরের উপর, 'ওরকম না! আমার দেশে অনেকে গরু খায় না... কেননা গরু দুধ দেয়, জমি চাষ করে, আরও কত। তারা খুবই উপকারী জন্তু।'

পরিবেশকেন্দ্রিক এই উত্তরে খুশি হল না উস্তাজ মুস্তাফা, 'ওটা কোনও যুক্তিই নয়।' এটুকু বলার পরই....

অমিতাভের জবাব শোনার সময় নেই, তার বন্ধুদের নমাজ পড়ার সময় হয়ে গেছে। অমিতাভ লক্ষ করেছিল, ওই গ্রামের প্রধান কাজ ছিল, নমাজ পড়া, যখন যেখানেই থাকুন না কেন, পাঁচবার নমাজ না পড়লে ওদের শান্তি নেই। ওই গাঁয়ের লোকেরা অমিতাভকে ভালবাসত, তাকে উদ্ধার করার জন্য মুসলমান হতে বলেছিল, কিন্তু মসজিদে যাওয়ার জন্য টানাটানি করলেও, তার গবেষণায় সেটা কাজে লাগতে পারে জেনেও, অমিতাভ মসজিদে যেতে উৎসাহ পায়নি।

অমিতাভের যে সমস্যা, সেটা সাধারণ হিন্দুমাত্রেরই সমস্যা। খ্রিস্টানদের গড আছে, মুসলমানদের আল্লাহ্ আছে, হিন্দুর কী? বিষ্ণুকে পূজা করে যে বৈষ্ণব সেও হিন্দু, শিবকে পূজা করে যে শৈব সেও হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন সবাই হিন্দু, ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেও হিন্দু, না করলেও হিন্দু। তাহলে হিন্দুত্ব কী? এই নিয়ে কচকচি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, হিন্দু না বলে সনাতন ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৈদিক ধর্ম বলে পার পাওয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ কেউ। আমরা সে সব তর্কে যাচ্ছি না। তর্কে কূল পাব না বলেই। একটি হালের ইংরেজি-বাংলা অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখি christianity আছে, Islam আছে, Brahman আছে, Juolaism আছে, Confucionism আছে Hinduism নেই। বাঙালিকে Islam শব্দের অর্থ দেওয়ার দরকার আছে, Hindu শব্দের অর্থ দেওয়ার দরকার নেই!

হিন্দুরা কমে যাচ্ছে, হিন্দুস্থানে হিন্দু না থাকায় হিন্দুস্থান শব্দটিই নিরর্থক হয়ে যাবে, পরেশবাবুর এমন নিঃসংশয় ঘোষণার কারণটি খোঁজা যেতে পারে।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির The Bengalee পত্রিকার ১৯০৯ জুন সংখ্যা থেকে ছাপা হতে থাকে Hindus — A Dying Race । লেখক ইউ.এন.মুখার্জি — সুরেন্দ্রনাথের জামাই, সিরাজগঞ্জের ডাক্তার, চৈতন্য বংশোদ্ভব বৈষ্ণব। মুসলমানরা সংখ্যায় বাড়ছে, হিন্দুরা সংখ্যায় কমছে। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাস শেষ হয়েছে ১৯০৯-এর ডিসেম্বরে। পরেশবাবুর মনে এই বিশ্বাসের মূলে কি ওই ইড. এন. মুখার্জির প্রবাসীর লেখা?

রবীন্দ্রনাথ ওই লেখা না পড়লেও, ১৯০১-১৯১১ সময়ে বাংলার আকাশেবাতাসে এই সংশয়টা উড়তেই পারে। ১৮৯১-এর সেন্সাস কমিশনার Census of India 1891 গ্রন্থে এমন ভবিষ্যদ্বাণীই করেছিলেন। সেই সময় কমিশনার ছিলেন সি.এ.ও'ডোনেল। তার প্রতিধ্বনি করেছিলেন এইচ. এইচ. রিসলে, গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার হোম সেক্রেটারি। হিন্দুরা বহুদিন টিকে আছে, কিন্তু আর কি টিকতে পারবে? সেন্সাস তা বলে না, জানিয়েছিলেন তাঁরা।

এই সময়টা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন প্রদীপকুমার দত্ত। দিল্লির এক ইংরেজির অধ্যাপক, তাঁর Carving Blocs গ্রন্থে। তাঁর গ্রন্থে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭৯ সালে হিন্দু মহাসভার ইন্দ্রপ্রকাশ They Count Their Gains —We Calculate Our Losses বইটিতে বলছেন, তিনি তাঁর বইয়ের নাম করেছেন ভাই পরমানন্দের একটি উক্তি থেকে। আসলে তিনি ধার করেছেন Hindus—A Dying Race থেকে। ১৯০৯ সালের এই বইটি হিন্দু মহাসভাকে দীর্ঘকাল ধরে অনুপ্রাণিত করেছে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের সঙ্গে ইউ. এন. মুখার্জির আলাপ হয় ১৯১২ সালে আর স্বামী শ্রদ্ধানন্দ এই গ্রন্থটি দ্বারা বিশেষভাবে আবিষ্ট হন। ১৯২৫ সালে পাটনায় বক্তৃতার সময়ও তিনি মুখার্জির 'হিন্দুর ধ্বংস' তত্ত্বটি উল্লেখ করেন।

ও'ডোনেল-এর ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করে মুখার্জি লক্ষ করলেন, বাঙালি হিন্দু চাষির বর্ধমান দারিদ্র, বাঙালি মুসলমান চাষির ক্রমাগত জমি কেনা। শুধু তাই নয়, কলকাতার শ্রমবাজার ক্রমাগত চলে যাচ্ছে বাঙালি হিন্দুদের হাত থেকে বাঙালি মুসলমানদের হাতে। কারণ, জাতিভেদ বর্ণভেদে বিশ্বাসী বাঙালি হিন্দুরা সহসা পৈতৃক বৃত্তি থেকে বিচ্যুত হতে ইচ্ছুক নয়, যেটা মুসলমানরা অনায়াসেই করে। মুসলমানরা ধার্মিক, কর্মঠ, স্বাস্থ্যবান। নিচু জাতের হিন্দুরা মদ্যপ, অলস, নোংরা পরিবেশেও দিব্যি মানিয়ে থাকার চেষ্টা করে, তারা বেহিসাবী, একজোট হতে পারে না।

মুসলমানদের বাড়বৃদ্ধির কারণ, মুখার্জি জানালেন, তাদের নবোদ্যমে ধর্মসংস্কার। তারা নিয়মমতো মসজিদে যায়, নমাজ পড়ার পর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উপদেশ শুনে উদ্বুদ্ধ হয়। গ্রামে গ্রামে মসজিদে এই বাণী শুনে তারা জোট বাঁধছে, কোনও কেন্দ্রীয় সংগঠনের প্রয়োজন তাদের হয়নি। তারা সংগঠিত, স্বশাসিত হওয়ার অনুপ্রেরণা পাচ্ছে। সিপাহি বিদ্রোহের পর তারা হতোদ্যম হয়ে গিয়েছিল, এখন তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে।

হিন্দুরা কমে যাচ্ছে, তার এক কারণ, মুখার্জির মতে, হিন্দুদের বিধবাবিবাহে অনিচ্ছা, ফলে হিন্দু বিধবারা মুসলমান বিয়ে করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। হিন্দুরা হীনস্বাস্থ্য, সবল মুসলমানদেরই হিন্দুবিধবাদের পছন্দ। হিন্দু পুরুষরা হীনস্বাস্থ্য, অর্থাৎ হীনবীর্য, সুতরাং বীর্যবান মুসলমানদের আকর্ষণ হিন্দুবিধবাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে।

হিন্দুদের অনৈক্যের কথা যখন বলছেন মুখার্জি, সংখ্যায় কমে যাওয়া হিন্দুদের কারণ হিসেবে, বলছেন অন্ত্যজ হিন্দুদের আলস্য আর মদাশক্তির কথা, মনে করা যাক গোরা উপন্যাসটির সেই অংশ, যেখানে পরেশবাবু হিন্দুদের ক্রমাস্বল্পতার কথা বলছেন। ঠিক এই সময়েই গোরা জেল থেকে বেরিয়ে আবার গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। সেখানে কলু, কুমার, কৈবর্তরা এই গৌরবর্ণ প্রকাণ্ডকায় ব্রাহ্মণটিকে সন্দেহের চোখে দেখে, বা তাঁর উদ্দেশ্য ভাবে, আর গোরা দেখল এদের মধ্যে বাধানিষেধের বেড়া ভদ্রসমাজের চাইতেও বেশি। খাওয়াদাওয়া শোওয়াবসা কাজকর্মের উপর সমাজের নিত্য ভ্রূকুটি। সমাজের বন্ধন, আচারের নিষ্ঠা কর্মক্ষেত্রে এদের নিঃশক্তি করে দিচ্ছে। 'ইহাদের মতো এমন ভীত, অসহায়, আত্মহিতবিচারে অক্ষম জীবজগতে কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।'

গোরা আরও দেখল এদের মধ্যে স্ত্রীসংখ্যার স্বল্পতা। অনেক পুরুষকে চিরজীবন বা অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হয়। বিধবাবিবাহ সম্পর্কে কঠিন নিষেধের বেড়া। ঘরে ঘরে সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত হয়ে উঠছে, বিধবাদের জন্য। অথচ মুসলমানরা আপদে-বিপদে পরস্পরের পাশে দাঁড়ায়। ধর্মের দ্বারা মুসলমানেরা এক, আচারের দ্বারা নয়।

এরপরই গোরার প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন,'প্রায়শ্চিত্ত-রোধকল্পে কৃষ্ণদয়ালের গোরার জন্মের কথা বলার চেষ্টা এবং মৃত্যু হলে পাছে গোরা তাঁর শ্রাদ্ধ করে সেই ভয়ে কৃষ্ণদয়ালের বলে দেওয়া যে গোরা হিন্দু নয়, গোরা আইরিশম্যান। হিন্দুত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত গোরা এখন ভারতবর্ষীয়। হিন্দুত্বের বন্ধন-মুক্তি ছাড়াও, ব্রাহ্ম সুচরিতার আকর্ষণও আছে।

এই অংশটি, অর্থাৎ হিন্দুর সংখ্যাল্পতা, হিন্দুদের অনৈক্য, বিশেষ করে এই প্রসঙ্গে বিধবা-সমস্যা, আজ, রবীন্দ্রনাথ একবছর পরে হলে লিখতেন কিনা সন্দেহ হয়। কারণ, মুখার্জির গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা হয় সমসাময়িক বাংলায়। মুখ্য অংশ নিয়েছিলেন সখারাম দেউস্কর। ১৯১০ সালে তিনি লিখলেন, 'বঙ্গীয় হিন্দুজাতি কি ধ্বংসোন্মুখে?' হিন্দুরা মুসলমানদের তুলনায় কম বেড়েছে ১৮৭১-১৮৮১ সালে, এটা সত্য। কিন্তু ১৮৮১-১৮৯১ সালে হিন্দুরা বেড়েছে। এই পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দুদের বর্ণভেদ বা দারিদ্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি তাহলে, তারা বাড়তে পারল কেন? আসলে ১৮৭১-১৮৮১ সালে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে মহামারী ম্যালেরিয়া হিন্দুসংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিল। মুসলমানদের বহুবিবাহ, ঐক্য, সুস্বাস্থ্য, বর্ধমান সঞ্চয় তাদের বাড়ার কারণ নয়। ও'ডোনেল যে হিসেবের হার দেখিয়ে বলেছিলেন হিন্দুরা লোপ পাবে, সেই হিসেব মেনে নিলেও হিন্দুদের লোপাট হতে ৬৫০ বছর লাগবে, সুতরাং অত গেল গেল রব তোলার দরকার নেই।

গোরা উপন্যাসে পরেশবাবুর ওই বিস্ময়কর উক্তির পুনরুচ্চারণ রবীন্দ্ররচনায় আর পাওয়া যাবে না। কারণ সম্ভবত ও'ডোনেল, রিসলে, মুখার্জিদের ওই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে বাঙালিরা আর উত্তেজিত হয়নি, সেন্সাসে হিন্দুদের ক্ষীয়মানতার প্রমাণের অনস্তিত্বের জন্যই হয়তো।

পরেশবাবু হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আস্থাবান ছিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম বিষয়েও তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। ললিতার বিবাহচেষ্টায় ব্রাহ্মরা তাঁর কাছে কৈফিয়ত চেয়েছিল। শ্রান্ত পরেশবাবু রণে ভঙ্গ দিয়ে সিমলায় নির্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই সময়বিন্দু থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' আর 'হিন্দু-ব্রাহ্ম' প্রবন্ধে যেতে পারি।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আর ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ বলছিলেন ব্রাহ্মরা হিন্দু নন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেরই একটি অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ ছাত্রদের জানালেন, ব্রাহ্মরা হিন্দুই। তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় এক ব্রাহ্ম লেখক প্রতিবাদ জানালেন আর একটা টিপ্পনী জুড়লেন, ব্রাহ্মদের সম্পর্কে আদি ব্রাহ্মসমাজের কারও বলার অধিকার নেই, বলতে পারে উন্নতিশীল সাধারণ বা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আরও স্পষ্ট করে বললেন ব্রাহ্মরা হিন্দুই। প্রবাসী, তত্ত্বকৌমুদী আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এরপর অনেক দিন ধরে বাদ-প্রতিবাদ চলে। এটা ১৯১২ সালের কথা।

রামমোহন রায় সমাজপ্রচলিত বিশ্বাস, পূজার্চনা ছেড়েছিলেন, কোরান পড়তেন, বাইবেল থেকে সত্যধর্মের সারসংগ্রহ করতেন, অ্যাডাম সাহেবকে দলে টেনে ব্রাহ্মসভা স্থাপন করেছেন। সমাজ তাঁকে বিধর্মী বলে গাল দিয়েছে, কিন্তু রামমোহনের, রবীন্দ্রনাথ বললেন, কখনও মনে হয়নি তিনি হিন্দু নন। গোরা উপন্যাসে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কাগজের সম্পাদক, স্ত্রীবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি, নৈশস্কুলের শিক্ষক, যাঁর ইংরেজি ভাষা ও দর্শনশাস্ত্রে অধিকারের খ্যাতি ব্রাহ্মসমাজের বাইরেও পৌঁছেছিল, সেই হারানবাবু রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্গীতাকে হিন্দুদের সামগ্রী বলে ব্রাহ্মপরিবার থেকে নির্বাসিত করতে চান, তাঁর ধর্মগ্রন্থ কেবল বাইবেল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, হিন্দুসমাজেই ব্রাহ্মদের জন্ম, ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্মেরই বিকাশ। পিতৃপরিচয় অগ্রাহ্য করা যায় না, পিতার পরিচয়ে পুত্র গৌরব অনুভব না করলেও । হিন্দুধর্ম ছেড়ে কেউ মুসলমান বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে যোগ দিলেও সে হিন্দুই। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্রিস্টান হলেও, তাঁরা হিন্দুখ্রিস্টানই, অর্থাৎ জাতিতে হিন্দু, ধর্মে খ্রিস্টান। ব্রাহ্মরা হিন্দুত্বের সংকীর্ণ গণ্ডি কাটিয়েছেন বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু সেই গণ্ডি তাঁর স্বরচিত নয়, কৃত্রিমও নয়, তাঁরা হিন্দুসমাজেই আছেন।

তত্ত্বকৌমুদী প্রশ্ন তুলল, যদি কোনও মুসলমান বা খ্রিস্টান ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে, তখন কি তাঁরা হিন্দুও হয়ে গেলেন? রবীন্দ্রনাথ বললেন, হ্যাঁ। হিন্দুসমাজের যে অংশ সত্য, সেই অংশের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মও অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, সেই অংশের সঙ্গে নবদীক্ষিত ব্রাহ্মরাও জড়িত। তাঁরা

হিন্দুধর্মের জন্মান্তর, অস্পৃশ্যতা, সাকার-উপাসনা বা অন্যান্য সংস্কার, যেসব তাঁদের বিবেচনায় যুক্তিহীন, না-ও মানতে পারেন কিন্তু হিন্দুসমাজ এসবেই শুধু আটকে নেই। গোরা উপন্যাসে আনন্দময়ী কৃষ্ণদয়ালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বামনাই যদি অতই তেজের, তাহলে তাদের একবার পাঠানের , একবার মোগলের, একবার খ্রিস্টানের কাছে মাথা মুড়াতে হচ্ছে কেন? কৃষ্ণদয়ালবাবু 'ওসব অনেক কথা' বলে এড়িয়ে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়'-এ উত্তর দিলেন। হিন্দুসমাজ মাথা মোড়ায় নি, হিন্দুসমাজ পাঠান মোগল ব্রিটিশদের আত্মস্থ করে নিয়েছে। হিন্দুত্ব কী? এটা সংজ্ঞার আওতায় পড়ে না। একটা আচার বা সংস্কার যদি পঞ্জাবে হিন্দুত্ব বলে গণ্য হয়, দ্রাবিড় অঞ্চলে সেটা হিন্দুত্ব নাও হতে পারে, কান্যকুব্জেও হয়তো সেটা হিন্দুত্ব বলে গ্রহণীয় নয়। কোনও আচারই হিন্দুত্বের বিশাল সমাজে একইভাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু তাই বলে হিন্দুত্বই অস্বীকৃত হচ্ছে না। হিন্দুসমাজে মানুষের গভীরতম ঐক্য আছে, সেটাকে সংজ্ঞা দিয়ে ধরা যায় না, তাই হিন্দুসমাজ শত সহস্র আঘাত-আক্রমণ সত্ত্বেও বেঁচে আছে —হিন্দুত্ব জড়ত্বে নয়, জীবনধর্মী। হিন্দুসমাজ যা ধর্ম তা-ই পালন করে। ধর্ম কী? যা সকলের মঙ্গল করে। বিচার আর পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কোনটায় সবার মঙ্গল। কোনও শাস্ত্রে বর্ণিত আছে বলেই সেটা মঙ্গল নয়।

চিরন্তন বলে যেমন কিছু নেই, জীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে যে জীবনচর্যা সেটাই সত্য। আবার অতীতকে একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না, তাহলে সমাজ বায়বীয় হয়ে উঠবে। চিরন্তনের কোন অংশ আজও জীবনধারায় মঙ্গলের পথে প্রবাহিত, তাকেই হিন্দুসমাজ গ্রহণ করেছে বারবার আঘাত সত্ত্বেও সেই সমাজ ভেঙে পড়েনি। হিন্দুসমাজের ইতিহাসে ধর্মবিশ্বাসের অচলতা নেই, এই সমাজে যত ধর্মবিপ্লব হয়েছে অন্য কোনও সমাজে সেটা ঘটেনি। তবু যে হিন্দুসমাজ টিকে আছে, সেটাই প্রমাণ করে, এর মধ্যে সত্য আছে। সেই সত্য নির্দিষ্ট করা যায় না, জীবনচর্যা দিয়ে নিজের মধ্যে অনুভব করতে হয়। গোরা শেষ পর্যন্ত নিজেকে হিন্দু না ভেবে ভারতবর্ষীয় ভাবে। সেই 'ভারতবর্ষীয়' হিন্দুসমাজেরই অন্য অভিধা।

হিন্দু শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে প্রচলিত এবং সাধারণ্যে গৃহীত ইতিহাস সবাই জানেন। আরবরা ভারতবর্ষে এসে সিন্ধু অববাহিকার অধিবাসীদের হিন্দু নামে ডাকতে শুরু করে। তারও আগে গ্রিকরা সিন্ধুকে বলত ইনডাস, যার থেকে সেই স্থানটির নাম হয় ইন্ডিয়া। আরবিদের উচ্চারণে সিন্ধু হয় হিন্দু। প্রথমে ছিল যে শব্দটি স্থানবাচক, পরে সেটা হল জাতিবাচক, তারও পরে ধর্মবাচক। স্থানবাচক শব্দটি ছিল ভারত, সেটা আমাদের সংবিধান প্রণেতারা অনেক চিন্তাভাবনা করে রেখেছিলেন বটে (India that is Bharat), কিন্তু বাংলায় ছাড়া ভারত শব্দটি ভারতের অন্যান্য অংশে বিরল, সকলেই India-কে হিন্দুস্থান নামে ডাকেন। সংঘ পরিবারের রাজু ভাইয়া সংবিধান পালটাবার দাবি করছেন, বলছেন, লিখতে হবে India that is Hindusthan। এই হিন্দুত্ব কী এর স্পষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছিলেন ভি. ডি. সাভারকার। 'যিনি ভারতে উদ্ভূত যে কোনও ধর্ম, মত বা পথের অনুগামী তিনিই হিন্দু'। আত্মপরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের হিন্দুর ব্যাখ্যা এই ব্যাখ্যার দূরবর্তী নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ উদ্ভবের স্থান নিয়ে মাথা ঘামাননি। মুসলমান খ্রিস্টান ইহুদিরাও হিন্দু হতে পারেন, ভারতবর্ষে জন্মালে, ভারতবর্ষকে নিজের বলে স্বীকার করলে। হিন্দু না বলে ভারতবর্ষীয় বা ভারতীয় বলতে পারলে সমস্যা চুকে যেত, কিন্তু সাধারণ্যে হিন্দুই প্রচলিত হয়ে গেছে। সংবিধান তৈরি করে, আইন করে এটা পালটানো যাবে না, যতদিন সাধারণ লোক সেটা গ্রহণ না করে।

ভারতে আদমসুমারি শুরু হয় ১৮৭২ সালে। এরপর ১৮৮১ সাল আর তারপর দশ বছর পরপর লোকগণনা চালু আছে। এই আদমসুমারিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাথা গোনা থেকেই, অনেকের সন্দেহ, সাম্প্রদায়িকতার জন্ম। নিজের সম্প্রদায়ের শক্তি বা শক্তিহীনতার চেতনা থেকেই পারস্পরিক সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রতিপত্তি অর্জনের চেষ্টা, ইত্যাদি মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। হিন্দু মুসলমানের পারস্পরিক দৌর্বল্য বা ক্ষমতার চেতনা কীভাবে উসকে ওঠে, নজর দেওয়া যাক। যাকে বলে বেঙ্গল প্রপার (বর্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী-জলপাইগুড়ি, ঢাকা, চট্টগ্রাম নিয়ে যে বঙ্গদেশ) তার জনগণনা ১৮৭২-এ ছিল এরকম:

বিভাগ	জনসংখ্যা	হিন্দু	শতকরা	মুসলমান	শতকরা
বর্ধমান	৭২,৮৬,৯৫৭	৬২,১৬,০৬০	৮৫.৩	৯,২৯,৩৯১	১২.৭
প্রেসিডেন্সি	৬৫,৪৫,৪৬৪	৩৩,৩৪,৭২৬	৫০.৯	৩১,৫৭,০২৬	৪৮.২
রাজসাহী জলপাইগুড়ি	৯৯,৩৯,৬৮০	৩৬,৭৯,৯২১	৩৭	৫৫,৭২,১৮৮	৫৬
ঢাকা	৯৫,১৭,৪৯৮	৩৮,৪৭,৫৮৬	৪০.৪	৫৬,১৫,৩২৫	৫৯
চট্টগ্রাম	৩৪,৪৪,৮৭৪	১০,২২,১৪৫	২৯.৬	২৩,২৩,০০৮	৬৭.৪
মোট	৩,৬৭,৩৪,৪৭৩	১,৮১,০০,৪৩৮	৪৯.২	১,৭৬,০৯,১৩৫	৪৮

অখণ্ড বঙ্গে ১৮৭২ সালেও হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু তারপরের আদমসুমারি থেকে বোঝা যাবে মুসলমানেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে থাকে। ইউ .এন.মুখার্জির আশঙ্কা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছিল, কিন্তু বাংলায় সেটা ঠিকই ছিল। তবে, যে সব কারণে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাচ্ছিল, সেই সব কারণ অনেকটাই কাল্পনিক ছিল। গোরার হিন্দুত্ব থেকে ভারতবর্ষীয় হয়ে যাওয়া কিছুটা বিস্ময়কর, কারণ গোরা শুধু বাংলাদেশকেই চেনে জানে, বাংলার বাইরের চিত্র তার কাছে স্পষ্ট, এমন কোনও আভাস রবীন্দ্রনাথ দেননি। ১৯০০ -এর প্রথম দশকেও বাঙালির স্থান ভারতবর্ষে এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কারণে যে হয়তো বাঙালি আর ভারতবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথের কাছে সমার্থক মনে হয়েছিল। ইউ.এন.মুখার্জির গ্রন্থটির পরে পরেই বেরিয়েছিল তাঁরই শিষ্য দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'জাতিভেদ' গ্রন্থটি। সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে আমরা আদমসুমারির সংখ্যাগুলো দেখে নিতে পারি।

	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	১,৮১,০০,৪৩৮	১,৭৬,০৯,১৩৫
১৮৮১	১,৭২,৫৪,১২০	১,৭৮,৬৩,৪১১
১৮৯১	১,৮০,৬৮,৬৫৫	১,৯৫,৮২,৩৪৯

১৯০১ সালের সেন্সাস কমিশনার ই.এ. গেট হিন্দুকে বোঝার জন্য চারটি প্রশ্ন করতে হবে, এমন একটি সার্কুলার পাঠিয়েছিলেন জনগণনাকারীদের জন্য। যাঁকে জিজ্ঞাসা করা

হচ্ছে তিনি কি 'great Hindu gods'—কে পূজা করেন? তাঁকে কি মন্দিরে ঢুকতে এবং পূজার অর্ঘ দিতে দেওয়া হয়? যে পুরোহিত তাঁর হয়ে পূজা দিচ্ছেন তিনি কি ব্রাহ্মণ, তাঁকে কি অন্যান্য ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেন? তিনি কি অচ্ছুত?

সার্কুলারটির উদ্দেশ্য অবশ্যই নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের আলাদা করে নেওয়া এবং নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের হিন্দু হিসাবে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা। ১৯০৫-এ যে বর্ণহিন্দুদের কোণঠাসা করা হয়েছিল বঙ্গভঙ্গ করে, সেই বর্ণহিন্দুদের আরও কোণঠাসা করার জন্য সেন্সাসের এই চেষ্টা। ক্রুদ্ধ ইউ.এন. মুখার্জি ১১১১-তে প্রচার করলেন তাঁর পুস্তিকা Hinduism and the coming census। হিন্দুদের উপর এই আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জনমত গঠনের চেষ্টায় তিনি পুস্তিকাটি বাংলায় অনুবাদ করে বিনামূল্যে প্রচার করলেন ২৫,০০০ কপি। তার সঙ্গে প্রচার করলেন তাঁর আগের গ্রন্থটির সারসংগ্রহ করে আরও ২৫,০০০ কপি। সেন্সাস কমিশনারের সার্কুলারের সঙ্গে যুক্ত হল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের লন্ডন অফিসের পক্ষ থেকে আমীর আলির আবেদন, (মর্লি-মিন্টোর ১৯০৯-এর সংস্কার উপলক্ষে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব যাতে আছে, সেই সংস্কার প্রসঙ্গে) অনুন্নত হিন্দু শ্রেণীকে যেন হিন্দু হিসাবে গণ্য করা হয়। অনুন্নত শ্রেণীদের প্রতিনিধিরাও আঁর হিন্দু হিসাবে বিবেচিত হইতে চাইছিলেন না। বর্ণহিন্দুদের চাপে পড়ে 'গেট' সার্কুলারটি প্রত্যাহৃত হয়েছিল। বর্ণহিন্দুদের নেতারা জেলায় জেলায় নেমে পড়েছিলেন নমঃশূদ্র সহ অন্যান্য অনুন্নত হিন্দুদের বোঝাতে যে তাঁরা হিন্দুই। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গে মুসলমানরা সংগঠিত হচ্ছিলেন নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং প্রসারে ক্রমশ হিন্দুমুসলমান অনৈক্য তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল। কিন্তু অনুন্নত হিন্দুরা হিন্দু নয় এটা শাসকশ্রেণী প্রতিপন্ন করতে রপ্ত হলে, বর্ণহিন্দুদের অনুন্নত হিন্দুদের নিজেদের আওতায় আনতে বেশি সময় আর শ্রম দিতে হয়। ১৯১১-এর বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যাওয়ায় বর্ণহিন্দুরা তখন সাময়িকভাবে তৃপ্ত। রবীন্দ্রনাথের ১৯১২ সালে লেখা 'ভারতবর্ষের ইতিহাস', 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে যেজন্য মুসলমান প্রসঙ্গ থাকলেও, সেটা প্রধান নয়।

বাংলাদেশে হিন্দুদের ক্রমাগত সংখ্যালঘু হয়ে যাওয়ার কারণ যে বিধবাবিবাহে বাধা, বা মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান স্বাস্থ্যোন্নতি বা অর্থপ্রাপ্তি তা নয়, মূল কারণ যে বর্ণহিন্দুদের জাতিভেদ, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতার বাই, এবং জমিদার ও জমিহীনদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পার্থক্য এবং তারফলে হিন্দুদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ, এ বিষয়ে আজ কোনও সন্দেহ নেই। তবু সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক, মুসলমানরা বাংলাদেশে ক্রমশ সংখ্যাগুরু হয়ে উঠল কী করে।

বখতিয়ার খিলজি নবদ্বীপ জয় করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেন ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। এরপর বিভিন্ন মুসলমান শাসক সম্প্রদায় বাংলাদেশ শাসন করেন ১৭৬৫ পর্যন্ত, যারপর ইংরেজরা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। তারও একশো বছর পর, ১৮৭২ সালের আদমশুমারি থেকে দেখা গেছে অবাঙালি মুসলমানরা তেমন আসেননি বাংলাদেশে। বাংলাদেশের মুসলমানরা বেশির ভাগই বাঙালি।

(পরিসংখ্যান পরের পাতায়)

১৮৭২-এর সেন্সাস

বিভাগ	মোট মুসলমান	মুঘল	পাঠান	সৈয়দ	শেখ	বহিরাগত মুসলমান মোট মুসলমানের %
বর্ধমান	৯,২৯,৩৯১	১৪১	৩,৩৯৮	৩০৫	১৮,০৩৮	২.৩৫
প্রেসিডেন্সি	৩১,৫৭,০২৬	১,৮৯৯	৮,৫৪২	৪,৬০৪	৬৫,৭৭৯	২.৫৬
রাজসাহী-জলপাইগুড়ি	৫৪,২০,৯৬০	৫৩	৬,৪৭৩	১,০৭৭	৬২,১৫৪	১.২৮
ঢাকা	৫৬,২৭,৫২২	৪৮	৪,৩২৩	২,৭০৭	৮১,৫৯৮	১.৫৭
চট্টগ্রাম	২৩,২৩,০০৮	—	৩২৮	১৬০	৪,৫৩৭	০.২১

১৮৭২-এ মুসলমান অবাঙালি মুসলমান বাঙালির শতকরা ২-এর কম ছিল। মুসলমান শাসনের আগেকার বাঙালি যারা অমুসলমান ছিল (তারা হিন্দু ছিল কি না, হিন্দু বলতে কী বোঝায়। ইত্যাদি প্রশ্নে না গিয়ে), তারা মুসলমান হল কেন? ধরে নেওয়া যাক, মুসলমান শাসকদের প্রশ্রয় পাওয়ার জন্য। তা সত্ত্বেও হিন্দুরা ১৮৭২ পর্যন্ত বাংলাদেশে সামান্য হলেও সংখ্যাগুরু। কিন্তু ১৮৭২ সালের পর থেকে দ্রুত পট পরিবর্তন। ধর্মান্তরকরণ ছাড়া এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই। এই ধর্মান্তরকরণ কি স্বেচ্ছায় অথবা অত্যাচারে? অত্যাচারের, শক্তির সাহায্যে ধর্মান্তরকরণের উল্লেখ থাকলেও, তেমন নেই যাতে মনে হতে পারে সেটাই একমাত্র কারণ। বর্ণহিন্দুদের অবহেলা এবং অত্যাচারেই যে বেশির ভাগ স্বেচ্ছায় ধর্মান্তরগ্রহণ হয়েছিল, এই ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কোনও কারণ পাওয়া যায় না। ১৮৭২-এর পর বাংলার মানসজগতে ক্রমবর্ধমান চেতনা অনুন্নত বাঙালির মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছিল, যার ফলে ১২৮২-১৮৭২-এ যা হয়নি, ১৮৭২-১৯৪৭-এ তাই হয়েছিল। বিংশ শতকের প্রথম দিকে নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, গোপ, পোদ্ সম্প্রদায়ের আন্দোলনগুলোই তার প্রমাণ। দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের 'জাতিভেদ' যার একটি উদাহরণ। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ইউ.এন. মুখার্জি বর্ণহিন্দুদের কাছে দাবি করছিলেন, অনুন্নত হিন্দুদের কাছে এগিয়ে না গেলে, হিন্দুসমাজের ভবিষ্যৎ নেই। দিগিন্দ্রনারায়ণ কিন্তু দাবি করছিলেন, অনুন্নত শ্রেণীদের হয়ে, তাদের সব অধিকার, এমনকী ব্রাহ্মণত্ব, দিতে হবে। ১৯২৬ সালে কলকাতায় যে ভয়াবহ হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়, তার আগে পর্যন্ত বাঙালি অন্ত্যজদের সমস্যাই রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছিল। হিন্দুসমাজের অনৈক্যই তাঁকে সংশয়ান্বিত করে তুলেছিল হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলন ১৯০৮-এ থমকে যায় মুসলমান, নমঃশূদ্রদের অসহযোগিতায়। এরপর সন্ত্রাসবাদীদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতাই, তখন বাংলার মুখ্য আন্দোলন। ১৯১১-এর পর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভরকেন্দ্র বাংলা থেকে সরে যায় উত্তর ভারতে। এই সময় হিন্দুদের আত্মানুসন্ধান চলছে। মুসলমান সমস্যা তেমন প্রবল নয়। ১৯১৯-এর শাসনসংস্কারে মুসলমানদের বেশি সুযোগ দেওয়া আর ১৯২৬-এর আর্যসমাজি শুদ্ধি-আন্দোলনের জবাবে ১৯২৬-এর ভয়ংকর হিন্দুমুসলমান হানাহানি আবার মুসলমান সমস্যা বাঙালি বর্ণহিন্দুচেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে উপস্থিত হল। সমস্যাটি মুসলমান-অবিশ্বাসেই পরিণত

হল শেষ পর্যন্ত, যার হাত থেকে রবীন্দ্রনাথও মুক্তি পাননি। ১৯০৯, ১৯১৯, ১৯৩৭-এর শাসনসংস্কারে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন, মুসলমানদের বেশি সুযোগ দেওয়া তিনি সমর্থন করেননি। অবশ্য, পৃথক নির্বাচন ভারতীয়দের ঐক্যের বাধা, এটা ছিল তাঁর প্রকাশ্য আপত্তি। ১৯৩৭-এ এসে অবশ্য বর্ণহিন্দুদের এবং পুরো হিন্দুজাতির পক্ষে প্রতিকূল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই তাঁর আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অদৃষ্টের পরিহাস এই, যে সময়ে বাংলার বর্ণহিন্দুরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, মুসলমানরা যে লড়াইয়ে যোগ দিচ্ছে না সেটা তেমন খেয়ালও করছে না। শুধু তাই না হিন্দুরা ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে স্বেচ্ছায়, সেটা বর্ণহিন্দুরা খেয়ালই করেনি। যার ফলে ১৯৪৭-এ বাংলার মুসলমানপ্রধান হয়ে যাওয়া এবং বাংলা-বিভাগ। হিন্দুধর্মের সংস্কার না করে, অন্ত্যজদের দাবি-দাওয়া মেনে কংগ্রেস, স্বরাজী, সন্ত্রাসবাদী, কমিউনিস্ট সকলেই সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত, কিন্তু হিন্দুসমাজের পায়ের তলার মাটি যে আলগা হয়ে যাচ্ছে, সেই বোধ কাউকে তেমন বিচলিত করেনি। বাঙালি ভদ্রলোকের রেনেশাঁস নেহাতই ছিল বুদ্বুদ, অন্তঃসারহীন।

প্রেম-অপ্রেমে চার গন্ধর্ব

অশেষ চট্টোপাধ্যায়

'কচি সংসদ'-এর কেষ্ট, প্রেম সম্পর্কে তার মোহমুদগরমার্কা ডেফিনিশনের ওপর ব্রজেন উকিলের সংশোধনীর ব্যাখ্যায় বলেছিল : প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়গ্রাপ্রপাত, আকস্মিক বিপদ — যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

আমাদের বিদ্যাসাগরী চটি বা খড়মপরা বাপ-ঠাকুরদারা কিংবা একগলা ঘোমটা অথবা ফাঁদি নথ-নাড়া মা-ঠাকুমারা — দেশকাল ভেদে তাঁদের বিকল্পরা — ছেলেমেয়ে, নাতিনাতনিদের পঞ্চশরের হামলা থেকে রুখতে যতই কাকতাড়ুয়া সাজুন না কেন, সেলিম-আনারকলিরা তাবৎ নিষেধের গড়খাই পেরিয়ে একে অন্যের হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব ঠিকই করে। তখনও, এখনও। প্রেমের অন্ত পর্বে কখনও বা দুজন দু ঠাঁই হয়ে একা একা গায় : 'আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে'; কচিৎ কোনও জুড়ির কপালে — অ্যান্ড দে লিভ্ড্ হ্যাপিলি হিয়ারআফটার।

তা কেষ্টর মন্তব্য থেকে সিনিসিজ্‌ম্-এর মোড়কটা ছিঁড়ে ফেললেও মস্ত এক চাঙড় খনিজ পাথরের মধ্যে মূল্যবান ধাতুর ক্ষীণ শিরার মতো এক চিলতে সত্য যেন ঝিলিক দেয়। কারুর কারুর জীবনে একটা বয়েসে ভালবাসা আচমকা হুড়মুড়িয়ে উঠে-আসা এক আগ্নেয় লাভার স্রোত। এই স্রোত উপচে ওঠে, ছড়িয়ে পড়ে তার অজানা উৎস থেকে। খুঁজে বেড়ায় থিতু হয়ে জমাট বাঁধার মতো আধার। তা সেই মানুষী আধারের উপমেয় মাটি, সিসে, সোনা যাই হোক না কেন, অনুরাগীর চোখে সেই অতি তুচ্ছ পাত্রও তখন আপনার মনের মাধুরী মেশানো এক অপরূপ রত্নভৃঙ্গার। অন্তত সেই ভাললাগার, ভালবাসার মুহূর্তে।

এই চোখের চাওয়ার কত না রকমফের। দগদগে কামনার লালা-মাখানো মোহ থেকে বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের শেষে আগুয়ান বৃষ্টির ঠাণ্ডা, ভিজে মাটির গন্ধমাখা চন্দনস্পর্শের মুগ্ধতা। এক অনুভব থেকে আরেক অস্বাদিত অনুভব। মানুষ নিজেও জানে না তার মনের চিলেকোঠার বাঁশিওয়ালা বুঝে, না বুঝে, তার একান্ত-আপন ভাললাগাকে কত ভাবেই না বাজাতে পারে। আর প্রেমিক পুরুষটি যদি শিল্প, সাহিত্য, সুরের মাটিতে বেড়ে-ওঠা চারা গাছ হয়, তাহলে তার ডালপালা আরও বেশি উতলা। ভালবাসার বাতাস তার অঙ্গে অঙ্গে বাঁশি বাজায় : 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে।'

ভালবাসা পাওয়া, পেতে পেতে না-পাওয়া, পেয়ে হারানো— চাওয়া-পাওয়ার হরেক কারচোপ প্রেমিক পুরুষটির জীবনে চিহ্ন রেখে যায়। বুকের মধ্যে ছবির ঝড় হয়ে থাকে উথালপাথাল আর্তি। বীঠোফেনের জীবনে সকল দুঃখের কাঁটা ধন্য করে কোনও ভালবাসার ফুল ফোটেনি। তাই হয় তো মনের মধ্যে যে নীরবে ছিল সে-ই নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমানিশীথিনী-সম জ্যোৎস্নার ঝড় তুলেছে 'মুনলাইট সোনাটা'-য়। শ্যুবার্টের প্রেমহীন জীবনের বুকজোড়া তৃষ্ণা মেটাতে হয়েছিল জীবাণুতে কিলবিল দূষিত জলে। তাই আয়ুর ফিতেটা অকালে ছাঁটাই হয়ে অস্তিত্বটাই হয়ে গেল 'আনফিনিশ্‌ড্ সিম্‌ফনি।' শপাঁ-র শঙ্খমালাকে তাঁর পৃথিবী একবারই পেয়েছিল, গভীরভাবেই পেয়েছিল। কিন্তু তার পর থেকেই সে অধরা। তবু নারীসঙ্গ পেয়েছেন আষ্টেপৃষ্ঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত থেকে গেছে যন্ত্রণার পেরেক। এক বিষণ্ণ, গুমোট, জলেভেজা

সন্ধ্যায় তাঁর দুঃখের বরষা সাদা অশ্রু হয়ে পিয়ানোর পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছে 'রেনড্রপ প্রেলিউড্।' চাইকোভ্স্কি তো শুরু থেকেই পূর্বাচলের পানে না তাকিয়ে অস্তাচলের ধারে এসেছেন, জীবনটাকে 'প্যাথেটিক সিম্ফনি' বানিয়ে।

এই চার গন্ধর্বের মধ্যে তিনজনেরই ঘর পাকাপাকিভাবে ঘরণীহীন। অন্তত অফিসিয়ালি। একজনই শুধু নিতান্ত নাচার হয়ে জেনেশুনে বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন, তাও অতি অল্পদিনের জন্যে। এঁদের কেউই চিত্রগুপ্তের খেরো খাতায় লম্বা অ্যাকাউন্ট খুলতে পারেননি। সব চেয়ে বেশি দিন পৃথিবীর জলহাওয়ার ভাগ নিয়েছেন বীঠোফেন — ছাপ্পান্ন বছর। সব চেয়ে কম শ্যুবার্ট, মোটে একত্রিশ বছর। শপাঁ টিকেছিলেন উনচল্লিশ পর্যন্ত। আর চাইকোভ্স্কি-র জন্যে বরাদ্দ ছিল পৃথিবীর তিপান্নটি সূর্য পরিক্রমা।

এঁদের সকলের জীবনের বটম্লাইন তারাশংকরের কবিয়াল নিতাইচরণের সেই উপলব্ধির সারাৎসার : 'ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।' এঁদের জীবনপাত্র উচ্ছলিয়া মাধুরী নয়, উঠে এসেছে গরল। সেই গরলই আবার সংগীত প্রতিভার বিচিত্র রসায়নে পরিণত হয়েছে সুরের অমৃতধারায়। আজও একাধিক শতাব্দীর শেষে সেই ধারার অবগাহনে দেশকাল নির্বিশেষে সুররসিকদের মনে হয় : মধুর তোমার শেষ নাহি পাই। এম. টি.ভি., চ্যানেল ভি-র দাপাদাপি সত্ত্বেও।

বীঠোফেন : অ-রব অন্ধকারে ক্যাক্টাসের ফুল

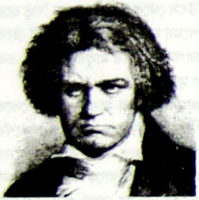

একশো তিয়াত্তর বছর আগে ভিয়েনা শহরে মার্চ-শেষের এক সন্ধ্যা, রাতের টানেলের মধ্যে ঢুকে গেছে। বাইরে গুঁড়ো গুড়ো তুষারকুচি ছড়ানো হু-হু হাওয়ার রাজ্যপাট। প্রকৃতি তার লাইট অ্যান্ড সাউন্ডের জমজমাট প্রদর্শনী সাজিয়েছে এক মহাপ্রয়াণের সম্মানে। থেকে থেকে আকাশে বিদ্যুতের আঁকিবুকি। তার পিছু পিছু মেঘের বুকফাটা শব্দ। কিন্তু যাঁর অন্তিম লগ্নে এত আয়োজন, সেই বীঠোফেন শব্দের জগৎ থেকে নির্বাসিত অনেক বছর। বেঁচে থাকতেই প্রতিভার স্বীকৃতি, মানানসই খ্যাতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, আর্থিক স্বচ্ছলতা — জীবনের এই বড় পাওনার ঘরগুলোতে তাঁর অদৃষ্ট ঠিকমতো টিক মেরে গেছে। কিন্তু লোকসানের ঘরে এন্ট্রি মোটে দুটি দফায়। কিন্তু দুটিই ওজনে ডবল লোহাপাথরের চাঙড়। তারই চোটে জীবনের দাঁড়িপাল্লায় তাবৎ লাভের কড়ি আকাশে-ওড়া শিমূলতুলোর আঁশ। আর লোকসানের পাল্লা মাটিতে গাঁথা। এই জোড়া পাষাণের একটি হল জীবনের মাঝরাস্তা থেকেই একটু একটু করে — পরে হুড়মুড়িয়ে — কালা হয়ে যাওয়া। শেষের দশ বছর তো দু কানের পাল্লায় পাকাপাকিভাবে তালামারা। কিছুই শুনতে পেতেন না। দ্বিতীয়টি হল : জীবনের প্রেম যমুনায় এপার থেকে যত ঢেউই তুলুন না কেন, তার একটিও ওপারে না পৌঁছোনো। মাথায় সোনার মুকুট পরে প্রেমে পড়ার — প্রায়শই একতরফা — এবং ব্যর্থ হবার এমন রেকর্ড দুর্লভ।

ঘরের বাইরে ঝড়ের দাপট বাড়তির দিকে। পাল্লা দিয়ে মেঘের হাঁকডাক। ঘরের মধ্যে ফিসফিসে মোমের আলো। যে ঘুম চেতন-অচেতন, চাওয়া-পাওয়া, দুঃখ-সুখের ভেদাভেদ

মুছে অন্ধকারের পুরু, ভারী পরতে মোড়া চতুর্দোলায় চড়িয়ে জীবনের শেষ সীমান্ত অবলীলায় পার করে দেয়, তারই মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে হারিয়ে গেছেন বীঠোফেন। বহুকাল ধরে দীর্ঘ অ-সুখে ভোগা গনগনে মেজাজি দৃষ্টি পুরোপুরি ঢাকা দু'চোখের বন্ধ পাতার নীচে। ছোটভাই ইয়োহান্-এর স্ত্রী আর তাঁর অর্ধেকেরও কমবয়েসি, তাঁকে দূর থেকে পূজা-করা লাজুক ভক্ত শ্যুবার্ট-এর বন্ধু হিউট্টেনব্রেনার তাঁর বিছানার পাশে বসে সেই অমোঘ মুহূর্তটির অপেক্ষায়। হঠাৎ এক অলৌকিক নীল আলোয় ভরে গেল সারা ঘর। একঝলক চোখ-ধাঁধানো রোশনাই। সঙ্গে সঙ্গে অশনিসংকেতে আকাশ শেষবারের মতো জানাল একসঙ্গে একুশ তোপের গান স্যালিউট। সেই মহারবের ধাক্কা সামলাবার আগেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা দুই তরতাজা মানুষ কেঁপে উঠলেন এক শিরশিরে বিস্ময়ের অনুভূতিতে। বীঠোফেনের সেই আঁঠা-সাঁটা চোখ টানটান হয়ে পুরোপুরি খুলে গেছে। সারা জীবন ঈশ্বরের কাছে একান্ত অবনত বীঠোফেন-এর চোখে প্রচণ্ড তীব্র চ্যালেঞ্জ জানানো আগুনে দৃষ্টি। শুধু তাই-ই নয়। ডান হাতটাও মুঠো হয়ে উঠে এসেছে অনেকখানি। কিন্তু নেমে এল পরক্ষণেই। বীঠোফেন তখন ইতিহাস হয়ে গেছেন। হু-হু করে ফুরিয়ে আসা প্রাণশক্তি একজোট হয়ে শেষবারের মতো একটা ঝলক দিল যেন। অদৃশ্য কারুর উদ্দেশে এক শব্দহীন প্রতিবাদে। নাকি অভিযোগে। কার বিরুদ্ধে এই দু-এক লহমার উৎক্ষেপ? সে কী তাঁর প্রাণের প্রাণ ঈশ্বর, যাঁর কাছে বার বার তিনি আকুল প্রার্থনা করেছেন জীবনে বধিরতা-আরোপিত শব্দহীন, প্রত্যাখান-উৎসারিত প্রেমহীন এই পৃথিবীর তাবৎ প্রতিকূলতাকে গুঁড়িয়ে দেবার মতো শক্তি, তাঁকেই লক্ষ করে শেষ বারের মতো 'আমি ভয় করব না ভয় করব না' বলে সদর্প ঘোষণা? না কি তাঁর প্রায় এক শতাব্দী বয়োকনিষ্ঠ প্রাচ্যের সাংগীতিক অনুজ রবীন্দ্রনাথ পরিদৃষ্ট জীবনমরণের সীমানা ছাড়িয়ে যে বন্ধু দাঁড়িয়ে থাকে, তাঁকে অনুমান করে? না কি সেই নারী, যাঁকে তাঁর জীবনে ভালবাসার জন্যে তীব্র আর্তির প্রতিকল্প বানিয়ে শুধুমাত্র Immortal Beloved বলে সম্বোধন করেছেন; লিখেছেন এক দিনের মধ্যে দু'কূল ভাঙা উচ্ছ্বাসের বানডাকা তিনখানা প্রেমপত্র, যা কিনা কোনওদিনই উদ্দিষ্ট নারীটির কাছে পাঠানই হয়নি। গোপন কথাটি গোপনেই থেকে গেছে। চিরটা কাল। নেভার আগে প্রদীপের অন্তিম স্ফূরণ কি তাঁরই স্মরণে? কে জানে।

লুড্ভিগ্ ভ্যান্ বীঠোফেন-এর পরিবারটির শেকড় হল্যান্ডের ফ্ল্যান্ডার্স অঞ্চলে। সেখানকার লোকজন আর তাদের ভাষা ফ্লেমিশ্ বলে পরিচিত। দুই-এর সঙ্গেই জার্মানির পশ্চিম দিকের এলাকার অনেকটা মিলমিশ। বংশটিতে পেশাদার সংগীতচর্চার চলন ছিল। ঠাকুরদা bass গাইয়ে — স্বরসপ্তকের সব চেয়ে নিচু বা খাদে যার গলা — হিসেবে যথেষ্ট নামযশ ছিল। সেই খ্যাতির জোরেই জার্মানির বন্ সহরে কলোন্-এর পাদ্রি রাজার নিজস্ব গির্জায় গাইয়েদের দলে ঠাঁই পেলেন দু-চার ঘাট ঘুরে। ছেড়ে এলেন হল্যান্ডের মেখেলেন সহর। হলেন প্রধান গায়ক। এইখানেই বীঠোফেনের বাবা ইয়োহান্-এর জন্ম। তিনিও পরে নাম করেন সুর আর সুরা দুইয়ের প্রতি প্রবল আসক্তির জন্যে। মা ছিলেন একেবারে সাদামাঠা ধরনের। আগের দিনের বাঙালি মায়ের মতো। সন্তানদের প্রতি অপরিসীম স্নেহমমতা। আবার দুর্দান্ত নেশাখোর স্বামী এবং গানবাজনা শেখানোর জন্যে বীঠোফেনকে বাড়াবাড়ি রকমের তাড়নার প্রতি প্রশ্নহীন, অভিযোগহীন। অভাবের সংসার তার মুখের হাসি শুষে নিয়েছিল। সাতটি সন্তানের মধ্যে বীঠোফেন দ্বিতীয়, যদিও কার্যত প্রথম; সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রটি জীবিত ছিল মোটে পাঁচ দিন। বাকি পাঁচ জনের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত ছোটবেলাটা পার হয়েছিল বীঠোফেনের পরের দুটি ভাই —

কাস্‌পার আর নিকোলাউস্‌। বীঠোফেনের জন্ম ১৭ই ডিসেম্বর, ১৭৭০।

বাবা ইয়োহান্‌ হয়তো এতটা কল্পনা করতে পারেন নি যে তাঁরই এই আত্মজটি সংগীতের চিরাচরিত ভিত্তিভূমিকে কাঁপিয়ে ভবিষ্যতে এক অক্ষয় মহা বোধিবৃক্ষে পরিণত হবে। কিন্তু এই বালকের মধ্যে ভোরবেলার প্রত্যাশিত নরম আলোর বদলে মধ্য দিনের সূর্যের আসন্ন ঝলককে ঠিকই চিনেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা ইচ্ছের ভর : আমার ছেলেই বা কেন মোৎজার্টের মতো শিশু প্রতিভার স্বীকৃতি পাবে না? কেনই বা তাকে ভাঙিয়ে অভাবের সংসারে দুটো পয়সা রোজগারের কাজে লাগানো যাবে না? তাই চার বছরের লুড়্‌ভিগ্‌-এর হাতে বাবা ইয়োহান্‌ ধরালেন বেহালা, তাকে বসালেন পিয়ানোর আগের আমলের বাজনা ক্ল্যাভিয়ার-এর সামনে। কিন্তু সেই শেখানোটা যথেষ্ট ছিল না, কেতামাফিকও নয়। তাও বাবার কাছ থেকে যেটুকু শেখার, সেই ছোট্ট বীঠোফেন আত্মস্থ করে নিলেন ঝটপট।

ইয়োহান্‌ নিয়ে এলেন তাঁর বন্ধু এবং বাজনা শেখাতে সত্যিই ওস্তাদ টোবিয়াস ফেইফার-কে। দুজনেই আবার এক গেলাসের ইয়ার। একেবারে মণিকাঞ্চন যোগ। এমনও হয়েছে দুই বন্ধু অনেক রাত পর্যন্ত মদ ঢেলে আড্ডার ময়দা মেখে চলেছেন। হঠাৎ দুই স্যাঙাতের খেয়াল হল; আরে লুড়্‌ভিগ্‌কে তো শেখানো হয়নি দিন কয়েক। ঘুমের বিছানা থেকে উপড়ে এনে তাকে শেখানো শুরু হল। তর্জন, গর্জন, শাসন সহযোগে সেই আসুরিক শিক্ষা চলত সারারাত। বাবা ইয়োহান্‌-এর এই কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর চেষ্টায় বীঠোফেনের স্কুল যাতায়াত বছর বারো-তেরো বয়েসেই শেষ। সেই নড়বড়ে ভিতের ওপর শিক্ষার ইমারত খানিকটা তৈরি হয়েছিল পরে ভিয়েনায় থাকার সময় ফন্‌ ব্রয়নিং পরিবারের সংস্পর্শে এসে। জংধরা বাতিল পেরেকভর্তি তালতোবড়ানো টিনের বাক্সর মতো যার শৈশব, সেই বীঠোফেন এই প্রথম পেলেন রুচি ও কৃষ্টির সুগন্ধ। এই পরিবারের ছেলে স্টেফান হল বন্ধু। এখানেই অঙ্কে কাঁচা, বানানে কাঁচা, কিশোর শিখলেন কিছু ল্যাটিন, ফরাসি, ইটালিয়ান; স্বভাবচেতনায় ভালবাসলেন সাহিত্য, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্য। কি রাস্তায় রাস্তায়, কি মনের মাঠে, একলা-ঘোরা, ভালবাসার বৃষ্টিভেজা বাতাসের জন্যে আকুল, বীঠোফেনকে মধ্যেমাঝে ঝলসাত অক্ষম রাগের ঝোড়ো লু বাতাস। তখন তাকে সামাল দিতেন এই ফন্‌ ব্রয়নিং পরিবারের স্নেহময়ী মাসিমা-গোছের বিধবা গিন্নিমা। এই চণ্ডাল রাগ, বয়েস এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়া বধিরতার সঙ্গে, ক্রমশ উর্ধ্বগামী হয়েছে; মূলত সোজাসাপটা, অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিপ্রবণ মানুষটি অন্যকে ভুল বুঝেছেন, তার জন্যে অনুতপ্ত হয়েছেন, আবার লোকেও তাঁকে ভুল বুঝেছে। এ সব আরও পরের কথা।

বীঠোফেনের খানাখোঁদলে ভর্তি ছোটবেলার ন'বছর বয়েসে তিনি পেলেন গানবাজনার একজন খুব ভাল শিক্ষক, খ্রিষ্টিয়ান নীফে। স্থানীয় সামন্ত রাজার সভায় প্রথমে থিয়েটারের ডিরেক্টর, পরে রাজার নিজস্ব গির্জায় প্রধান অর্গান বাজিয়ে ছিলেন তিনি। জহুরি গুরু, শিষ্যের মধ্যে কমলহীরের ঝিলিক ঠিকই দেখেছিলেন। এবং নানান পত্রপত্রিকায় তাঁর আবিষ্কারের কথা বড় গলায় ঘোষণা করেছিলেন। তিনি কাজেকর্মে বন্‌-এর বাইরে গেলে, তাঁর জায়গায় অর্গানে বসতেন এগারো বছরের বীঠোফেন। সতেরো বছর বয়েসে ১৭৮৭ সালে বীঠোফেন তাঁর অন্নদাতা রাজার কাছ থেকে জলপানি নিয়ে গেলেন সাম্রাজ্যের রাজধানী ভিয়েনায়। গানবাজনায় আরও উঁচুদরের তালিম নেবার জন্যে। দেখা হল বয়েসে তাঁর চেয়ে চোদ্দ বছরের বড়, তখনই খ্যাতির তুঙ্গে, মোৎজার্টের সঙ্গে। তাঁর কাছে শিখলেনও কিছু। একদিন মোৎজার্টের

দেওয়া টাস্ক চটজলদি করে এমন জাদু দেখালেন বীঠোফেন যে গুরু একেবারে উচ্ছ্বসিত। সেই মুহূর্তেই বীঠোফেনের মধ্যে ভবিষ্যতের মহীরুহের বীজ দেখেছিলেন মোৎজার্ট। বীঠোফেনকে দেখিয়ে উপস্থিত ছাত্র-শ্রোতাদের তিনি নাকি বলেছিলেন : দেখ রাখো ছেলেটিকে, এক দিন খুব নাম করবে।

ঠিক তখনই বীঠোফেনের জীবনে ঝকঝকে সকালের ওপর পড়ল ঘন মেঘের ছায়া : বন্‌ থেকে খবর এল তাঁর মা বলে ডাকার দিন ফুরিয়ে আসছে। ভিয়েনা ছেড়ে তক্ষুনি বন্‌-এ। কিন্তু মা-কে ধরে রাখা গেল না। যক্ষ্মা অনেক দিন ধরেই কুরে কুরে খাচ্ছিল তাঁকে। নেশায় গানের গলা নষ্ট করে মাইনে-বন্ধ স্বামীর অনটনের সংসার থেকে ধরিত্রীর মতো সর্বংসহা, চির বিষাদময়ী মা তাঁর সব জ্বালা জুড়োলেন। ভেতরে ভেতরে সবসময় একা কিশোর বীঠোফেনের কাছে মা ছিলেন পরম বন্ধু, ভালবাসার উৎস, অবলম্বন। সেই মা-এর চলে যাওয়ায় কষ্ট পেলেন খুব। বহতা জীবন শোকের পাথর সরিয়ে দেয়। নেশায় বেসামাল বাবার আটক মাইনের অর্ধেক পাবার ব্যবস্থা করে, ছোট দুটি ভাইয়ের পাশে দাঁড়িয়ে, বেহাল সংসারের ঠেকনার ব্যবস্থা করে আবার ফিরে এলেন ভিয়েনায়। গানবাজনার জন্যে মুক্তহস্ত, সমঝদার ব্যারন, কাউন্ট, ডিউকের খামতি নেই শহরে। এক বছর আগে ১৭৯১ সালে মোৎজার্ট-এর অকালপ্রয়াণের পরেও রাজধানীর গানের দুনিয়ার জেল্লা কমেনি। কিন্তু সংগীতের এই ম্যানহাটানে বীঠোফেনের পাকাপাকি ঠাঁই নেওয়া যে এক মহা মহা অশোকস্তম্ভের ভিত গাঁথার শুরু, তার জানকারি যারা বুঝবার বুঝে গেল।

তখনকার এক নামী পিয়ানোর সুরকার কার্ল ৎজেরনি — পরে বীঠোফেনের শিষ্য, আরও পরে আগামী যুগের দিকপাল কম্পোজার, ফ্রানৎজ লিস্‌জ্‌ট্‌-এর গুরু — বুঝেছিলেন: বীঠোফেনের বাজনার ভাষা, ভাবনাচিন্তা, সবই এ পর্যন্ত চেনাজানা ধারণা থেকে শুধু আলাদাই নয়; এ আরেক নতুন মহাদেশের একটু একটু করে উন্মোচন। ৎজেরনির কথায় : বীঠোফেন জানেন তিনি অনন্য। তাই তার ধারণার সোচ্চার প্রকাশে অকুণ্ঠ। স্থান, কাল, পাত্রের তোয়াক্কা রাখেন না। যদিও বয়েসে তখন সদ্য কৈশোর ছাড়িয়েছেন। তাঁর মেজাজে যখন তখন মধ্যাহ্ন সূর্যের আগুন। বীঠোফেন সেই বয়েসেই পিয়ানোকে দিয়ে ইচ্ছেমতো কথা বলান। এক ঘরোয়া আসরে দারুণ চমক-লাগানো চটজলদি একটা কিছু বাজালেন। বাজনার রেশ মেলানোর আগেই এক অট্টহাসির বোমা। তার পিছু ধরে কথার স্পিল্‌ন্টার : যত্তো সব বুদ্ধুর দল। এই বাক্যবর্ষণে — তাঁর এই খামখেয়ালি মেজাজ বয়েসের সঙ্গে, কানে শোনার ক্ষমতা তলানিতে নামার সঙ্গে — আরও বেড়েছে বই কমেনি। তাঁর অভিজাত রাজা-উজির মুরুব্বিদের কেউ কেউ ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। কিন্তু তিনি তো সংগীতের সম্রাট, এক সমালোচকের মতে 'সংগীতের শেক্সপিয়ার।' এই মেজাজের জন্যে অপমানের পাঁকে পড়তে হয়নি।

এই খিটখিটে মেজাজের গরম তেলে বেগুনের ফালি ছিল আসপাশের সব লোককে এক অস্বাস্থ্যকর সন্দেহের চোখে দেখা। তাই তাঁর অমর সংগীতসৃষ্টির নাছোড়বান্দা কিছু ভক্তরা ছাড়া তাঁর বন্ধুর সংখ্যা চিরকালই কম। এই ভক্তদের মধ্যে অনেকেই তাঁর শিষ্য। (যতই বদমেজাজি হোন না কেন শেখাতে কিন্তু কসুর করতেন না।) তার ওপর সংগীতের গন্ধর্ব, রূপে মোটেই কিন্নর ছিলেন না। মাঝারি উচ্চতা, লাল মুখে ভ্রূকুটিকুটিল চোখ, নীচের ঠোঁট একটু বাইরে ঠেলা, চওড়া চৌকো চোয়াল, মধ্যে ভাঁজ চিবুক, এক মাথা ইট রঙের ঝাঁকড়া উলুরঝুলুর চুল, পেছনের দিকে জোড়বাঁধা দুই হাত সামনে একটু ঝুঁকে পথ চলার সময়,

মাঝে মাঝে নিজের মনে বিড় বিড় করা, পোশাক পরিচ্ছদ পরতে হয় ব'লে পরা, খাবার টেবিলে হুমহাম করে খাওয়া, ঝোল ফেলা — এক প্রতিভা বাদ দিলে, প্রেমে পড়ার জন্যে পা বাড়িয়ে থাকা, কম লেখাপড়া জানা খেঁদিবুঁচিরা ছাড়া অন্য মেয়ের নজর কাড়া খুবই কঠিন। অথচ বীঠোফেনের মেলামেশা সমাজের যে ওপর মহলে, সেখানে হাবেভাবে, আচার-আচরণে, কথায়-বার্তায়, পমেটম আর পারফিউমের বাড়াবাড়ি।

তবু ভিয়েনায় জাঁকিয়ে বসার প্রায় শুরু থেকেই বীঠোফেন দুমদাম প্রেমে পড়েছেন। তবে হ্যাংলার মতো নয়। ডানাকাটা পরী ছাড়া তাঁর নজর কেউ কাড়তে পারত না। চেহারা বা পোশাকে নিজে যতই হাবিজাবি হোন না কেন, মনে তাঁর সুন্দর এবং সৌন্দর্যের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার ধুনি জ্বলতো সব সময়। পিয়ানোর ওপর তাঁর দু'হাতের দশ আঙুল এত রকমের ভাষা আর আবেগ, অনুভূতি, মেজাজ ফোটাতে পারত যে তাঁর প্রতি মুগ্ধ স্বর্ণকেশী, মৃগনয়নী, অনাবৃত স্কন্ধ এবং বুকের ভাঁজ কেউ না কেউ পৌঁছে যেত কাছাকাছি। এমনি একজন ছিলেন সামাজিক বিন্যাসে হাই অল্টিটিউডের অধিবাসিনী, কাউন্টেস্ গিউলিয়েতা গিউচ্চিয়ার্দি। পাণিপ্রার্থী গানের মাস্টারের প্রতি — তা সে যতই প্রতিভাধর হোক না — ছাত্রীর বাবা মার, আমাদের এই দগ্ধ বঙ্গদেশে আজকের দিনে যা মনোভাব, দুশো বছরেরও আগে ইউরোপে— বিশেষ করে কাউন্ট-ডিউক-ব্যারন-মার্কা অভিজাত মহলে — খুব একটা আলাদা ছিল না। পঞ্চদশী টেরেসে মালফাত্তিকে বিয়ে করতে চেয়েও ওই একই বিপত্তি। ফলে বীঠোফেনের একতরফা ভাললাগা কখনই পারস্পরিক ভালবাসার পর্যায়ে প্রোমোশন পায়নি। চাল নেই, চুলো নেই, গানের মাস্টারের অ্যাত আস্পদ্দা-গোছের বাঙালি মধ্যবিত্তসুলভ চিল চিৎকারে অভিষিক্ত হতে হয়নি বীঠোফেনকে, বা তাঁর সামাজিক স্বীকৃতিতেও কোনও কালির দাগ লাগেনি। ফলে গোপন কথাটি গোপনেই থেকে গেছে। তবু এমনিতে অনুল্লেখ্য, কাউন্টেস-এর নাম কিন্তু বীঠোফেনের জীবনীতে পাকাপাকি ঠাঁই পেয়ে গেছে; বীঠোফেনের বহু উল্লিখিত চোদ্দ নম্বর পিয়ানো সোনাটা-টি, যা 'মুনলাইট' নামে বিশেষভাবে খ্যাত, তার উৎসর্গপত্রে এঁরই নাম লেখা। আর বীঠোফেনের মনের গহন গোপনে এঁর একটা স্থায়ী জায়গা ছিল নিশ্চয়ই। নইলে সুরের গুরুর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের মধ্যে এই তরুণীর সেই কাঁচা বয়েসের একটি পোর্ট্রেট থেকে যাবে কেন?

এই পর্বের পিঠোপিঠি পাওয়া যাচ্ছে আরও কয়েকটি মেয়ের নাম: প্রথমোক্তার এক তুতো বোন, ইয়োসেফিনে আর কাউন্টেস টেরেসে ফন্ ব্রুন্সভিক্। ইয়োসেফিনে-কে নাকি প্রোপোজও করেছিলেন বীঠোফেন। দুজনের মাঝখানে সামাজিক অবস্থানের সেই গভীর খাদ। যা অলঙ্ঘিতই থেকে গেল।

১৮০১ সাল, বীঠোফেনের বয়েস একত্রিশ, কানের অবস্থা আরও খারাপ। তখন না ছিল ওষুধ, না ই.অ্যান্ড.টি বিশেষজ্ঞ। নানান হাতুড়ের পরামর্শে বীঠোফেন কানে ঢালছেন দানুব নদীর ঈষদুষ্ণ জল, কখনও চা-ভেজানো জল, কখনও বা বাদামের তেল। কানের মধ্যে সব-সময় হু হু করে বাতাস বয়, ভোমরার ক্রমাগত পাখসাট নয় তো ইঞ্জিনের হুইস্‌ল্। বীঠোফেন বুঝতে পারছেন একটু একটু করে নৈঃশব্দ্যের কবরে ঢুকে যাচ্ছেন। কানে চোঙা লাগিয়ে অন্যের কথা শুনতে হয়। মাথার মধ্যে সুরের আনাগোনার তবু কামাই নেই। কানে বলতে গেলে শোনেনই না। পিয়ানোর পর্দা গায়ের জোরে ঠুকে তার-ই ছেঁড়ে। শব্দহীন মনের আয়নায় তবু ফোটে স্বরলিপি। সেখান থেকে চালান করেন কাগজে, কলম চালিয়ে। মনের মধ্যে

গানবাজনার জগৎ থেকে প্রায় নির্বাসিত হবার অসহ্য যন্ত্রণা। আর প্রেম-ট্রেম তো দূর আকাশের নীহারিকা। কানে চোঙা লাগিয়ে প্রেমের নাটকে বড়জোর কমিক চরিত্রে অভিনয় করা যায়।

প্রেমে ক্রনিক ব্যর্থতা মনের মধ্যে পাকাপোক্ত এক ঘুণপোকা। কাউন্টেস, ডাচেস, ব্যারনেসদের জগতে বান্ধবী যে জোটেনি বীঠোফেনের এমন নয়। কিন্তু তাঁরা সকলেই হাল্কা ধরনের মহিলা। এমনিতে ভাব দেখিয়েছেন বীঠোফেনের মতো প্রতিভার সঙ্গে জান-পহচান হয়ে যেন কৃতার্থ। কিন্তু তাঁদের সংগীত সৃষ্টির প্রতি যতটা আকর্ষণ ছিল, তাদের স্রষ্টার জন্যে এক দামড়িও ছিল না।

বেট্টিনো ফন্ ব্রেন্টানো এক বিদুষী — এবং রূপসীও — অষ্টাদশীর বাতিক ছিল নানান বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করা। ১৮১২ সালে বীঠোফেনের সঙ্গে গ্যোয়টে-র কার্লসবুড় শহরে পরিচয়ের অনুঘটক এই মেয়েটি। বীঠোফেনের বয়েস তখন বেয়াল্লিশ; কানের অবস্থা বেশ খারাপ। এর সঙ্গে চিঠিপত্রে বীঠোফেনের একটু মাখমাখ সম্পর্ক ছিল। অন্তত বালিকার সেই দিকে ইঙ্গিত। যদিও সন্দেহের অবকাশ আছে তার দাবিতে। যাই হোক সেই অথ-বীঠোফেন-গ্যোয়টে সংবাদে বীঠোফেনের হাম-কিসিসে-কম-নেহি গোছের এটিকেট না-মানা, মানসিক স্টিফ-নেকের ব্যামোটা ভাল রকম চাগাড় দিয়েছিল। বীঠোফেনের ভাষায়: রাজা, রাজপুত্ররা তাদের পছন্দসই লোকজনকে মন্ত্রী কি প্রোফেসার, তাদের মর্জিমাফিক বানাতে পারে; খেতাব-টেতাব দেওয়াও তাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু মুরোদ আছে তাদের একটা বড় মাপের মানুষ বানানোর? পারে তারা জন-গণ লেভেলের ওপরের মেধা সৃষ্টি করতে। উনি বলতে চেয়েছেন তিনি নিজে আর গ্যোয়টে এ-ধরনের হাই-ফাই ব্যক্তিত্ব। একদিন বিকেলে ওই কার্লস্‌বুড় শহরেই রাস্তায় দেখলেন পুরো রাজ পরিবারের সদস্যদের। গ্যোয়টে তাদের প্রচলিত আদবকায়দামাফিক সামনে ঝুঁকে কুর্নিশ জানাতে শশব্যস্ত। তাঁর নানান ইশারা সত্ত্বেও বীঠোফেন অচঞ্চল। মাথার টুপিটা চোখ ঢেকে নামিয়ে, কোটের সব বোতামগুলো এঁটে, বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়ি ভাঁজ করে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে নির্বিকারভাবে হাঁটতে লাগলেন। সাম্রাজ্ঞী তাঁকে চিনতে পেরে অভিবাদন জানালেন। এদিকে ডিউক রুডল্‌ফ্ বীঠোফেনের খাতিরে মাথার টুপি হাতে। ওদিকে গ্যোয়েটে রাজা রাজড়াদের সম্মানে টুপি হাতে নিয়ে ঝুঁকেই আছেন। পরে গ্যোয়টের এই অতি ভদ্রতার জন্যে বীঠোফেন তাঁকে রীতিমতো ঝেড়ে কাপড় পরিয়েছিলেন বাক্যবাণে বিদ্ধ করে। তবু পারস্পরিক শ্রদ্ধা অবশ্যই ছিল দুজনের মধ্যে।

কারণ চাণক্য শ্লোক না পড়েও বীঠোফেনের উপলব্ধি — এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে 'স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্যান (এ ক্ষেত্রে তাঁর মতো মহাপ্রতিভাধর সংগীতস্রষ্টা এবং শিল্পী) সর্বত্র পূজ্যতে।' এবং বীঠোফেনের নাম তত দিনে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, এমন কি অ্যাটলান্টিকের ওপারে আমেরিকাতেও পৌঁছে গেছে। (বাই দা বাই, আমাদের দেশে ওই একইভাবে সামন্ততন্ত্রের বেতনভুক ওস্তাদদের অনুরূপ অবস্থায় অনুকরণীয় কে হতেন — বীঠোফেন না গ্যোয়টে?)

প্রচণ্ড হইচই করে এবং মেজাজ দেখিয়ে ভূতে-পাওয়া ঘোরের মধ্যে কম্পোজ করতে করতে দিনের বেলা প্রায়ই খেতে ভুলে যেতেন। নিজের প্রতিভার ওপর বিপুল আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও 'নারীর ললিত লোভন লীলায় ভুলে' ওই একই মানুষ মনে-ধরা কোনও রমণীর আলিঙ্গন বা চুম্বনের জন্যে প্রায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরেছেন। এই পাথরচাপা কপালের অসহায় মানুষটি তবু কোনও মায়াবনবিহারিণী হরিণীর দেখা পাননি। অবশ্য তাঁর ধৈর্য এই অন্বেষণে

চিরদিনই কম। এক বন্দরে ঠাঁই না পেয়ে গেছেন অন্য বন্দরে। কিন্তু ভালবাসার নোঙর স্থায়ীভাবে ফেলতে উৎসুক বীঠোফেন আসলে বুঝি খুঁজতেন তাঁর একান্ত নিজস্ব মনোলোকের তিলোত্তমাকে। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে, আমার মনে।' কিন্তু তাঁর সেই মানসী 'অধরা মাধুরী'-ই থেকে গেল চিরটা কাল। তার কাছেই তিনি চির বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিলেন।

অবশ্য এ কথাও অবশ্যমান্য যে বীঠোফেনের বিয়ের ফুল যদি ফুটতোও, তাঁর বা জীবনসঙ্গিনীর পক্ষে সত্যিকারের সুখ, মরুভূমিতে এক মিলিমিটার বৃষ্টির চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা আমেজ দিতে পারত না। তা তাঁর স্ত্রী যেই হোন না কেন। বীঠোফেন হয়তো চাইতেন স্বভাবটা মাখনের তাল করতে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। যে কোনওরকম ত্যাগ স্বীকারেও তিনি রাজি ছিলেন। কিন্তু রোজকার সংসারের নানান খুঁটিনাটির সমাধান তাঁর নাগালের বাইরে। তাঁর মনের স্বাভাবিক ঢাল, ক্ষেপে গিয়ে গাঁক গাঁক করে চ্যাঁচানোর দিকে। তাঁর মনের এই দুই ভিন্নমুখী প্রবণতা বলা বাহুল্য তাঁর সংসার জুড়িগাড়িটিকে উল্টে দিতে। সামনে দুই ঘোড়া আর পেছনে দুই ঘোড়া যদি উল্টোমুখো টান দেয় তাহলে চৌঘুড়ির অবস্থা এমনটাই হবার কথা। অথচ মানুষটার মনে ভালবাসার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল। ঘরসংসার, সন্তানহীন বীঠোফেন তাঁর আগলে-রাখা অপত্যস্নেহের সবটা খরচ করতে গেছেন ভাইপো কার্ল-কে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার কাজে। তা স্নেহময় জ্যাঠামশাইয়ের এন্তার পেল্লাদে সেই ভাইপো টাকাকড়ি মেরে, সুইসাইডের চেষ্টা করে এক মহা বাঁদর হল। অপার লাঞ্ছনা ও মনোদুঃখ পেয়েছেন এই বয়ে-যাওয়া ভাইপোর জন্যে, তবু তার প্রতি জ্যাঠার স্নেহ-ভালবাসায় কোন টান পড়েনি।

নানান বাধাবিপত্তির মধ্যে দিয়ে নিজের আরব্ধ কাজ সুসম্পন্ন করতে পারেন একমাত্র মহামানবেরাই। এবং রম্যাঁ রলাঁ বলেছেন : তিনি সত্যিই একজন Saint, একজন Titan, অথবা একজন Prophet। বিরল ব্যক্তি এবং অতি উচ্চ মানের নীতিবোধের অধিকারী, তিনি প্রকৃতই একজন মহামানব। (তিনি তাঁর থেকে বয়েসে প্রায় ১১০ বছরের ছোট এক বাঙালি সুরকার কবির কথায় অবশ্যই মেয়েদের বলতে পারতেন : 'আমারে বাঁধবি তোরা সেই বাঁধন কি তোদের আছে')।

সারাটা জীবন ধরে তিনি একলা মানুষ। বীঠোফেনের বয়েস বাড়ার এবং বধিরতায় অবরুদ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঘনীভূত হয়েছে তাঁর গাম্ভীর্য, অজানা ভবিষ্যতের চিন্তার আতঙ্ক মেয়েদের থেকে তাঁকে আরও বেশি করে দূরে ঠেলে দিয়েছে। তবু কামনা একেবারে মরেনি। ১৮০৯ সালে উনচল্লিশ বছরের বীঠোফেন বন্ধু ব্যারন গ্লেইখেনস্টেইনকে আধা ঠাট্টা, আধা সিরিয়াস স্বরে লিখছেন : এখন তোমরা আমার জন্যে একটা বউ খুঁজতে পারো। আর যদি তোমার ফ্রেইবার্গ শহরেই দেখতে শুনতে ভাল এমন একটি মেয়ে পাও — অবশ্য সে এমন একজন হবে যে আমার সৃষ্ট স্বরগুচ্ছ নিয়ে কখনও-সখনও একটা দীর্ঘশ্বাস অন্তত ফেলবে— তা হলে জোগাড়যন্ত্র দেখো এবার। কিন্তু মেয়েটি যেন দেখতে অবশ্যই ভাল হয়, কারণ যা সুন্দর নয়, তা আমি সহ্য করতে পারি না। না হলে আমার তো নিজেকে ভালবাসা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কেন তিনি বিয়ে করেননি, এই প্রশ্নের জবাবে বীঠোফেন একবার বলেছিলেন, অবশ্যই গভীর দুঃখ ও অভিমানে : মেয়েদের মধ্যে যার আত্মা (অনুভূতিশীল মন) আছে, তাদের শরীর নেই, (তাদের দিকে তাকানো যায় না) আর যারা শরীরসর্বস্ব, তাদের আত্মা নেই।

জীবনের উপলব্ধ এই সারাৎসারই তাঁর ঘরকে বোধ হয় চিরটা দিন ঘরনিহীন করে রেখেছে।

কিন্তু বাহির দুয়ার যতই তাঁর রুদ্ধ হয়েছে বধিরতার পাথরের চাপে, নিজের অবরুদ্ধ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে ততই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন একের পর এক সংগীতের বহুবিচিত্র ধ্বনিময় প্রাসাদ তৈরির কাজে। এ যেন, ধরে নেওয়া যাক, অন্ধ মাইকেল অ্যাঞ্জেলো খোদাই করছেন ডেভিডের মূর্তি। শ্রুতির জগৎ থেকে বীঠোফেনের নির্বাসনের শুরু মাত্র আঠাশ বছর বয়েস থেকে। তারপর থেকে বধিরতার সাঁড়াশিতে তাঁর দু কান আরও বন্ধ; জীবনের শেষের দশ বছর তো কিছু শুনতেই পেতেন না। আটত্রিশ বছর বয়েসে কথাবার্তা চালাতেন খাতায় লিখে লিখে। এই খাতাগুলো স্পীচ্ বুক নামে খ্যাত। অথচ এই সময়ের মধ্যেই তিনি সৃষ্টি করেছেন তাঁর ন'টি সিম্ফনি-র প্রথম দুটি বাদ দিয়ে বাকি সাতটি। তা ছাড়াও পিয়ানো, বেহালা; তিন, চার বা তার কিছু বেশি বাজনার সমন্বয়ে রচিত নানান চেম্বার মিউজিক, তাঁর একমাত্র অপেরা 'ফিডেলিও', এমনি আরও কত। শুধুমাত্র সোলো পিয়ানোর জন্যে 'হ্যামার ক্লাভিয়ের', 'ডায়াবেলি ভ্যারিয়েশান'-এর মতো অসম্ভব প্যাঁচদার রচনা বা মৃত্যুর তিন বছর আগে শেষ করা রক্ অফ্ জিব্রালটার সদৃশ তাঁর একমাত্র সম্মেলক কণ্ঠসংগীত (Mass in D Major) বানানোর সময় তো তিনি বদ্ধ কালা এবং শরীর, মন অতল খাদের ধারে। মূলত মেলডি, ধ্যানময়তা এবং বাণী নির্ভর ভারতীয় মার্গসংগীত বা হালের পপ, জীবনমুখী — এ সবেরই প্রায় তাবৎ শিল্পী ও শ্রোতাদের পক্ষে এই বিপুল — এবং চিরস্থায়ী — কর্মকাণ্ডের হদিশ পাওয়া ভার। (ব্যতিক্রম কুমারপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো এক-আধ জন)। কি পরিমাণ মেধা, মনন এবং কল্পনাশক্তির সমাবেশের দরকার, তার অনুধাবনে সবচেয়ে বড় বাধা তাঁদের নাকের সামনের পর্বতপ্রমাণ অজ্ঞতার পাঁচিল। যার আড়ালে ঢাকা অন্য দেশের সংগীত। বীঠোফেন কিন্তু ভালবাসতেন হোমার, গ্যোয়টে, প্লেটো এবং শেক্সপীয়ার। ফরাসি বিপ্লবের মধ্যে অনুভব করেছেন দুঃশাসনের অবরোধ থেকে মানবাত্মার মুক্তি। নেপোলিয়নকে এই মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক ভেবে তাঁকেই উৎসর্গ করেছেন তাঁর রচিত তিন নম্বর সিম্ফনিটি। আবার সেই নেপোলিয়ান নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলে স্বপ্নভঙ্গের প্রচণ্ড ক্রোধে ছিঁড়ে ফেলেছেন উৎসর্গপত্রটি।

শোপেন্‌হাওয়ার-এর কথায় : বীঠোফেনের সিম্ফনির মধ্যে আমরা পাই মানুষের তাবৎ তীব্র আবেগ, অনুভূতির কণ্ঠস্বর। কি নেই তাতে — আনন্দ, গভীর বেদনা, প্রেম, ঘৃণা, ভয়, আশা, এমনি কত। রঙের আলোছায়ারই বা কত বাহার, তেমনি নানান ধরনের ওপরনীচ। ইন্দিরা গান্ধিও নাকি এক সময় বীঠোফেন অনুরাগী ছিলেন। আর অবশ্যই নীরোদ সি. চৌধুরি মশাই। অলডাস্ হাক্সলির মনপসন্দ ছিল বীঠোফেনের বধিরতার পূর্ণগ্রাসের সময়কার একটি শেষ দিকের ফসল — Grosse Fugue। এঁরা কেউই সংগীতজগতের লোক নন। সত্যজিৎ রায়, নিজেও কম্পোজার বলে তাঁর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়নি। প্রায় সেই একই কারণে ড. রাজা রামান্নাও বাইরে থাকলেন।

বীঠোফেনের ওপর মৃত্যুর শিলমোহর পড়ার ক'দিন পর তাঁর এক নাছোড়বান্দা ভক্ত শিন্ডলার তাঁর গুরুর লঝঝড় দেরাজের এক চোরাগোপ্তা খোপে পেলেন সেই হতচ্ছাড়া, হাড়-জ্বালানো ভাইপো কার্লের জন্যে রেখে যাওয়া ব্যাংক নোট, ছোট দুই ভাই কার্ল আর ইয়োহান্-এর উদ্দেশে পঁচিশ বছর আগে লেখা এক গভীর মনস্তাপ আর আত্মধিক্কারে ভরা এক দীর্ঘ বিবৃতি — এটি পরে 'হেইলিগেন্‌স্টাড্ টেস্টামেন্ট' নামে খ্যাত হয়েছে। এবং বছরের উল্লেখ

নেই কোনও এক জুলাই মাসের ৬ এবং ৭ তারিখে লেখা সকালবেলার উল্লেখ আছে প্রথম আর তৃতীয় চিঠিতে — বিরহের যাতনায় দীর্ণ, উচ্ছ্বাসে ছাপাছাপি তিনখানা প্রেমপত্র যা কোনও এক Immortal Beloved-এর উদ্দেশ্যে নিবেদিত। যদিও তাদের চিরঅজ্ঞাত প্রাপিকার কাছে কোনওদিন প্রেরিত হয়নি। লাগামছাড়া আবেগের বাড়াবাড়ি নজরে পড়ার মতো। মনে হয় অনেক কমবয়সি — এবং কানের দরজা খোলা — বীঠোফেনের লেখা। শেষ চিঠিতে বীঠোফেন লিখছেন এক জায়গায় : 'হয় আমি তোমার সঙ্গে পুরোপুরি থাকব, নয় তো একেবারেই নয়। অনেক দূর দেশে গিয়ে থাকব (বলা বাহুল্য, যাননি)। যতক্ষণ না পর্যন্ত নিজেকে তোমার দুই বাহুর মধ্যে সমর্পণ করে বলতে পারি আমি এখন সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছি।.... অন্য কেউ আমার হৃদয়ের দখল নিতে পারবে না (এ প্রতিজ্ঞাও টেঁকেনি).... কক্ষনো না, কক্ষনো না। হে ভগবান, কেন যাকে এত ভালবাসি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে হয়।'

একটা চিঠি থেকে মনে হয় প্রেমটা যেন একতরফা নয়, যেমন: 'তুমি কষ্ট পাচ্ছ, হে আমার প্রিয়তমা, তুমি কষ্ট পাচ্ছ।....এমন কিছু একটা করো না যাতে আমি তোমার সঙ্গে থাকতে পারি। তাঁহলে কি জীবনটাই না আমরা কাটাব!!!' এই তীব্র আসঙ্গলিপ্সা সব চিঠিগুলিরই ছত্রে ছত্রে। চিঠির শেষ লাইনে আছে : চিরদিনের জন্যে তোমার, চিরদিনের মতো আমার, চিরদিনের মতো একে অন্যের!' শুধুমাত্র প্রথম চিঠির নীচে 'তোমার বিশ্বস্ত লুড্ভিগ্' বলে উল্লেখ আছে। অন্য দুটি চিঠি সম্বোধনহীন, চিঠির লেখকের নামও নেই।

কে এই রহস্যময়ী Immortal Beloved? এই প্রশ্নের জবাবে বীঠোফেনের জীবনীকাররা শুধুমাত্র অনুমান করতে পারেন। কেউ কেউ এই মৃত্যুঞ্জয়ী প্রিয়তমার খালি ফ্রেমটায় বসাতে চান আগেই উল্লিখিত কাউন্টেস গুইলিয়েতা গুইচ্চিলার্দির ছবি। অন্যদের ধারণা বীঠোফেনের এই আকুল সম্বোধনের হকদার কাউন্টেস টেরেসে ফন্ ব্রুন্সভিক্। দুজনেই তীক্ষ্ণনাসা, বিশালাক্ষী, পীনস্তনী। প্রথমজনের হেয়ার স্টাইল সযত্নে আলুলায়িত, দ্বিতীয়জন নানান হেয়ার ব্যান্ড জড়িয়ে চুলের ধাঁচে কতকটা বিদেশিনী। তবে দ্বিতীয় জন গড়নে যেন একটু ভারীসারি। এ ছাড়াও তৃতীয়া একজনকে দাবিদার বানানোর পক্ষে একটা মতও আছে। তিনি ব্যারনেস ডারোথিও ফন্ এর্টমান। বিউটি কন্টেস্ট হলে এই তৃতীয়ার মাথাতেই কিন্তু বিজয়িনীর মুকুট চড়ত। তন্বী, চোখের দেখায় আরও কম, চোখমুখে বুদ্ধি, মেধার বাড়তি পালিশ, ব্যারনেস ফন্ এর্টমান একজন নামি পিয়ানো বাজিয়ে ছিলেন। বীঠোফেনের সান্নিধ্যে না এলে এই সব রূপসী কাউন্টেস, ব্যারনেসদের কি কেউ মনে রাখত?

বীঠোফেনের পাকাপাকি চলে যাবার দু দিন আগের সকাল। পাদ্রি মশাই এলেন স্বর্গের টিকিট কাটার ব্যবস্থা করতে। ঈশ্বরের আগাম আশীর্বাদ নিতে আচার অনুষ্ঠান। তা সে পর্ব চুকলো। দিন আগত ওই — যিনি জানাবার তিনি জানালেন, যিনি বুঝবার তিনি বুঝলেন। বিছানা ছেড়ে কফিনে শোবার অপেক্ষা। বিছানা ঘিরে বন্ধুবান্ধবেরা। দুর্বল একটি হাত শূন্যে ছোঁড়ার মতো করলেন বীঠোফেন। কমজোরি গলায় বোধহয় পাদ্রি মশাইয়ের ল্যাটিন মন্ত্রের খেই ধরে সেই ল্যাটিনেই যা বললেন তার মর্মার্থ : দোস্তলোগ, এক দফে তালি বাজাও এক দফে, ইয়ে কমেডি এঁহি পরই খতম। বেলা একটা নাগাদ বীঠোফেনের সেই প্রথম যৌবনে ভিয়েনায় স্নেহ-ভালবাসা-শিক্ষাদীক্ষার পয়লা ঠেক, ফন্ ব্রয়নিং পরিবার থেকে এল ভাল ওয়াইন, আরও কিছু চাঙ্গায়নী। আহা, শেষবারের মতো একটু চুমুক দিয়ে নিক, এই ভেবেই

বোধহয় এই ভেট। বীঠোফেন ভেটের বাক্সর দিকে একবার তাকালেন মাত্র। বললেন: খুব দেরি হয়ে গেছে, তাই তো আশঙ্কা আমার — হায়! হায়! হায়! এই হাহাকারই হল বীঠোফেনের সজ্ঞান অবস্থায় শেষ উক্তি। তারপরেই ঢুকে গেলেন বড় ঘুমের দেশে যাবার আগে ছোট ঘুমের ওয়েটিং রুমে।

মৃত্যুর পরোয়ানা কার্যকরী হবার তিনদিন পর বীঠোফেনকে নিয়ে যাওয়া হল তাঁর চিরস্থায়ী বিশ্রামাগারে। রাজা-রাজড়ার শেষ যাত্রাতেও এত জাঁকজমক তখন হতো কি না সন্দেহ। ভিয়েনা শহর ভেঙে পড়ল। অন্তত দশ হাজার লোক হাঁটল তাঁর কফিনের সঙ্গে। এত ভিড়ভাট্টা দেখে এক উটকো গাঁওয়ার জিজ্ঞাসা করল এক বৃদ্ধাকে : কি হয়েছে গো বুড়ি মা? বুড়ি জবাব দিল : সুরের রাজা চলে যাচ্ছেন।

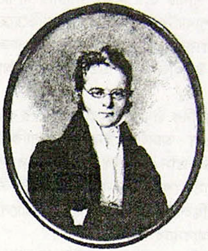

শ্যুবার্ট : 'আমি যে গান গেয়েছিলেম'

প্রাকৃত বাংলায় 'জন্মে দিলে না ভাত-কাপড়/মরলে করবে দানসাগর' — প্রবচনটির উদাহরণ তথা ব্যাখ্যায় শ্যুবার্টের নামটা বেশ মানিয়ে যায়। জীবনের যা কিছু কাঙ্ক্ষিত — স্বীকৃতি, খ্যাতি, অর্থ — এ সবই তাঁকে এড়িয়ে গেছে। পাওনার ঘর প্রায় শূন্য। কিছু গুণমুগ্ধ বন্ধুবান্ধব না থাকলে শ্যুবার্টের দুঃখ ও দারিদ্র্যের কাঁটা বিছোনো রাস্তায় তাঁর মোটে ৩১ বছরে শেষ জীবনটা আরও দুর্বিসহ হতে পারত। এই কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক বন্ধুরা তাঁর সংগীত রচনাগুলোর প্রচার এবং প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শ্যুবার্টের অকালমৃত্যুর পরেও ছাড়েননি। শ্যুবার্টের অন্তিম ইচ্ছা ছিল তিনি যাঁর একলব্য ভক্ত, বীঠোফেন, একই শহরের বাসিন্দা হয়েও দূর থেকে দেখেছেন যাঁকে, লজ্জায়, ভয়ে কাছে ঘেঁষতে ভরসা পাননি, তাঁর পাশেই মৃত্যুর পর যেন একটু ঠাঁই পান। তা সেই বাসনা পূর্ণ করেছিলেন এই বন্ধুরা। তাঁদের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও শ্যুবার্টের সুবিশাল সৃষ্টির এক সামান্য ভগ্নাংশ তিনি বেঁচে থাকতে থাকতে ছাপা হয়েছিল। অথচ খোদ বীঠোফেন তো বটেই — বেঁচে থাকতে শ্যুবার্ট কোনওদিন জানতেও পারেননি — মোৎজার্ট, মেন্ডেল্শন এবং আরেক ট্র্যাজিক সংগীতনায়ক শ্যুমান-এর কাছ থেকে তারিফআদায় করেছিলেন তিনি। অথচ তাঁর বড় কাজগুলো শ্রোতাদের হাততালি যখন পেতে আরম্ভ করল, তার কয়েক বছর আগেই শ্যুবার্ট মাটির সঙ্গে পাকাপাকি ঘর বেঁধেছেন। তারপর তাঁর জন্মশতবার্ষিকী হয়েছে। এই তো ১৯৯৭ সালে মহা ধূমধাম করে বিশ্ব জুড়ে পালন করা হল তাঁর দ্বিশততম জন্মদিন। (মওকা বুঝে কলকাতার এক সংগীত সমালোচক ম্যাক্সমূলার ভবন থেকে একখানা অনুষ্ঠানলিপি জোগাড় করে এই উপলক্ষে কী কী হবে-হচ্ছের বাংলা তর্জমা করে এক নামী বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিকে প্রবন্ধ লিখে ফেললেন। তার প্রথম দশ লাইনের মধ্যে সবচেয়ে দামি খবরটিও জানাতে ভুললেন না : শ্যুবার্ট কিন্তু মারা গিয়েছিলেন সিফিলিসে)।

শ্যুবার্ট-এর সঙ্গে তাঁর চেয়ে ৬৪ বছরের ছোট রবীন্দ্রনাথের এক জায়গায় দারুণ মিল : দুজনেই গানের দুনিয়ায় নিজস্ব রাজত্বের স্থাপক। রবীন্দ্রনাথের প্রায় আড়াই হাজার গানের

বিশাল রাজ্যপাটে কথায়, সুরে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাট। আঠারো বছরের সংগীতজীবনে শ্যুবার্ট নিজস্ব প্রতিভায় ভাস্বর করেছেন ছ'শোর বেশি ছোট, বড় গান, যা তিনি সংগ্রহ করেছেন স্বদেশ, বিদেশের নানান দিকপাল কবি, নাট্যকারদের লেখা বা তার জার্মান অনুবাদ থেকে। এই কবিদের মধ্যে আছেন হাইনে, শিলার, গ্যোয়টে, ইস্কাইলাস্, পেট্রার্ক, ওয়াল্টার স্কট, শেক্সপীয়ার। নির্বাচনের এই ব্যাপকতায় স্তম্ভিত হতে হয়। তা ছাড়া দুই গানের রাজাই অনেক ভাইবোনের মধ্যে নীচের থাকে; রবীন্দ্রনাথ ১৫ জনের মধ্যে ১৪ নম্বরে, শ্যুবার্ট ১৪-র মধ্যে ১৩।

জার্মান ভাষায় 'লীট' মানে গান, বহুবচনে 'লীটের' কিন্তু শুধু একের বেশি গানই বোঝায় না; ইংরেজিতে একবচন, বহুবচন দুটি শব্দই মূলত শ্যুবার্টের সঙ্গে ডাকটিকিট-সাঁটা; অর্থাৎ বুঝতে হবে সেই গান বা সেই সব জার্মান গান, যা শ্যুবার্ট তাঁর নিজস্ব ঘরানার বাগানে একেবারে নিজের মতো করে ফুটিয়েছেন। পরে অবশ্য শ্যুবার্টের বাগানের সীমানা বাড়িয়েছেন শ্যুমান, ব্রাহ্ম্স্ এবং ভোল্ফ্-এর মতো প্রখ্যাত সুরকাররা। গানের সংজ্ঞা বলতে একজন সুরকারের নাম, তাও বিশ্বের সবচেয়ে প্রচলিত ভাষা ইংরেজিতে — এতটা সৌভাগ্য আর কোনও সুরকারের কখনও হয়েছে কিনা জানা নেই।

কিন্তু প্রতিভার এই স্বীকৃতি, আর্থিক সঙ্গতি, প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি তো অনেক দূরের কথা, কোনও কিছুই শ্যুবার্ট বেঁচে থাকতে পাননি। কথায় বলে : আনলাকি ইন কার্ডস্, লাকি ইন্ লাভ। তা টাকা-পয়সা, সম্মান, প্রতিষ্ঠা — এ সব রংচটা তাস তো অদৃষ্ট নামে জাদুকর কবে হাওয়া করে দিয়েছে। প্রেমের ব্যাপারেও সেই অদৃষ্ট হাসল শেষ হাসি। না কি গব্বর সিং-এর অট্টহাসি। জীবনে একটিই প্রেম কৈশোর-যৌবনের সন্ধিলগ্নে। তা সেই কনে দেখা আলোর ঝিলিক চাপা পড়ে গেল বাকি জীবনজোড়া মেঘলা অমাবস্যার অন্ধকারে।

গরিব ইস্কুলমাস্টার বাবার চোদ্দ সন্তানের — সাতটি অকালমৃত — সব শেষের আগের সন্তান ফ্রান্টজ্ শ্যুবার্ট, জন্ম ৩১শে জানুয়ারি, ১৭৯৭, ছোটবেলায় স্বচ্ছল জীবনের অনেক কিছুই নাগালের বাইরে। কিন্তু তা বলে ভাল লেখাপড়া, গানবাজনা শেখার — বাড়িতে চর্চা ছিল — কোনও ঘাটতি হয়নি। ফলে এগারো বছরের শ্যুবার্ট চমৎকার পিয়ানো, বেহালা আর অর্গান বাজাতে পারতেন। সহজাত সম্পদ দেববালকের মতো গানের গলা তো ছিলই, ভবিষ্যতের গানের রাজার। সেই অল্প বয়েসেই নিজের মনে কম্পোজ করতেন। অথচ বাড়ির অবস্থা এত খারাপ যে স্বরলিপি লেখার জন্যে দরকার পাঁচটা পাঁচটা লাইন ছাপা কাগজ কেনার পয়সা নেই। বয়েসে বড় বন্ধু ইয়োসেফ্ ফন্ স্পাউন গাদা গাদা কাগজ জোগাতেন। চির বিরূপ ভাগ্য শ্যুবার্টের বন্ধুদের বিগড়োতে পারেনি কখনও।

সেই কাঁচা কৈশোরেই গ্যোয়টে আর শিলারের কবিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যুবার্ট তাঁর পছন্দসই লেখায় তখন থেকেই সুর লাগান নিজের অন্তরের নির্দেশে। সেই নির্দেশে মানুষের কথার স্বাভাবিক ছন্দ সুরের পোশাক পরে। তারই খানিক শুনে সে যুগের বিখ্যাত সংগীতগুরু আন্তোনিও সালিয়েরি—এঁর কাছে বীঠোফেনও শিখেছেন — নিজে শেখাতে শুরু করলেন শ্যুবার্ট-কে। শিখছেন শ্যুবার্ট, কিন্তু প্রাণমন ডুবে আছে মানসগুরু বীঠোফেনের রচনায়। এক শহরে থেকেছেন, পরে কখনও-সখনও একই পানশালায় বীঠোফেনের বন্ধুদের কথাবার্তা অন্য টেবিল থেকে শুনেছেন; কিন্তু চিরলাজুক, মুখচোরা, দেখতে বেঁটে, একটু গাব্বুগুব্বু ধরনের, সংকোচের বেড়া কোনওদিন ডিঙোতে পারেননি শ্যুবার্ট। কোনওদিন তাঁর জানা হল না 'এলেম আছে ছেলেটার' বলে একাধিকবার তারিফ করেছেন চির বদরাগী বীঠোফেন।

ষোল বছর বয়েসে শ্যুবার্টের গানের গলা নষ্ট হয়ে গেল। ফিরতে হল বাড়িতে। বাবার ইস্কুলে একটা ছোটখাটো পড়ানোর চাকরি। ভাল লাগে না শ্যুবার্টের। বাচ্চাদের চেঁচামেচিতে কম্পোজিশানের মুড যায় নষ্ট হয়ে। এরই মধ্যে অনেকগুলো ছোট বড় কম্পোজিশান। একটা অপেরা, গ্যোয়টে-র পঞ্চান্নটা কবিতায় সুর দেওয়া, একটা বড় সম্মেলক গান, Mass, যার অনুষ্ঠান নাম পেল কিছুটা, কিন্তু পয়সার ভাগ্য সেই নাছোড়বান্দা শূন্য।

এর কিছু কাল পরে শ্যুবার্ট জানালেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনসেল্ম্ হিউট্টেনব্রেনারকে : তিনি প্রেমে পড়েছেন ষোড়শী সোপ্রানো গায়িকা — গানের বাজারে সব চেয়ে চড়া গলা — টেরেসে গ্রোব-এর সঙ্গে। দেখতে তেমন ভাল নয়। মুখটা খোদরা খোদরা, কিন্তু মেয়েটি খুব ভাল আর মনটাও খুব নরম। তিন বছর ধরে চলছে এই মন দেওয়া-নেওয়ার পর্ব। মেয়েটি তো চায় শ্যুবার্টকে বিয়ে করতে। কিন্তু চাকরিবাকরি নেই, সংসার চলবে কি করে? তারপর — যেমন হয় — বাবামার চাপে মেয়েটি অন্য লোককে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু শ্যুবার্ট এখনও তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু নতুন করে ভালবাসার নৌকো ভেড়াবার ঘাট আর পেলেন না শ্যুবার্ট। সবই ললাট লিখন।

ভাঙা মন শ্যুবার্ট কিন্তু সংগীত রচনায় ঢিল দেননি। পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গসংগীতে সব চেয়ে উচ্ছ্বসিত ঝর্নার নাম শ্যুবার্ট। ওই আঠারোটা বছর জীবনের — ১৮১০ থেকে ১৮২৮-এ মৃত্যু পর্যন্ত — তাঁর কম্পোজিশানের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। মোৎজার্টের পঁয়ত্রিশ বছর জীবনে ৬০০-র কিছু বেশি। আর আছেন এঁদের শতাব্দী আগেকার ইতালিয়ান বেহালার জাদুকর, আন্তোনিও ভিভাল্ডি (১৬৮০-১৭৪১), যাঁর রচনার সংখ্যা প্রায় ৬৫০। তবে সৃষ্টির ক্ষেত্রে শ্যুবার্টই আজ পর্যন্ত এক নম্বর। এর মধ্যে বন্ধুবান্ধবরা নিজেদের পয়সায় কিছু গান ছাপতে পেরেছিলেন। বাকি সব তাঁর মৃত্যুর পর বেরিয়েছে।

প্রেমের পরীক্ষায় ফেল করার পর আর নতুন করে প্রস্তুতি নেননি শ্যুবার্ট। বিয়েথা করে ঘরসংসার করার দিকেই গেলেন না। বরং হয় তো চালু প্রবচন অনুযায়ী ভেবেছেন দুধ যখন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় তখন আর কষ্ট করে গরু পোষার ঝক্কি পোয়ানো কেন। তা ছাড়া শরীরের একটা চাহিদা আছে। শ্যুবার্ট দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে জনপদবধূদের কাছে যাতায়াত শুরু করলেন। তাদের কোনও একজনের থেকে পেনিসিলিনের স্বপ্নবিহীন যুগে সিফিলিস-এর মতো মারাত্মক রোগ জোটালেন। অবশ্য ধরো তক্তা, মারো·পেরেক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত রাজাগজারাও রেহাই পাননি এই রোগের কামড় থেকে। কম মাত্রায় আর্সেনিক খাইয়ে রোগের লক্ষণকে চাপা দিতেন চিকিৎসকরা। এইভাবেই বছর কয়েক টিকেছিলেন শ্যুবার্ট। কিন্তু তাঁর সংগীত সৃষ্টির উৎসে রোগ কখনই পাথরচাপা দিতে পারেনি। কিন্তু তুষের আগুন রোগ ভেতর ভেতর ধিক ধিক করে জ্বলতে জ্বলতে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধের ঢালটাকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছিল। তাই টাইফয়েড্, এমনিতেই সে যুগে মারাত্মক, প্রায় বিনা প্রতিরোধ তাঁর জীবনের শেষ সুতোটা কেটে দিল। তারিখটা ১৯শে নভেম্বর, সাল ১৮২৮। মৃত্যুর আগে বিছানার পাশে বসা.ভাইকে ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন: আচ্ছা কেন আমার কিছু হল না? কী কম ছিল আমার? উত্তরটা ভাই, বন্ধু, কারুরই জানা ছিল না। সেই দন্তহীন বৃদ্ধের মতো বলতে হয় : তপাল, তপাল।

শপাঁ : 'অনেক পাওয়ার মাঝে'

'পিয়ানোর কবি' তথা সেই বাজনাটির মধ্য দিয়ে গভীরভাবে সংবেদনশীল, আবেগ আর কল্পনার অতিসূক্ষ্ম কারুকাজে সমৃদ্ধ একেবারে নিজস্ব বাগধারার স্রষ্টা, ফ্রেডেরিক শপাঁ, তাঁর জন্মভূমি পোল্যান্ড আর কর্মভূমি, প্যারিস-কেন্দ্রিক ফ্রান্সের, বলতে গেলে, যৌথ সম্পদ। আক্ষরিক অর্থে এবং প্রাকৃতিক নিয়মেও তাই। ফরাসি বাবা নিকোলাস শপাঁ। ফ্রান্সের লোরেইন প্রদেশে একদা ঘোড়ার গাড়ির চাকা বানিয়ের বংশে জন্ম। পরে তাঁর দ্বিতীয় স্বদেশভূমি পোল্যান্ডে কখনও অ্যাকাউন্টেন্ট, কখনও সৈনিক, এমনি নানান ঘাট ঘুরে শেষমেশ সেদেশেই থিতু হলেন ফরাসি ভাষার শিক্ষক হয়ে। রাজধানী ওয়ার্‌শ-এর মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে এক সময়ে এই ভাষাটি শেখাতেন। বিয়ে করেন একেবারে সাদামাঠা পোলিশ মহিলা জাস্টিন ক্রাইঝানোভ্‌স্কা-কে। এই ফরাসি-পোলিশ বাবামার চারটি সন্তানের মধ্যে দু নম্বরটিই বাবার ফরাসি পদবিকে সংগীতের আকাশে হিরে দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন। মাত্র উনচল্লিশ বছরের জীবনের দ্বিতীয় আধখানা পাকাপাকিভাবে প্যারিসিয়ান। সেখানে সমান মাপের সংগীতজ্ঞ, কবি, শিল্পীদের আসরের মধ্যমণি শপাঁ — বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন বেলিনি, বেরলিওজ্, মেইয়েরবীয়ার-এর মতো কম্পোজার, বালজাকের মতো ঔপন্যাসিক, দেশ থেকে নির্বাসিত কবি হাইনে এবং দেলাক্রোয়া-এর মতো চিত্রশিল্পী। শপাঁ কিন্তু মনেপ্রাণে পোলিশ ছিলেন। দেশে আর কোনওদিন না ফিরলেও বাবামা-র সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন চিঠিপত্তরের মাধ্যমে। পোল্যান্ডও চিরটাকাল গর্ব বোধ করে তার এই সন্তানের জন্যে। রাজধানী ওয়ার্‌শ-তে জাতীয় সংগ্রহশালায় রাখা আছে তাঁর টিকে থাকা জিনিসপত্র, যার মধ্যে আছে তাঁর আর তাঁর নানান প্রেমিকাদের সঙ্গে চালাচালি করা চিঠির তাড়া।

যে কোনও কারণেই হোক শপাঁ-র জন্মদিন, এমনকী জন্ম বছরটা নিয়েও কিছুটা অস্বচ্ছতা আছে। তাঁর বার্থ সার্টিফিকেট মৃত্যুর ৪৪ বছর পরে পাওয়া যায়। সেই অনুযায়ী শপাঁ-র জন্ম ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮১০। হাসিখুশি ছোটবেলায় ভাল লেখাপড়ার সুযোগ ছিল। চার বছর বয়েসেই প্রথমে দিদির কাছে পিয়ানোর হাতেখড়ি। পরে একজন ভাল মাস্টারমশাই এলেন। প্রথম লোকজনের সামনে আসরে বাজানো আট বছর বয়েসে। তখনই বাজনার হাত এত ভাল যে ওয়ার্‌শ-এর সমঝদারদের নজর পড়ল ভারি সুন্দর দেখতে এই ছেলেটির ওপর। বারো বছর বয়েসে কনসার্ভেটরিতে (সংগীত মহাবিদ্যাপীঠ) সংগীততত্ত্ব, বিশেষ করে হার্মনি আর কাউন্টার পয়েন্ট শেখার শুরু। (এই দুটি ব্যাপার, যা পাশ্চাত্য সংগীতের অবিচ্ছেদ্য অংশ, মেলডি-প্রধান ভারতীয় সংগীতের শিল্পী বা শ্রোতাদের ধ্যান-ধারণার চৌহদ্দির একদম বাইরে; আমাদের গানবাজনা সবই একক অনুষ্ঠান, সম্মেলকের কোনও স্থান নেই। জাতীয় সংগীত একশো জন মিলে গাইলেও সকলে একটাই সুর একসঙ্গে গাইবার চেষ্টা করে, যেহেতু কাউন্টার পয়েন্ট তো অনেক দূরের কথা, হার্মনি, যা অতটা জটিল নয়, তার সম্বন্ধেও আমরা কিছু জানি না। অবশ্য সলিল চৌধুরির মতো কিছু সুরকার কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন এই দুটি উপাদানকে।)

কৈশোরের শুরুতেই পিয়ানো শিল্পী হিসেবে শপাঁর নাম পোল্যান্ড ছাপিয়ে গেল। এর মধ্যে একবার ভিয়েনায় বাজিয়ে দারুণ নাম করলেন। এমনকী প্রকাশক পাওয়া গেল সহজেই। রাশিয়ার 'জার' পর্যন্ত তাঁর বাজনার তারিফ করে একটা দামি আংটি ইনাম দিলেন। বাবা নিকোলাস রুশ সরকারের শিক্ষামন্ত্রকে আবেদন করলেন — পোল্যান্ড তখন 'জার' শাসিত রাশিয়ার অধীন — তাঁর এই প্রতিভাবান পুত্রটিকে জার্মানি, ফ্রান্স আর ইতালিতে আরও ভাল করে শেখার জন্যে মাসোহারা দিতে। কিন্তু অর্থমন্ত্রক 'সরকারি টাকা অত সস্তা নয়' বলে দরখাস্ত নামঞ্জুর করে দিল। (আজও 'ফিনান্সের স্যাংশন নেই' বলে আমাদের দেশে যেমন হয়।)

শপাঁর জীবনে প্রতিভা আর প্রতিষ্ঠা, এই দুই 'প' হাত ধরাধরি করে চলছিল; এবার এল তৃতীয় 'প'টি— প্রেম—জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে। তিনে মিলে একটি জীবনভর যন্ত্রসংগীতের ট্রায়ো-র সৃষ্টি হল। শ্যুবার্টের ছিল এই তিন 'প'-র প্রথমটি — প্রতিভা।

বীঠোফেনের প্রথম দুটির কোনও অভাব ছিল না। শপাঁর জীবনে তিনটিই এসেছিল একেবারে ছাপ্পড় ফুঁড়ে। এর ওপর শপাঁ-র ছিল একটি বাড়তি কবচকুণ্ডল : অ্যাডোনিস্-এর মতো চেহারা। ফলে তাঁর কোনও প্রেমই একতরফা ছিল না। তা ছাড়া অনেক প্রেমই তাঁর কাছে প্রেরণার ইঞ্জেকশন-বিশেষ। সেই প্রথম প্রেম থেকে। কিন্তু কোনও প্রেমই শপাঁ-র জীবনে তাঁর কম্পোজিশানের মতো নিটোল মুক্তো হয়ে উঠতে পারেনি। সাময়িক সুখ, আনন্দ হয় তো পেয়েছেন; স্থায়ী পরিতৃপ্তি তাঁকে এড়িয়ে গেছে।

ওয়ার্‌শ কনজারভেটরির সমবয়সি কণ্ঠসংগীতের ছাত্রী কন্সটান্‌তিয়া গ্লাড্‌কোভ্‌স্কা আর শপাঁ কলিশান কোর্সে একে অন্যের দিকে এগোলেন; একাত্ম হলেন। কিন্তু সকালের প্রসন্ন ভৈরবীতে সাঁঝের পূরবীর বিষণ্ণতা। শপাঁ লিখছেন বন্ধুকে : আমার একটা লক্ষ্যবস্তু আছে, সেটাই আমার মন্দকপাল। নইলে আমি তো ওর (কন্সটান্‌তিয়া) প্রতি গত ছ মাস ধরে বিশ্বস্তই থেকেছি। ওকে আমি স্বপ্নে দেখি। আমার বি মাইনর কনচের্টো-র অ্যাডাজিও-র (একটি মুভ্‌মেন্ট) সঙ্গে এই সব স্বপ্নই জড়িয়ে আছে। আজ সকালেই ওদের (স্বপ্নদের) প্রেরণায় এই ছোট্ট ওয়াল্‌জ-টা লিখে ফেললাম। সেটাই পাঠালাম তোমাকে (বন্ধুকে)। (টেকনিকাল শব্দগুলো আর ব্যাখ্যা করা হল না।)

তবু ছেড়ে যেতে হয়। ১৮৩০ সালে বিশ বছরের শপাঁ ভিয়েনা রওনা হলেন নভেম্বরের গোড়ার দিকে। যাবার আগে তিনি আর কন্সটান্‌তিয়া এর আংটি ওকে পরালেন। শপাঁকে অ্যালবামে তাঁর প্রথম প্রেমিকা লিখে দিলেন : ভুলো না পোল্যান্ড তোমাকে ভালবাসে। বিদেশে তুমি প্রতিষ্ঠা পাবে, পাবে অর্থ। কিন্তু ওরা তোমাকে কখনই এত ভালবাসা দিতে পারবে না।

শপাঁর এই যাওয়াই অগস্ত্যযাত্রা হয়ে গেল। দুজনের মধ্যে আর কখনও দেখা হয়নি; শপাঁর মনে মাতৃভূমি পোল্যান্ডও স্মৃতি হয়ে থেকেছে বাকি জীবনে।

সেই বছরেই 'জার'-এর রাশিয়া-কে ঘাড় থেকে ঝেড়ে ফেলতে পোলান্ডের সশস্ত্র এবং সংঘবদ্ধ মরিয়া প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিল শাসকরা। পোল্যান্ড থেকে নিগৃহীত বহু পরিবার ছড়িয়ে পড়ল পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে ফ্রান্সে। শপাঁ তখন জার্মানির স্টুট্‌গার্টে; খবর পেলেন রুশরা রাজধানী ওয়ার্‌শ আবার দখল করে নিয়েছে। ক'দিন গভীর বিষাদের ঘেরাটোপে থাকলেন শপাঁ। শোনা যায় এই বিষণ্ণতার পর্দা ছিঁড়ল এই সময়ের সৃষ্টি

'রেভেলিউশনারি এতুদ'-এ। আবার জেগে ওঠার উদ্দীপনা। অবসন্ন শরীর আর মন নিয়ে গেলেন প্যারিস। সেখানে লুফে নিল সংগীতপ্রেমীরা এই সুদর্শন সদ্য তরুণকে। শপাঁ নিজেও এক চিঠিতে লিখেছেন অতি উচ্চকোটির ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর স্বচ্ছন্দ প্রবেশের কথা।

গোড়ার দিকে প্যারিসে পরপর একক অনুষ্ঠান করেছেন। কিন্তু বছর চারেক পরে তিনি সাধারণ্যে আর আসতেন না বিশেষ। বুঝেছেন ততদিনে, তাঁর বাজনার ধরন বড় কনসার্ট হলে আমজনতার জন্যে নয়; সুনির্বাচিত অল্প শ্রোতাদের সামনেই তিনি আত্মনিমগ্ন হতে পারেন। তাই জোর দিলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব ধরনের সংগীতরচনার ওপর। প্যারিসের ব্যয়বহুল — তখনও তাই ছিল—জীবনযাপনের জন্যে দরাজ-হাত বড় লোকদের বাড়িতে বাজনা শেখাতেন। এই শেখানোর সূত্রেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ডিভোর্সি পোলিশ কাউন্টেস ডেলফিন্ পোটোক্কা-র। শপাঁ অবশ্য মুখে বলতেন — কাউন্টেস-এর সঙ্গে তাঁর প্রেম-ট্রেম কিছু নেই। প্রায় ১০০ বছর অজ্ঞাতবাসের পর নজরে-আসা এক বান্ডিল চিঠি — ওয়ার্শ-এর জাতীয় সংগ্রহশালায় সযত্নে রাখা আছে এই পত্রগুচ্ছ — একেবারে উল্টো কথা বলে : শপাঁর সঙ্গে কাউন্টেস পোটোক্কা-র শোওয়া-বসার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু শপাঁ শুধুমাত্র কাউন্টেস-এর রূপের মোহে পড়েননি; তাঁকে জয় করেছিল এই প্রেমিকার কিন্নরী কণ্ঠ। পরে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে-যাওয়া এই অন্তঃসলিলা প্রেম আরেকবার ঝর্নার শেষ স্ফূরণে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। জীবনের পরের অজানা স্টেশনে একমুখো টিকিট-কাটা ক্ষয় রোগে বিধ্বস্ত শপাঁর বিছানার পাশে। শপাঁর পাণ্ডুর মুখে হাসি ফোটাতে তাঁরই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিলেন কাউন্টেস। কণ্ঠে নিয়েছিলেন গান প্রেমিকের শেষ পারানির কড়ি জোগাতে। অনুমান, এই কাউন্টেস-ই শপাঁর ভালবাসার প্রতিদান দিয়েছিলেন ঠিক মতো। শপাঁর প্রথম প্রেমিকা কন্সটান্তিয়া-র অনুপ্রেরণায় যে পিয়ানো 'কন্‌চের্টো ইন এফ্ মাইনর'-এর অ্যাডাজিও অংশটি লেখা, সেটি শেষ করে উৎসর্গ করেছিলেন কাউন্টেস-কে। আর নিবেদন করেছিলেন ওয়াল্‌জ্ ইন ডি ফ্ল্যাট (ওপাস সিক্সটি ফোর, নাম্বার ওয়ান)। এটি 'মিনিউয়েত্ ভালসে' নামে খ্যাত। (শপাঁর সঙ্গে অপরিচিত, এমন কি পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গসংগীতেও অনভ্যস্ত, কোনও সংগীতপ্রেমী যদি তাঁর কালজয়ী রচনাগুলি সম্বন্ধে আগ্রহী হন, তাহলে এই ওয়াল্‌জ্‌টি হবে — অন্তত এই লেখকের তাই বিশ্বাস — ভ্রমণসংক্রান্ত পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপিত কোনও পাঁচতারা হোটেলে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশিত 'ওয়েলকাম ড্রিংক'।)

দুটি রচনার মধ্যে প্রায় ষোলো-সতেরো বছরের তফাত; আর শপাঁ বেঁচেছিলেন মোটে ৩৯ বছর। মনে হয় কাউন্টেস সত্যি সত্যি শপাঁর 'মনের গভীর গোপন মহা আপন' হয়ে সঙ্গোপনে শেষ পর্যন্ত ছিলেন।

শপাঁর জীবনে দীর্ঘতম — সুখেদুঃখে প্রায় দশ বছর — প্রেমের জোয়ার ছিল ফরাসি লেখিকা জর্জ সাঁদ-এর সঙ্গে। জর্জ সাঁদ — অরোর দুদ্‌ভঁ-র ছদ্মনাম — সর্ব অর্থে অসাধারণ মহিলা। ইনি তসলিমা নাসরিন-এর অতি অতি অতি বৃদ্ধা প্রপিতামহী তথা এক ব্রবডিংনাগের মানবী। তখনও তরুণ উনবিংশ শতাব্দীর নিয়মনীতিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে কখনও কখনও পুরুষের পোশাক পরতেন, চিমনির মতো চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তেন সর্বসমক্ষে। আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে নিয়ে শপাঁর সঙ্গে থেকেছেন শয্যাসঙ্গিনী, বন্ধু, সচিব, সখা, চূড়ান্ত অসুস্থতার সময় সেবিকা, সব কিছু একসঙ্গে হয়ে। অর্থোপার্জন চিন্তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তাঁকে পুরোপুরি সংগীত রচনায় ডুবে থাকতে সাহায্য করেছেন। বাংলা যাত্রার টিপিকাল সতী নারীও তাঁর সঙ্গে পতিসেবার প্রতিযোগিতায় ফেল মেরে যেতেন।

এঁদের দুজনের সম্পর্ক নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন : এই মহিলা শপাঁর জীবনে শনির দশায় রাহুর অন্তর্দশা। আবার অন্যমতে : জর্জ সাঁদ পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে না থাকলে শপাঁর আয়ুর ফিতেটা আরও আগে ছাঁটাই হত। হাওয়া বদল করতে অসুস্থ শপাঁকে ভূমধ্যসাগরে মাজোরকা দ্বীপে নিয়ে গেছেন। শপাঁ যক্ষ্মা রোগী জেনে হোটেলওয়ালা বলল ঘর ছাড়তে। শুধু তাই নয়। ঘর চুনকাম করার , মায় শপাঁর ব্যবহার-করা বিছানাপত্র পুড়িয়ে দেবার খরচও দিতে হবে। জর্জ সাঁদ দশভুজা হয়ে আন-অফিসিয়াল কর্তা, অফিসিয়াল ছেলে (আগের পক্ষের), মালপত্র নিয়ে উঠলেন খ্রিষ্টান সাধুদের এক মঠে। মান্ধাতার আমলের বাড়ি। রাত্তিরে প্রায় অন্ধকারে ডোবা। জর্জ সাঁদের স্মৃতিকথায় জানা যায় : এই বিশাল বাড়ির প্রতি কোণে শপাঁ ভূত দেখতে পেতেন। কখনও গুম হয়ে থাকতেন, কখনও বা ডিপ্রেশানের ঘন মেঘের মধ্যে একটু একটু হলদেটে আভা, আনন্দের। কখনও বা নিজের রচিত প্রেলিউড্ পিয়ানোয় বাজাতে বাজাতে কান্নায় ভেঙে পড়তেন। এই রকম ড্যাম্পধরা মন আর যক্ষ্মাজীর্ণ শরীরে এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় রচনা করেছেন এই প্রেলিউড্‌গুলোর মধ্যে একটি ঝকঝকে রত্ন, ১৫ নম্বরটি, 'রেনড্রপ'। অবশ্য ওই মঠে থাকার সময় আরও প্রেলিউড্ মনের থেকে নিয়ে স্বরলিপির ছকে বেঁধেছিলেন শপাঁ।

কিন্তু এই হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভবের সম্বন্ধ শেষপর্যন্ত ভেঙে যায়। তার পেছনে জর্জ সাঁদের বালক পুত্র মরিস-এর — সে এক 'আঁফাঁ তেরিবেল' — যথেষ্ট অবদান ছিল। সে তার মায়ের সঙ্গে শপাঁর এই ঘনিষ্ঠতা দু চোখে দেখতে পারত না। অবশ্য কোন ছেলেই বা পারে।

স্কটল্যান্ডে গিয়েছিলেন শপাঁ। সেখানে শরীর আরও খারাপ। অতি কষ্টে ফিরলেন প্যারিসে। যে যাত্রা একটু সামলালেও পরের বছর ১৮৩৯, ১৭ই অক্টোবর, তাঁর সৃষ্টি এবং প্রেম-অপ্রেমের নাগালের বাইরে চলে গেলেন, চিরদিনের জন্যে। মৃত্যুর পর তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে সিল্কের ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা খামের মধ্যে আরও কতগুলো চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। সেগুলো তাঁর আরেক পোলিশ প্রেমিকা মারিয়া ভড়্জিনস্কা এবং তাঁর মার কাছ থেকে পাওয়া। খামের ওপর শপাঁর নিজের হাতে পোলিশ ভাষায় লেখা ছিল — 'আমার দুঃখ'।

চাইকোভ্‌স্কি : নন্দন কাননে বাজপড়া গাছ

একটি বছর চারেকের বাচ্চা ছেলে রাতদুপুরে একবুক কান্না নিয়ে এক পাহাড় ঘুমের তলা থেকে বেরিয়ে এল। বাড়ির লোক 'কি হল, কি হল' বলে ছুটে এলে সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ; 'তোমরা সুর শুনতে পাচ্ছ না?' পিয়োতর চাইকোভ্‌স্কির জন্ম মস্কো থেকে ৬০০ মাইল দূরে, রাশিয়ার শিল্পাঞ্চলের এক ছোট শহরে। তিনি আর রবীন্দ্রনাথ; দুজনেরই এক জন্মদিন, ৭ই মে। চাইকোভ্‌স্কি একুশ বছরের বড়। সেই শিশুকালেই আবেগ আর অনুভূতির হাল্কা হাওয়াতে গাছের মগডালের কচি পাতাটির মতো

থরথর। কোনও দুঃস্বপ্ন তার ঘুম ভাঙায়নি; স্বর্গের গান হয়তো স্বপ্নের মধ্যে অসহ পুলকে তাঁকে কাঁপিয়েছে, কাঁদিয়েছে। এমনটা মধ্যে মাঝেই হত। স্বচ্ছল পরিবার। বাবা ইলিয়া খনি বিভাগের জেনারেল ম্যানেজার। মা আলেক্সান্দ্রা ফরাসি বংশের মেয়ে। তাঁদের ছটি সন্তানের মধ্যে পিয়োতর চাইকোভ্স্কি মেজো; শেষের দুজন — আনাতোলি আর মোডেস্ট — যমজ ভাই।

এই লেখার ভিত্তিভূমি চার গন্ধর্বের মধ্যে বয়েসে সবথেকে ছোট পিয়োতর-এর একদম ছোটবেলা থেকেই পিয়ানো নিয়ে অষ্টপ্রহর মেতে থাকাটা বাবা ইলিয়ার না-পসন্দ। বারণ করলে ছেলে টেবিলের ওপর তোলে শব্দহীন সুর। পিয়োতরের ১৪ বছর বয়েসে কলেরায় — এই রোগটি ইউরোপের আর কোথাও ছিল কি? — মার মৃত্যু তাঁর মনটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিল; এই শোকের রেশ বাকি জীবনেও পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি। মায়ের জায়গা নেবার চেষ্টা করল কিশোরী দিদি সাশা।

চাইকোভ্স্কি কিন্তু তাঁর তিন সংগীত অগ্রজের মতো ছোটবেলায় প্রতিভার তেমন কোনও বিস্ফোরণ দেখাননি; মোৎজার্ট-এর মতো 'চাইল্ড প্রডিজি' হওয়া তো অনেক দূরের কথা। কিন্তু তাঁর রক্তে সুর মেল ট্রেনের গতিতে সব সময় দৌড়োদৌড়ি করত। তাঁর লুকিয়ে-থাকা সংগীত প্রতিভা প্রথম নজরে আসে তাঁর গভর্নেস, সুইস্ বংশজাত ফ্যানি ডিউরবাখ্-এর। একদিন রাত্তিরে তিনি দেখেন তাঁর আগলে রাখা বালকটির বিছানায় দাঁড়িয়ে উত্তেজিত দাপাদাপি; তাঁর সঙ্গে চিৎকার করে স্বগতোক্তি — উঃ এই সুর, এই সুর আমাকে তিষ্ঠোতে দেবে না; সব সময়ে চক্কর খাচ্ছে মাথার মধ্যে।

ঠিক এই সময়েই চাইকোভ্স্কি-র জীবনধারা একটা বড় বাঁক নিল। বাবা পুরো পরিবারটি নিয়ে ভোট্কিন্স্ক নামের সেই ছোট্ট শহরটির পাট চুকিয়ে চলে এলেন রাজধানী সেন্ট পিটার্সবুর্গে। তখন চাইকোভ্স্কি আট বছরের। ছিঁড়ে গেল মমতাময়ী গভর্নেস ফ্যানির সঙ্গে সম্পর্ক; পেছনে প রইল বালকের অতি প্রিয় নিসর্গ জগৎ। তাঁকে ভর্তি করা হল বোর্ডিং স্কুলে। নরমসরম, অল্পেই আবেগ, অনুভূতিতে উথালপাথাল বালকের ওপর বোর্ডিং-এর ধাড়ি ছেলেদের উৎপাত। কিন্তু বাবা চান বড় অফিসারের ছেলেকে অফিসারই হতে হবে। তাই মুখ বুজে সবই মেনে নিতে হল। পরের নয় বছর গড়পড়তার চেয়ে ভাল কিন্তু নজর কাড়ার মতো কিছু নয় — এমন ছাত্র হয়ে টিকে রইলেন সেই স্কুলে। শিখলেন গান, পিয়ানো বাজনা, আর পাঁচটা ছেলে যেমন শেখে, তেমনই। তাঁর মায়ের মৃত্যুর পর লেখা প্রথম সংগীত রচনাটি নাপাত্তা। তবে পনেরো বছর বয়েসের কম্পোজিশানটি থেকে গেছে।

স্কুল থেকে বেরিয়ে বিচার বিভাগে একেবারে হরিপদ কেরানি হয়ে ঢুকলেন চাইকোভ্স্কি উনিশ বছর বয়েসে। বছর তিনেক চাকরি করে ধুত্তোর বলে কাজ ছেড়ে ভর্তি হলেন কনজারভেটরিতে (সংগীত মহাবিদ্যাপীঠ)। পিয়ানো শিখিয়ে, গানবাজনার ফরাসি বই রুশ ভাষায় অনুবাদ করে, কোনওমতে দিন গুজরান, আর সেই সঙ্গে সংগীত সৃষ্টি। মাঝে মাঝে চলে যেতেন দু বছরের বড় দিদি সাশার বাড়ি ইউক্রেন-এর কামেস্কা শহরে। সেখানে দিদি, ভগ্নীপতি লেভ্ ডাভিডভ্, আর তাঁদের তিন ছেলেমেয়ের সান্নিধ্যে দ্বিতীয়বার নিজের ঘর খুঁজে পেলেন। সেখানেই কম্পোজ করেছিলেন কতকগুলো নাচের সুর। তারই একটি ১৮৬৫ সালে পাভলোস্ক শহরের মুক্তমঞ্চে অর্কেস্ট্রায় পরিবেশিত হয়। এই প্রথম লোকসমক্ষে এলেন চাইকোভ্স্কি। এই অর্কেস্ট্রার কন্ডাক্টর ছিলেন 'ওয়ালজ্-এর সম্রাট' বলে খ্যাত ইয়োহান

স্ট্রাউস(ছোট)। এর পরে বিখ্যাত পিয়ানো বাজিয়ে আন্টন্ রুবিনস্টাইন-এর সুপারিশে তাঁর ভাই নিকোলাই রুবিনস্টাইন সদ্য স্থাপিত মস্কো কনজারভেটরিতে হার্মনি শেখানোর অধ্যাপকের চাকরি দিলেন ২৫ বছর বয়েসি চাইকোভ্স্কি-কে। মাইনে কুল্লে বছরে ৬০০ রুবল (আজকের ৫০ পাউন্ডের মতো)। নতুন প্রতিষ্ঠান, ভাল মাইনে দিয়ে নামিদামিদের টানবার ক্ষমতা নেই। এ কথা জেনে বাবা রেগে কাঁই। (তিনি চেয়েছিলেন ছেলে আইন পড়ুক)। মাইনে যাই হোক, পেশাদার সংগীতজ্ঞ বলে স্বীকৃতি পেলেন চাইকোভ্স্কি।

১৮৬১ সালে ভূমিদাস প্রথার(সার্ফ) অবলুপ্তির আগে থেকেই রাশিয়ায় কাউন্ট-ডিউক পরিবেষ্টিত জার শাসনের বিরুদ্ধে রুশ জাতীয়তাবাদের ঝাণ্ডা তুলে ধরা হল। (সে যুগের রুশ অভিজাতরা মাতৃভাষাকে চাকরবাকরের ভাষা জ্ঞান করে কথা বলতেন ফরাসিতে। ছেলে-মেয়েদের জন্যে বিদেশ থেকে নিয়ে আসতেন গভর্নেস।) এই আন্দোলনের ফসল পুশ্কিন্, টুর্গেনেভ, ডস্টয়েভস্কি-র মতো লেখক এবং 'বিগ ফাইভ' বলে কথিত সংগীতের পঞ্চপাণ্ডব — বালাকাইরেভ, 'বোরোদিন, সেজার কুই, গ্লিংকা এবং মদের নেশায় নিজেকে নিঃশেষ করে দেওয়া মহা প্রতিভাবান মুজোরোগ্স্কি। এঁদের জনমুখী সংগীতের সঙ্গে সমমর্মিতা থাকলেও একটু গা বাঁচিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ধারাটিকেই আঁকড়ে থেকেছেন চাইকোভ্স্কি।

সুরস্রষ্টা হিসেবে বেশ নাম হলেও, শ্যুবার্টের মতো স্বভাবলাজুক চাইকোভ্স্কি মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন না। তবু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এক বেলজিয়ান সোপ্রানো গায়িকা। (কণ্ঠসংগীতে সবচেয়ে চড়া স্কেলে, প্রায় পিকোলো বাঁশি বা লার্ক পাখির মতো স্বচ্ছন্দে — না চেঁচিয়ে — উঠতে পারেন যে গায়িকারা; আমাদের দেশে সম্ভবত নেই বা ছিলও না।) তিনি হলেন দেজিরে আর্তো। এঁকে চাইকোভ্স্কি 'প্রোপোজ' করেন, সাড়াও পান। একটা 'এনগেজমেন্ট'- গোছের হয়েও ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত টিকল না। চাইকোভ্স্কির গুণগ্রাহী হলেও দেজিরে চাননি নিজের পায়ে বেড়ি পরিয়ে মস্কোতেই—তখনও শহর হিসেবে আহামরি নয় — ঘরকন্না করতে। তাঁর তখন উঠতি কেরিয়ার। এক জায়গায় বসে গেলে তার বারোটা বাজা অনিবার্য। তাই প্রেমটা জমে ওঠার আগেই দেজিরে বেরিয়ে পড়লেন কন্সার্ট ট্যুরে; বিয়েও করলেন চার সপ্তাহের মধ্যে এক স্প্যানিশ ব্যারিটোন গায়ককে।

চাইকোভ্স্কি 'না, না, ও সব কিছুই না' বলে নিস্পৃহতার চাদর মুড়ি দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তখন তাঁর লেখা চিঠিপত্র ব'লে ভেতরে ভেতরে তিনি খুবই নিঃসঙ্গ। অথচ চাইতেন স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনযাপন করতে। এ সবই ঘটেছিল বছর পঁচিশেক বয়েসে। এ সময়ে লেখা একটি চিঠির আয়নায় তাঁর মানসিক অবস্থার প্রতিফলন: 'নিজেকে যেন পরিত্যক্ত বলে মনে হয়। যদি সুরসৃষ্টিতে নিজেকে ব্যস্ত না রাখতে পারতাম, তাহলে ডুবে যেতাম বিষাদের গভীরে। ভাবতে পারো আমার মনে হচ্ছে জীবনটাকে শেষ করে দিই, সব ছেড়েছুড়ে, সন্ন্যাসী হয়ে চলে যাই কোনও মঠে।'

পরের বছর ছোট ভাই মোডেস্ট-কে লিখছেন : আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি বিয়েটা এবার করে ফেলব। যে কোনও মেয়ে হলেই চলবে। আমি বুঝতে পারছি জীবনে আনন্দ লাভের পথে এই একাকিত্বই সবচেয়ে বড় বাধা....এই বছরের মধ্যেই বিয়েটা যে করে পারি, করেই ফেলব। যদি এমন হয় যে ততটা সাহসী হতে পারলাম না, তাহলে চেষ্টা করব আমার মধ্যে যে অবাঞ্ছিত প্রবণতা আছে, সেটা অন্তত ত্যাগ করতে।'

এই 'অবাঞ্ছিত প্রবণতা' কথা দুটির মধ্যে চাইকোভ্স্কি-র এমনিতে অত্যন্ত মার্জিত,

সুভদ্র চরিত্রের 'অ্যাকিলিস-এর গোড়ালি'-টি বেরিয়ে পড়েছে : চাইকোভ্স্কি ছিলেন সমকামী বা আজকের লবজে 'গে'। তাও সেই উনবিংশ শতাব্দীর যাটের দশকে। (অস্কার ওয়াইল্ড-এর দুর্গতির কথা স্মর্তব্য।)

১৮৭৭ সালে, চাইকোভ্স্কি ৩৭ বছরের আইবুড়ো। কম পয়সার চাকরি হলেও কনজারভেটরিতে খাটনি প্রচুর। তা ছাড়া নিজের কাজ তো আছেই। আর আছে নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা। চাইকোভ্স্কি-কে দেখায় যেন প্রায় বছর পঞ্চাশের বুড়ো। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্যাসিমির-কে বলেছেন : 'আমার যা প্রয়োজন তা হল একজন বয়স্কা কুমারী বা বিধবা, যার উদগ্র কামনায় আবিষ্ট হবার ভান করতে হবে না।'

এই করুণ আর্তির মূলে, যেমন-তেমন দেখতে, যা হোক বয়েসের কোনও নারীর কাছে নিছক মানসিক আশ্রয় প্রার্থনা, শারীরিক সম্ভোগের বাসনা নয়। পরোক্ষ অর্থ — চাইকোভ্স্কি হয় সমকামী মনোভাব ছাড়তে পারেননি নয় এই প্রবণতা তাঁর নারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধের ক্ষমতাটাই নষ্ট করে দিয়েছে। এবং সে অক্ষমতা শারীরিক, মানসিক দুদিক দিয়েও হতে পারে। এর অল্প দিন পরেই তাঁর জীবনে দ্বিতীয় এবং শেষ নারীর আর্বিভাব, যা তাঁর অতীব অসুখী জীবনকে আরও বিধ্বস্ত করে দেয়।

তাঁর এক তরুণী ছাত্রী অ্যান্তোনিয়া মিলিউকোভা তাঁকে একের পর এক প্রেমপত্রাঘাতে জর্জরিত করতে থাকেন। চাইকোভ্স্কি পড়লেন মহা ফাঁপরে। সেই যে কথায় আছে না — তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তুমি হাতে এনে দিলে আধখানা বেল। চাইকোভ্স্কি তো আসলে চেয়েছিলেন — যা কেউ চায় না — ওই আধখানা বেলই; পরিষ্কার জল তো তাঁর কাম্য ছিল না। এদিকে সে মেয়ে তো বিয়ের জন্যে ক্ষেপে উঠেছে। চাইকোভ্স্কির 'আমায় ক্ষ্যামা দাও'-এর জবাবে বলে — তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। তখন চাইকোভ্স্কি চেতাবনি দিলেন নিজের মারাত্মক দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে — আমার কিন্তু আচার-আচরণ একটু 'অদ্ভুত ধরনের।' তাতেও সে বিয়েতে পিছপা নয়। ফলে অবধারিত ভাবেই ঘটল সেই দুর্ঘটনা : অ্যান্তেনিয়ার সঙ্গে চাইকোভ্স্কি-র তথাকথিত বিয়ে। আসলে মেয়েটাই পাগল ছিল, মানসিক ভারসাম্যহীন তো বটেই। তার ঠিক পরেই ঘোর দুর্বিপাক।

বিয়ের নাগপাশে তখন চাইকোভ্স্কি-র দমবন্ধ অবস্থা। ওদিকে সেন্ট পিটার্সবুর্গে দীর্ঘকাল বিপত্নীক বৃদ্ধ বাবা ইলিয়া একটি সাদাসাপটা চাষির মেয়েকে কিছুকাল আগে বিয়ে করে দিব্যি জীবনে বিলম্বিত বসন্তের মৌতাতে। আর বয়েসে ন'বছরের ছোট স্ত্রীর নাগালের থেকে একেবারে বাইরে চলে যাবার জন্যে মস্কোয় চাইকোভ্স্কি নেভা নদীর বরফ-ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবে রইলেন বেশ কিছুক্ষণ। ভেবেছিলেন নিউমোনিয়া বাঁধিয়ে মরলে লোকে আত্মহত্যার কথা ভাববে না। বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বললেন পা পিছলে জলে পড়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যটা এতই মজবুত যে হাঁচিটি পর্যন্ত হল না। ছোট ভাই আনাতোলি-এর সাহায্যে ছুতো করে মস্কো থেকে পালিয়ে গেলেন সেন্ট পিটার্সবুর্গ। সেখানে আনাতোলি তাঁকে নিয়ে গেল হোটেলে। সেখানে টেনশান থেকে আচমকা মুক্তি পেয়ে দু দিন পুরোপুরি কোমা-য় আচ্ছন্ন। ডাক্তার বললেন হাওয়া বদলাতে। কিন্তু বিয়েটা ভাঙা দরকার, যদিও তার কোনও রেডিমেড উপায় নেই।

ছোট ভাই আনাতোলি আর চাইকোভ্স্কি-র কর্মস্থান কনজারভেটরির অধ্যক্ষ অনেক বুঝিয়ে অ্যান্তোনিয়া-কে দূরে কৃষ্ণ সাগরের পারে ওডেসা শহরে যেতে অনুরোধ করলেন। এবং অ্যান্তোনিয়া রাজিও হয়ে গেলেন; সম্ভবত বুঝেছিলেন বিনি সুতোয় গাঁথা এই দাম্পত্য সম্পর্ককে আর টিকিয়ে রাখা যাবে না। তার স্বপক্ষে এটুকু বলা যায় যে যতটা ফ্যাসাদে তিনি চাইকোভ্স্কি-কে ফেলতে পারতেন, তার কিছুই করেননি। কিন্তু মধ্যেমাঝেই চলে আসতেন চাইকোভ্স্কির কাছে; চিঠিপত্র তো লিখতেনই। ওপর-ওপর ডিভোর্সে রাজি হলেও, ব্যাভিচার, যার ছুতো ছাড়া বিয়ের বাঁধন আইনত খোলা যায় না, এই অভিযোগ মানতে তিনি একেবারেই নারাজ। কিন্তু অ্যান্তোনিয়া নিজেই কামনাতাড়িত হয়ে স্বামীর সঙ্গ ছাড়াই একাধিকবার সন্তানের জন্ম দিলেন। মাথাটা, এমনিতেই খারাপ, দিন দিন আরও বিগড়োতে লাগল। কিন্তু চাইকোভ্স্কি-র নামে বেফাঁস কিছু বলেননি। জীবনের শেষ ২০ বছর এই অসম ভালবাসার দাম তিনি মিটিয়েছিলেন মানসিক চিকিৎসালয়ে থেকে। চাইকোভ্স্কি-র জীবনে দুঃখের কালো হাওয়া এই দুর্ভাগা নারী নিজেও কম কষ্ট পাননি। সহানুভূতির দীর্ঘশ্বাস তাঁর অবশ্যই পাওয়া উচিত।

বিয়ে নিয়ে দুর্বিপাকের মধ্যেই অদৃষ্ট চাইকোভ্স্কি-র জীবনে নিয়ে এল শেষ বসন্তের উপচার। তাঁর সেই 'একটুকু ছোঁওয়া' তাঁর কাছে অসহ্য গুমোটের পর ভোরের মৃদু ঠাণ্ডা বাতাস। কিন্তু সেই ভোরের নরম আলোর আর বয়েস বাড়ল না, যদিও চাইকোভ্স্কির সংগীত প্রতিভাকে একেবারে মধ্যাহ্ন সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিল তাঁর সেই লঘু অনুষঙ্গ। শরীরে, মনে বিধ্বস্ত চাইকোভ্স্কি অজস্র সৃষ্টির মধ্যে মেতে থেকে আবার নতুন করে পেলেন বেঁচে থাকার মানে। পরের অনেকগুলো বছর।

কোনওদিন চোখের সামনে না এসেও এক বিচিত্ররূপিনী সংগীতপ্রেমী নারী চাইকোভ্স্কি-কে দিলেন এতদিন ধরে কাঙ্ক্ষিত মানসিক আশ্রয়। শুধু তাই নয়। বাড়তি পাওনা বছরের পর বছর অপ্রত্যাশিত আর্থিক নিরাপত্তা। চাইকোভ্স্কি-র চির অদেখা কিন্তু গভীর ভাবে সংশ্লিষ্ট মর্মসঙ্গিনী হলেন মাদাম নাদেঝ্দা ফন্ মেক্। ধনী এক রেল কোম্পানির মালিকের বিধবা স্ত্রী। নিজে পিয়ানো বাজিয়ে, বারোটি সন্তানের জননী, (বারো নম্বরটি তাঁর স্বামীর সেক্রেটারির ঔরসজাত) বয়েসে চাইকোভ্স্কি-র চেয়ে ন' বছরের বড় এই রমণী স্বভাব বৈচিত্র্যে শপাঁর সঙ্গিনী জর্জ সাঁদ-এর পকেট সংস্করণ বিশেষ।

স্বামী বেঁচে থাকতে মাদাম ফন্ মেক্-এর পিয়ানোর সঙ্গে বেহালা বাজাতেন। স্বামীর অবর্তমানে সেই বেহালা বাজিয়ের ফাঁকটা বোজাতে চিঠি লেখেন চাইকোভ্স্কি-কে, এক সংগীতজ্ঞের সুপারিশে। চাইকোভ্স্কি সে ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে করেও দেন। বিনিময়ে পেলেন মাদাম ফন্ মেক্-এর কাছ থেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ধন্যবাদ। তার জবাবে চাইকোভ্স্কি-র চিঠি। এমনিতে খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন ছাড়া চিঠিপত্র বিশেষ লিখতেন না। কিন্তু এই প্রাথমিক দুটি ফর্মাল চিঠির উত্তরে বিনা প্রয়োজনে চাইকোভ্স্কি-র এই চিঠিটাই তাঁর জীবনের এক সিংহ দরজা খুলে দিল। শুরু হল এক অফুরন্ত চিঠি চালাচালি। প্রথম-প্রথম মাদাম ফন্ মেক্ চাইকোভ্স্কি-কে দিতেন নিত্য নতুন কম্পোজিশানের ফরমাশ। পারিশ্রমিক দিতেন প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি। শেযে একদিন মাদাম লিখলেন — এবার থেকে তিনি বছরে ছ'হাজার রুবল 'মাইনে' — চাইকোভ্স্কি-র স্থায়ী চাকরিতে পাওনার দশগুণ — দেবেন। ফরমাশি কম্পোজিশানের জন্যে অনিয়মিত ভাবে টাকা দেবার বদলে পাকা ব্যবস্থা। তবে শর্ত একটাই : দুজনে কেউ কখনও সামনাসামনি হবেন না। চাইকোভ্স্কি তাই করেছেন; কারণ-জানতে চাননি।

এই অসাধারণ পত্রসাহিত্যে (পরে সম্পাদিত হয়ে বইয়ের চেহারা নিয়েছে) সংগীত, বিশেষ করে চাইকোভ্স্কির রচনা নিয়ে মাদামের মন্তব্য, ছাড়াও ধর্ম থেকে আবহাওয়া পর্যন্ত নানান বিষয়ের উল্লেখ থাকত। কিন্তু থাকত না প্রত্যক্ষভাবে প্রেমের ইঙ্গিত। দুজনেই আসলে নিঃসঙ্গ, দুজনের জীবনেই চাওয়া, গভীরভাবে চাওয়া, প্রত্যাশা, স্বপ্নভঙ্গ, হতাশা—এ সব ধারাবাহিকভাবে ঘুরেফিরে এসেছে। লাভটা বেশি হয়েছে চাইকোভ্স্কি-র। আর্থিক নিরাপত্তা ছাড়াও পেয়েছেন মানসিক আবেগের সুস্থিতি, সমমর্মী এক কর্ষিতচিত্ত রমণীর প্রায় নিকট-সান্নিধ্য। একে অন্যের অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবের মাটিতে নামালে যদি এই সম্পর্কে ধুলোমাটি লাগে, এই আশঙ্কা দুজনেরই ছিল। তাই ঘটনাচক্রে কখনও সামনাসামনি হলেও — একই শহরে বাস — একে অন্যকে না চেনার ভান করে এড়িয়ে গেছেন। এই কি তাহলে প্লেটোনিক প্রেম? হবেও বা।

মাদাম ফন্ মেক্-এর আর্থিক আনুকূল্যে চাইকোভ্স্কি দশ বছরের পুরোনো চাকরিটা ছেড়ে দিলেন ১৮৭৮ সালে। কলেজ অবশ্য তার আগে পুরো মাইনেয় এক বছরের ছুটি দিয়েছিল। আসলে হার্মনি শেখাতে শেখাতে ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলেন। মাদামের পরোক্ষ অস্তিত্বের প্রেরণায় সে বছরেই শেষ করলেন তাঁর একটি সেরা কাজ — বিশ্বের সব সেরা অপেরাগুলোর অন্যতম, 'ইউজিন্ ওনেগিন' আর চার নম্বর সিম্ফনি। এর আগে সুইজারল্যান্ডে ছুটি কাটাতে গিয়ে লিখেছিলেন একটি পিয়ানো সোনাটা এবং আজও পৃথিবীর তাবৎ সেরা বেহালা বাজিয়েদের প্রিয়, ভায়োলিন কনচের্টো ইন্ ডি মেজর। চার নম্বর সিম্ফনিটি উৎসর্গ করেছিলেন মাদাম ফন্ মেক্-কে। অনেক দিন গেল নতুন সংগীত রচনায়, কখনও কখনও বিদেশ ভ্রমণে (দেশের বাইরেও তখন প্রচুর নামডাক) এবং অবশ্যই মাদাম ফন্ মেক্-কে নিয়মিত চিঠি লেখায় আর তাঁর কাছ থেকে জবাব পাওয়ায়।

এমনি করে তেরোটা বছর চলে গেল। হঠাৎ একদিন মাদাম লিখলেন : তিনি আর টাকা পাঠাতে পারবেন না। অবশ্য ততদিনে চাইকোভ্স্কি-র অর্থাভাব ঘুচে গেছে। টাকার দরকার তেমন নেই। সে কথা জানিয়ে তিনি লিখলেন — টাকার দরকার নেই, কিন্তু চিঠি লেখায় যেন ভাঁটা না পড়ে। কিন্তু এই প্রথম 'ও পারে নীরব কেন কুহু হায়' — তাই হল। তারপর থেকে একেবারে পাথুরে নীরবতা। আর কখনও সাড়া পাওয়া যায়নি, চোখে দেখার তো কথাই ছিল না। চাইকোভ্স্কি-র মৃত্যুর পরের বছর মারা যান মাদাম ফন্ মেক্।

এর মধ্যে আমেরিকা ঘুরে এসেছেন চাইকোভ্স্কি। নিউ ইয়র্কে সদ্য-তৈরি কার্নেগি হলে পরিবেশিত হয়েছে তাঁর রচনা। আমেরিকানরা প্রশংসার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। কিন্তু 'সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে।' তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছিলেন চাইকোভ্স্কি। বয়েস যখন ৫০, দেখায় ৬০। গেল আরও তিন বছর। মাঝে মাঝে রচনার মধ্যে ফুটে উঠছে ক্লান্তির ছাপ। তবু ওরই মধ্যে সমাপ্ত করলেন জীবনের শেষ বড় কাজ — 'বি মাইনর সিম্ফনি'-যেটির নম্বর ছয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গে চাইকোভ্স্কি আছেন ছোট ভাই মোডেস্ট-এর বাড়ি। দিন পাঁচেক আগে তাঁরই নির্দেশনায় এই সিম্ফনিটি পরিবেশিত হয়েছে। ভাই মোডেস্ট-এর সঙ্গে চাইকোভ্স্কি আলোচনা করছিলেন এই সিম্ফনিটির কি নাম দেওয়া যায়। ভাই বললেন ট্র্যাজিক্। পছন্দ হল না। পরে নিজের হাতে ফরাসিতে লিখেছিলেন — 'পাথেতিক'। এর সঙ্গে ইংরেজি শব্দ 'প্যাথেটিক'-এর ধ্বনিগত মিল থাকলেও, দুটি শব্দ সমার্থক নয়। পরে এই নামটিও নামঞ্জুর করেন।

একদিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গেলেন। দুপুরবেলা বাড়ি ফিরে গরম করে জীবাণুমুক্ত না-করা এক গেলাস জল খেলেন ঢক্ ঢক্ করে। ভাই, আর ছিল যারা, হাঁ হাঁ করে বারণ করা সত্ত্বেও। দেখা গেল কলেরার লক্ষণ। ডাক্তার বললেনও তাই। চলে গেলেন দিন কয়েক ভুগে, ৬ই নভেম্বর, ১৮৯৩। বোধহয় জীবনেই ক্লান্তি এসে গিয়েছিল তাঁর। অসুস্থ অবস্থায় বলেও ছিলেন : 'যেতে হলে অন্য রোগের থেকে কলেরায় মরাই ভাল।' আশ্চর্য সমাপতন — মা, ছেলে দুজনেরই কলেরায় মৃত্যু।

আমাদের দেশে শতকরা প্রায় একশো ভাগ শ্রোতাই পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গসংগীত সম্বন্ধে অনুৎসাহিত। তবু তাঁরা টেলিভিশনে প্রদর্শিত নানান জিনিসের বিজ্ঞাপনে — বিশেষ করে যেগুলি দামি — নিজেদের অজান্তেই শুনে ফেলেন বীঠোফেন, মোৎজার্ট, চাইকোভ্স্কি, ভিভাল্ডি-র রচনার এক-আধ চিলতে। তার মধ্যে 'শ্লিপিং বিউটি' ব্যালে-র একটি ওয়াল্জ্-এর সুর প্রায়ই বাজে। আসলে 'সোয়ান লেক' আর 'শ্লিপিং বিউটি' এই দুটি ব্যালে-র মধ্যে চাইকোভ্স্কি লিখেছেন সুরের কবিতা। আর 'দ্য নাট্ক্র্যাকার'-এর মধ্যে দিয়ে টুকরো টুকরো মজার ছড়া।

লেখকের নিবেদন : এই লেখায় ব্যবহৃত নানান বিদেশি নাম এবং শব্দের উচ্চারণে যদি কোনও ত্রুটি — অবশ্যই অনিচ্ছাকৃত — থেকে গিয়ে থাকে, তাহলে জ্ঞানীগুণী পাঠকেরা মাপ করে দেবেন। অনেক শব্দের টীকা ইচ্ছে করেই দিইনি। বিষয়ান্তরে গেলে লেখাটি আরও বড় হত, সম্পাদক রুষ্ট হতেন।

অধিকার হরণ

কল্যাণী দত্ত

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জগতে নিঃসন্দেহে একজন দিকপাল। ঢাকা থেকে বৃহত্তর ভারতের (দু'খণ্ডে সুবর্ণদ্বীপ) দিয়ে তাঁর যাত্রা শুরু। 'হিস্ট্রি অ্যান্ড কালচার অফ দি ইন্ডিয়ান পিপল', এগারো খণ্ডে সম্পাদনা বোধহয় তাঁর বৃহত্তম কাজ। পুত্র অশোক কুমার পিতার গ্রন্থাদির সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। অশোককুমার গুর্জর প্রতিহার যুগ নিয়ে গবেষণা ও গ্রন্থ রচনা করে ভারতীয় বিদ্যাভবনের কানহইয়া লাল মুন্সির স্নেহ ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। আমাদের বাড়ীতে দাদা বিনয়কৃষ্ণের কাছে তাঁর যাতায়াত ও পত্র ব্যবহার দুই নিয়মিত ছিল। রমেশচন্দ্রের সুদীর্ঘ জীবনে বিদ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খ্যাতি, প্রতিপত্তি এবং ধনাগম সবই বর্ধিত অঙ্কে শীর্ষে স্থান পায়। রমেশচন্দ্রের একাধিক কন্যা থাকলেও তাঁর পুত্র একটিই, তাতে জননী প্রিয়বালা দেবী হঠাৎ বংশরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে সন্তানহীন পুত্রকে দ্বিতীয়বার বিবাহের জন্য অনুরোধ করলেন। পুত্র এই সামান্য কারণে বিবাহিতা পত্নী ত্যাগ করতে কোনরূপে সম্মত হলেন না। তখন তাঁর জননী অর্থলোভ দেখালেন অর্থাৎ বিবাহ না করলে পিতার সম্পত্তির অধিকারচ্যুত হতে হবে এমন। ত্যাজ্যপুত্র করবেন এমন কথা পিতাকে দিয়েই বলালেন। অশোক তাতেও সংকল্পচ্যুত হলেন না, বিপিন পাল রোডের মস্ত বড় বাড়ির মায়া ছেড়ে শান্তিনিকেতনে অতি ক্ষুদ্র বাড়িতে (কর্ণিকায়) রইলেন দীর্ঘকাল। সেখানে তাঁর একাগ্র বিদ্যাচর্চা আর স্ত্রীর অনুক্ষণ সেবা নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। রমেশ মজুমদারের মৃত্যুসংবাদ দৈনিক কাগজে এভাবে বেরোয় যে দেশমান্য পিতার শেষকৃত্য করতেও পুত্র আসেননি, তিনি নিভৃত অবসর জীবনযাপন করছেন। অশোক পিতার মৃত্যুর পরে বিনয়দাকে বলেন — বাবা তাঁর বাড়ি বা মা তাঁর অলংকার মেয়েদের দেবেন এ তো জানাই ছিল কিন্তু বাবা বইগুলো আমাকেই দিয়ে যেতে পারতেন — তাও দিলেন না। একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং দেশমান্য ঐতিহাসিক স্ত্রীর বশ হয়ে নিজের জেদ এবং অকারণে ছেলের অধিকার হরণের যে দৃষ্টান্ত রাখলেন তাতে রাজা দশরথের বৃত্তান্ত আবার মনে পড়ে।

আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর জীবিতকালেই দেশের সর্বত্র শ্রদ্ধাভক্তি অর্জন করেন। তাঁর আত্মচরিতের মতো সুখপাঠ্য বই সে যুগে অল্পই ছিল। বালক বয়েসেই তাঁর বিবাহ হয়, স্ত্রীর নাম প্রসন্নময়ী। শিবনাথের পিতা হরানন্দ বিদ্যাসাগর, প্রসন্নময়ীর পিতৃকুলের দোষ আবিষ্কার করে পুত্রের আবার বিবাহ দেন, এই স্ত্রীর নাম বিরাজমোহিনী। দুই স্ত্রীকে নিয়ে একগৃহে বাস করার সংকটের কথা আত্মচরিতে স্পষ্টভাবে লেখা হয়েছে। নিজে সংসারী হবার পর শিবনাথ প্রসন্নময়ীকেই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন। প্রসন্নময়ীর সমাজসেবা, ঔদার্য, সন্তানবাৎসল্য, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি নানা গুণের কথা আত্মচরিতের অনেকগুলি পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। শিবনাথ বিরাজমোহিনীর পুনরায় বিবাহ দেবার প্রস্তাব করলে, বিরাজমোহিনী দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর পিতৃগৃহের আশ্রয় দৃঢ় ছিল না, অগত্যা শিবনাথের গৃহে প্রসন্নময়ীর সঙ্গিনী হয়েই তাঁকে থাকতে হয়। যদিচ বিরাজমোহিনীর নিজের বিবাহে কোনও দায়িত্ব বা অধিকার ছিল না তবু তাঁর একাকিত্ব নিয়ে শিবনাথ কোনও দিন চিন্তিত ছিলেন না। প্রসন্নময়ীর মৃত্যুর পরে শিবনাথ যখন তাঁকে পত্নীভাবে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তখন তা প্রত্যাখ্যান করে তিনি যথেষ্ট শক্তি ও মনোবলের পরিচয় দেন।

এখন যে উপেক্ষিতা মহিলার কথা বলতে যাচ্ছি তাঁর জন্ম উত্তরপ্রদেশে। ত্রিপিটকাচার্য সমাজবাদী দার্শনিক রাহুল সাংকৃত্যায়নের তিনি প্রথম পত্নী। এগারো বছর বয়েসে আজমগড় জেলার পন্দহাগ্রামে রীতিমতো মিছিল করে রাহুল বিয়ে করতে যান। এই বিয়েকে রাহুল সারাজীবন উচ্চকণ্ঠে অস্বীকার করে নিজের বিবেককে সুস্থ এবং পরিচ্ছন্ন রাখতে চেয়েছেন, কিন্তু কার সঙ্গে লড়াই? রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং ব্রাহ্ম-আন্দোলনের কারণে কলকাতা এবং বঙ্গভূমির শহর অঞ্চলে শিক্ষিত হিন্দু পরিবারে দশ-এগারো বছরের ছেলেদের বিয়ের কথা তেমন শোনা যেত না, কিন্তু সরযূ নদী পেরিয়ে আজমগড় অঞ্চলে বাল্যবিবাহ খুবস্বাভাবিক ঘটনা। বিশেষত ওই সব ক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার বা দায়িত্ব বলতে বিন্দুবিসর্গ কখনওই ছিল না। এই অবস্থায় বিয়ের তিরিশ বছর পরে কৃতী ও সুপণ্ডিত হয়ে নিজের গ্রামে ফেরার পরে একটি আপাদমস্তক কাপড়ে মোড়া স্ত্রী-মূর্তি যখন তাঁর পায়ের ওপর পড়ে তখন রাহুল তাকে বিশ্বসংসারের অচ্ছুত জ্ঞান করলেন কেন? কোন অধিকারে? নিরুপায় মেয়েটিকে সর্বসমক্ষে তিনি স্ত্রী বলে স্বীকার না করে বললেন — এই ছেলেখেলার বিয়ের কোনও দায়িত্ব তিনি নেবেন না। দায়িত্ব কি তবে এ মেয়েটিরই ছিল? মেয়েটি কিছু টাকা চায়, তীর্থযাত্রার কড়ি। রাহুল তাও দিলেন না। মাসোহারা দেওয়া দূরের কথা একবার মাত্র থোক টাকা দিলে তাঁর মহাভারত অশুদ্ধ হত কি? রাহুল রাশিয়ায় গিয়ে লোলাকে আর প্রায় শেষ জীবনে প্রাইভেট সেক্রেটারি (কমলা দোরজি) নেপালি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন সেসব কথা সকলেরই জানা। সরল গ্রাম্য পিতৃকুল শ্বশুরকুলে আশ্রয়হীনা নামগোত্রহীন এই মেয়েটিকে দয়া করতে তাঁর ভাঁড়ার শুকিয়ে গেল! এই কি এঁদের সাম্যবাদ আর সমাজবাদ! সংসারে শত শত অনাদৃতা বা উপেক্ষিতা মহিলা ছিলেন, আছেন বা থাকবেন। সাধুসন্তেরা যখনই গৃহত্যাগ করেন তখনই তাঁদের পত্নীরা সঙ্গীহীন অনাদৃত জীবনযাপনে বাধ্য হন। তবে আধুনিক কালে চিন্তাশীল বিবেকী মানুষদের দায়িত্বহীন হতে দেখলে মানুষ দুঃখ পায়। স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা একই কথা, পিতৃগৃহে মর্যাদাহীন হয়ে বিনা মাইনের সেবিকা ছিলেন তাঁরা।

শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ীদেবীর মুখের কথা একটু বলি। একবার তাঁর কোনও ভগ্নীপতির ক্ষয়রোগ হয়। ছোঁয়াচের ভয়ে কচি ছেলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী সরে এলেন। তখন দূর পাহাড়ে বাঙালি মেয়েরা সেবা করতে যেতে চাইতেন না। লেখিকার মা ব্যবস্থা দিলেন — 'জ্যোতু যাক, ওর যদি কিছু হয় ওর ছেলেমেয়েদের তখন আমরাই দেখব।'

আমাদের নিজেদের ঘরেও তাই দেখেছি — স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে আমাদের ঘরে মুরলা এলেন কিন্তু তাঁর ডাইনে বাঁয়ে দুই বিত্তবতী এবং সন্তানবতী ভগ্নী। তাদের অসুখেবিসুখে, সেবা পরিচর্যায় আর সন্তান পালনে মুরলার জীবনের বারো আনাই ক্ষয়ে যায়। দুঃখী মেয়ে

তো দুঃখ পাবেই, ভগবান যার কপালে যা লিখেছেন। মায়ের ওপর কর্তব্য থাকে ছেলেদের, যে মাসি মানুষ করে খাওয়া-দাওয়া ভুলে, রাতের পর রাত জাগে সে তখন ধাইমার মতো অপরিহার্য, তারপর?

সেকালে কিছু টাকা হাতে ধরিয়ে কাশী পাঠিয়ে দেওয়া হয়তো এর চেয়ে ভাল ছিল। কোনও প্রত্যাশা ছিল না মাসকাবারের। ঘুরে-ফিরে, পরের বাড়ি রেঁধে-বেড়ে বেশ পাকাপোক্ত হয়ে যেতেন সেই মহিলারা।

এ যুগে অধিকার কতটুকু আর কী পর্যন্ত, তার বিচারের মাপকাঠি হয়তো আলাদা।

(পুনর্মুদ্রণ)
প্রথম প্রকাশ
বিভাব - ৬৪তম সংখ্যা
শীত সংখ্যা ১৪০২/
অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৫

পাখির সঙ্গে

উৎপলকুমার বসু

[এই লেখাটি বিখ্যাত পক্ষী বিশারদ অজয় হোমের ‘চেনা-অচেনা পাখি’ গ্রন্থটি প্রসঙ্গে উৎপলকুমার বসু লিখেছিলেন প্রায় এক যুগ আগে। লেখাটি উৎকর্ষে অভিনব, রম্যরচনার চমৎকার নিদর্শন — **সম্পাদক**]

পাখি বলতে দু-টি। আমার একালীন সময়ে। অর্থাৎ দুই প্রকারের পাখি — কাক ও চিল। কেননা, আমি শহরে থাকি। এবং ফ্ল্যাটবাড়িতে।

ওরা আসে। চিল বসে কার্নিশে। কখনও তাদের দেখি উষ্ণ বাতাসে শুধু ডানা মেলে বাজারের ওপরে, রেল স্টেশনের মাথায় পাক খাচ্ছে। তারও ওপরে ওড়ে শকুন। ‘সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে শকুনেরা উড়িতেছে....’ জীবনানন্দ লিখেছিলেন। এত নিচু থেকে তাদের ঠিক ঠাহর হয় না।

আমাদের ফ্ল্যাট বাড়িতে একটি রহস্য-পাখি আছে। বাস্তুপাখি বলা যায়। একটি চড়াই। সে একাই আসে। পাড়ার বিড়াল দুটো চলে যাওয়ার পর। দুপুরের দিকে জানলা গলিয়ে টুক করে নেমে পড়ে রান্নাঘরে। তারপর হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে পড়ে শোয়ার ঘরে। যায় বারান্দায়। খুব যে কিছু খেতে-টেতে এসেছে বলে মনে হয় না। যেভাবে ঘাড় ফিরিয়ে চারদিক দেখে, তাতে সে খোঁজখবর নিতে এসেছে বলে আমার ধারণা। বাড়িতে কেউ নেই। এক আমি ছাড়া। ভোটার লিস্ট চেক করতে আসে না তো? যাই হোক, আমি পা টিপে-টিপে ওকে অনুসরণ করি। সেদিন হুমড়ি খেয়ে পড়লাম এক চেয়ারের গায়ে। পাখি তো ওদিকে ফুড়ুৎ। আমি হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছি। পাখিকে কখনও নকল করতে নেই।

আমার চেয়েও অনেক বেশি হতভাগ্য পক্ষী অনুকরণকারী ছিলেন গ্রিক বীর ইকারুস। তিনি পাখির মতো উড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশেষ দোষ নেই যদিও। বাবা ডেডালাস এবং ছেলে ইকারুসকে বন্দি করেছিলেন মিনোস। বাপ-ব্যাটায় বুদ্ধি করলেন উড়ে পালাবেন। প্রচুর পালক জোগাড় হল। মোম দিয়ে সেগুলো জুড়ে জুড়ে ডানা বানানো হল। দুজনে উড়লেন। কিন্তু ইকারুসকে ওড়ার নেশায় পেয়ে বসল। তিনি উড়তে উড়তে সূর্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেন। আর, প্রচণ্ড তাপে সব মোম গলে গেল। উনি তখন পপাত ধরণীতলে। বোকা ইকারুস।

পাখি নিয়ে আমাদের, বাঙালিদেরও, তো কিছু কম হল না। পায়রা উড়িয়ে অনেক বনেদি জমিদার ফৌত হয়ে গেলেন। বাগবাজারের ‘পক্ষীর দল’-এর একজন, কথিত আছে, গাঁজাগুলি খেয়ে নিজেকে পাখি ভেবে উড়তে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে হাত-পা ভাঙলেন। উনি উত্তর কলকাতার ইকারুস।

এ সব পুরনো দিনের গল্পকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না। পাখিরা মানুষকে দিয়ে করিয়ে নিতে না পারে হেন কাজ নেই। পাঁচশো বছর পর পর চিতার ছাই থেকে জেগে ওঠে ফিনিক্স পাখি। মানুষই তাকে পুড়িয়ে দেয়। সে আবার জন্ম নেয়। পণ্ডশ্রম আর কাকে বলে! তাছাড়া, এই তো সেদিন ক্ষীর নদীর কূলে খোকার ছিপ কে কেড়ে নিল? চিল-ই তো। নিরন্ন চাষির ভিটেয় কোন পাখি চরে বেড়ায়? ঘুঘু-ই-তো। হায়, লোভী বুলবুলিদের জন্য এক গৃহবধূর

শেষ পর্যন্ত খাজনা দেওয়া হল না। আর সেই ল্যাজঝোলা পাখিটি কি ছেলেকে ঘুম পাড়ানোর মতো সামান্য কাজ করতে রাজি হয়েছিল — তাকে খাবি দাবি, কলকলাবির আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও? বোধহয়, না। পাখিরা অবাধ্য।

অনেক পাখি আবার ছদ্মবেশ ধরে। ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের কথা তো সবাই জানেন। তাদের না চিনলে বিপদ। আবার চিনলেও সমস্যা কম নয়। তখন তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। যেমন ধরুন, বকরূপী ধর্মের চালাকিটা। যুধিষ্ঠির তার প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছিলেন। কিন্তু সবাই তো আর জ্ঞানগম্যিতে যুধিষ্ঠির নয়। ধন্যবাদ বিনয় মজুমদারকে। তিনি আমাদের প্রবোধ দিয়েছেন এই লিখে যে — 'মানুষ নিকটে গেলে/ প্রকৃত সারস উড়ে যায়....'। সম্ভবত, জাত পাখি কিনা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়ার ওইটিই একমাত্র উপায়।

পাখির খুব নিকটে গেছেন কিন্তু অজয় হোম মশায়। তিনি যথার্থ পক্ষীবিশারদ। হয়তো, পাখিরাও ওঁকে চেনে। ওঁর 'বাংলার পাখি' পড়ে একদা মুগ্ধ হয়েছিলাম। 'চেনা-অচেনা পাখি' তারই পরিপূরক গ্রন্থ। মুগ্ধতা আরও বাড়ল। আপনারা যদি আমার মতো টিয়া-চন্দনায় তফাত না করতে পারেন, আপনাদের যদি কাক-কোকিল জ্ঞান না থাকে, তবে এই বইটির শরণ নিন:

'(টিয়া)-পশ্চিমবঙ্গের এই সর্বনেশে পাখিটিকে কোনওদিনই পছন্দ করতে পারিনি। দেখতে সুন্দর হলেও তার কোনও গুণ খুঁজে পাইনি। অথচ, বহু লোক পোষেন, কথা বলানোর চেষ্টা করেন, বলেও কিছু জড়ানো গলায়। একটু অসাবধান হলেই পালায়। সবাই বলে — এরা শিকলিকাটার জাত'....

এই টিয়াদের জন্যে সন্দেশখালির দু-নম্বর ব্লকের গ্রামপঞ্চায়েতের সভাপতি ধীরেন দত্তর কী সর্বনাশ হয়েছিল তা এই বইতে পড়লে আপনি শিউরে উঠবেন। তিনি ঝুপখালিতে বিঘেতিনেক জমি নিয়ে সূর্যমুখী ফুলের চাষ করেছেন। ফুল ধরেছে। বীজ এসেছে। কাটার সময় হল। হেনকালে —

'....একদিন সকালে কোথা থেকে শয়ে-শয়ে এই পাখিরা এসে ফুলের ওপর পড়ল। এদের চিৎকারে পাড়া মাত।....দেখতে দেখতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব শেষ করে দিয়ে উড়ে চলে গেল। বীজ খাওয়ার চেয়ে নষ্ট করল বেশি। ডগা থেকে ফুল মাটিতে ফেলেছে।....'

পাশাপাশি আপনারা চন্দনাকে তুলনা করে দেখুন:

'....গিরিডিতে এক পাখিওয়ালার কাছ থেকে তার ঝাঁকাভর্তি পাখির মধ্যে থেকে দু-আনায়, বর্তমানের বারো পয়সায়, তাকে কিনেছিলাম।....কথাও শিখেছিল কয়েকটি। বাড়ির দুই দুর্দান্ত ডানপিটে ছেলেকে একটু বেশিক্ষণ চোখের সামনে দেখতে না পেলে তাদের মা যা বলে খোঁজ নিতেন, পাখিটাও সেই সুরে, তবে, একটু জড়ানো গলায়, হাঁক পাড়ত সঙ্গে সঙ্গে 'খুচু-খোকন কোথায় গেল?' দুষ্টু ছেলে দুটি বকুনি খেলে তার মুখে হাসিমেশানো ব্যঙ্গ ফুটে উঠত, হাসত হেঃ হেঃ হেঃ।....'

হয়তো এই জাতীয় পাখিকেই রূপকথায় বলে ব্যাঙ্গমা পাখি।

তবে মানুষও পাখিদের এইসব বেয়াদপির বদলা নিতে ছাড়ে না। বন্ধুর সঙ্গে নলহাটি থেকে রাতের ট্রেনে কলকাতা ফিরছেন অজয়বাবু। ভোর হয় হয়। হঠাৎ শুনলেন কঁকর-কোঁ কোঁ-ও-ও। (পাখির ডাক আমি কোনওদিন নকল করে উঠতে পারিনি। আপনারা দেখুন পারেন কিনা।) যাইহোক, তাঁদের কামরার পিছনে লাগেজ ভ্যান থেকে যেন ডাক শোনা যাচ্ছে। অজয়বাবু লিখছেন :

'বললাম ওরা যেন বলছে আমায় খাও গো, খা-ও। গাড়ির ভিতর যাঁরা জেগে ছিলেন হেসে উঠলেন। বললাম কান পেতে শুনুন এই কথাই বলছে কিনা। তাছাড়া, কনফুসিয়াস বলেছেন, যে কোনও পশু, পাখি, মাছ সুন্দর করে রান্না করার পর পাঁচজন খেয়ে যদি সুখ্যাতি করে তবে সেই পশু-পাখি-মাছের মুক্তি ঘটে। পরজন্মে তারা উচ্চতর জীব রূপে জন্মগ্রহণ করে। এদের পরার্থেই জীবন।....গাড়ির ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠলেন, বাঃ দাদা! কনফুসিয়াসের নামে একটা ছাড়লেন তো?'

অথচ, ভেবে দেখুন পাখি মানুষের সঙ্গে যত না কথা বলেছে — মানুষ তার সঙ্গে কথা বলেছে অনেক, অনেক বেশি। পাখিকে উপদেশ দিয়েছে, ঠাকুরদেবতার নাম শিখিয়েছে, গালাগাল দিয়েছে, গান শুনিয়েছে, ওরে বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর — বলে এক অন্ধ পাখির কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছে, তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঝড়ের সমুদ্রের দিকে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করেছে। আমার এক বন্ধু এবং তাঁর স্ত্রী (দু-জনেই অধ্যাপক) খাঁচার পাখিকে শেখাবেন বলে নিজেরা রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন, ভজন শিখেছেন। দু-বছর এক নাগাড়ে চেষ্টা করার পর পাখি শুধু বলল, 'অ....'! আমি বন্ধুকে উপদেশ দিলাম, ভাই, এর অর্ধেক পরিশ্রমে তোমাদের ছেলেটাকে ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি করতে পারতে। কিছু না হোক পি জি-তে ধরাধরি করে, তোমাদের দু-জনের কান-গলাটা ভাল করে দেখিয়ে নিতে পারতে। তাতে সে বন্ধু কি বলল জানেন? সে বলল — আমাদের যথেষ্ট অভ্যেস আছে। কলেজেও তো ওই পাখিপড়া পড়াই।

কিন্তু অজয়বাবুর পাখি-কপালটা কত ভাল দেখুন। তিনি লিখছেন :

....'স্কুলে পড়ার সময় আমাদের বাড়ির সামনে ছিল চ্যাটার্জিদের বাড়ি। বাড়ির ঠাকুমার পোষা এক কাকাতুয়া ছিল। রোজ সকালে বাইরের বারান্দায় তাকে দাঁড়সুদ্ধু রোদে রাখা হত। সে চিৎকার করে নানারকম কথা বলত। নাতি হরেনবাবুর নাম ধরে ডাকত বেশি। একদিন সকালে শুনি পাখিটা তারস্বরে চিৎকার করছে — 'কি কেলেঙ্কারি, কি কেলেঙ্কারি, শেষে হরেনের বউটা বেইরে গেল।' সে আর থামে না। রাস্তায় বেশ ভিড় জমে উঠল।....'

আরেকটা উদাহরণ :

'....নাবিকদের কাছ থেকে আমার দাদা এক আফ্রিকান কাকাতুয়া কিনেছিলেন। সে যেসব বাণী উচ্চারণ করত তা মোটেই সুবিধের ছিল না। ভদ্র পরিবেশে এসে সে রিকশার ঘণ্টা, কুঁজো থেকে জল গড়ানোর শব্দ, কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া ইত্যাদির ডাক, এমনকী কনক দাস (পরে বিশ্বাস)-এর ''আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস, বল্....'' এই লাইনটি রেকর্ড থেকে মিউজিক সহ হুবহু তুলেছিল....'

মিউজিকসহ। ভেবে দেখুন।

আমার ধারণা, মানুষের মধ্যে যেমন বোকা আছে, চালাক আছে, হিংসুটে আছে — পাখিদের মধ্যেও তেমনই রকমফের আছে। ঘুষখোর আছে, দালাল আছে, সাংবাদিক আছে, দলবাজ আছে, অনাবাসী ভারতীয় আছে। পাখিরাও জ্যোতিষ জানে। কলকাতার ফুটপাথে এদের দেখা পাবেন। জলপিপি-গোছের পাখিদের স্ত্রী-রা, এই বই পড়ে শিখলাম, আবার বহুগামিনী। ওদের মধ্যেও হরেনের বউ আছে জেনে ভাল লাগল। কিন্তু অজয়বাবু লিখছেন :

'....বড় জাতের প্যাঁচাদের ভারতের প্রায় সব জায়গাতেই অমঙ্গলের চিহ্ন বলে ধরা হয়।

মারণ, বশীকরণ, উচাট্টন প্রভৃতিতে হুতোমের অবদান কিছু কম নয়।.... একটা হুতোমকে অন্ধকার ঘরে না খেতে দিয়ে রাখো। সেই ঘরের দেওয়ালের ঠিক মাঝখানে পেরেক পুঁতে এক পায়ে দড়ি বেঁধে তাকে টাঙিয়ে রাখো। প্রতিদিন তার কাছে একঘণ্টা ধরে মন্ত্র জপ করো। চল্লিশ দিন পরে ওই মৃত পাখিকে একটা ছালায় পুরে ঘরের ঢাল থেকে আরও একুশ দিন ঝুলিয়ে রাখো। তারপর দেহ থেকে সমস্ত হাড় একটি একটি করে আলাদা করে নদীর তীরে নিয়ে যাও। কিন্তু তোমার এই যাওয়া যেন কেউ না দেখে ফেলে। তারপর একে একে হাড় নদীর জলে ছোঁড়ো। তার মধ্যে যে হাড়টি জলের মধ্যে সাপের মতো কিলবিল করে চলবে, তাকে তুলে রেখে দাও। তোমার প্রাণের সব আকাঙ্ক্ষা ওই হাড় পূরণ করবে।....'

এত সহজে ইচ্ছাপূরণ হতে পারে — কজনই বা জানে? কিছু কিছু ওপরমহলের লোককে অবশ্য আমার ওই রকম দাওয়াই দেওয়ার বাসনা অনেকদিন ধরে আছে। তাতে আমার ইচ্ছাপূরণ হোক, বা না হোক। অজয়বাবু অবশ্য আমাদের সন্দেহ জাগিয়েছেন :

'....কত যে উদ্ভট, কল্পনাপ্রসূত কুসংস্কার আছে তার ইয়ত্তা নেই।....' পাখিদের বিষয়ে হয়তো আছে। মানুষদের ক্ষেত্রে করে দেখতে হয়। যদি লেগে যায় তবে তাকে কুসংস্কার বলা চলবে না।

কোরান শরিফের বয়ান বলে এমন জংলি পাখির সন্ধান অজয়বাবু পেয়েছেন মহীশূরের সান্তাবেরি গ্রামে। বাবুদ্দিন সাহেবের আস্তানায়। এবার অজয়বাবুর মুখে শুনুন '....সকালে হাজির হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে গাছের ওপর থেকে ওরা অভ্যর্থনা জানাল ''সালাম আলয়াকুম''। একের পর এক পাখিরা, কখনও সমস্বরে, বলতে লাগল ''ইয়ে আল্লা'' বালা ইলাহা ইল্লা লাহ....তেরি কুদরত....'' অনেক বয়ান শুনলাম যা আমি কখনও শুনিনি।....বহু বছর আগে বাবুদ্দিন বলে এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মক্কায় যান। সেখান থেকে ফেরার সময় ইয়েমেন থেকে তিনিই দক্ষিণ ভারতে প্রথম কফির চারা নিয়ে আসেন। তিনি কিছু জংলি তোতা ধরে কোরান শরিফের বাণী শেখান। তারপর ছেড়ে দেন। বংশানুক্রমে সেই পাখিরাই এই বাণী বলে আসছে।....'

সব প্রেমিকদের মতো পক্ষীপ্রেমিকদের বেশ কিছুটা খ্যাপামি থাকে। একবার, বিদেশে তেমন এক পাগলের পাল্লায় পড়ে, পাহাড়ের মাথায়, ঘন জঙ্গলে এক পাখি দেখতে গিয়েছিলাম। পাখিটির নাম 'অসপ্রে'। অনেকটা বাজ-জাতীয়। বর্তমানে নিশ্চিহ্নপ্রায়। সেবছর একজোড়া গাছের চূড়ায় বাসা বেঁধেছে। রীতিমতো পারমিট নিয়ে সে জঙ্গলে ঢুকতে হল। সাজপোশাক পরতে হল সৈনিকদের মতো, জংলি শার্টপ্যান্ট, বুট জুতো, পাতা-আঁকা হেলমেট। কোনওভাবেই যেন পক্ষীদম্পতি ভয় না পায়। মাটিতে গর্ত করে ছাউনি তৈরি হয়েছে। সেখানে ফিট করা আছে দূরবীন। বহু দূর থেকে দেখলাম, জোড়ার একটা শোঁ করে পাশের হ্রদ থেকে মাছ ধরে নিয়ে এল। আমার নাকি খুব সৌভাগ্য যে, মাত্র কয়েক মিনিটের অপেক্ষায় অমন একটা দৃশ্য দেখতে পেলাম — সমবেত পক্ষীবিশারদরা জানালেন।

কিন্তু যে যাই বলুন, পাখিদের ইংরেজি নামগুলো মোটেই আমার মনঃপূত নয়। কেমন যেন কাঠখোট্টা। যে পাখির নাম 'কোয়েটজাল ফারোম্যাকরাস মকিত্রো' বাংলায় তিনিই হলেন 'সদাসোহাগী'। 'হুপো' পাখির নাম সুসাহিত্যিক বনফুল দিয়েছিলেন 'মোহনচূড়া'। 'সোনা কবুতর', 'গাঙচষা', 'কাপাসী', 'পান চিল', 'গিন্নি শকুন', 'ফুলটুসি', 'পোকামারা', 'কাস্তেচরা', 'গগনভের', 'রেখা বসন্ত', 'লাল ঠেঙ্গি', 'তিলে ঘুঘু', 'বড় বাঁশপাতি', 'তাল চড়াই' — এ

সব পাখির নাম ইংরেজিতে লিখতে আমার কলম ভেঙে যাবে। তারচেয়ে বরঞ্চ জলজঙ্গল ঘেঁটে এদের দেখতে যাওয়াই আমি অধিকতর সুবিবেচনার কাজ বলে মনে করব। নয়তো ঘরে বসে অজয়বাবুর বর্ণনা পড়ব।

পাখি নিয়ে যদি এত কথা হল, তবে পাখির খাঁচার প্রসঙ্গটি বাদ যাবে কেন? খাঁচা তৈরি করা একটি শিল্পকর্ম বটে। বছর খানেক আগে আমার এক পরিচিত ভদ্রলোক গিয়েছিলেন তিউনিসিয়ায়। সঙ্গে নিয়ে এলেন ময়ূরপঙ্খির আদলে গড়া এক এলেমদার খাঁচা। সাদা কাঠি দিয়ে তৈরি সেই বিশাল খাঁচায় আছে পাখির শোয়ার ঘর, ডাইনিং-কাম-সিটিং মায় টয়লেট-শাওয়ার পর্যন্ত। তিন বাই তিন স্কোয়ার ফিটের মধ্যে প্রমোটারের স্বপ্ন বলা যায়। 'কিন্তু পাখি কি ও সব শৃঙ্খলা মেনে খাঁচায় থাকবে' — আমি সন্দেহ প্রকাশ করি। 'মানুষই থাকে না, তো পাখি' — এই হল বিদেশ-প্রত্যাগতের জবাব। এখনও পর্যন্ত যতদূর জানি, তিনি ওই খাঁচায় বসবাসের উপযুক্ত পাখি খুঁজে পাননি। ঝুলন্ত খাঁচাটি যে তাই বলে খালি পড়ে আছে, তা নয়। তিনি সে খাঁচায় বইপত্র রাখছেন। ভাবছি, সামনের মাসের মাইনে পেলেই আমি অজয় হোমের এই বইটি কিনে তাঁকে উপহার দেব। পাখির খাঁচায় পাখি না থাক, পাখিরই বই অন্তত একটা থাকুক।

‘বিভাব’ যেখানে পাবেন

পাতিরাম
(কলেজ স্ট্রিট)

দে’জ
(কলেজ স্ট্রিট)

ইষ্টার্ন বুক এজেন্সি
৮/সি, টেমার লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি-র কাছে
(কলেজ স্ট্রিট)

বিভাবের পুরোনো এবং নতুন সংখ্যা পাবার জন্য যোগযোগ করুন :

বিভাব সম্পাদকীয় দপ্তর
৫০৮/এ, যোধপুর পার্ক,
কলকাতা - ৬৮
দূরভাষ : ৪৭৩-৩৬০০

জোব্বার নীচে এক হৃদয় : এক শিক্ষার্থী যাজকের আত্মবিশ্বাস

(জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো বিরচিত)

অনুবাদ : কমলেশ চক্রবর্তী

ভূমিকা : আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতা কাব্যশরীরের জটিলতা থেকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেনি। জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো যথার্থই অনেক কবির তুলনায় সহজতর। কিন্তু এই কবির রচনা অনুধাবন করতে হলে যেমন মরমি সাধনার ক্ষেত্রে, যেমন প্রেমের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সমর্পণ প্রয়োজন তেমনি সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক সমর্পণের প্রয়োজন। অর্ধচেতনায় নিমীলিত দৃষ্টিতে শ্রবণ ও পঠনের মধ্য দিয়ে এই কবির কৈশোরিক রচনা পর্যন্ত বোধগম্য করা দুঃসাধ্য হয়। কিন্তু র‍্যাঁবোর রচনায় এমন শব্দ পাওয়া দুষ্কর যার অর্থের যথার্থতা প্রণিধানের জন্য অভিধানের সহায়তা মুহুর্মুহু নিতে হতে পারে যেমনটি অন্য অনেক কবির ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। অক্টাভিয়ো পাৎস বলছেন : র‍্যাঁবো এই পৃথিবীকে সম্বোধন করে কিছু রচনা করেন না, পক্ষান্তরে উচ্চারণ করেন এমন সব শব্দ যার উপর পৃথিবী তার ভারসাম্য স্থাপন করতে চায়। আমাদের মনে হয় যদি কোনও শব্দ দ্ব্যর্থক অথবা অনিশ্চিত না হয় তবে অবশ্যই বলতে হবে তা বুদ্ধিবৃত্তির উপযোগী দুর্বোধ্য নয় পক্ষান্তরে তার দুরূহতা অবশ্যই আত্মিক। যার জন্য প্রয়োজন সমর্পণ, নিবেদন। এটা এমন এক শ্রেণীর অভিজ্ঞতা যার মধ্যে নিহিত থাকে বহির্জগতের অস্বীকৃতি। সংক্ষেপে বলা যায় আধুনিক কবিতা বস্তুতপক্ষে সমস্ত চিরাচরিত অর্থময়তাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা কারণ কবিতা নিজেই তো জীবন এবং মানুষের শেষতম অর্থময়তা। সুতরাং কবিতায় একই সঙ্গে ভাষার বিনাশ তথা সৃষ্টি সংঘটিত হয়। ধ্বংস সাধিত হয় শব্দের তথা শব্দার্থের, নৈঃশব্দ্যের এবং একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয় শব্দমালা শব্দের সন্ধানে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই র‍্যাঁবোর প্রতি আমাদের মনোনিবেশ প্রয়োজন।

আমরা জ্ঞাত আছি একজন কবির ব্যবহার্য অন্য কোনও কিছুই নেই কেবলমাত্র শব্দ ভিন্ন — যার প্রত্যেকটির একটি বা কখনও কখনও একাধিক অর্থ বর্তমান এবং বেদনার কথা এই যে সেই অর্থ প্রত্যেকেরই ব্যবহার্য — অথচ কেবলমাত্র কবিরই দায় এইসব ব্যবহৃত শব্দাবলির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাকে সৃষ্টি করতে হয় এক নূতন ভাষা। নূতন অর্থময়তার পরিভাষা। কবির ব্যবহৃত শব্দসমূহ হয়ে উঠতে থাকে এক শ্রেণীর ভাষা এবং একই সঙ্গে সে সব হয়ে ওঠে অন্য কিছু। কবিতা, এমন কিছু যা পূর্বে কখনও শ্রবণ করা যায়নি, উচ্চারিত হয়নি, এমন কিছু যা বস্তুত ভাষা এবং একই সঙ্গে এমন কিছু যা ভাষাকে অস্বীকার করছে আর তা উত্তরণের মধ্য দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে এক অনির্বচনীয়তায়। র‍্যাঁবো পাঠের মধ্য দিয়ে একজন সচেতন পাঠকের এমনি সব উপলব্ধি ঘটে।

দ্বিতীয় একটি কারণে র‍্যাঁবো অতীব খ্যাতি অর্জন করেছিলেন — তা হচ্ছে কাব্যচর্চা বর্জন। তাঁর রচনা সমকালে ফরাসি দেশে যতখানি অভিনন্দিত হয়েছে তার তুলনায় অধিকতর চমৎকারিতা প্রদর্শিত হয়েছিল তাঁর সোচ্চার সাহিত্য পরিহারের ঘোষণায়। স্তেফান মালার্মে এই তথ্যটিকে বর্ণনা করেছেন যথার্থ অর্থময়তায় : ‘তিনি কবিতা থেকে, জীবন্ত, নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করেছিলেন’। যদিও আমরা অনুমান করতে পারি এই ব্যবচ্ছেদ যেমন অসাধ্য

তেমনি অনৈতিহাসিক। এই কয়েক বছর পূর্বে ফরাসি প্লেইয়াদ সংস্করণে সংযোজিত হয়েছে তাঁর চমকপ্রদ ইথিওপিয়ান পত্রাবলি। এখানেই শেষ নয়। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে আঁদ্রে ব্রেতোঁ ও লুই আরাগঁ হঠাৎ আবিষ্কার করলেন র‍্যাঁবোর একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি যার অধিকারী ছিলেন হেনরি সাফ্রে নামক একজন সংগ্রাহক। যতদূর আমরা জ্ঞাত আছি রচনাটির বর্তমান অধিকারী এর পুত্র আলফ্রেড সাফ্রে। এই রচনাটিকে উক্ত দুই ধুরন্ধর কবি সহস্তে কপি বানিয়ে নিজেদের পরাবাস্তবতামূলক পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। দীর্ঘদিন রচনাটি পাঠকের মনোযোগী দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। এই রচনাটিকে বর্ণনা করা হয়েছে র‍্যাঁবোর রচিত কাব্যপ্রকরণে একটি কাহিনী হিসেবে। কাহিনীতে এমন কোনও চমৎকৃতি নেই যা অমনোযোগী পাঠকের কাছেও নিবেদনের যোগ্য বিবেচিত হতে পারে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, ‘পৃথিবীর পরিবর্তন এবং জীবনের পরিবর্তন’ এই দুটি সূত্র যেমন আকৃষ্ট করেছিল কার্লমার্কস-কে তেমনি আকর্ষিত করেছিল আর্তুর র‍্যাঁবো-কে। এই ভাবনা পরবর্তীকালে দাদা-আন্দোলনের পুরোহিত আঁদ্রে ব্রেতোঁকে প্রভাবিত করেছিল যথার্থ গভীরভাবে। বস্তুত পাশ্চাত্য পৃথিবীর এটাই আধুনিক জ্ঞানের সারাৎসার। সম্ভবত বাংলায় এই রচনাটির কোনও অনুবাদ ইতিপূর্বে হয়নি। অন্তত আমাদের জানা নেই। — অনুবাদক।

জাঁ আর্তুর র‍্যাঁবো বিরচিত

জোব্বার নীচে এক হৃদয় : এক শিক্ষার্থী যাজকের আত্মবিশ্বাস

[র‍্যাঁবোর এই রচনাটি অনেকটাই গল্পের মতো। তবে কবিতারও অনুপ্রবেশ ঘটেছে বারবার। অনেকে এটাকে তাঁর একমাত্র গল্প বলে মনে করেন। বাংলা অনুবাদ এর আগে প্রকাশিত হয়নি বলে অনুবাদক জানিয়েছেন। — সম্পাদক।]

...হায় থিমোথিনা লাবিনেতে! আজ যখন আমি সেই পবিত্র জোব্বাটা গায়ে চাপিয়েছিলাম, আমি সহজেই অনুমান করতে সক্ষম হয়েছি সেই যন্ত্রণা, যা এখন শীতল তথা সুষুপ্ত এই জোব্বার নীচে, যা, গত বছরেও, আমার একজন তরুণের হৃদয় যাজকতা শিক্ষানবিসির চাপে প্রকম্পিত হয়েছিল!...

মে ১, ১৮...

...এখন বসন্ত। যাজকের একটুকরো দ্রাক্ষাকুঞ্জ...তার মাটির পাত্রে মুকুলগুলি দৃশ্যমান; উঠোনের বৃক্ষে খুদে খুদে অঙ্কুরগুলি এমন কোমল যেন সবুজ বিন্দু সব এর ডালে ডালে। আর একদিন, পড়ার ঘর থেকে বাইরে আসতেই, আমি দেখলাম দোতলার জানালায় ঠিক যেন অনুনাসিক ছত্রাক নৈশ আহারের যোগ্য...জে’র পাদুকা খানিকটা গন্ধযুক্ত, এবং আমি লক্ষ করেছি ছাত্ররা ঘন ঘন বাইরে যায় প্রয়োজনে...উঠোনের দিকে। তারাই অধিকতর যারা পড়ার ঘরে থাকে। অতিরিক্ত সময় যেন সমাকীর্ণ গন্ধমূষিক, আপন উদরের উপর শায়িত, তাদের রক্তবর্ণ মুখমণ্ডল চুল্লির দিকে এগিয়ে দিয়ে, তাদের প্রশ্বাস এমন ঘন ও উত্তপ্ত ঠিক যেমনটা দেখা যায় গাভীদের বেলায়! তারা আজকাল দীর্ঘক্ষণ বাইরে কাটায়, এবং যখন তারা ফিরে আসে, তারা বিদ্রূপ করে আর স্বেচ্ছায় আপনাপন প্যান্টের ঢাকনার বোতাম খুলে ফেলে — না, এটা যথার্থ হল না — খুব ধীরে — মুদ্রাদোষে আর মনে হয় এই কাজটা থেকে যা বস্তুত অত্যন্ত সাময়িক তার থেকে সহজ সুখানুভূতি লাভ করার জন্য...

মে ২...

তিনি ...গতকাল তাঁর ঘর থেকে নেমে এসেছিলেন, এবং, তাঁর দু’চোখ অনুন্মীলিত, দু’হাত লুক্কায়িত, ভীত আর কম্পিত, তাঁর আনুশাসনিক পাদুকাজোড়া খুব প্রচেষ্টায় উঠোনে টেনে টেনে!...

এখন আমার হৃদ্‌পিণ্ড বুকের ভেতর সজোরে ধকধক করছে, আর আমার বুক আমারই পঙ্কিল টেবলে ধকধক করছে! হায়! এখন আমি এই সময়কেই ঘৃণা করি যখন অন্য শিক্ষানবিসিরা তাদের আপনাপন নোংরা পোশাকের আড়ালে সুস্বাস্থ্য মেষের মতো ঘামছে এবং পড়ার ঘরের দুর্গন্ধ পরিপার্শ্বে নিদ্রা গিয়েছে, গ্যাসের বাতির তলায়, চুল্লির একঘেয়ে বিস্তারিত উত্তাপে! আমি দু’হাত ছড়িয়ে দিলাম! একটা দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করে আমার দু’পা টানটান করেছি...আমি অনুভব করতে পারছিলাম অনেককিছু আমার মাথার ভিতর, হায়! নানা ভাবনা!...

মে ৪...

...এখন, গতকাল, আমি তা সহ্য করতে পারিনি! গাব্রিয়েল নামক দেবদূতের মতো, আমি আমার হৃদয়ে পাখাদুটি ছড়িয়ে দিলাম। আমার অন্তরাত্মায় সেই পবিত্র আত্মার প্রশ্বাসের প্রবহণ হল! আমি আমার বীণযন্ত্রটি তুলে গান ধরলাম :

এস আরও কাছে,
মহামহিমময়ী মেরি!
প্রিয়তমা মাতাঠাকুরানি
আদরণীয় যিশুখ্রিস্টের!
সাঙ্গটাস খ্রিস্টান!
শিশুক্রোড়ে কুমারী
পবিত্র মাতা,
শোনো আমাদের প্রার্থনা!

হায়! এই কাব্যিক গোলাপের পাপড়ি যখন আমি ছিন্ন করেছিলাম তখন কী রহস্যময় দূষিত বাষ্প আমার হৃদয় কম্পিত করেছিল তুমি যদি তা অনুমান করতে পারতে! আমি তুলে নিয়েছিলাম আমার তারযন্ত্রটি, প্রার্থনাসংগীত রচয়িতার মতো, আমার নিষ্পাপ বিশুদ্ধ কণ্ঠস্বর স্বর্গের অভিমুখে তুলে ধরেছিলেম!
ওহো আল্টিচুডো আল্টিচুডিনাম!

মে ৭...

হা হতোস্মি! আমার কবিতা গুটিয়েছে তার পাখা, কিন্তু যেন গালিলিও, আমি বলতে চাই, দৌরাত্ম্যে আর যন্ত্রণায় চূর্ণবিচূর্ণ : তথাপি তা প্রচল! — পাঠ করো : পাখা দুটি ঝাপটায়! — আমি তো খুবই করেছি অবহেলা আত্মবিশ্বাসের পূর্ববর্তী পাতা... জে. তা তুলে নিয়েছিল, জে., যে তুরস্কের পদাতিক যোদ্ধার ন্যায় অতীব ভয়ংকর। প্রধানের সব অত্যাচারী অনুবর্তীদের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ..., এবং সে সংগোপনে তা বহন করে নিয়ে গেল তার কর্তার কাছে। কিন্তু সেই নরখাদক, প্রত্যেকের কাছ থেকে প্রাপ্ত অবমাননার মধ্য দিয়ে যাতে আমাকে যেতে হয়, তার সব বান্ধবদের প্রদর্শন করালো আমার কবিতা।

গতকাল, প্রধান ...আমাকে ডেকে পাঠাল। আমি তার বাসগৃহে দেখা করতে গেলাম। আমি দাঁড়িয়েছিলাম তার সামনে, আমার বিশ্বাসে অবিচল। তার কেশহীন ললাটের শেষতম রক্তিম কেশ অলক্ষিত দীপ্তির ন্যায় ছিল কম্পমান। তার দুই চক্ষু, শান্ত ও শীতল, মুখমণ্ডলের মেদ থেকে ভাসমান। তার নাসিকা, গুবরেপোকার মতো, স্বাভাবিক নড়াচড়ায় কাঁপছিল। সে একটা স্তোত্র ফিসফিস করে উচ্চারণ করছিল। বুড়ো আঙুল জিভে ভিজিয়ে তার গ্রন্থটির কয়েকটা পৃষ্ঠা উলটিয়ে নিল, এবং বের করে আনল একটু ছোট্ট তেলতেলে ভাঁজ করা কাগজের টুকরো....

পুপুপুণ্যাণ্যাণ্যবতী মামামারি!...
পিপিপ্রিয়য় মামামাতা!

সে আমার কবিতা পদদলিত করেছে! আমার নাকের উপর নিষ্ঠীবন ছিটিয়েছে! সে সমস্ত সন্তদের বোকা বানিয়েছে এই কুমারীবন্দনার সংগীতটিকে মলিন ও কলুষিত করবার জন্য। তোতলামি করতে করতে সে এক-একটি শব্দকে দীর্ঘায়ত করছিল ঘৃণার থেকে জাত ঘন অবজ্ঞায়। তারপর যখন সে পঞ্চম ছত্রটিতে পৌঁছে গেল...শিশুক্রোড়ে কুমারী! পাঠবন্ধ, তার নাকি সুর সহসা বদলে চিৎকার করে উঠল : শিশুক্রোড়ে কুমারী! শিশুক্রোড়ে কুমারী! সে এমন একটা গির্জার স্তবের মতো বাচনভঙ্গিতে, নিজের স্বপ্রকাশ উদর এক ঝটকায় সংকুচিত করে, এক ভয়াবহ কণ্ঠস্বরে যাতে আমার গণ্ডদেশ অত্যন্ত ক্ষীণ রক্তিমায় আবরিত হয়ে উঠল। আমি নতজানু হয়ে গেলাম, এবং আমার দুইহাত ছাদের দিকে উঠিয়ে, সরবে উচ্চারণ করেছিলাম : হে পিতা!...

....

— তোমার বীণা! তোমার সেতার! তরুণ বালক! তোমার সেতার! সেইসব দূষিত গ্যাস যা তোমার হৃদয় কম্পিত করেছে, যদি আমি তা প্রত্যক্ষ করতে পারতাম! আমার তরুণ আত্মা, আমি লক্ষ করেছি, সেই অপবিত্র স্বীকারোক্তিতে, এমন একটা কিছু যা যথার্থ পার্থিব, একধরনের ভয়াবহ লাম্পট্য, একধরনের প্রলোভন, একটা শব্দ থেকে নির্গত! —
বক্তৃতা থামিয়ে, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত তার উদরের সম্পূর্ণটা মোচড় দিয়ে অবশেষে পুনর্বার গম্ভীর কণ্ঠে আরম্ভ করল :
— যুবক, তোমার কি যথার্থ বিশ্বাস আছে?...
— ফাদার, আপনি এ কথাটা জিজ্ঞেস করছেন কেন? আপনার রসনা কি আমাকে নিয়ে মজা করতে চাইছে?...অবশ্যই, আমি বিশ্বাস করি যা আমার মা....পবিত্র গির্জে...বলে!
— কিন্তু ...শিশুক্রোড়ে কুমারী!....সেটাই তো বক্তব্য, তরুণ যুবক, সেইটাই ভাবনা!...
— ফাদার, আমি দার্শনিক মতবাদে বিশ্বাস করি!
— তুমি ঠিকই বলছ, যুবক, সেইটাই তো সমস্যা...
...সে কথা বলা থামাল...তারপর : — জে নামক ছেলেটি....আমার কাছে একটা নালিশ জানিয়েছে যাতে বলা হয়েছে, সে নিজে দেখেছে, তুমি তোমার দু'পা প্রতিদিন একটু বেশি বেশি করে দেখার মতো ছড়াচ্ছ, বিশেষত যখন তুমি পাঠগৃহে থাকো। ওতো দাবি করে দেখেছে বলে, তুমি তোমার দু-ঠ্যাঙ সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দাও, টেবলের নীচে, ঠিক যেমন, যুবক...তার নিতম্ব সঞ্চালন করে। এ সবই এমন সব ঘটনা যার কোনও উত্তর আমাদের আশা করাটাও ঠিক নয়...আমার আরও কাছে এস, হাঁটু ভাঁজ করেই এস। আমি তোমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করতে চাই। আমাকে বলো তো : পাঠগৃহে কি তুমি খুবই বেশি ছড়িয়ে বসো?

তারপর সে আমার কাঁধে তার হাত রাখল, এবং আমার ঘাড় বেষ্টন করে, আর তার দুই চোখ ক্রমশ উজ্জ্বলতর হচ্ছিল, আর সে আমাকে আমার দুপা বিস্তরণের বিষয়ে সব কিছু বলতে বাধ্য করছিল....কেন, তোমাদের বলতে চাই এটা আসলে খুবই বিরক্তিকর হয়েছিল, কারণ আমি জ্ঞাত আছি এই দৃশ্যগুলির মর্মার্থ কী!...সুতরাং ওরা আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করেছে, ওরা আমার হৃদয়ের পবিত্রতা তথা কোমলতার উপর কলঙ্ক লেপন করেছে — এবং এখান থেকে আমার আর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয় : এইসব নালিশ, এইসব বেনামি ছাত্রদের

প্রেরিত পত্রাবলি যা পরস্পর বিরোধী, আর সেইসব প্রধানের কাছে অনুমোদিত তথা নির্দেশিত — এবং আমি এই কক্ষে উপস্থিত হয়েছি আর প্রধানের অভিশপ্ত দুই হাতের সাঁড়াশি বন্ধনে আটকে গিয়েছি....হায়! এই যাজকদের শিক্ষালয়!....

....

মে ১০...

হায়! আমার সতীর্থরা কী ভয়নক ধূর্ত তথা কী প্রবল কামুক! পাঠগৃহের এইসব অদীক্ষিত মানুষগুলি আমার কাব্যচর্চার ঘটনাটা সম্পূর্ণ জ্ঞাত, আর যখনি আমি আমার ঘাড় ঘুরিয়েছি, আমি প্রত্যক্ষ করতাম দ্রুত হাঁপানো ডি..., যে আমার কানে কানে ফিসফাস করে বলত : আর তোমার সেতার, তোমার তারযন্ত্র? এবং তোমার রোজনামচা? তারপর সেই গাড়োল এল...বলতে লাগল : আর তোমার বীণা? আর তোমার তারযন্ত্র? আর তারসঙ্গে সমস্বরে তিনচারটি কণ্ঠের গুঞ্জন :

মহামহিম মেরি,
প্রিয়তম মাতা!

এবং আমি একজন গবেট। জিসাস, আমি নিজে লাথিটাও মারি না! কিন্তু আমি তো অন্যের উপর গোয়েন্দাগিরি করি না। আমি তো লিখি না উড়ো চিঠি। আমি আমার কাছেই সংগোপনে রাখি আমার নিষ্কলুষ কবিতা আর আমার নিজের ভব্যতা!

মে ১২ ...

তুমি পারো নাই করিতে প্রতর্ক প্রেমে কেন মজি আমি?
পুষ্প বলে : শুভেচ্ছা; পাখি বলে : অভিনন্দন!
শুভেচ্ছা, এখন বসন্ত! লাবণ্যের যাহা দৈবসাথি!
তবু কী কল্পনা অসমর্থ কেন আমি আহ্লাদে পুড়ে যাই?
আমার পিতামহীর দৈবীআত্মা, আমার দোলনার পরি,
তুমিও পাও না অনুমান আমি হয়ে উঠি এক পাখি,
কম্পমান আমার বীণার সুর আমি ঝাপটাই পাখসাটে
যথা দেখি এক সোয়ালোরে?

আমি এইসব পদ্য রচনা করেছিলাম গতকাল, অবশ্য বিরতির সময়। আমি গির্জের ভেতর প্রবেশ করেছিলাম এবং স্বীকারোক্তির প্রকোষ্ঠে নিজেকে গোপন করেছিলাম। সেখানে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে আমার তরুণ কবিতা যাতে স্পন্দিত হতে পারে আর যাতে প্রেমের নীলাকাশে হতে পারে উড্ডীন। তারপর, যেহেতু সেসব লোক দিনে-রাতে সবসময় উপস্থিত হত আর আমার পকেটে যত কাগজ থাকত সবই তারা নিয়ে যেত কেড়েকুড়ে, আমি এইসব কবিতা আমার অন্তর্বাসের তলার দিকে সীবন ক'রে রাখতাম, যা কেবল আমার ত্বকের কাছাকাছি, আর পাঠের সময়, আমি টেনে আনতাম, আমার পোশাকের তলায় তলায়, আমার কবিতা আমারই হৃদয়ের কাছাকাছি, আর আমি দীর্ঘক্ষণ তা, যখন আমি স্বপ্ন দেখতাম, সেখানেই চেপে রাখতাম...

মে ১৫...

ঘটনা একের পর এক সংঘটিত হতে লাগল, যেহেতু আমার শেষতম গোপনীয়তা, আর ছিল সেসব অতীব অকলঙ্কিত ঘটনা, ঘটনা যা সন্দেহাতীতরূপে আমার ভবিষ্যৎ আত্মিক জীবন প্রভাবিত করবে তুলনাহীন ভয়াবহ উপায়ে!

থিমোথিনা লাবিনেতে, আমি তোমায় পূজি!

থিমোথিনা লাবিনেতে, আমি তোমায়, পূজি! আমি তোমায় পূজি! আমার বাঁশিতে আমাকে গীত বাজাতে দাও, যেমন করে স্বর্গীয় স্তবরচয়িতা সাধন করেছেন তাঁর স্তবরচনা কর্ম, আমি তোমাকে কেমন দর্শন করেছিলাম, আর কেমন আমার হৃদয় উল্লম্ফনে এক চিরায়ত প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় তোমার হৃদয় স্পর্শ করতে চায়!

বৃহস্পতিবারটা ছিল আমাদের ছুটির দিন। আমরা বাইরে যেতাম দু'ঘণ্টার অবসরে। আমিও গিয়েছিলাম। আমার মা, তাঁর শেষতম চিঠিটিতে, আমাকে লিখেছিলেন :'...আমার তোমার আপাতভাবে অধিকারভুক্ত ছুটির সময় তোমার প্রয়াত পিতার সুহৃদ সেজার্‍্যাঁ লাবিনেতে মহাশয়ের কাছে গিয়ে কাটিয়ে এস, তাঁর সঙ্গে কোনও একদিন তোমার অবশ্যই পরিচিত হওয়া দরকার তোমার যাজক হবার পূর্বেই...'

...আমি মঁসিয়ো লাবিনেতের সঙ্গে একদিন দেখা করতে গেলাম, তিনি একটা শব্দও উচ্চারণ না করে আমাকে সরাসরি তাঁর পাকশালে যাবার অনুমতিদানে কৃতজ্ঞ করলেন। তাঁর কন্যা, থিমোথিনা, যে আমার সঙ্গে একাকীই ছিল, একটা তোয়ালে তুলে নিয়ে একটা বড়সড় গোল বাটি মুছে নিজের বুকের উপর রাখল, এবং হঠাৎ করে আমার দিকে ফিরে, বেশ কিছুক্ষণের নিস্তব্ধতার পর : বেশ, মঁসিয়ো লিওনার্দ?...

তখন পর্যন্ত, আমাকে এই তরুণ প্রাণীটির সঙ্গে পাকশালের নির্জনতায় দেখে আমি খুবই হতভম্ব হয়েছিলাম, আমি আমার দু'চোখ নীচের দিকে নমিত করে হৃদয় দিয়ে মেরির পবিত্র নাম গুঞ্জন করছিলাম। সলজ্জ, আমি আমার চোখ ওঠালাম এবং আমার রূপবতী আলাপচারিণীর সম্মুখে, আমি কেবলমাত্র একটা ক্ষীণ উচ্চারণে সমর্থ হলাম : মাদমোয়াজেল?...

থিমোথিনা! তুমি তো অপরূপ রূপসী! যদি আমি একজন চিত্রকর হতাম, আমি অবশ্যই ক্যানভাসে তোমার পবিত্র অবয়ব প্রতিকৃত করতাম আর তার নামকরণ হত : কুমারী একটি বাটি হাতে! কিন্তু আমি তো মাত্র একজন সাধারণ কবি, আর আর শব্দের সম্ভার তোমাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে অনেকখানি অসম্পূর্ণ ভাবে...

কৃষ্ণবর্ণের চুল্লি, যার গর্তটা থেকে জ্বলন্ত অঙ্গারের রক্তিম চোখ জ্বলছিল, তার উপরের পাত্রটি থেকে সূক্ষ্ম ধোঁয়ার স্রোত আসছিল বাঁধাকপি-বরবটির সুপের স্বর্গীয় গন্ধবহ হয়ে। তার সামনে, তরকারির গন্ধ নিচ্ছিল তোমার মিষ্টি নাসিকা আর তোমার সুন্দর ধূসর দু'চোখ লক্ষ্য রাখছিল তোমার বৃহদায়তন মার্জারটিকে, ও কুমারী হাতে ধরা বাটি, তুমি মুছেছিলে তোমার পাত্রটি! নিস্তরঙ্গ আলো তোমার কেশ যা পাতাকেটে আছে আলতো ভাবে তোমার কপোলে তা প্রত্যক্ষ হচ্ছে যেন সূর্যের মতো হরিদ্রাভ। তোমার দু'চোখ থেকে তোমার গণ্ডদেশের

মাঝামাঝি নেমে এসেছে নীলাভকাঞ্চন, ঠিক যেমনটি ছিল সাধ্বী তেরেসার! তোমার নাসিকা, বরবটির গন্ধে ভরপুর, তার দুটি কোমল নাকের পাটা খুলে দিল। নীচে নেমে আসা তোমার ঠোঁটের ওপর ধনুকের রক্তিম রেখা তোমার মুখমণ্ডলের বিশুদ্ধ উদ্দীপনা গঠনে অনেকখানি সহযোগিতা করেছে। তোমার গণ্ডে প্রত্যক্ষ একটি বাদামি তিল দেখা যায় যাতে সুদৃশ্য, ক্রীড়ানিপুণ কয়েকটি কেশ উড়ছে। তোমার কেশ খুব যত্নে পশ্চাৎ-কপালে চুলের কাঁটা দিয়ে আটকানো, অথচ একটা ছোট কেশগুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে...বৃথাই আমি তোমার বক্ষের দিকে তাকালাম। তোমার তেমন কিছুই নেই। তুমি এমনসব পার্থিব অলঙ্কার অবজ্ঞা করো। তোমার হৃদয়ই তোমার বক্ষদ্বয়!...যখন তুমি তোমার লম্বা পা তুলেছিলে ঘুরে তোমার হলুদ বেড়ালটাকে আঘাত করতে, আমি লক্ষ করেছি তোমার কাঁধের অস্থির অভিক্ষিপ্ততা আর তোমার পোশাকের উত্থান তার ফলে, আর আমি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম ভালোবাসায়, যখনি আমি তোমার পশ্চাতের দুটি সুস্পষ্ট পবিত্র বঙ্কিমতা লক্ষ করলাম!...

সেই মুহূর্ত থেকে আমি তোমাকে বন্দনা শুরু করেছিলাম। আমি বন্দনা করিনি, তোমার কেশদাম, তোমার কাঁধের চাতাল অস্থিদুটি, এমনকী তোমার নিতম্বের নীচের দিকের মোচড়। আমি একজন নারীর মধ্যে যা পছন্দ করি, একজন কুমারীর মধ্যে, তা হচ্ছে শিষ্টাচার আর কারুণ্য। আর তাই আমি তোমার মধ্যে বন্দনা করেছি, তরুণী পশুপালিকা!...

আমি তাকে আমার অনুরাগ প্রদর্শন করতে সচেষ্ট ছিলাম, আর পক্ষান্তরে, আমার হৃদয়, আমার হৃদয় আমাকে প্রতারণা করেছিল! আমি কেবলমাত্র তার প্রশ্নগুলির অর্ধোচ্চারিত শব্দবন্ধে উত্তরদানে সমর্থ হয়েছিলাম। অনেকবার আমার বিভ্রান্তিতে আমি ওকে মাদমোয়াজেলের পরিবর্তে মাদাম অভিধায় ডাকছিলাম! ক্রমশ অনুমিত হচ্ছিল তার কণ্ঠের জাদু শব্দসমূহের ধ্বনিতে আমি যেন তলিয়ে যাচ্ছি। এবং শেষ পর্যন্ত আমি স্থির করলাম এই টানে নিজেকে ছেড়ে দেব এবং সবকিছু পরিবর্জন করব। কোনও একটা বিশেষ প্রশ্নে বা অন্য কোনও সময়ে সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমি আমার আসনে পিঠ এলিয়ে, একটা হাত আমার হৃদ্‌পিণ্ডে রেখে, এবং অন্য হাতে আমার পকেট থেকে তুলে আনলাম একটি জপমালা আর যাতে তার শাদা ক্রুশ প্রকাশ্য হয় তার প্রচেষ্টা করলাম। এক চক্ষু থিমোথিনার দিকে আর অন্য চক্ষু স্বর্গের দিকে নিবদ্ধ রেখে, আমি বেদনার্ত তথা কোমল কণ্ঠে উত্তর করলাম, যেমন একটি সম্বর বলে অন্য একটি চিতল হরিণকে:

— ও। হ্যাঁ। মাদমোয়াজেল...থিমোথিনা!

হতভাগ্য! হতভাগা! — আমার চোখ ভাবাবেশে ছাদের দিকে খুলে গেল আর তৎক্ষণাৎ এক ফোঁটা নোনা জল, আমার মাথার ওপরে দোদুল্যমান একটা শূকরের রাং খসে পড়ল, এবং তখন, লজ্জায় রক্তিম হয়ে, আর যখন আমার অনুরাগ পুনর্জাগরিত হয়েছিল, আমি আমার মাথা নোয়ালাম, দেখলাম আমার বাম হাতে, জপমালার বদলে, একটা বাদামি দুধপানের বোতল; আমার মা গতবছর আমাকে দিয়েছিল কোনও শিশুকে অথবা তেমনি কাউকে দান করবার জন্য! আমার যে চোখ ছাদের দিকে রেখেছিলাম তার থেকে তেতো নোনা জল চুইয়ে পড়ল; — কিন্তু তোমার দিকে নিবদ্ধ আমার অন্য চক্ষুটি, ও থিমোথিনা, একবিন্দু অশ্রু

গড়িয়ে নামছিল, প্রেমের অশ্রু, একবিন্দু বেদনার অশ্রু!...

....

এর একঘণ্টা পর, যখন থিমোথিনা আমাকে জানাল বরবটি ও শূকর মাংসের তৈরি ওমলেটের খাবার প্রস্তুত, আমি উত্তর করেছিলাম খুব নিচু কণ্ঠে এবং তার আকর্ষণী শক্তিতে আবিষ্ট হয়ে : — দেখো, আমার হৃদয় আসলে এমন পরিপূর্ণ যে এর প্রভাবে আমার জঠরের আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হয়ে গেছে! — এবং আমি টেবলে গিয়ে উপবেশন করলাম। হায়, আমি এখনও তা অনুভব করতে সক্ষম। তার হৃদয়ও আমার হৃদয়ের ডাকে সাড়া দিয়েছিল : এই সামান্য আহারের সময় সে আসলে কিছুই আহার্য গ্রহণ করেনি।

তোমার একটা গন্ধ লাগছে না? ও বলেছিল। তার পিতা অবশ্য অনুমান করতে সমর্থ হননি; কিন্তু আমার হৃদয় ঠিক বুঝতে পেরেছিল : এটা বস্তুত ডেভিডের গোলাপ, জেসের গোলাপ, ধর্মগ্রন্থের মরমি গোলাপ, যা আসলে প্রেম!

সে হঠাৎ করে উঠে পড়ল এবং পাকশালের একটা কোণার দিকে গেল। যাতে আমি তার নিতম্বের যুগল পুষ্প প্রত্যক্ষ করতে পারি, সে আকারবিহীন স্তূপীকৃত বুটজুতো আর নানা প্রকারের পাদুকার সরঞ্জামের মধ্যে তার হাত ঢুকিয়ে দিল, তার থেকে তার বৃহদাকার মার্জারটিকে তুলে আনল। একটা পুরাতন খালি বাক্সে যা যা ছিল সব সে ফেলে দিল। তারপর সে তার আসনে এসে পুনরায় উপবেশন করল এবং বেশ ব্যতিব্যস্ত হয়ে বাতাসে গন্ধ নেবার চেষ্টা করতে লাগল। সহসা সে তার ভ্রূযুগল কুঁচকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল :

— ওই গন্ধটা এখনও এখানে আছে!...

— হ্যাঁ, কিছুর একটা গন্ধ বেরোচ্ছে, তার বাবা নির্বোধের মতো উত্তর দিলেন। (তিনি আসলে এমনই অপবিত্র, তিনি অনুমানের অযোগ্য।)

আমি যথার্থ বুঝতে পেরেছিলাম এইসব কিছুই বস্তুতপক্ষে আমার কৌমার্যরক্ষিত শরীরের অন্তর্নিহিত অনুরাগের বর্হিপ্রকাশ! আমি ওকে বন্দনা করেছিলাম এবং পরম মমতায় সোনালি ওমলেটের স্বাদাস্বাদন করছিলাম, আর আমার হাত ফর্কের সাহায্যে সময়কে সঞ্চালিত করছিল, আর টেবলের নীচে, আমার পদযুগল পাদুকার মধ্যে তৃপ্তিকর কম্পনে কম্পিত হতে লাগল!...

কিন্তু আমার পক্ষে কী এক আলোর ঝলকানি, চিরায়ত প্রেমের এক নিদর্শন, থিমোথিনার কাছ থেকে প্রাপ্ত এক আকর্ষণের হীরকদ্যুতি, যা আমার প্রতি প্রশংসনীয় কারুণ্যের উৎসর্গ, যখন আমি বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত, একজোড়া শুভ্র মজা, সহাস্যে এবং এই কথাগুলো সহযোগে : — তোমার পায়ের জন্য কি তুমি এগুলো পছন্দ করবে, মোঁসিয়ো লিওনার্দ?

....

মে ১৬...

থিমোথিনা, আমি বন্দনা করি তোমাকে, তোমাকে আর তোমার পিতা আর তোমার মার্জার....

ভাস দেভোসিয়োনিস,
রোজা মিস্তিকা,
থিমোথিনা : তুরিস দাভিদিকা, ওরা প্রো নোবিস!
কোয়েলি পোর্তা,
স্টেলা মারিস,

মে ১৭....

এখন আর পৃথিবীর আর পাঠগৃহের চিৎকৃত গোলয়োগের ফলে কী অসুবিধা আমার হতে পারে? কী আর গুরুত্ব থাকবে যখন সেইসব আলস্য আর নির্জীবতা আমার খুব কাছাকাছি এসে ভিড় করবে? এই সকালবেলায়, প্রত্যেকটি লোক, নিদ্রায় ভারাক্রান্ত টেবিলে যেন আঠায় সাঁটা। শেষ বিচারের তুরীভেরীর নিনাদের মতো, ভারী, ধীর নাসিকাগর্জন উঠছিল বৃহদায়তন গৃহ থেকে। অথচ আমি, একজন খাঁটি নির্বিকার, ধীর, উর্ধ্বশির, এইসব মৃত-সদৃশ্যদের মধ্যে যেন এক তালগাছ, আমার হৃদয় যা থিমোথিনায় পরিপূর্ণ তার উত্থানপতনের শব্দ শ্রবণ করছি, আর আমার দুইচক্ষু শূন্যের নীলিমায় নিবদ্ধ, যা আমি জানালার উপরের শার্সি দিয়ে প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ!...

মে ১৮...

এইসব মনোমুগ্ধকর কাব্যর, আমার মনে হয়, প্রেরণা এসেছিল সেই পবিত্র আত্মার কাছ থেকে। আমি এইসব কবিতা আমার হৃদয়ের মন্দিরে স্থাপন করতে চাই এবং যখন ঈশ্বর আমাকে পুনর্বার থিমোথিনাকে দেখবার সুযোগ প্রদান করবে, আমি এগুলো সব তাকেই সমর্পণ করব, তার দেওয়া মোজাজোড়ার প্রতিদানে!...

আমি এটাকে 'মলায়ানীল' নাম প্রদান করেছি :

এর তুলোট আবাসে
পশ্চিমবাতায় নিদ্রা যায় সুগন্ধি প্রশ্বাসে:
রেশম ও পশমের এর আবাসনে
নিদ্রা যায় মলয়পবন লম্পট চিবুক নিয়ে!
মলয়পবন যদি গুটায় দু'পাখা
তার তুলোট আবাসে,
যখন ঝটিতি ছোটে যেখানে পুষ্পের ডাক,
সুমিষ্ট প্রশ্বাস তার ছড়ায় সুগন্ধ!

পঞ্চম ইন্দ্রিয় জাত পবনমলয়!
পঞ্চম ইন্দ্রিয় জাত প্রেমাভিষেক!
যখন শুকায় শিশিরের কণা,
দিনমান কী মোহন সুবাস বিস্তারে!

জিসাস! জোসেফ! জিসাস! মা মেরি!
তুলনা তাহার ঈগলের পাখার বিস্তার
তন্দ্রাচ্ছন্নতা দূরে রাখে প্রার্থনা যাহার!
আমাদের অন্তরে করে প্রবেশ রাখে নিদ্রাবশে!

....

শেষটা বস্তুত খুবই ব্যক্তিগত এবং খুবই মিষ্টি। আমি এটাকে আমার আত্মার উপাসনালয়ে সযত্নে রক্ষা করব। পরের দিনটি এলেই আমি এটি আমার পবিত্র তথা সুগন্ধী থিমোথিনাকে পাঠ করে শোনাব।

আমাকে এখন শান্ত তথা উপাসনার একাগ্রতায় অপেক্ষা করতে হবে।

....

তারিখটা স্থির হয়নি। — আমাকে অপেক্ষা করতে হবে!....

জুন ১৬...

প্রভু, তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হোক। এর পথে আমি কোনও প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করব না! যদি তোমার পরিকল্পনাই থাকে যে তোমার দাসের কাছ থেকে তুমি থিমোথিনার প্রেম অপসারণ করবে। কিন্তু, প্রভু জিসাস, তুমিও কি ভালোবাস না, এবং তোমাকে কি প্রেমের ভল্ল হতভাগ্যের যন্ত্রণায় প্রসন্ন হবার শিক্ষাদান করেনি! আমার জন্য প্রার্থনা করো!

হায়! ১৫ জুনের দুপুর দুটোর স্বাধীনতালাভের জন্য কত দীর্ঘ সময়ই না আমি অপেক্ষায় ছিলাম। আমি আমার বেশ হালকা হয়ে আসা কেশবিন্যাস করেছিলাম, এবং একটা গোলাপি, তীব্রগন্ধী কেশরাগ ব্যবহার করে আমি ললাটে মুক্তি লাভ করবে সেই দিন: জুন ১৫। আমি আমার বেশ হালকা হয়ে আসা কেশবিন্যাস করেছিলাম এবং একটা গোলাপি, তীব্রগন্ধী কেশরাগ ব্যবহার করে আমি ললাটের উপর পাটপাট করে রাখলাম, ঠিক যেমনটি থিমোথিনার বিনুনি। আমি কেশরাগ আমার ভ্রূ-তেও লাগালাম। আমার কৃষ্ণবর্ণের পোশাকটি যত্নসহকারে পরিষ্কার করলাম, আমার পোশাকের যা যা ত্রুটি তা খুব নিপুণভাবে ঠিক করলাম, এবং আশায় ভর করে মঁসিয়ো সেজাৰ্ঁয়া লাবিনেতের দরোজায় ঘণ্টি বাজালাম। তিনিই এলেন, বেশ অনেকটা সময় কাটিয়ে, তাঁর মাথার টুপিটার এককোণ টেনে তুলে, একগুচ্ছ শক্ত কেশ, খুব বেশি ক'রে কেশরাগ মর্দিত যা তাঁর মুখের উপর একটা ক্ষতদাগের মতো, তাঁর লম্বা আলখাল্লার পকেটে একটা হাত ঢুকিয়ে, যা হলুদ ফুলে চিত্রিত, তাঁর অন্যহাত দরোজার হাতলে...তিনি অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে আমাকে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন, আমার জুতোজোড়ার দিকে তাকিয়ে যার কালো ফিতে, তাঁর নাসিকা কুঞ্চিত করলেন, এর ভেতরে ঢুকলেন আমাকে পথ প্রদর্শন করে, তাঁর দুইহাত তাঁর দুই পকেটে, আলখাল্লার সামনের অংশটা টেনে, যেমন যাজক...করেন তাঁর যাজকের পোশাকে, তেমনি করে আমাকে তাঁর পশ্চাদ্দেশের চতুর্সীমার রেখা প্রদর্শন করতে করতে।

আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

তিনি পাকশালার মধ্য দিয়ে গেলেন, এবং তাঁর পিছন পিছন আমি উপস্থিত হলাম বৈঠকখানায়। আহা! সেই বৈঠকখানা! আমি স্মৃতির কীলকে এই বৈঠকখানা আমার মনের সঙ্গে আটকে রেখেছি! দেওয়ালের কাগজগুলোয় বাদামি ফুল। অগ্নিকুণ্ডের উপরতাকে একটা মস্ত কাঠের থাম্বাওয়ালা ঘড়ি; দুটো নীল পুষ্পদানিতে গোলাপের গুচ্ছ; দেওয়ালে, ইঙ্কারমানের যুদ্ধের একটা চিত্র; এবং একটা পেন্সিল ড্রইং, সেজার‍্যাঁর এক বন্ধুর অঙ্কিত যাতে আছে একটা মিল যার চাকাগুলো থেকে নিষ্ঠীবনতুল্য সামান্য স্রোত, এমন ছবি যা প্রত্যেকটি আরম্ভকারী চিত্রী কালো পেন্সিলে বানায়। কবিতা অবশ্যই অধিক পছন্দের।

বৈঠকখানার ঠিক মাঝখানে, একটা সবুজ ঢাকনাচাপা টেবল, যাতে আমার হৃদয় দেখতে পেল থিমোথিনা, সেখানে মঁসিয়ো সেজার‍্যাঁর একজন বন্ধুও ছিল, প্রাক্তন ঘণ্টাবাদক গির্জের..., এবং তার পত্নী মাদাম দ্য বিফ্লাঁদুইঙ, এবং মঁসিয়ো সেজার‍্যাঁ নিজে আমি প্রবেশ করামাত্র উপবেশন করলেন।

আমি একটা গদি আঁটা চেয়ার নিলাম, এবং ভাবলাম আমার শরীরের একটা অংশ এই সূচিকর্মের উপর বিশ্রাম নেবে যা সন্দেহ নেই থিমোথিনা বয়ন করেছে। আমি উপস্থিত প্রত্যেককে অভিবাদন জ্ঞাপন করলাম এবং, আমার কালো টুপিটা টেবিলের উপর রেখে, আমার সামনে, ঠিক আত্মরক্ষার প্রাচীর তৈরি করে, শুনতে লাগলাম....

আমি কোনও কথা বলিনি, কিন্তু আমার হৃদয় কথা বলছিল! ভদ্রলোকেরা তাদের তাসখেলা চালাতে লাগল যা তারা আরম্ভ করেছিল। আমি লক্ষ করছিলাম প্রত্যেকে অন্যকে প্রতিদ্বন্দ্বীর ন্যায় ফাঁকি দিচ্ছে, এবং তা আমাকে যুগপৎ বিস্মিত এবং বেদনার্ত করছিল যখন খেলা শেষ হয়ে গেল, এই সব লোকজনেরা শূন্য অগ্নিকুণ্ড ঘিরে গোল হয়ে উপবেশন করল। আমি একটা কোণায় ছিলাম, সেজার‍্যাঁর বিপুলদেহী বন্ধুর দ্বারা আমি প্রায় আড়াল হয়েছিলাম যার আসনটাই কেবল আমাকে থিমোথিনার থেকে পৃথক করে রেখেছিল। মনে মনে আমি খুশি হয়েছিলাম আমার প্রতি অভিনিবেশের অপ্রতুলতায়। অবৈতনিক ঘণ্টাবাদকের আসনের আড়ালে আমি নির্বাসিত হবার ফলে, আমি অন্য কারও মনোযোগ আকর্ষণ না করে আমার হৃদয়ের অনুভূতি আমার মুখে সপ্রকাশ রাখবার চেষ্টা করছিলাম। আমি খুব ধীরে আমাকে আমার অনুভূতির কাছে সমর্পণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং ভাবছিলাম ওই তিনটে প্রাণীর মধ্যে আলাপচারিতা জীবন্ত হয়ে থাক। থিমোথিনা খুবই কম কথা বলছিল। সে প্রেমমণ্ডিত দৃষ্টি ক্ষেপণ করছিল তার যাজকবৃত্তির শিক্ষানবিসির দিকে, এবং আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকাবার সাহস না দেখিয়ে, সে আমার অত্যন্ত বেশি পালিশ করা পাদুকার দিকে দৃষ্টিক্ষেপন করছিল!...স্থূলকায় ঘণ্টাবাদকের পশ্চাতে, আমি আমার হৃদয়ের অনুভূতি বিস্তার করছিলাম।

আমি শুরু করলাম থিমোথিনার দিকে একটু ঝুঁকে এবং আমার চোখ উপরের দিকে উঠিয়ে সে ঘুরে বসেছিল। আমি আবার সোজা হয়ে বসলাম এবং আমার মাথা নিজের বুকের দিকে নমিত করে, আমি একটা দীর্ঘশ্বাস উচ্চারণ করলাম। ও কিন্তু একটুও নড়ল না। আমি তখন আমার জপমালা আবার তুলে নিলাম। আমি আমার ওষ্ঠ একটু নাড়িয়ে একটা ক্রুশের ক্ষুদ্র চিহ্ন আঁকলাম। ও এর কিছুমাত্র লক্ষ করল না। তারপর, মস্তিষ্ক বিকৃতির মতো হয়ে এবং প্রেমে উন্মাদপ্রায় আমি, ওর দিকে বেশ অনেকটা নিচু হলাম, প্রার্থনা সময়কালীন দু'হাত জড়ো করে, আর খুব দীর্ঘ একটা বেদনাময় আহা! হতভাগ্য! যখন আমি অঙ্গভঙ্গি করেছিলাম, প্রার্থনা করেছিলাম, আমার আসন থেকে বেশ সশব্দে পড়ে গেলাম, এবং ঘণ্টাবাদক মুখ ভেংচিয়ে ফিরে তাকাল, আর থিমোথিনা তার পিতাকে বলল :

— মঁসিয়ো লিওনার্দ মেঝেতে কেন!

তার পিতা অবজ্ঞার প্রকাশ করে! হতভাগা!

আমি লজ্জায় লাল হলাম আর প্রেমে দুর্বল। ঘণ্টাবাদক আমাকে তুলে আবার আমার গদি আঁটা কেদারায় বসিয়ে দিল, এবং কেদারাটার জন্য একটা স্থানও করেছিল। কিন্তু আমি আমার চোখ বন্ধ করেছিলাম এবং চেষ্টা করলাম ঘুমাতে! এইসব লোকজন বিরক্তির কারণ হয়েছিল। তারা তো অনুমান করতে সমর্থ হয়নি এই সবকিছুর ছায়ার আড়ালে কোন সে প্রেম বেদনাসিক্ত হচ্ছিল। আমি নিদ্রা দেবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শ্রবণে আসছিল আমার চারিপাশে কথোপকথনের গুঞ্জন!...

আমি একটু আমার চোখ খুললাম।

সেজার‍্যাঁ আর ঘণ্টাবাদক দু'জনে একটা করে সরু সিগারের ধূমপান করছিল, প্রায় প্রতিটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুদ্রাদোষ প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে, যা দেখে তাদের দু'জনকে ভয়ানক হাস্যকর বলে মনে হচ্ছিল। ঘণ্টাবাদকের পত্নী, তার চেয়ারের কোণায় বসে, তার ফাঁকা বুক সামনে ঝুঁকিয়ে পিছনদিকে তার হলুদ পোশাকের ঢেউ তুলে যা তাকে তার গলা পর্যন্ত আচ্ছাদিত করে রেখেছিল, এ তার কোমরের কাছে ঘাঘরার ফালি তাকে ঘিরে রাখা পুরো দেখিয়ে, খুব কামময় হয়ে একটা গোলাপ থেকে পাপড়িগুলো বিচ্যুত করছিল। একটা ভয়াবহ হাসি তার ওষ্ঠদুটি অর্ধোন্মোচিত করেছিল এবং তার হালকা মাড়িতে প্রত্যক্ষ করছিল দুটি কালো কালো হলুদ দাঁত ঠিক যেমনটি পুরাতন কোনও চুল্লিতে পাথরের কাজে দেখা যায়। — কিন্তু তুমি, থিমোথিনা, তুমি যথার্থ সুন্দরী তোমার শুভ্র গলবন্ধে, তোমার নমিত দৃষ্টিতে, আর তোমার চিতানো বিনুনিতে!

— ও আসলে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পন্ন একজন তরুণ। ওর বর্তমান ওর ভবিষ্যতের উদ্বোধন করছে, এক ঢেউ ধূসর ধূম্র গ্রহণ করতে করতে গির্জের ঘণ্টাবাদক বলছিল...

— ওহো, মঁসিয়ো লিওনার্দ তার পোশাকের সম্মাননা আনয়ন করবে, তার পত্নী তার নাকি স্বরে পটাং পটাং করে বলছিল, এবং তার দুটি দাঁতই তার ফলে প্রত্যক্ষ হয়েছিল!..

যথোপযুক্তভাবে বড় হওয়া ভাল স্বভাবের ছেলেদের মতো আমি রক্তিম হলাম। আমি দেখতে পাচ্ছিলাম চেয়ারগুলি আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছিল এবং আমিই ছিলাম ওদের গুনগুনানির বিষয়...

থিমোথিনা তখনও আমার পাদুকাদ্বয়ের দিকেই তাকিয়ে ছিল...দুটো নোংরা দাঁত ভয় দেখাচ্ছে...ঘণ্টাবাদক তির্যক হাসিতে উথলে উঠল....আমি তখনও আমার মাথা নত করেই রেখেছিলাম!....

— লামার্তিন প্রয়াত হয়েছেন....থিমোথিনা হঠাৎ বলে উঠল।

প্রিয় থিমোথিনা। এটা তো তোমার বন্দনাকারীর জন্য, তোমার বেচারি কবি লিওনার্দের জন্য, তুমি এই কথোপকথনে আনয়ন করলে লামার্তিনের নাম। তখন আমি আমার শির ওঠালাম, আমি বুঝতে পারছিলাম যে কবিতার ভাবনাই একমাত্র এইসব অদীক্ষিত মানুষদের কৌমার্য পুনরুদ্ধার করতে পারে, আমি বুঝতে পারছিলাম আমার দুটি পাখা কম্পিত হচ্ছে, এবং আমি আনন্দকণ্ঠে বললাম, আমার দুই চক্ষু থিমোথিনার উপর ন্যস্ত করে :

— মেপিতাসিও পোয়েতিক্স-এর রচয়িতার শিরোপায় অনেক সুন্দর পুষ্পের অর্ঘ আছে।

— কবিতার রাজহংস প্রয়াত হয়েছেন! বলেছিল ঘণ্টাবাদকের পত্নী।

— যথার্থ, কিন্তু, তিনি অত্যুৎসাহে উত্তর করলাম, তাঁর মৃত্যুর গান নিজেই গেয়েছেন।

— কিন্তু, ঘণ্টাবাদকের পত্নী বলল, মঁসিয়ো লিওনার্দ একজন কবিও বটে! গতবছর ওর মা আমাকে ওর কাব্যলক্ষ্মীর বন্দনার কয়েকটি নমুনা দেখিয়েছিল...

আমি বেশ সাহসের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম :

— ওহো! মাদাম, আমি তো বীণা অথবা সেতার কোনওটাই আনিনি, কিন্তু....

— ওহো! তুমি অবশ্যই অন্য একদিন তোমার সেতারটি সঙ্গে আনবে...

— কিন্তু, যদি আপনার কাছে অসন্তুষ্টির কারণ না হয়, আমি আপনাকে কয়েকটি কবিতা পাঠ করে শোনাতে পারি....আমি কবিতাগুলি মাদমোয়াজেল থিমোথিনাকে উৎসর্গ করেছি।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ, যুবক! অতি উত্তম! তুমি সেগুলি আবৃত্তি করো। ঘরের অন্যদিকে যাও...

আমি সেদিকেই গেলাম...থিমোথিনা আমার জুতোর দিকেই তাকিয়ে ছিল। ঘণ্টাবাদকের পত্নী ম্যাডোনার অভিনয় করেছিল। দুইজন ভদ্রলোক একে অন্যর দিকে ঝুঁকে ছিল...আমি রক্তিমগণ্ড, কাশি এল, এবং উচ্চারণ করলাম কোমলভাবে ছন্দের দোলায় :

এর তুলোট আবাসে
পশ্চিমা বাতাস নিদ্রা যায় সুগন্ধি প্রশ্বাসে :
রেশম ও পশমের এর আবাসনে
নিদ্রা যায় মলয়পবন লম্পট চিবুক নিয়ে।

যারা উপস্থিত ছিল সব হাসিতে ফেটে পড়ল। পুরুষেরা এ ওর দিকে ঝুঁকে মোটাদাগের মশকরা বিনিময় করছিল। কিন্তু যা ছিল সবচেয়ে ভীতিপ্রদ তা হচ্ছে ঘণ্টাবাদকের পত্নীর ব্যবহার, যে নিজের দু'চোখ স্বর্গের দিকে উঠিয়ে, কেমন এক রহস্যময় এবং তার কুৎসিত দন্তের হাস্য ছড়াচ্ছিল! থিমোথিনা, থিমোথিনা হাসিতে গর্জন করে উঠল। এটা আমার পক্ষে ছিল মরণান্তিক আঘাত : থিমোথিনা নিজের পক্ষই অবলম্বন করেছিল!... — একটা সুমিষ্ট মলয়পবন তুলোট আবাসে, কেন তা অতীব মনোরম!....পিতা সেজার্‍্যাঁ বললেন বাতাসের গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে....

আমার মনে হল, আমি কিছু দেখতে পেয়েছি, কিন্তু এই হাস্যরোল কেবলমাত্র একসেকেণ্ড ছিল। তারা সকলেই নিজের নিজের আন্তরিকতা ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, যদিও তা মাঝে-মাঝেই ভেঙে যাচ্ছে...

— পাঠ করো, যুবক, এটা খুবই ভাল!

মলয়পবন যদি গোটায় দু'পাখা
তার তুলোট আবাসে,
যখন ঝটিতি ছোটে যেখানে পুষ্পের ডাক,
সুমিষ্ট প্রশ্বাস তার ছড়ায় সুগন্ধ!...

এই সময় আমার শ্রবণকারীদের গভীর অট্টহাসি কম্পিত করে দিয়েছিল। থিমোথিনা আমার পাদুকার দিকেই তাকিয়েছিল। আমার কেমন গরম বোধ হচ্ছিল। সে যখন তাকিয়েছিল আমার দু'পা যেন পুড়ে যাচ্ছিল, আর পা দুটি তাদের নিজেদের স্বেদে সাঁতার দিচ্ছিল; আর তাই আমি নিজেকেই বলেছিলাম : এই মোজাদুটি ওরই তো ভালোবাসার দান যা আমি গত একমাস পরিধান করছি। আমার পায়ের দিকে যে দৃষ্টিক্ষেপ ও করছে তাও তো তার প্রেমেরই চিহ্ন। ও-ওতো আমাকে বন্দনাই করে!

তারপর একটা ক্ষীণ গন্ধ আমার জুতো থেকে আসছে মনে হল। হায়! আমি এবার বুঝতে পারলাম এইসব লোকজনের প্রবল অট্টহাসির কারণ! আমি বুঝতে পারলাম যে থিমোথিনা লাবিনেতে, এই জনতার মধ্যে বস্তুতপক্ষে প্রক্ষিপ্ত, থিমোথিনা কখনও পারবে না তার আপন অনুরাগের মুক্তিদান করতে! আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম যে আমাকেও পরিবর্জন করতে হবে সেই বেদনাবিধুর প্রেম যা এক মে মাসের অপরাহ্ণে আমার হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল, লাবিনেতেদের পাকশালে যখন আমি দেখেছিলাম এই কুমারীর, বাটি হাতে, নিতম্বের নৃত্য!

এখন চারটে বাজে, আমার ফেরবার সময় হয়েছে, বৈঠকখানার ঘড়িতে। অস্থিরমস্তিষ্ক প্রেমের আগুনে পুড়ে যাই, দুঃখে উন্মত্ত, আমি আমার টুপিটা তুলে নিলাম, পালাতে গিয়ে একটা চেয়ার পর্যন্ত উলটে ফেললাম, হল ঘরটা পার হতে হতে আমি গজগজ করতে লাগলাম, আমি থিমোথিনাকে অনুরাগের বন্দনা করে, এবং একবারও না থেমে যাজকদের শিক্ষালয়ের দিকে পলায়ন করলাম...

আমার কালো পোশাকের লেজুড় আমার পেছন পেছন অমঙ্গলে এক পাখির মতো পতপত করে উড়তে লাগল!...

....

জুন ৩০....

এখন থেকে, আমি পবিত্র কাব্যলক্ষ্মীকে আমার বেদনার পরিচর্যার হাত থেকে নিষ্কৃতি দান করলাম। আঠেরো বছরে আমি শহিদ হওয়াটাই শ্রেয় জ্ঞান করলাম এবং আমার যন্ত্রণার মধ্যে, যৌনতার অন্য একজন শহিদের কথা ভাবলাম যা আমাদের আনন্দ ও সুখের জন্ম দেয়, যাকে ভালবাসতাম তাকে না পেয়ে, আমি ধর্মকেই ভালবাসব! যিশুখ্রিস্ট, মেরি আমাকে তাঁদের হৃদয়ে ঠাঁই দিন। আমি তাঁদেরই অনুসরণ করব। আমি তো জিসাসের পাদুকার ফিতে খোলারও উপযুক্ত নই; কিন্তু হে আমার বেদনা! এবং হে আমার যন্ত্রণা! আমিও তো আঠেরো

বছর, সাতমাস, বহন করছি একটা ক্রুশ, একটা কণ্টকাকীর্ণ মুকুট, কিন্তু আমার হস্তধৃত. নলখাগড়ার পরিবর্তে, একটি তারযন্ত্র! এটাই আমার ক্ষতগুলির মলম হবে!...

....

একবছর পর, অগস্ট প্রথম।

আজ ওরা আমার শরীরে পবিত্র জোব্বাটা চাপিয়ে দিল। আমি ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হলাম। আমি লাভ করব কোনও বিত্তশালী গ্রামে একটি পল্লী যাজকের জন্য নির্দেশিত ভবন এবং একটি ভদ্র চাকর। আমার বিশ্বাস আছে। আমি আমার পাপমুক্তি অর্জন করতে সক্ষম হব, এবং মিতব্যয়ী হবার ফলে, আমি ঈশ্বরের একজন মহৎ পরিচারকের ন্যায় তার পরিচারককে নিয়ে জীবনযাপন করতে পারব। আমার মাতা পবিত্র গির্জে আমাকে তার বক্ষে আশ্রয়দান করবে। তাঁকে মহিমান্বিত করো, ঈশ্বরকে মহিমাময় করো!

...যেহেতু সেই নিষ্ঠুর প্রেমময় অনুরাগ আমি আমার হৃদয়ের অতলে সযত্নে রেখেছিলাম, আমি বিশ্বস্ততার সঙ্গে তা বহন করতেও সক্ষম হব। কোনও মুহূর্তেও তা আর জাগরুক হতে না দিয়ে, কোনও কোনও সময়ে আমি তার স্মৃতি রোমন্থন করব : এইসব বস্তুত অতীব মধুর! — অধিকন্তু, আমি তো জন্মেছিলাম প্রেমের জন্য এবং বিশ্বাসের জন্য। — সম্ভবত একদিন, এই শহরে প্রত্যাবর্তন করলে, আমি থিমোথিনার স্বীকারোক্তি শ্রবণের সুযোগ লাভ করব...এবং তখন, তার কাছ থেকেও আমি লাভ করব একটি মধুর স্মৃতিচারণ : গত একবছর আমি তার দেওয়া মোজাজোড়া পরিত্যাগ করিনি....

হায় ঈশ্বর, আমি এই মোজা, যতদিন না তোমার আশীর্বাদধন্য স্বর্গে পৌছতে সক্ষম হই, ততদিন আমার পায়েই পরিহিত থাকবে!...

মূল রচনা : Un Cocur sous une soutane : Intimités d'un Séminariste
ইংরেজিতে : A Heart under a Cassock : confidences of a seminarian

শান্তিদেব ঘোষের কিছু চিঠি

অমিতাভ চৌধুরি

*(শান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্রনৃত্যে একটি স্মরণীয় নাম। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র ও বিখ্যাত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরিকে লেখা কিছু চিঠি ও তার সঙ্গে চিঠির বক্তব্য-সংলগ্ন একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা এখানে ছাপা হল। বলাই বাহুল, চিঠিপত্রে প্রকাশিত শান্তিদেবের সব বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। দু-একটি জায়গায় আমরা সম্পূর্ণ অন্য মত পোষণ করি। তবু চিঠিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। মুদ্রণের অনুমতি দেবার জন্য শ্রদ্ধেয় অমিতাভ চৌধুরিকে জানাই কৃতজ্ঞতা। — **সম্পাদক বিভাব**)*

শান্তিদেব ঘোষ চিঠি লিখতেন প্রচুর। রবীন্দ্রনাথের মতোই। আমাকে, তাঁর ছোটভাই শুভময়ের বন্ধুকেলেখা চিঠিও কম নয়। তাতে আছে কারও প্রতি ভালবাসা কারও প্রতি রাগ এবং তাঁর প্রতি নানা জনের অবিচারের অভিযোগ। শান্তিদা আমাকে ভালবাসতেন ছোটভাইয়ের মতো, নানা পরামর্শও চেয়েছেন। তাঁর সঙ্গে গিয়েছি দিল্লি, আমেদাবাদ, মুম্বাই, শিলাইদহ, ঢাকা ইত্যাদি জায়গায়, আড্ডা মেরেছি, তাস খেলেছি বাড়িতে বসে, কলকাতায় আমার বাড়িতেও থেকেছেন। কিন্তু চুপিচুপি বলি, তিনি ছিলেন যাকে বলে 'কানপাতলা লোক'। 'কেউ কারও সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে কোনও কুকথা বললে তিনি বিশ্বাস করতেন এবং ভালভাবে যাচাই না করেই বকাবকি করতেন। আমার ক্ষেত্রেও দু'চারবার এমন হয়েছে। পরে ভুল বুঝতে পেরে ত্রুটি স্বীকার করেছেন। অকারণে ভুল বুঝে একেবারে শেষে সে সুযোগ আর পাননি। এই সঙ্গে আমাকে লেখা তাঁর বাছাই করা চিঠি পরপর সাজিয়ে দিলাম। চিঠিগুলোতে শান্তিদেব ঘোষকে খানিকটা চেনা যেতে পারে, আমি চিঠির কোনও কিছু গোপন করিনি, কারও নাম কেটে দিইনি — যা ছিল তাই আছে। কোনও কোনও চিঠির তলায় সামান্য টীকা দিলাম, নাম ও বক্তব্য একটু বিশদ করার জন্য, সত্তরের দশকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অনুরোধ করে শান্তিদার যৎকিঞ্চিৎ সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করি। তারও উল্লেখ আছে একটি চিঠিতে। বারবার বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়েছে, আজ যে প্রিয়জন, কাল তিনি অপ্রিয় হয়েছেন, কিন্তু সব ছাপিয়ে তিনি তাঁর পিতার পিতৃতুল্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা বা আনুগত্য হারাননি।

১। শান্তিনিকেতন
১৫/১০/৫২

প্রীতিভাজনেষু

অমিতাভ — আমার শিলচর যাবার বিষয়ে তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে। তুমি আমাকে একটু খবর দিয়ো লক্ষ্মীপুর ইত্যাদি অঞ্চলে আগামী পূর্ণিমার দিন মণিপুরিদের

মহারাসের নৃত্যগীত দেখবার ও শোনবার সুবিধা কেমন হবে। তোমাদের অঞ্চলে যদি থাকে তাও জানিও। মোট কথা যেখানে গেলে দিন কয়েক পূর্বে Rehearsalও দেখা যাবে সেই সংবাদও দিয়ো। তোমার চিঠি পেলে পাকাপাকি ব্যবস্থা করব।

আশা করি তোমরা ভাল আছ। এখানকার সংবাদ মোটামুটি ভাল। হাসি, ভুলুরা ভাল আছে। এদিকে কয়েকদিন বৃষ্টি হয়ে এখন বেশ পরিষ্কার দিন যাচ্ছে। শেষ করি। ইতি

তোমাদের

[হাসি : শান্তিদেবের স্ত্রী ইলা ঘোষ।
ভুলু : শান্তিদেবের ছোটভাই শুভময় ঘোষ]

শান্তিদেব
শান্তিনিকেতন
২৭/১১/৬১

২।

ভাই অমিতাভ,

৭ই পৌষের উৎসবের লোকগীতের আসরে অন্যান্য গাইয়েদের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে। এখন নির্মল চৌধুরির বিষয়টা পাকা করে ফেলতে চাই। ওদের দলের ৬ জনের মতো থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। এখন টাকার প্রশ্নটাই পাকা করে ফেলতে চাই। সব মিলিয়ে আমরা যদি ১৫০টাকা দিই তাহলে কি ওদের হবে? এখানে খাওয়ার খরচ আমাদের। অন্যরা আলাদা কোনও পারিশ্রমিক নিচ্ছে না। যাতায়াত থাকা ও খাওয়ার খরচ নিয়েই আসছে। তুমি আমাকে জানিও এ টাকায় নির্মল রাজি হবে কিনা। বিচিত্র রকমের লোকনৃত্য গীত অভিনয়ের আয়োজন হবে। আশা করছি এবারে শতবার্ষিকী উৎসবের এই দিকটাই জমজমাট হবে। তুমি চিঠি পেয়েছ সংবাদ নিয়ে আমাকে জানিয়ো। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

তোমার বইটি পড়া হয়ে গেছে। পরে তোমাকে ওই বিষয়ে জানাব। আজ খুব ব্যস্ত আছি।

ইতি—
তোমাদের
শান্তিদা

[নির্মল : বিখ্যাত গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী।]

৩।

শান্তিনিকেতন
২১/৭/৭০

প্রিয় অমিতাভ,

আনন্দবাজারের চিঠিপত্র অংশে শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারার ব্যাখ্যা এবং আমার বিষয়ে তুমি যা লিখেছ (আমার অনুমান) তাতে আমি যে কতখানি খুশি হয়েছি তা বলতে পারি না। অনাদিদার শিক্ষকতার সংবাদেও তুমি ঠিক কথাই লিখেছ। গুরুদেবের দু-তিনটি চিঠির লাইন তোমাকে পাঠাচ্ছি আনন্দবাজারের চিঠিতে আমার বিষয়ে যা বলা হয়েছে তাতে তার সমর্থন পাবে।

১। ১৯৩৬, ২৯ আশ্বিন, প্রতিমাদেবীকে —

"চিত্রাঙ্গদার রিহর্সল চলবে। এর নাচের অংশ সম্বন্ধে বিচার করা আমার পক্ষে শক্ত। শান্তি আছে সে একরকম ঠিক করে নেবে।"

২। ১৯৩৮, ২১/৯ - প্রতিমাদেবীকে —

"কাল বর্ষামঙ্গল — শান্তির সঙ্গে রফা করে নিয়েছি — ভালোই হবে। সেই সিন্ধি মেয়েটি খুব ভালো নাচছে।"

৩। ১৯৩৯ সালে সভাযাত্রার পক্ষে রেঙ্গুনে কিছুদিন থেকে টিকিট করে একটি নৃত্যানুষ্ঠান এবং সেখানকার বাঙালি মেয়েদের দিয়ে 'নটীর পূজা' অভিনয় করিয়েছিলাম। সংবাদপত্রে দুটি অনুষ্ঠানই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পায়। রেঙ্গুন থেকে কোনও পরিচিত ব্যক্তির কাছ থেকে গুরুদেব সেই সংবাদ পেয়ে শ্রীমতী নন্দিতাকে ১১/৬ তারিখের চিঠিতে লিখছেন —

"নটরাজ পথিমধ্যে রেঙ্গুনে খুব ধুমধাম করেছে। ভদ্রলোক আস্ত ফিরলে হয়।"

নন্দিতাদের সামনে গুরুদেব সর্বদাই আমাকে নটরাজ বলে ডাকতেন।

আমার শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি —
তোমাদের
শান্তিদা

[অনানিদা : অনাদিকুমার দস্তিদার। সিন্ধি মেয়েটি : শান্তিনিকেতনের ছাত্রী বিষনি জগ্‌গিয়া। নন্দিতা : নন্দিতা কৃপালনি।]

৪।

শান্তিনিকেতন
তারিখ ??

প্রিয় অমিতাভ,

তুমি হয়তো শুনেছ যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ২৫০০ টাকা পাঠিয়েছেন আমার বর্তমান আর্থিক অনটনের কথা কারু কাছে শুনে। আমি তা গ্রহণ করেছি। যদিও এরকম সাহায্যের চিন্তা আমি করিনি। আমি চেয়েছিলাম আমার কাছ থেকে কাজ নিয়ে, পরিবর্তে আমাকে পারিশ্রমিক দেবে। তাঁকে ভাল করে ধন্যবাদ জানিয়ে অবশ্য চিঠি দিয়েছি।

এদিকে মাসুদ্ সাহেব আমার পেনশনের বিষয়ে চিঠি তৈরি করবার জন্যে এখানকার কর্মসচিবের অফিস থেকে যাবতীয় কাগজ-পত্র নিয়ে গেছেন। আমার কাছ থেকে পূজনীয় গুরুদেবের চিঠিটির একটি কপিও তিনি নিজে থেকে চেয়েছেন। ইন্দিরার প্রাইভেট সেক্রেটারির পাঠানো টাকার সঙ্গে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটিও তাঁকে দেখানো হয়েছে। এছাড়া বিশ্বভারতীর কর্মসচিব ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ তারিখে যে চিঠিটি আমাকে দিয়েছিলেন, মাসুদ সাহেবকে সেটিও দেখানো হয়, কর্মসচিব কীভাবে মিথ্যাচারণ করেছিলেন এবং কীরূপ অভদ্র ভাষায় চিঠিটি লিখেছিলেন তা উদ্ধৃত করে তোমাকে জানাই :—

"With reference to your letter dated 24.11.73 on the subject cited above, I am directed to let you know that as per decision of the karma-samiti taken at its meeting held on 27.4.68, your services as an Adhyapaka in Rabindra sangit & Dance of this university will be counted w.e.f. 14.8.61.

I would therefore, request you kindly to exercise your option on the prescribed form, already sent to you, and send it to this office stating reson or not exercising it within the stipulated period for placing it before the Karma-Samiti for obtaining a decision in the matter."

১৯৭১ সালে আমার কর্ম-ছেদ-এর বিষয়টিকে কর্মসমিতি ও সংসদ condone করার

পরেও প্রস্তাবটিকে গোপন করে কেন যে এইরূপ চিঠি দিয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ মিথ্যাচারণ করলেন প্রথমে তার কারণ বুঝে উঠতে পারিনি। এখন তা অনুমান করছি।

তুমি হয়তো শুনে থাকবে ২/৩ বছর পূর্বে U.G.C.-র প্রস্তাব অনুসারে যখন বিশ্বভারতীর কয়েকজন অধ্যাপককে সিনিয়র প্রফেসর করার কথা ওঠে তখন সেই তালিকায় নাকি আমারও নাম উঠেছিল। কিন্তু, কর্মসমিতির কয়েকজন সদস্য সেই তালিকায় আমার নাম দেখে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, আমি আইনত ১৯৬১ সালে কর্মে যোগ দিয়েছি সুতরাং সিনিয়র প্রফেসর-এর সুবিধা গ্রহণে অধিকার আমার নেই। উপাচার্য এই আপত্তির কোনও প্রতিবাদ করেননি এবং ১৯৭১ সালের পেনশনের প্রস্তাবটির কথাও সেখানে ওঠেনি। এরপরে, আমার কর্মচ্ছেদ্-এর বিষয় নিয়ে যখনই প্রশ্ন তুলেছি, উপাচার্য সেসময়ে আমাকে সঠিক কিছু বলতেন না। ক্রমাগত বলতেন আইনত তা সম্ভব নয়। কর্মসচিবের ২৮ ফেব্রুয়ারির চিঠির উদ্দেশ্য ছিল, তার দ্বারা ১৯৬১ সালকে মেনে নিয়ে আমি যাতে দরখাস্ত পত্রে সই করতে বাধ্য হই। কিন্তু, আমার সই করা স্বীকৃতি-পত্রটি না পাওয়ার দরুন উপাচার্য ও কর্মসমিতির কতিপয় সদস্য মনে মনে আমার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট। শোনা যায়, মাসুদসাহেব এনিয়ে খোঁজ-খবর করবেন শুনে কর্মসমিতির ওই সব সদস্যগণ এবারের অধিবেশনে আমার বিষয়ে কোনওপ্রকার আলোচনা বা প্রতিবাদ তোলেননি। এবং আমার কর্মচ্ছেদ বাতিলের পুরানো (১৯৭১) প্রস্তাবের ভিত্তিতে মাসুদসাহেবকে চিঠি তৈরি করবার জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং উপাচার্যকে নির্দেশ দেন সেই চিঠি আচার্যের কাছে অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে। সিনিয়র প্রোফেসর-এর ঘটনাটির জন্যেই এই গোপনতা।

কৌশিক যে একসঙ্গে কলাভবন ও সংগীত-ভবনের ডাইরেক্টর হবার চেষ্টা চালিয়ে আসছে এবং উপাচার্যেরও এবিষয়ে একসময়ে সমর্থন ছিল, এখন তা পরিষ্কার বোঝা গেল। গত ২৮ জুন তারিখে, বিশ্বভারতীর উন্নতিকল্পে কমিশন শান্তিনিকেতনে এসেছিল। সেসময়ে বিশ্বভারতীর পেনশন প্রাপকদের অনেককেই একে একে ডাকা হয়েছিল কমিশনের কাছে তাঁদের মতামত জানবার জন্যে। আমাকেও বলা হয়েছিল। আমাকে প্রথমেই যে প্রশ্নটি করেছিলেন শঙ্খ ও কৃপালনি, তাহল — সংগীতভবন ও কলাভবন গুরুদেবের আমলে একসঙ্গে ছিল, পুনরায় সেইভাবে দুই ভবনকে এককরা যেতে পারে কি? আমি বলি — একসঙ্গে ছিল ১৯৩১ সাল পর্যন্ত। ১৯৩২ সালে দুটিকে আলাদা নামে, ভিন্ন করেছিলেন স্বয়ং গুরুদেব ও নন্দলাল। প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দুই বিভাগের শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ও কাজ বেড়ে যাওয়ায়। বর্তমানে দুই ভবনের কাজ নতুন নিয়মে যেভাবে বেড়ে গেছে তাতে আর পুরনো জায়গায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়, কিছুতেই।

এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে কৌশিক কেন আমাকে বিশ্বভারতী থেকে সরাবার জন্যে গত একবছর থেকে উঠে পড়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিল এবং উপাচার্য এতদিন কৌশিকের ভয়ে সমস্ত মেনে আমার কাছে, সব কিছু লুকোচ্ছিলেন।

[মাসুদ : বিশ্বভারতীর তৎকালীন অর্থসচিব বিচারপতি মাসুদ। ইতি —
কৌশিক : চিত্রশিল্পী দিনকর কৌশিক। শঙ্খ : ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। তোমাদের
কৃপালনি : কৃষ্ণ কৃপালনি, নন্দলাল : নন্দলাল বসু।] শান্তিদা

৫। ১৮/৩/৭৪

প্রিয় অমিতাভ,

তোমাকে একটি সংবাদ দিই। এবারে যখন কলিকাতায় গিয়েছিলাম তখন কানাই আমাকে বলেছিল, প্রতুলবাবু, তাঁকে বলেছেন কণিকা ব্যানার্জি, বরুণ দে এবং আরও কয়েকজন কর্মসমিতির সদস্যদের সাহায্যে, আমার বিরুদ্ধতা করার জন্যেই নাকি আমাকে প্রতুলবাবু সংগীত-ভবনের কাজে আর রাখতে পারলেন না। কণিকা নাকি কর্মসমিতির সদস্যদের সাহায্যে আমার সঙ্গীত ভবনে থাকার বিরুদ্ধতা করে যাচ্ছে। এই কারণে তিনি নিরুপায় বোধ করেছেন।

এছাড়া আর একটি খবর ছিল, জানুয়ারি মাসে জামসেদপুর যাবার সময় সন্তোষ ঘোষ আমার কম্পার্টমেন্টে এসে কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন, কণিকাদেবীর অভিযোগ হচ্ছে, আমি নাকি তাঁকে পছন্দ করি না। সন্তোষবাবু অবশ্য কথাটি হাসিঠাট্টার ছলেই বলেছিলেন। এই হল বর্তমান অবস্থা। সুতরাং তুমি যে প্রস্তাব ইন্দিরার কাছে দিয়েছ সেটি যদি সফল হয় তো আমি সত্যিই বেঁচে যাই। এ ধরনের নোংরামির মধ্যে থাকতে মন আর কিছুতেই চাইছে না। ইতি —

[প্রতুলবাবু : প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। কণিকা : কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমাদের
কানাই : কানাইলাল সরকার। বরুণ দে : ঐতিহাসিক বরুণ দে। শান্তিদা
সন্তোষ ঘোষ : সন্তোষ কুমার ঘোষ।]

৬। দয়ালচাঁদ নগর
জি: পূনা, মহারাষ্ট্র
৬/২/৭৪

কল্যাণীয়া,

সুনন্দা, আজ সকালে মুম্বাই থেকে আসছি। "Indian Express" সংবাদ পত্রটির খবর পড়তে পড়তে হঠাৎ চোখে পড়ল ''Tagore Music Exponent dies''। তারপরে দেখি, অনাদিদার মৃত্যুসংবাদ। ৪ তারিখে বিকালে প্রাণত্যাগ করেছেন। সংবাদটি পেয়ে খুবই মন বিচলিত। আমাদের বাল্যজীবনের সঙ্গে, সংগীতাদির ক্ষেত্রে যাঁরা ঘনিষ্ঠ্যভাবে যুক্ত ছিলেন অনাদিদা বোধ হয় তাদের মধ্যে শেষ ব্যক্তি। আর কারও কথাই মনে পড়ছে না যিনি গুরুদেবের গানকেই জীবনের সব কিছু মনে করে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে একটি যুগের অবসান হল।

তাঁর সঙ্গে জীবনে অনেকভাবে আমার যোগাযোগ ছিল। তিনি আমাকে ছোটভাইয়ের মতোই দেখতেন। সেই কারণে মন আমার খুবই খারাপ লাগছে। যদিও তিনি সুস্থ ছিলেন না তবুও তিনি জীবিত ছিলেন এটাই ছিল আমার কাছে আনন্দের বিষয়।

তোমাদের এ বিষয়ে কী আর বলব। বলার কিছুই নেই। অনাদিদা পরলোকে গিয়ে এতদিনে পরম শান্তি পেলেন বলেই মনে করি।

আমি এখান থেকে কদিন পরে মুম্বই ফিরব। সেখানে হয়তো কিছুদিন থাকতে হবে। তারপরে কলকাতা হয়ে ফিরব। তখন তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

তোমরা আমাদের শুভেচ্ছা জেনো। অনাদিদার স্ত্রীকে আমার কথা বলো। আজ এখানেই

শেষ করছি।

[সুনন্দা : অনাদিকুমার দস্তিদারের কন্যা। অনাদিদা : অনাদিকুমার দস্তিদার।] ইতি—

তোমাদের
শান্তিদা

৭। শান্তিনিকেতন
২৯/৪/৭৪

প্রিয় অমিতাভ,

আজকে তোমার চিঠি পেয়ে আমি যে কতখানি নিশ্চিন্ত হলাম তা তোমাকে বলতে পারছি না। এভাবেই এখানে থাকতে পারলে সব দিক থেকে বেঁচে যাই। যে টাকা দেবে স্থির হয়েছে তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। সেভাবেই আমি চালিয়ে নেব। যাইহোক, এদিকের বিশেষ খবর তোমাকে জানাই।

যোশি, মোহর, নীলিমা ও আরতি সম্প্রতি কীভাবে যোশির সঙ্গে এখানকার মেয়েটির অশোভন আচরণ নিয়ে আন্দোলনকে আমার বিরুদ্ধে লাগাচ্ছে তা লিখছি।

গত ২৭/৪ তারিখে যোশি, মোহর, নীলিমা ও আরতি বোলপুর থানার দারোগাকে সংগীত-ভবনে আনিয়েছিল — উপাচার্য মহাশয়, কর্মসচিব এবং ওয়াচ এন্ড ওয়ার্ডকে না জানিয়ে। সংগীত-ভবনের অফিসে দারোগার সামনে সংগীত-ভবনের দুটি ছাত্রকে তাঁরা সকলে মিলে জেরা করে। যোশি, মোহর, নীলিমা এবং আরতি ছাত্রদুটিকে প্রশ্ন করে বারে বারে এই বলে যে,

১। শান্তিদাকে তাদের ভাল লাগে না যোশিকে তাদের ভাল লাগে?
২। অধ্যক্ষ হিসেবে যোশি উপযুক্তি কি? শান্তিদা উপযুক্ত?

ওই চারজন প্রমাণ করবার চেষ্টায় উঠেপড়ে সর্বত্র প্রচার করে বেড়াচ্ছে এই বলে যে, শান্তিদা বিশ্বভারতীকে নিজের সম্পদ করে নিয়েছেন। তিনি চিরকাল অধ্যক্ষ থাকবেন। আর কেউ যাতে হতে না পারে সেই জন্যে চেষ্টা চলেছে। যোশিজির নামে ছাত্রীঘটিত আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল যোশিজিকে অধ্যক্ষপদ থেকে সরানো। তোমরা যে চিঠি ইন্দিরাকে পাঠিয়েছিলেন তাতে ওদের ধারণা হয়েছে যে, যদি আমি সংগীত-ভবনে ফিরে যাই তাহলে যোশিজিকে হয়তো সরতে হবে ইত্যাদি নানারূপ কাল্পনিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে এই চারজন প্রবল হইচই করে বেড়াচ্ছে। পুলিশ ডেকে প্রমাণ করতে চাইছে আমি এর পিছনে আছি।

এই হল বর্তমান পরিস্থিতি। যে কারণে তোমার কাছে যে খবর পেলাম তাতে আমি খুবই স্বস্তি বোধ করছি। ওদের ভয় ভাবনাও দূর হবে। আমিও নিশ্চিন্ত।

আজ শেষ করি। কলকাতায় ১০/১১ তারিখে যাব তখন বিস্তারিত কথা হবে।

ইতি,

[যোশি : ধ্রুবতারা যোশি। মোহর : কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তোমাদের
নীলিমা : নীলিমা সেন। আরতি : আরতি গুপ্ত।] শান্তিদা

৮। শান্তিনিকেতন
১১/৪/৭৪

প্রিয় অমিতাভ,

তোমার কাছে একটি লেখা পাঠিয়েছিলাম আনন্দবাজারের রবিবারের পাতায় প্রকাশের ইচ্ছায়। আমার বিশেষ অনুরোধ, প্রবন্ধটি প্রকাশের ব্যবস্থা করো। ওই চিঠি কটি প্রকাশের দ্বারা বর্তমানের বিশ্বভারতী সংক্রান্ত চিন্তার উপর বড় রকমের ধাক্কা এসে পড়বে বলে আমার ধারণা।

গুরুদেবের সর্বাঙ্গীন শিক্ষার আদর্শকে তাঁর জীবিতকালেই তাঁর অত্যন্ত অনুরাগীরা যে বিশ্বাস করতেন না এবং গ্রহণ করেননি সেকথা এর থেকে পরিষ্কার ধরা পড়বে। গুরুদেব প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার পর থেকে। তখন বাইরের একদল জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বানেরা বিশ্বভারতীর সুষ্ঠু পরিচালনার কথা শুনিয়ে, কেবল বিশ্বভারতীর প্রশাসনের দায়িত্ব নেবার কাজে এসে ভিড় করলেন। এখানকার প্রতিদিনের কর্মজীবনের সঙ্গে তাঁদের কোনও যোগ ছিল না। নিজেদের স্বার্থত্যাগ করে তাঁরা এখানে এসে পূর্বযুগের অধ্যাপকদের মতো জীবন উৎসর্গ করতে চাইলেন না।

দেখা যায়, শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের অধ্যাপকেরা এখানে আসতেন গুরুদেবকে গুরুরূপে ভক্তি নিয়ে, তাঁর কর্মেই জীবন উৎসর্গ করতেন, এবং তাঁদের হাতেই থাকত বিদ্যালয়ের পরিচালনার দায়িত্ব। বিশ্বভারতীর সময় থেকে বাইরের ভক্তরা প্রশাসনের দায়িত্ব নিলেন, কিন্তু এখানকার কর্মের দায়িত্ব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেলেন। এরা গুরুদেবের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসও রাখেননি কিন্তু আলোচনা করব বলে সংলাপ করেছি।

গত ৬/৪/৮৪ তারিখে, অমিতাভ ঘোষ কর্তৃক আয়োজিত ''রবীন্দ্রসংগীত পরিষদে' আমার একক গান গাওয়া নিয়ে শৈলজাবাবু কীরূপ নোংরামি করেছিলেন তুমি অমিতাভ ঘোষকে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করে নিয়ো। কানাইকে আমি বলেছি ঘটনার কথা সেও তোমাকে বলতে পারবে। শৈলজাবাবু ম্যাজিস্ট্রেটকে দিয়ে আমার গানের অনুষ্ঠান বন্ধ করার জন্য ইনজাংশন জারি করিয়েছিলেন। গান বন্ধ হয়নি। পুলিশ এসে গানের সময় তদন্ত করেও গিয়েছিল। ''গুরুদেবের আদর্শে অনুপ্রাণিত'' ভক্তের এইরূপ কাজে আমি স্তম্ভিত। কতখানি নিচতার পঙ্কে নামলে পরে লোকে এমন গর্হিতকাজ করতে পারে এ তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ইন্দিরাকে লেখা তোমার চিঠির কপি পেয়েছি। ভালই হয়েছে। তবে এর সঙ্গে একটি বিষয় যদি জুড়ে দিতে তাহলে হয়তো যুক্তি আরও জোরাল হতো। আমার শান্তিনিকেতনের কর্মে জড়িত থাকার আর একটি বড় কারণ হল, গুরুদেবের লিখিত নির্দেশ। তিনি মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে লিখিতভাবে বলেছিলেন, কোনওরূপ প্রলোভনে আমি যেন শান্তিনিকেতন ত্যাগ না করি। যদি তা করি, তবে গুরুদেব ও শান্তিনিকেতনকে আমার অসম্মান করা হবে। তাঁর এই নির্দেশ আমি কোনওদিনই অমান্য করিনি, করবার চেষ্টাও করিনি। আমাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বভারতী, তবেই আমি বাইরে গেছি। এইরূপ অপমানজনক অবস্থায়ও আমি নিজে থেকে যাইনি। সব সহ্য করেছি। গুরুদেবের নির্দেশের কথাটি ইন্দিরার চিঠিতে থাকলে ভাল হতো এই কারণে যে তাতে তোমরা বলতে পারতে যে গুরুদেব যা চেয়েছিলেন তোমরা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ মাত্র। এরপরেও যদি বিশ্বভারতী মনে করে আমার

প্রয়োজন নেই তখন তার দায়িত্ব বিশ্বভারতীর। এবং গুরুদেবের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ বিশ্বভারতীই করবে। আজ এখানেই শেষ করছি। ইতি —

তোমাদের
শান্তিদা

[অমিতাভ ঘোষ : সংগীত সমালোচক।
শৈলজাবাবু : শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ইন্দিরা : ইন্দিরা গান্ধী।]

৯।

শান্তিনিকেতন
২৫/৬/৭৪

প্রিয় অমিতাভ,

আজ হঠাৎ শ্রীমতী ইন্দিরার অফিস থেকে একটি ২৫০০ টাকার চেক পেলাম। Private Secretary সঙ্গের চিঠিতে জানাচ্ছে — "She has sanction a sum of Rs. 2500 from the funds at her disposal which she hopes will be of some help." বুঝতে পারছি না কেন এই টাকাটা পাঠাচ্ছেন ইন্দিরা। এ ধরনের সাহায্যতো আমি চাইনি। আমার মনে হচ্ছে বোধহয় তিনি কারও মুখে শুনেছেন যে বর্তমানে আমি মাইনে পাচ্ছি না, পেনশনের টাকাও নেই, তাইতে হয়তো অসুবিধায় পড়েছি। তাই উপস্থিতে এ টাকাটা পাঠালেন। ভবিষ্যতের জন্য হয়তো কিছু করছেন। টাকাটার জন্যে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে উত্তর দেব। কাজের বিষয়ে এখনও জানতে পারিনি। উপাচার্য মহাশয় খুলে কিছু বলছেন না কাউকেই। তবে এটুকু বলছেন U.G.C. কিছু করছে। খরচ এলেই সব জানা যাবে।

পেনশনের বিষয়ে যা হয়েছে তার খবর নিশ্চয় পেয়েছ। কানাইকে লিখে তা জানিয়েছি। তোমাকেও জানাতে বলেছি। টাকার খবরটাও ওকে দিয়ো। আমার শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

তোমাদের
শান্তিদা।

[ইন্দিরা : ইন্দিরা গান্ধী। কানাই : কানাইলাল সরকার।]

১০।

শান্তিনিকেতন
২/১২/৭৪

প্রিয় অমিতাভ,

বিশ্বভারতীর স্বরলিপি সংক্রান্ত তোমার চিঠি যথা সময়েই পেয়েছিলাম। তোমার প্রবন্ধটি প্রকাশিত হবার পর গ্রন্থন বিভাগের মনোভাব সম্প্রতি ভিন্ন পথ যে নিয়েছে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। স্বরবিতান ১ম খণ্ডের বিজ্ঞপ্তিটির পরিবর্তন তাঁরা বোধহয় আর করবেন না বলেই স্থির করেছেন। এবং স্বরলিপি সংক্রান্ত তাঁদের অন্যায় কাজের জন্য আমাকে দায়ী করার সিদ্ধান্ত থেকে এখন আর তাঁরা নড়বেন না বলেই মনে হচ্ছে।

অনাদিদা সম্পর্কে তুমি যা বলেছ তোমার চিঠিতে তার উত্তরে আমার বক্তব্য আমি জানাচ্ছি।

অনাদিদার কোনওদিনই সম্পাদনার প্রকৃত দায়িত্ব ছিল না। তাঁর দায়িত্ব ছিল স্বরবিতান প্রকাশের এবং ছাপার ভুলভ্রান্তি সংশোধন করার। তাঁর কাছে তথ্যহীন নানারকমের স্বরলিপি আসত, তিনি তাকে মুদ্রণের সময় যথাযথ নিয়মে গ্রন্থে যোগ করে দিতেন। প্রামাণ্য সুরের পরিবর্তে অজ্ঞাতকুলশীল সুরগুলি বসানোর সিদ্ধান্ত অনাদিদা নেননি। তাঁকে সেভাবে কাজ করতে বলা হয়েছিল, তিনি সেইভাবে কাজ করে গেছেন। এ নিয়ে বেশ কয়েকবার তাঁর সঙ্গে আমার চিঠিপত্রে বাদপ্রতিবাদ হয়েছে। তিনি নিজে তার উত্তর খুব কমই দিতেন, পরিবর্তে শ্রীপুলিন সেনের কাছ থেকেই বেশি উত্তর পেতাম। তোমাকে পূর্বেও বলেছি যে, অনাদিদা অত্যন্ত নির্বিরোধী লোক ছিলেন বলেই তাঁকে কেবল প্রকাশনার দায়িত্ব দিয়ে কয়েকজন যা খুশি তাই করে গেছেন।

সম্পাদনা কালে গ্রন্থে সুর পরিবর্তনের কারণ এবং আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সন্নিবেশের দায়িত্ব শ্রীপুলিন সেন তাঁর নিজের হাতেই রেখেছিলেন। এপথে তাঁকে সাহায্য করতেন অন্যরা। তাঁরাই লিখতেন ভূমিকা প্রভৃতি। তাতে সর্বদাই সংক্ষিপ্ত বা অসম্পূর্ণ বক্তব্য রাখা হত শ্রীপুলিন সেনের নির্দেশ মতো। স্বরবিতানের প্রতি খণ্ডে সুরের পরিবর্তন, নতুন সুরের সংযোজন যা দেখি, তাকে, কখন কীভাবে পাওয়া গেল, কার কাছ থেকে পাওয়া গেল সে সব তথ্য কিছুতেই গ্রন্থে মুদ্রিত হত না, এখনও তা হচ্ছে না। পূর্বমুদ্রিত প্রামাণ্য স্বরলিপির সুরগুলি ইচ্ছে করে স্বরবিতানে যোজনা করা হয়নি, অথচ পরিচয়হীন সুর অজস্র যোজনা করা হয়েছে। এই বিকৃত রীতির সম্পাদনার জন্যে অনাদিদা একেবারেই যে দায়ী নন সে কথা আমি ভাল করেই জানি।

পূজনীয় গুরুদেবের মৃত্যুর পর প্রথম স্বরলিপি সমিতি গঠিত হয়। প্রথম অধিবেশনের পর থেকে বহু বৎসর পর্যন্ত সদস্য হিসেবে কখনও জানতে পারিনি, সমিতির কোনও অধিবেশন ডাকা হয়েছিল কিনা। এদিকে ওই সময়ে প্রতিবছরেই কয়েকটি ক'রে স্বরবিতান প্রকাশিত হয়েছে বিকৃতরীতিতে সম্পাদনার নামে। এর জন্য শ্রীপুলিন সেনই সম্পূর্ণ দায়ী। ওই ভ্রান্তরীতির সম্পাদনার প্রতিবাদ করব জেনেই, তিনি যতদিন বিশ্বভারতীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন একটি সভাতেও যোগদানের কথা আমাকে জানাননি। সভা বসত কিনা তাও জানি না। এই কারণে আমি বেশ কয়েক বছর পর বিরক্ত হয়ে সদস্যপদ ত্যাগ করি। শ্রীপুলিন সেন এইভাবে দাপটের সঙ্গে স্বরলিপির বা স্বরবিতান প্রকাশনের কাজ করে গেছে। এইরূপ একজন কর্তার অধীনে কাজ করতে গিয়ে অনাদিদার মতো নির্বিবাদী ব্যক্তির পক্ষে প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিল না। তা করলে, আমাকে যেভাবে বিশ্বভারতী থেকে, বারে বারে অপমান ক'রে তাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এখনও করেছে, তাঁকেও সেইরূপ অবস্থার মধ্যে পড়তে হতো। শেষ পর্যন্ত হয়তো অনাদিদাকে স্বরলিপি বিভাগ থেকে তাড়িয়ে তবে তাঁরা ছাড়তেন। আমি নেহাত নির্লজ্জ বলেই অপমান গায়ে না মেখে শান্তিনিকেতনে রয়ে গেছি। অনাদিদার পক্ষে তা সম্ভব ছিল না।

দিনুবাবুর মতো ব্যক্তিকে স্বরলিপি নিয়ে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত গ্রন্থন বিভাগ কীভাবে অপমান করে গেছে তার ইতিহাস আমার সবই জানা। দিনুবাবু চেষ্টা করেছিলেন প্রাণপণে তা সহ্য করতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন অসহ্য হয়ে উঠেছিল যে তিনি শান্তিনিকেতন ত্যাগ করলেন, বিশ্বভারতীর সঙ্গে আর তাঁর কোনও যোগ রইল না। এবং একবছর পরেই তিনি মারা গেলেন, সেই দুঃখে। দিনুবাবুর মতো ব্যক্তির যখন ওই দশা তখন অন্যদের এই অবস্থা কী দশা হতো তা সহজেই অনুমান করা যায়।

কর্মজীবনে, অনাদিদা কোথাও কোনও প্রকার বাদ-বিতণ্ডার মধ্যে যেতে একেবারেই চাইতেন না। সর্বদাই নিরপেক্ষ থাকতে চাইতেন। নানারূপ সংগীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত যখন ছিলেন তখন তার পরিচালকদের সঙ্গে কখনও কোনও বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হয়েছে বলে আমি শুনিনি। এরকম ব্যক্তিকে অযথা বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগ তাদের কৃত দোষে দোষী করতে

বদ্ধপরিকর। আমাকেও তার সঙ্গে জড়াচ্ছে মিথ্যে করে।

আমার শুভেচ্ছা নিও।

ইতি —

তোমাদেব

শান্তিদা

পুন: আমার আগামী ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতায় যাবার কথা আছে। তোমার সঙ্গে তখন কথাবার্তা কইব, পেনশনের বিষয়ে। — শান্তিদা।

[অনাদিদা : অনাদিকুমার দস্তিদার। পুলিন সেন : পুলিনবিহারী সেন।
দিনুবাবু : দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।]

১১।

শান্তিনিকেতন
২৯/১১/৭৬

প্রিয় অমিতাভ,

তোমাদের Record শুনে যা লিখেছিলাম তা তুমি নিশ্চয়ই সাগরের কাছ থেকে পেয়েছ। লেখাটি তোমাদের কীরকম লেগেছে? আমার গানের বিষয়ে যুগান্তরে তোমার লেখাটি পড়েছি, ভাল লেগেছে।

আমার গানের কথা কাগজে লিখবার জন্য তোমাকে জ্বালাতন করি বলে আমি খুবই লজ্জিত। একাজ আমি পূর্বে কখনও করিনি। ইদানীং অর্থ চিন্তার দুর্ভাবনায় তা করতে হচ্ছে বাধ্য হয়ে। বর্তমানে গান গেয়ে যা কিছু পাচ্ছি, তাতে সংসার খরচের অনেকটা সামাল নিতে পারছি। পূর্বে আমি সামান্য যেটুকু টাকা জমাতে পেরেছিলাম, পেনশনের গোলমালের প্রথম দিকে তার বারোভাগের তিনভাগ খরচ হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ U.G.C. বৃত্তিটা পেয়ে বাকি টাকায় আর হাত পড়েনি। কিন্তু তখন থেকে গান করে টাকা রোজগারের চেষ্টায় মন দিই। যদিও এ বয়সে একটানা দুঘণ্টা গান গাওয়া খুবই কষ্টকর। তবুও টাকার অভাবে তা আমাকে করতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে যে ক'বছর পারি তা করব। যখন আর পারব না তখন ''যা হবার তা হবে'' গানটি বারে বারে গেয়ে যাব বলে মনকে প্রস্তুত করছি।

সংবাদপত্রে আমার গানের খবর প্রকাশের জন্য তোমাদের বলবার কারণ হল এই অর্থ চিন্তা। আমার যে একদিন এ অবস্থা হবে তার কথা আগে কখনও মনে আসেনি। সেই কারণে অর্থ সংগ্রহ বা তা জমানোর জন্য কখনও ভাবিনি।

অমৃতবাজার এবং তোমাদের সাপ্তাহিকে আমার গানের খবরটি যদি প্রকাশ পায় তো খুবই উপকৃত হব। ''আনন্দবাজার'' এবং ''দেশ''-এর সংবাদে আমি সেদিন থেকে খুবই উপকৃত হয়েছি। তোমাদের কাগজ কটি থেকে এই উপকার যাতে পাই তুমি তার জন্য একটু চেষ্টা কোরো, এই আমার অনুরোধ। তুমি বলেই সব কথা খোলাখুলি লিখলাম। আর কাউকে আমি একথা কখনো বলিনি এবং বলতে খুবই সংকোচ হয়। যুগান্তর গোষ্ঠীর সংবাদপত্রের সংবাদ আমার আর্থিক অনটনকে যে অনেকখানি দূর করবে এ বিষয়ে আমি দৃঢ় নিশ্চয়ই।

পেনশনের ঝামেলা পুরোপুরি মিটতে বোধহয় আরও দু-একমাস সময় নেবে। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে হয়ে যাবে বলে মনে হয়। ওই সময়ের মধ্যে পাব বলে আশা করছি কিন্তু না পাওয়া পর্যন্ত ভাষা নেই। কর্মজীবনে, বিশ্বভারতীতে বারে বারে যা যা পেয়েছি, তার জন্যেই এখন আমার মনের এই অবস্থা। U.G.C. -র কাজ আগামী বছরেই শেষ হবে। দ্বিতীয় বছর শেষ হচ্ছে আগামী ডিসেম্বরে। আমার যা করণীয় তা আমি করে যাচ্ছি। অন্যদের মতো ফাঁকি দিচ্ছি না। দু-বছরে দুটো গ্রন্থ শেষ করলাম। আগামী বছরে নৃত্যের গ্রন্থটি শেষ করতে পারব বলে আশা রাখি।

বিপিন সিংহের মণিপুরী নৃত্যের বইটি নাকি প্রকাশিত হয়েছে। কোনওখানে তা পাওয়া যাবে তুমি যদি ঠিকানাটা দাও তাহলে আনিয়ে নেব।

তোমরা আমার শুভেচ্ছা নিও।

ইতি —

তোমাদের

শান্তিদা

[সাগর : সাগরময় ঘোষ। বিপিন সিংহ : মনিপুরী নৃত্যগুরু।
'তোমাদের সাপ্তাহিকে' : অমৃত।]

১২।

শান্তিনিকেতন
১/৬/৭৮

প্রিয় অমিতাভ,

তোমার নতুন বইটি পেয়ে, তোমার লেখা যুগান্তরের ছড়া পড়ে এবং গতকাল কানাই সামন্ত কর্তৃক নির্বাচিত প্রেমের কবিতার সংকলন গ্রন্থটির যুগান্তরে তোমার সমালোচনা পড়ে, আমি কতখানি যে খুশি হয়েছি, সেকথা বিস্তারিত ভাবে লিখে, তোমার নামে গতকাল একটি চিঠি দিয়েছি। তাতে আমার মনের কথা সবিস্তারে জানতে নিশ্চয় পেরেছো।

আবার বলি, তোমাকে এ সবের জন্য আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমালোচনাটির দ্বারা তুমি একটি মহৎ কাজ করেছ।

আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রীতি নিও।

ইতি —

তোমাদের

শান্তিদা

[কানাই সামন্ত : রবীন্দ্র গবেষক। সংকলন : রাখী।]

১৩।

শান্তিনিকেতন
১৩/৫/৮১

প্রিয় অমিতাভ,

তোমাদের কাছ থেকে আমার জন্মদিনের শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। গুরুদেবের ১২০ বছরের জন্মদিন এবং বাল্মীকি-প্রতিভা নাটকের শতবর্ষে উপলক্ষে নতুন দলকে নিয়ে, নাটকের অভিনয়ে অত্যন্ত জড়িয়েছিলাম বলে, উত্তর দিতে দেরি ছিল। ২৬শে বৈশাখ নাটকটি ভালভাবেই সম্পন্ন করা গেল। সকলেই খুশি হয়েছেন, সকলের অভিনয় ও গান শুনে। কলকাতায় গান আছে তিন-চারদিন। এখন তার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি। তারপর মে মাসের শেষ দিকে হাসিকে নিয়ে হায়দরাবাদ যাব। পুণা মুম্বই হয়ে — জুন মাসের শেষ দিকে ফিরব।

তোমরা সকলে আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার মাকে নমস্কার জানিও। ইতি—

তোমাদের

শান্তিদা

[হাসি : স্ত্রী ইলা ঘোষের ডাকনাম।]

১৪।

শান্তিনিকেতন
১লা বৈশাখ, ১৩৮৪

প্রিয় অমিতাভ,

তুমি ও সুনন্দা, আমাদের উভয়ের নববর্ষের শুভেচ্ছা ও প্রীতি নিও। তোমাদের পুত্রকে ও আমাদের আশীর্বাদ দিয়ো। তোমার মাকে আমাদের প্রীতি নমস্কার জানিয়ো।

যুগান্তরে বিশ্বভারতী সংক্রান্ত লেখাটি তোমার, খুবই উপযোগী হয়েছে। খুবই খাঁটি কথা। গুরুদেবের নাম করে কেবল টাকা মারবে, অথচ গুরুদেবের কোনও কথা এখনকার অধ্যাপকগুলি গ্রহণ করবে না।

গুরুদেবের প্রতি বিশ্বাস নেই। মনে পড়ে কয়েক বছর পূর্বে এখানেই কয়েকজন বয়স্ক অধ্যাপক খুবই মাতব্বরের মতো প্রকাশ্যে বলেছিলেন, গুরুদেবের মধ্যে কনট্রাডিকশন ছিল। সুতরাং, তাঁর চিন্তাকে গ্রহণের পূর্বে যুক্তির কষ্টি পাথরে ঘসে যাচাই করা দরকার এখন। বর্তমান বিশ্বভারতীর সত্যিই নিজস্ব কোনও চরিত্র নেই। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির নকল করবার জন্য প্রাণপাত করছে। এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা ছাগল দিয়ে ক্ষেত চাষ করার মত। সব সাধারণ শিক্ষকগুলি ভীত করে বসে আছে। সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে এই যে, যার যোগ্যতা নেই বা খুবই সাধারণ, তাঁকে বিশ্বভারতীর সেই সব বিভাগের কর্তা করে বসানো হয়। যেমন বিদ্যাভবনে সন্তোষ সেনগুপ্ত, কলাভবনে কৌশিক, শ্রীনিকেতনের প্রভাস সেন। ছোটখাটো এই প্রকার আরও আছে। যারা প্রকৃত যোগ্য নয় তারা বিভাগকে পরিচালনা করতে চেষ্টা করে জোর-জুলুম করে। ভবনে ভবনে, মাস্টার এবং ছাত্রদের মধ্যেই বিরুদ্ধদল পাকিয়ে। সবগুলি ভবনের কাজকর্ম, প্রশাসন প্রায় এই নীতি ধরেই চলছে। কৌশিক এর একটি বড় উদাহরণ। সে গর্ব করছে যে, তাঁর ভবনে ধর্মঘট হয় না। কিন্তু সে ধর্মঘট করে অন্যভাবে। যেমন — বিশ্বভারতীর কোনওপ্রকার উৎসব অনুষ্ঠান, সভানাটকের অভিনয়ের সাজসজ্জায় সাহায্য করা বন্ধ করে দেয়। পূর্বে একবার কয়েক মাস ধরে এই কাণ্ড করিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের কোথাও যোগ দিতে দেয়নি। লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছিল। এবারেও সে তাই করেছে সর্বাঙ্গীন অসহযোগের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। একজনও ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক এদিকে বিশ্বভারতীকে সাহায্য করছে না। কিন্তু, এরজন্য গতবারও কাজ আটকায়নি, এবারেও আটকাচ্ছে না। অন্য ভবন সব করে দিচ্ছে। সন্তোষ ঘোষের কার্যকলাপ নিয়ে আমি অশোকবাবুকে একটি চিঠি দিয়েছি। জানি না তিনি কীভাবে তা গ্রহণ করবেন। প্রতাপ চন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি? আজ শেষ করি।

ইতি —
তোমাদের
শান্তিদা

[সন্তোষ সেনগুপ্ত : বিশ্বভারতীর দর্শনের অধ্যাপক।
কৌশিক : দিনকর কৌশিক। সন্তোষ ঘোষ : সন্তোষকুমার ঘোষ।
অশোক বাবু : অশোককুমার সরকার। প্রতাপ চন্দ্র : ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র]

১৫।

শান্তিনিকেতন
৫/১২/৭৮

প্রিয় অমিতাভ,

"হে মোর দুর্ভাগাদেশ" গান সংক্রান্ত ১৯৪৭-এর একটি চিঠি — শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের আমাকে লেখা, আজ হঠাৎ পুরাতন কাগজ ঘাটতে গিয়ে, তার মধ্যে পেলাম।

প্রথম চিঠির তারিখ ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭। নৃপেনবাবু আমাকে লিখেছেন—

"নিমেষবাবুকে দিয়া শ্রী পঙ্কজ মল্লিককে খবর দিয়াছিলাম। তিনি একদিন আসিয়া স্বরলিপি লইয়া গিয়াছিলেন — আমি তখন বাড়িতে ছিলাম না। গত শনিবার রাত্রে পঙ্কজবাবু পুনরায় আসিয়াছিলেন। স্বরলিপি সম্বন্ধে কথা হল — তিনি আপনাকে লিখিতে বলিলেন যে তিনি এখন মনে করছেন যে, যে সুরটা আপনি আগে দিয়াছিলেন — যা তাঁকে আমার এখানে শোনান সেইটাই ঠিক suit করিবার। তাঁর অনুরোধ মতো পরে যে একটু বদল করিয়াছেন গোড়াটায় সেটুকু না করিয়া আগে যে সুরটা দিয়াছিলেন সেইটা বজায় রাখিয়া যদি স্বরলিপিটা সেইমতো সামান্য বদল করিয়াছেন তো ভাল হয়।"

এই চিঠির পর ওই গানটি বিষয়ে আর ৩/৪টি চিঠি তিনি আমাকে লিখেছিলেন। একটি চিঠিতে নৃপেনবাবু লিখেছেন আমার সুর দেওয়া নিয়ে পুলিন সেন কিছু আপত্তি তুলেছিল। কিন্তু, নৃপেনবাবু জানাচ্ছেন, রথীবাবুর নির্দেশ মতো আমাকে সুর যোজনা করতে তিনি বলেছেন। এই কটি চিঠি পেয়ে আমি খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। আমি খবর পেয়েছিলাম, এ গানের সুর যোজনা নিয়ে যে আন্দোলন কিছুদিন থেকে শুরু হয়েছে তার পিছনে নাকি পুলিন সেন ও তাঁর চেলারা আছে। এখন মনে পড়ল সে সময়ের কথা। এবারে এই চিঠিগুলিকে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছি।

পুরনো কাজগপত্র বাছতে গিয়ে এই চিঠি কটি পেয়ে আমি খুবই নিশ্চিন্ত হলাম। বড় বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল কতগুলি লোক। পুলিনদা এর পিছনে আছেন বলেই আমার ধারণা।

পরে দেখা হলে কথা হবে। শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি —
তোমাদের
শান্তিদা

[নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র : বিশ্বভারতী মিউজিক বোর্ডের তৎকালীন সচিব।
পঙ্কজবাবু : পঙ্কজকুমার মল্লিক। নিমেষবাবু : এইচ এম ভি-র
অন্যতম কর্তা নিমেষ ঘোষ। পঙ্কজ মল্লিক : খ্যাতনামা গাইয়ে।
পুলিন সেন : পুলিনবিহারী সেন।]

১৬।

শান্তিনিকেতন
২২/১১/৭৮

প্রিয় অমিতাভ,

তোমার চিঠির সঙ্গে অমৃত পত্রিকার কাটিংটা পড়ে খুবই আশ্চর্য হলাম। যা সত্যি তাকে মিথ্যা বলে প্রচার করবার কী অপচেষ্টা কিছুকাল থেকে শুরু হয়েছে। আমার আশ্চর্য লাগছে যে, এই অপবাদ, রেকর্ডটি যখন প্রথম বেরিয়েছিল তখন কেন উঠল না। আজ এতকাল পরে হঠাৎ এ নিয়ে এত আন্দোলনের অর্থ কী তাও বুঝি না। যাই হোক, এ নিয়ে আমি আর কিছু বলছি না। তুমি যা বলেছ তাতে আমি সত্যিই খুব অভিভূত। তোমরা কয়েকজন প্রকৃত আমাকে ভালবাস বলেই তোমাদের উপরই ভরসা রাখি। এবারের অমৃতে দেখলাম তোমার চিঠির সঙ্গে আর একটি চিঠি। পঙ্কজবাবু 'পরিচয়' চলচ্চিত্রের গান নির্বাচনের জন্যে এসেছিলেন বলেই মনে পড়ে। গল্পটি গুরুদেবকে বলেছিলেন তিনিই। তাদের বোধহয় ইচ্ছা ছিল গল্পটির জন্য গুরুদেব নতুন কিছু গান রচনা করে দেন। কিন্তু পরিচয় গল্পটি শুনে গুরুদেবের ভাল লাগেনি। তিনি আমাকে বলেছিলেন — সংক্ষেপে গল্পটি বলে — এইরূপ গল্পই কি চলচ্চিত্রে

চলে? তিনি নতুন গান রচনা করতে উৎসাহ পাননি ওই গল্পটি শুনে। সেই জন্যেই বলেছিলেন পঙ্কজবাবুকে আমার কণ্ঠে গান শুনে যেন তাঁদের প্রয়োজন মতো গান নির্বাচন করে নেন। ''হে মোর দুর্ভাগা দেশ''টি কোন চলচিত্রে পঙ্কজবাবুরা ব্যবহার করেছিলেন তা আমার মনে নেই। এ গানের ঘটনা গুরুদেবের মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর।

সম্প্রতি হিন্দুস্থান থেকে ১২টি গান রেকর্ড করিয়ে রাখল। আগামী বৈশাখ মাসে বোধহয় প্রকাশ করবে। এবারের গানগুলির রচনার পিছনের বাস্তব ঘটনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করে গেয়েছি। প্রতি গানের পূর্বে আমি নিজেই ঘটনাগুলি পড়েছি।

কাশ্মীরের পাহাড়ের ভ্রমণ সত্যিই খুব ভাল লেগেছে। পাবর্ত্যপথে ঘোড়ার পিছে, কখনও কখনও হেঁটে চলবার সময় আমার বারে বারে মনে হচ্ছিল যে, পূর্ব যুগের মানুষরা এইভাবে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যে কত কষ্ট করে কত বিপদ-আপদ মাথায় করে যেত। তারই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যেন খানিকটা হল। সত্যি প্রাচীন যুগের মানুষদের কী শক্তি ও সাহসই না ছিল।

আমার এবারের অভিজ্ঞতায় পুনরায় পাহাড়ে যাবার ইচ্ছা জেগেছে। ভেবেছি কিছু টাকা জমিয়ে এবারে 'লে' ও. 'লাদাখ'-এর দিকে যাব। বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের জন্য। দেখা যাক ইচ্ছা পুরণ হয় কিনা। কেন জানি না বিশাল পার্বত্যদেশ আমার মন খুবই আকর্ষণ করেছে। তোমরা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জেনো। ইতি—

[অমৃত : অধুনালুপ্ত সাহিত্য সাপ্তাহিক।
পঙ্কজবাবু : পঙ্কজকুমার মল্লিক।]

তোমাদের
শান্তিদেব ঘোষ

১৭। শান্তিনিকেতন
৭/৫/৭৯

প্রিয় অমিতাভ

স্টেটসম্যান পত্রিকার সংবাদে পড়লাম গুরুদেব সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য গবেষণার কৃতিত্বের জন্য অমৃতবাজার পত্রিকার পুরস্কার তোমাকে দেওয়া হয়েছে। আমরা দুজনেই এ-সংবাদ পড়ে সত্যিই খুবই আনন্দিত। তুমি আমাদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ নিও। তোমার কীর্তি তোমাকে আরও উজ্জ্বল করুক।

আমাদের খবর একপ্রকার। আমাকে কলকাতায় যেতে হবে মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে। সে সময়ে প্রায় দিন ৭ কাটাতে হবে। গত মাসে, কলকাতায় গিয়ে দূরদর্শন কেন্দ্রে ৬টি গান রেকর্ড করে এসেছি। মে মাসের ২৮শে সন্ধ্যায় শোনাবে। আকাশবাণী থেকে গতবারের মতো ১ ঘণ্টার একটি National Programme করাবে, আগামী ২রা আগস্ট তারিখ। বিষয় দিয়েছে ''অয়ি ভুবন-মনমোহিনী'' অর্থাৎ গুরুদেবের জাতীয় সংগীত বিষয়ক। এ মাসের ২০ তারিখ থেকে Reharsal ও Record করে দিতে হবে। গতবারের মতো কলকাতার শিল্পীদের আকাশবাণী থেকে নির্বাচন করেছে। কেবল তমালকে সঙ্গে রেখেছি। এবারে আমিএ একটি গান গাইব। তোমরা আমাদের ভালবাসা নিয়ো।

ইতি—,

[তমাল : শ্রীনিকেতনের প্রাক্তন শিক্ষক ও গাইয়ে তমাল ঘোষ।]

তোমাদের
শান্তিদা

১৮। শান্তিনিকেতন
১২/৭/৮৫

প্রিয় অমিতাভ

গত মাসে, বিশ্বভারতীর নতুন স্বরলিপি সমিতির অধিবেশন কলকাতায় বসেছিল। এই সমিতিতে শ্রী প্রফুল্ল দাস, একটি খাতা সব সদস্যদের দেখাল। খাতাটিতে সংগীত বিজ্ঞান পত্রিকায় প্রকাশিত অনাদিদার অনেকগুলি স্বরলিপির হাতে লেখা কপি ছিল। এই কপি করা স্বরলিপির মাঝে মাঝে দিনেন্দ্রনাথের হাতের সংশোধনও ছিল। খাতাটি স্বরলিপি দপ্তরে দিতে প্রফুল্ল দাস অনিচ্ছা প্রকশ করায় সমিতি বলেছিল সবকটি স্বরলিপির জেরক্স কপি করিয়ে দিতে। প্রফুল্ল দাস তাতে সম্মত হয় এবং সেই সঙ্গে একথাও সে বলে যে, অনাদিদার এইরূপ আরও কিছু খাতা তাঁর হেফাজতে আছে। কিন্তু, সেগুলি তাঁর নিজস্ব সংগ্রহের, সুতরাং, সেগুলি কাউকে সে দেবে না।

আমার জিজ্ঞাস্য হচ্ছে যে, খাতাগুলি অনাদিদা কি প্রফুল্লকে দিয়ে গিয়েছিলেন? তাঁর অসুস্থতার সময় তাঁর এই খাতাগুলি নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে কি পারেননি? অপিসেই ছিল? খাতাগুলি কীভাবে প্রফুল্ল পেয়েছে সে বিষয়ে কোনও কথা সে বলতে চায়নি। অনাদিদার বাড়ি থেকে খাতাগুলি সংগ্রহ করেছিল কি না তাও বলেনি। এ বিষয়ে খোঁজ নিও। তোমাদের কুশল কামনা করি। ইতি—

[প্রফুল্ল দাস : বিশ্বভারতী স্বরলিপি সমিতির প্রাক্তন কর্মী
প্রফুল্লকুমার দাস। অনাদিদা : অনাদিকুমার দস্তিদার।]

তোমাদের
শান্তিদা

১৯। শান্তিনিকেতন
২৪/৬/৮৯

প্রিয় অমিতাভ,

এই চিঠির সঙ্গে যে লেখাটি পাঠাচ্ছি তা পড়ে দেখো। তাতেই বুঝতে পারবে এটি কেন লিখতে বাধ্য হয়েছি। শ্রী অমলেন্দু সাঁই, শ্রী শৈলজাবাবুর যে অনুরক্ত, ভক্ত আমি তা জানি। তাঁকে দিয়ে শৈলজাবাবু যে এইসব লেখান, তাও আমি শুনেছি। পূর্বেও অমলেন্দু সাঁই, শৈলজাবাবুর কথা মতো আমার বিষয়ে অশোভন কিছু মতামত প্রকাশ করেছিলেন এক পত্রিকায়।

আমার এ চিঠিটি 'আজকাল' পত্রিকায়ও পাঠালাম। জানিনা এবারে তাঁরা এটি প্রকাশ করবে কিনা। পত্রিকাটির উপরে তোমার হাত আছে জেনে এটি যাতে তাতে প্রকাশিত হয়, তার ব্যবস্থা করবে। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। আমি চাই রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে ব্যাপকভাবে আলোচনা হোক। আমাকে নিন্দাও করুন, শৈলজাবাবু। কিন্তু তাঁর উত্তরে আমার বক্তব্যও আমি যেন বলবার সুযোগ পাই। এভাবে আলোচনার দরকার, তা না হলে নানা প্রকার ভিত্তিহীন প্রচার শৈলজাবাবু তাঁর ভক্তদের দিয়ে করে যাবেন, তা তো চলতে পারে না। এর শেষ হওয়া দরকার।

তোমাদের সকলকে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

[অমলেন্দু সাঁই : গীতবিতান সংস্থার বর্তমান সচিব।
শৈলজাবাবু : শৈলজারঞ্জন মজুমদার।]

শুভার্থী
শান্তিদা

২০।

গত ৩/৫/৮৯ তারিখের 'আজকাল' পত্রিকায় রবীন্দ্রসংগীতে হারমোনিয়ম যন্ত্রটির ব্যবহার সম্পর্কে শ্রীঅমলেন্দু সাঁই-এর ''গুরুদেব এস্রাজ ব্যবহারই পছন্দ করতেন'' — শীর্ষক যে চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে, তা পড়ে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, 'আজকাল' পত্রিকায় হারমোনিয়ম সংক্রান্ত ২.৪.৮৯ তারিখে, আমার যে পত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার উত্তর হিসেবেই এই পত্রটি প্রকাশিত। এবং পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে, শ্রী সাঁইয়ের বকলমে শ্রী শৈলজারঞ্জন বাবুই তার উত্তর দিলেন।

শ্রী সাঁই, হারমোনিয়ম যন্ত্রটির বিপক্ষে গুরুদেবের দু-একটি উক্তি এবং অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে গুরুদেবের এস্রাজের সাহায্যে গান করার ছবিটির উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চাইছেন যে, ওই যন্ত্রটি সম্পর্কে গুরুদেবের কী প্রকার অনীহা ছিল। কিন্তু একবারও শ্রী সাঁই, গুরুদেবের বাল্যজীবন থেকে হারমোনিয়ম, অর্গান ও পিয়ানোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের বিবরণ কোথাও দিলেন না।

একযুগে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বাঙালি ওস্তাদের ব্রহ্মোপসনার গানের সঙ্গে সারেঙ্গি বাজত। অ্যাকর্ডিয়ান যন্ত্রটি কলকাতায় প্রথম আসার পর সারেঙ্গির বদলে, তাঁদের গানের সঙ্গে সেটি বাজানোর প্রচলন হয়েছিল। পরে টেবিল হারমোনিয়ম ও পাইপ অর্গানও বেজেছে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের ওই যন্ত্রগুলি বাজানো নিয়মিত শিখতে হ তো। বাড়ির নানা প্রকার নাটকের অভিনয়ে বিদেশি যন্ত্র সর্বদাই যে বেজেছে তার কথা কিন্তু শ্রী সাঁই কোথাও লিখলেন না।

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে গুরুদেব নিজে হারমোনিয়ম বাজিয়ে ছাত্রদের নতুন গান শিখিয়েছেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিত চক্রবর্তী, বক্স ও টেবিল হারমোনিয়মের সাহায্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের গান শেখাতেন। আমার যখন চার-পাঁচ বছর বয়স, তখন দিনেন্দ্রনাথের গানের ক্লাসে এবং বিদ্যালয়ের যাবতীয় গানের অনুষ্ঠানে, তিনি ওই যন্ত্রটিই বাজিয়েছেন। আমরা তার সঙ্গে গান গেয়েছি। শ্রী সাঁই বলছেন, ''কলকাতায় বা ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানে যেভাবে যথেচ্ছ হারমোনিয়ম ব্যবহার হয়েছে শান্তিনিকেতনে তা নিশ্চয়ই নয়।'' কলকাতার ব্রাহ্মসমাজের অনুষ্ঠানেই কেবল যথেচ্ছ হারমোনিয়ম বাজেনি। গুরুদেবের জোড়াসাঁকোর বাড়ির পুজোর দালানে যখন ১১ই মাঘের উপাসনা হয়েছে, গুরুদেব আচার্য হিসেবে তার উপাসনা করেছেন, তখন আমরা অল্পবয়সের ছাত্রদল কলকাতায় গিয়ে সেই অনুষ্ঠানে গান গেয়েছি। ডোয়ারকিন কোম্পানি থেকে ভাড়া করে একটি অর্গান আনা হয়েছে। দিনেন্দ্রনাথ তা বাজিয়ে গানে আমাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন। আমরা ওই হারমোনিয়মের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে গান গেয়েছি। কলকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে একটি পাইপ অর্গান এসেছিল শান্তিনিকেতনে সে যুগে। শান্তিনিকেতনের মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণে সেটিকে রাখা হয়েছিল। একটি লোকের সাহায্যে তার বেলো করতে হত। দিনেন্দ্রনাথ যন্ত্রটি বাজাতেন আমাদের গানের সঙ্গে। বছর খানেক পরে যন্ত্রটি সম্পূর্ণ অকেজো হওয়ার পর পাইপসহ যন্ত্রটির সব অংশ খুলে তখনকার গুদামঘরে তা রাখা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের যুগে, ছাত্রাবাসে, বেশ কিছু ছাত্রের মধ্যে হারমোনিয়ম যন্ত্রটি নিয়ে অবসর সময়ে গান গাইবার রেওয়াজ ছিল। গুরুদেব তখন থাকতেন দেহলী বাড়ির দোতালায়। তিনি সেখান থেকে ছাত্রদের সেই গান প্রায়ই যে শুনতে পেতেন তার উল্লেখও আছে তার চিঠিতে।

অনাদি দস্তিদার ছিলেন এযুগের ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় হারমোনিয়ম বাজিয়েই গান গাইতেন।

বিশ্বভারতীর যুগে, যখন গানের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হলেন তখন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের তিনি হারমোনিয়ম বাজিয়েই গান শেখাতেন। ১৯২৫ সালে অনাদি দস্তিদার কলকাতায় স্থায়ী ভাবে যাবার পূর্বে যখন গুরুদেবের কাছে certificate চাইলেন তখন তাঁর হারমোনিয়ম বাজনোর দক্ষতার কথাও গুরুদেব উল্লেখ করলেন। শ্রী সাঁইয়ের মতে তা নাকি প্রশংসা সূচক নয়। certificate যখন কেউ কাউকে দেন তখন তাতে তাঁর গুণের কথাই থাকে। গুণের অভাবের কথা উল্লেখ করা হয় না। অনাদি দস্তিদার যদি হারমোনিয়ম বাজনায় দক্ষ না হতেন গুরুদেব কখনই যন্ত্রটির কথা লিখতেন না। ওই যন্ত্রে দক্ষতা ছিল বলেই যন্ত্রটির উল্লেখ করেছিলেন।

এই হল, সংক্ষেপে জোড়াসাঁকো এবং শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে হারমোনিয়ম ও অর্গানের সাহায্যে একটানা গানের ইতিহাস, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত।

এস্রাজ বাজবে না, তার পরিবর্তে কেবল হারমোনিয়ম বাজবে, একথা আমি,গুরুদেবের নাম করে কখনও বলিনি। কিন্তু কোনও গায়ক ও গায়িকার পক্ষে নিজে এস্রাজ বাজিয়ে গানের অনুষ্ঠানে, আকাশবাণীতে বা রেকর্ডে গান গাওয়া যে সম্ভব নয় এ বিষয়ে আমি স্থির নিশ্চয়। হারমোনিয়ম যা সম্ভব।

শ্রী শৈলজাবাবু, শ্রী প্রফুল্ল দাশ এবং শ্রী সুভাষ চৌধুরি এস্রাজ বাজিয়ে গান শিখিয়ে থাকেন, ঠিকই। কিন্তু তাঁরা কি কোনও দিন গানের কোনও বড় আসরে, আকাশবাণীতে বা রেকর্ডে এস্রাজ নিজে বাজিয়ে বা অন্যের বাজনার সাহায্যে গান গেয়েছেন? তাঁদের এইরূপ চেষ্টার পরিচয় আমি এখনও পাইনি। শ্রী সাঁই আরও একদল সুপরিচিত রবীন্দ্রসংগীত গায়কগায়িকার নাম উল্লেখ করে বলেছেন, তাঁরা নাকি ভাল এস্রাজ বাজাতে পারেন। তাঁরা এস্রাজ বাজিয়ে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের গানও নাকি শেখান। কিন্তু তাঁরা যখন বড় আসরে, বেতারে এবং রেকর্ডে গান করেন তখন হারমোনিয়মের সাহায্যেই তা করেন।

শ্রী সাঁই বলেছেন ''গুরুদেবের জীবৎকালে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে গান গাওয়ার সময় যদিও এস্রাজ বেহালা বাঁশি ইত্যাদির সাহায্য নেওয়া হত, কিন্তু সংগীতভবনে শিক্ষাদান কালে কেবল তানপুরা ও এস্রাজই বাজাত।'' আমি আমার বাল্যজীবন থেকে, দিনেন্দ্রনাথের ১৯৩৪ সালে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত, প্রায় ২০ বছর, তাঁর দ্বারা পরিচালিত কোনও প্রকার গানের অনুষ্ঠানে বা ক্লাসে তাঁকে তানপুরা ব্যবহার করতে দেখিনি। দিনেন্দ্রনাথের অবর্তমানে, গুরুদেবের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত, কখনো কখনো কোন গানের অনুষ্ঠানে তানপুরা বেজেছে, কিন্তু, কোনপ্রকার নৃত্যনাট্যে, বা নাটকের গানে তানপুরা আমরা রাখিনি। গুরুদেবের জীবনের শেষ জন্মদিনে, প্রভাতে মন্দিরের উপাসনার গানে, এবং সন্ধ্যায় উদয়নের সামনের বারান্দায় গান ও নৃত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতেও আমরা তানপুরা যে ব্যবহার করিনি, একথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। তানপুরার ব্যবহার যে অনিয়মিত হত তারও কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। আমি নিজে সর্বদাই ক্লাসে এস্রাজ বাজিয়েই গান শিখিয়েছি।

শ্রী সাঁই জানাচ্ছেন শ্রী অশোক সেন নাকি তাঁদের বলেছেন, হারমোনিয়মের বিরুদ্ধে গুরুদেবের মৌখিক সম্মতি পাবার পর দিল্লিতে তা জানানো হয়। তারপর হারমোনিয়ম বেতারে বন্ধ হয়। এই খবর পাবার পর গুরুদেব নাকি খুশি হয়ে, শ্রী সেনকে ১৯৪০ এর জানুয়ারিতে ধন্যবাদ সূচক ওই চিঠিটি লেখেন। শ্রী সেন যদি একথা বলে থাকেন তবে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে তিনি সম্পূর্ণ ভুল সংবাদ দিয়েছেন, শ্রী সাঁইকে। চিঠির বয়ানে পরিষ্কার বোঝা

যাচ্ছে যে, চিঠিটি হারমোনিয়ম বন্ধ হবার পূর্বেই লেখা। তা নাহলে গুরুদেব কখনওই লিখতেন না, "You will be doing a great service to the cause of Indian music if you can get it abandoned from the studious of the All India Radio" . এই পঙক্তি কটিতে ভবিষ্যতে আকাশবাণী থেকে হারমোনিয়ম বন্ধ হোক তারই আশা কি প্রকাশিত হচ্ছে না? এই চিঠিতে গুরুদেবের নিজের গানের কথা বলেননি, বলেছেন সমগ্রভাবে ''Indian Music''-এর বিষয়ে। শ্রী সাঁই শ্রী সেনের নাম করে আরও জানাচ্ছেন যে, গুরুদেব তাঁকে বলেছিলেন হারমোনিয়মের দ্বারা আকাশবাণী তাঁর গানকে হত্যা করেছে, তাঁর গানের উপর স্টিম রোলার চালিয়ে গানের ক্ষতি করছে। এখানে শ্রী সাঁইয়ের কাছে আমার প্রশ্ন হল এই যে, ১৯২৫/২৬ সাল থেকে হারমোনিয়মসহ নানা বিদেশি যন্ত্রে বাদিত গুরুদেবের গানগুলি গুরুদেব নিজে রেকর্ডে শুনে প্রচারের অনুমতি যখন দিয়ে গেলেন, তাঁর জীবৎকাল পর্যন্ত, তখন কিন্তু তাঁর সেইসব গানকে হারমোনিয়মের জন্য রেকর্ড কোম্পানি হত্যা করেছে বা তার উপর দিয়ে স্টিম রোলার চালানোর কোনও অভিযোগ তিনি তোলেননি। এই কারণেই শ্রী সেনের স্মৃতিচারণ সম্পর্কে রীতিমতো সন্দেহ জাগছে।

শ্রী সাঁই শ্রী হেমন্ত মুখার্জির উক্তি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চাইছেন, বেতারে হারমোনিয়ম পুনরায় চালু করবার বিষয় নিয়ে, প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র সংগীতের গায়করাই নাকি চেষ্টা করেছিলেন। আর কোনও রবীন্দ্রসংগীতের গায়ক বা গায়িকার নাম করলে না, শ্রী হেমন্ত মুখার্জি ছাড়া। শ্রী মুখার্জির উদ্ধৃতিটিতে আছে — ''ইন্দিরা যখন তথ্যমন্ত্রী আমি তখন একবার দিল্লি গিয়ে আকাশবাণীতে হারমোনিয়ম চালু করার জন্য সরাসরি তাঁর কাছে আবেদন রাখি। ইন্দিরা আমার প্রস্তাবটি শুনে নাকচ করে দেন। পরে অবশ্য বসন্ত শাঠেকে ধরে হারমোনিয়মের রেওয়াজ আকাশবাণীতে চালু করি।'' এখানে শ্রী সাঁইয়ের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য হল এই যে, উক্ত বাক্যটি থেকে তিনি কী করে অর্থ করলেন যে শ্রী হেমন্ত মুখার্জি কেবলমাত্রা রবীন্দ্র সংগীতের শিল্পী হিসেবেই রবীন্দ্রসংগীতের জন্য তদ্বির করেছিলেন? তাঁর সম্পর্কে সকলেই জানেন যে, তিনি রবীন্দ্রসংগীতের অন্যতম সুপরিচিত শিল্পী হলেও, আধুনিক বাংলা গান এবং চলচ্চিত্রের হিন্দী ও বাংলা গানের একজন সুরকার ও গায়ক হিসেবেও তাঁর বিশেষ খ্যাতি আছে। সুতরাং এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তিনি সবরকমের কণ্ঠসংগীতের সঙ্গে হারমোনিয়মের ব্যবহার নিয়েই কথা বলেছিলেন। কেবল রবীন্দ্রসংগীতই তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল না। আমি পূনরায় বলছি যে, কেবল মাত্র রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে সে যুগের রবীন্দ্রসংগীতের সুপরিচিত গায়কগায়িকারা কোনও আন্দোলন তোলেননি। নিষেধ উঠে গিয়েছিল ভারতের যাবতীয় কণ্ঠসংগীতের শিল্পীদের প্রতিবাদ আন্দোলনের প্রতি লক্ষ্য রেখে।

এযুগের শান্তিনিকেতনের সংগীত-ভবনের দুই প্রাক্তন অধ্যক্ষা, যাঁরা শ্রী শৈলজাবাবুর নামি ছাত্রী, তাঁরা, তাঁর মতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যখন সংগীত-ভবনের জন্য অনেকগুলি হারমোনিয়ম কেনালেন তখন শ্রী শৈলজাবাবু গুরুদেবের কথা তুলে কেন তাঁদের বারণ করলেন না? এ বৎসরের গুরুদেবের জন্মোৎসবের সময় সংগীত-ভবন থেকে যখন দিল্লির National Programme-এ গুরুদেবের গান প্রচারিত হল তখনও তাঁদের দুজনের গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজল। এ নিয়ে শ্রী শৈলজাবাবু, দূরদর্শনের কাছে কিন্তু গুরুদেবের নাম করে কোনরূপ প্রতিবাদপত্র পাঠাননি। শ্রী সাঁই বলছেন ''তাঁদের এই বিতর্কের মধ্যে না আনলেই হয়তো ভাল হত।'' শ্রী শৈলজাবাবু যখন হারমোনিয়মের ঘোরতর বিরোধী, তাঁরই স্নেহভাজনরা যখন তাঁকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করছেন, তখন সে কথা এখানে ''না আনলেই ভাল হত'' বলছেন কেন শ্রী সাঁই। বরং শ্রীশৈলজাবাবুর কথা ভেবে শ্রী সাঁই-এরই উচিত ছিল এ বিষয় নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ করা।

শ্রী সুবিনয় রায়ের হারমোনিয়ম নিয়ে রবীন্দ্রসদনের গানের সঙ্গে শ্রী শৈলজাবাবুর এস্রাজ বাজানোকেও আমি বলব যে, তিনি মুখে যতই প্রতিবাদ করুন না কেন, তিনি কিন্তু মনেপ্রাণে হারমোনিয়ম-দরদী। গত মহাযুদ্ধের সময় শ্রী শৈলজাবাবু যখন H.M.V.-র রেকর্ডে কিছু রবীন্দ্রসংগীত গায়ক ও গায়িকাদের দিয়ে গান গাইয়েছিলেন তখন সেইসব গানের পরিচালক হিসেবে তাঁর নামও তাতে মুদ্রিত হয়েছিল। এ গানগুলিতে হারমোনিয়ম সহ অন্যান্য কয়েকটি বিদেশি যন্ত্রও বেজেছিল, তাঁরই নির্দেশে। এখানেও দেখা যাচ্ছে, শ্রী শৈলজাবাবু, নিজেই গুরুদেবের ইচ্ছাকে অমান্য করেই তা করেছিলেন। শ্রী সাঁই এই ঘটনাটিকেও সম্পূর্ণ উপেক্ষা করলেন।

১৯২৫/২৬ সাল থেকে গুরুদেব তাঁর গানের যাবতীয় রেকর্ডের গান শুনে প্রচারের অনুমতি দিতেন। এই গানের একটিও কেবল তানপুরা ও এস্রাজের সাহায্যে গীত হয়নি। হারমোনিয়ম সহ আরও নানা প্রকার বিদেশি যন্ত্রও তার সঙ্গে বেজেছে। গুরুদেব এর একটিকেও হারমোনিয়মের কারণে তার প্রচার বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। এ বিষয়েও শ্রী সাঁই সম্পূর্ণ নীরব।

শ্রী সাঁই জানাচ্ছেন, গুরুদেব নাকি শ্রী শৈলজাবাবুকে বলেছিলেন — ''তুমি তো আমাকে মানো। তা হলেই হল।'' তাহলে, উপরোক্ত তথ্যগুলির দ্বারা শ্রী শৈলজাবাবু গুরুদেবকে যে কতটা মান্য করতেন তাতো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে। গুরুদেবের প্রতি মান্যতার পরিচয় কিন্তু এতটুকুও পাওয়া যায় না।

শ্রী সাঁই বলেছেন, ''গুরুদেব নিষেধ করে যাননি তবুও স্যুট কোট টাই পরে কোনও অনুষ্ঠানে কোনও শিল্পীকে রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করতে দেখা যায় না।'' তাঁর একথার উত্তরে কয়েকটি কথা বলতে চাই। গুরুদেব তাঁর যৌবনে, ইংল্যান্ড বাসকালে, নিজের গান যখন সে দেশবাসীকে শোনাতেন, তাঁদের অনুরোধে, তখন তিনি তাঁদের সামনে ধুতি পাঞ্জাবি ও চাদর গায় দিয়ে তা শোনাননি। যে সাজে সে দেশে বাস করতেন তা নিয়েই গান গাইতেন। Dr. Bake সাহেব পিয়ানো যন্ত্রের সাহায্যে স্যুট কোট টাই পরেই রবীন্দ্রসংগীত শোনাতেন শান্তিনিকেতনে এবং ভারতের নানা শহরে।

এ যুগে যে ভাবে শিক্ষিতদের মধ্যে স্যুট কোট ও টাই গলায় বেঁধে সাজপোশাক করবার রেওয়াজ ব্যাপক ভাবে চালু হয়েছে, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের বাঙালিরা সেই সাজে রবীন্দ্রসংগীত যে গাইবে না তা কে বলতে পারে। দেশের বহু বিদ্যালয়ে, ছোটবয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা প্যান্ট স্কার্ট সার্ট কোট এবং এক ধরনের টাই গলায় বেঁধে ইস্কুলে যায়। গুরুদেবের গানও তারা সেখানে শেখে, এবং গায় একই সাজে। এরা বড় হয়ে এই প্রকার বিদেশি সাজে গুরুদেবের গান গাইতে দ্বিধা বোধ করবে বলেও মনে হয় না। শিক্ষিত সমাজের কর্মজীবী স্যুট কোট টাই ঝোলানো মানুষ, গ্রীষ্মের দিনের গরমে নানাপ্রকার আপিসে এবং বাইরে কাজে নিযুক্ত থাকেন, তাঁরা ওই প্রকার বিদেশি সাজে ''এল যে শীতের বেলা'' গানটি যদি গ্রীষ্মে গায় তবে তাঁদের কাছে তা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না। এইভাবেই নব যুগের বাঙালি ধীরে ধীরে ভিন্ন ভাবে নিজেকে তৈরি করে চলেছে। রাত্রির আসরে সকালের আলোর

গান বা সকালে অন্ধকার রাত্রি বা পূর্ণিমা রাত্রির গান কি গাওয়া হচ্ছে না? অবশ্যই হচ্ছে। শ্রোতারা তা নিয়ে কোনও আপত্তি তুলেছেন কি?

হারমোনিয়ম ব্যবহার সম্পর্কিত শ্রী শৈলজাবাবুর আপত্তির কথা উদ্ধৃত করেছেন, শ্রী সাঁই। যথা ''গুরুদেব হারমোনিয়ম পছন্দ করতেন না কিন্তু কেউ কেউ দুটো হারমোনিয়ম দিয়ে গান করছেন।'' এরপর শ্রী সাঁই বলছেন। 'ইঙ্গিতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।'' আর কে দুটো হারমোনিয়ম নিয়ে গান করেন তা বলতে পারব না। কিন্তু আমি যে ইদানীং বেশ কয়েক বছর থেকে দুটো হারমোনিয়মের সাহায্য নিয়ে গান করি একথা রবীন্দ্রসংগীতের প্রায় সব শ্রোতারাই বোধহয় জানেন। আমি দেখেছি ১৯২২ সাল থেকে কীভাবে শান্তিনিকেতনে হারমোনিয়ম বাজানো বন্ধ হয়ে গেল, গুরুদেবের ইচ্ছায়। কিন্তু দেখেছি তখন থেকেই, বাইরে যখন তাঁর গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বেজেছে, তিনি তাকে সমর্থন করে গেছেন তাঁর জীবৎকালের শেষ পর্যন্ত। এবং আমি এও জানি যে, কী কারণে তখন বাইরের হারমোনিয়মের ব্যবহার নিয়ে গুরুদেব কেন কোনও আপত্তি করলেন না। এই কারণেই আমি হারমোনিয়ম ব্যবহার করতে সাহস পেয়েছি। তারজন্য আমার মনে কোনও দ্বিধা নেই। কিন্তু আমি শ্রী শৈলজাবাবুর মতো গুরুদেবের নাম করে হারমোনিয়মের নামে এক ক্ষেত্রে জেহাদ ঘোষণা করে নিজের ক্ষেত্রে তার উলটো কাজ কখনও করিনি। এটা আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী। আমি যা বলি তাই করি।

শান্তিদেব ঘোষ

২২।৬।৮৯

[অনাদিকুমার দস্তিদার, প্রফুল্লকুমার দাস, অমলেন্দু সাঁই ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েছে, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও। তাছাড়া অজিত চক্রবর্তী : রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, 'রবীন্দ্র কাব্য পরিক্রমা'র লেখক ও বিখ্যাত গায়ক। সুভাষ চৌধুরী : স্বরলিপি সমিতির প্রাক্তন কর্মী ও রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষক। অশোক সেন : আকাশবাণীর প্রাক্তন মহাপরিচালক। হেমন্ত মুখার্জি : নামকরা গায়ক। ইন্দিরা : ইন্দিরা গান্ধী। সুবিনয় রায় : রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ও শিক্ষক। দুই প্রাক্তন অধ্যাপক : কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলিমা সেন। ড: বাকে : ওলন্দাজ সংগীত বিশেষজ্ঞ ড: আরনল্ড বাকে।]

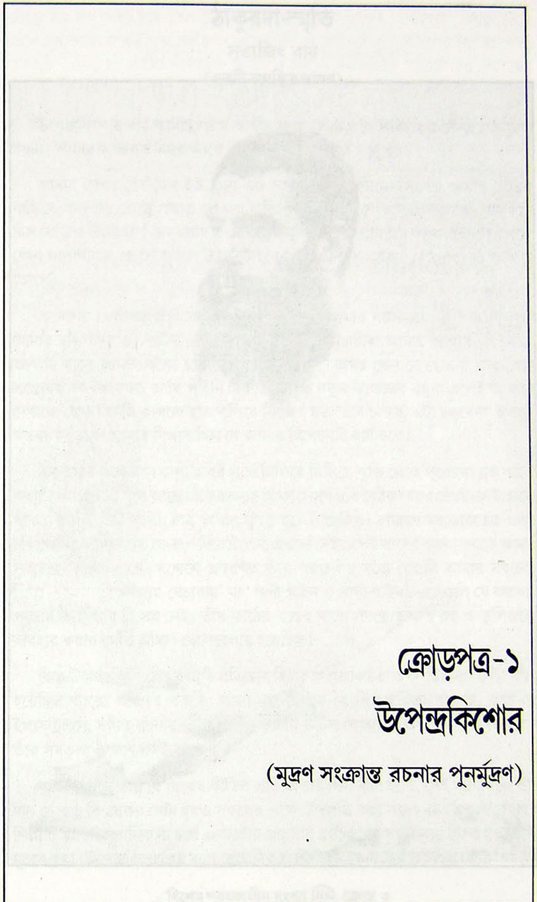

ক্রোড়পত্র-১

উপেন্দ্রকিশোর

(মুদ্রণ সংক্রান্ত রচনার পুনর্মুদ্রণ)

ঠাকুরদা-স্মৃতি

সত্যজিৎ রায়

(একটি অগ্রন্থিত ভাষণ)

উপেন্দ্রকিশোর রায় আমার পরম আত্মীয় হলেও তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার জন্মের ছ'বছর আগে ৫২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

আমার শৈশব কেটেছিল ইউ. রায় এন্ড সন্স মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের সংলগ্ন আমার পৈত্রিক বাড়িতে, গড়পাড় রোডে প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি; তার দক্ষিণাংশে আমরা থাকতাম, মাঝখানে ছিল সিড়ি ও উত্তরাংশে একতলায় ও দোতলায় মুদ্রণ কার্যের যাবতীয় কলকারখানা। এখনো কোন ছাপাখানায় প্রবেশ করলে টার্পেনটাইনের গন্ধ ত্রিশ বছরের পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে।

সন্দেশের শেষ অবস্থা আমি দেখেছিলাম। তখন আমার বয়স চার কি পাঁচ। দুপুরটা আমার ছাপাখানাতেই কাটত। প্রতি মাসেই প্রেসের কর্মচারীরা আমায় আশ্বাস দিতেন যে আগামী মাসে আমার আঁকা ছবি সন্দেশে ছাপা হবে। অথচ কেন যে হোতনা তার কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত্ আমি পাইনি। বিদেশ থেকে নতুন কাগজের নমুনা এলেই আমাকে দেখানো হোত। আমি কাগজে হাত বুলিয়ে বিজ্ঞের মত 'এটা চলবে, এটা চলবেনা' ইত্যাদি মন্তব্য করতাম। আমার বিশ্বাস ছিল যে আমার বিবেচনাই ধার্য হবে।

ঠাকুরমার সঙ্গে বসে ছাপা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে ঝুড়ি থেকে পুরোনো ব্লক বাছাই করার কথা এখনো মনে আছে। ঠাকুরদাদার আঁকা সেসব ছবি বৈঠকখানার দেওয়ালে টাঙানো থাকত তার প্রতিটি তুলির টান আমার মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। রামায়ণ মহাভারতের প্রধান চরিত্রগুলিকে ঠাকুরদাদা যে-রূপ দিয়েছিলেন, এখনো সেইরূপেই তাদের কল্পনা করতে আমার সবচেয়ে ভালো লাগে। সন্দেশে প্রকাশিত তাঁর গল্পগুলির মধ্যে যেগুলি আমার সবচেয়ে প্রিয়, —যেমন 'কেনারাম-বেচারাম' বা 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন'—সেগুলি যে কতবার পড়েছি তার আর হিসেব নেই। তাঁর কাঠের রঙের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত রঙ ও তুলিগুলো ব্যবহার করার দুর্মতি আমার ছেলেবেলায় হয়েছিল।

কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের বহুমুখী প্রতিভার বিচার করার ক্ষমতা তখন ছিল না। সেটা সম্ভব হয়েছিল আরো পরিণত বয়সে। তখন বুঝেছিলাম যে শিশুসাহিত্য রচনায়, কাহিনীর ইলাস্ট্রেশনে, সঙ্গীত রচনায়; এবং প্রাঞ্জল ভাষায় জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্য বর্ণনে ও বিশ্লেষণে তাঁর সমতুল্য এদেশে কমই আছে।

আজ এখানে তাঁর যে বিশেষ কীর্তির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হচ্ছে, সেই মুদ্রণশিল্পে তাঁর দান যে কত বিস্ময়কর সেটা হয়ত সকলের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। একাধারে মহত্ শিল্পী ও মহত্ বৈজ্ঞানিক না হলে এ-জাতীয় প্রচেষ্টায় ব্রতী হওয়া সম্ভব নয়, সফল হওয়া তো দূরের কথা। উপেন্দ্রকিশোরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পীর মহত্ সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর শিল্পীমন

সেই যুগের অপরিণত ছাপার কাজে পীড়িত হয়েছিল, এবং তাঁর বৈজ্ঞানিক মন মুদ্রণের কলাকৌশল সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তাঁর যে উন্নতিসাধন করেছিল, তার নিদর্শন সন্দেশের পাতায় রয়েছে। ৪০ বছরের পুরোনো সন্দেশের রূপসজ্জা আজকের দিনের যে কোন পত্রিকাকে অনায়াসে হার মানায়।

মানুষ হিসাবে উপেন্দ্রকিশোরকে চিনবার সুযোগ আমার হয়নি, কিন্তু তাঁর লেখায়, ছবিতে, গানে তাঁর সরল মাহাত্ম্যের পরিচয় পেয়েছি। আজ যে শুধু তাঁর পৌত্র হিসাবে আমি গর্ব অনুভব করছি তা নয়, আমাদের স্বজাতি তিনি, এটাও কম গর্বের কথা নয়।

গত ২০ শে ডিসেম্বর "উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ৪২তম মৃত্যু-বার্ষিকী উপলক্ষে বালিগঞ্জ গভর্ণমেন্ট স্কুলে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণটি পড়া হয়েছিল। — সত্যজিৎ রায়।

স্কুল অব প্রিন্টিং টেকনোলজি-র (বর্তমানে রিজিওনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিন্টিং টেকনোলজি) মুখপত্র — Impression-এর ২ খণ্ড, ১ সংখ্যায় মুদ্রিত -১৯৫৫ সালে। রচনাটি এ অবধি গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

(পুনর্মুদ্রণের সময় তৎকালীন বানান ও যতিচিহ্ন হুবহু অবিকৃত রাখা হল।)

উপেন্দ্রকিশোর প্রতিচ্ছবি মুদ্রণে অনন্য শিল্পী

সিদ্ধার্থ ঘোষ

উপেন্দ্রকিশোরের মুখ্য পরিচয় যদিও শিশু সাহিত্যিক, চিত্রকর, ইলাস্ট্রেটর ও সংগীতজ্ঞ রূপে, শুধু তাঁর হাফটোন সংক্রান্ত গবেষণাই তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে পারত।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে পাস করার পর ষোলো বছর বয়সে ১৮৭৯ নাগাদ উপেন্দ্রকিশোর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। প্রথমে তিনি দাদা সারদারঞ্জনের সঙ্গে ৮ নং রতু সরকার লেনে বাস করতেন। সম্ভবত ১৮৮৩ নাগাদ তিনি উঠে আসেন ৫০ নং সীতারাম ঘোষ স্ট্রিটে, যাকে গগনচন্দ্র হোম, 'ব্রাহ্ম কেল্লা' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে তখন বাস করতেন হেমেন্দ্রমোহন বসু (এইচ.বোস) ও প্রমদাচরণ সেন। হেমেন্দ্রমোহনের সঙ্গে পরে বিবাহ হয় উপেন্দ্রকিশোরের বোন মৃণালিনীর। প্রমদাচরণ প্রথমে সার্থক বাংলা শিশুপত্রিকার জন্ম দেন ১৮৮৩ সালে এবং এই 'সখা'-র দ্বিতীয় সংখ্যাতেই উপেন্দ্রকিশোরের শিশুসাহিত্য রচনায় হাতেখড়ি।

১৮৮৪-তে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে বি. এ পাস করার পর তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন এবং পরের বছর বিধুমুখীর সঙ্গে বিবাহের পর উঠে আসেন ১৩নং কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে। কলেজে পড়ার সময় থেকেই তিনি সংগীত-শিক্ষকের ও বাদ্যযন্ত্র মেরামতির কাজ করতেন। দ্বারিকানাথ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত 'ডোয়ার্কিন'-এর নামকরণও তিনিই করেছিলেন। দ্বারিকানাথের Musical Advertiser Press থেকে প্রকাশিত হয়েছিল উপেন্দ্রকিশোর রচিত 'শিক্ষক ব্যতিরেকে হারমোনিয়ম শিক্ষা'র দ্বিতীয় সংস্করণ ও 'বেহালা শিক্ষা'।

১৩ নম্বর কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের বাড়িতেই উপেন্দ্রকিশোর প্রথম পেশা হিসাবে ফোটোগ্রাফি-চর্চা শুরু করেন। হাফটোন ব্লক-নির্মাণ সংক্রান্ত পড়াশোনারও সূত্রপাত সেই সময়েই। তারপর বিলেতের পেনরোজ কোম্পানি থেকে ব্লক নির্মাণের জন্য প্রসেস ক্যামেরা ও অন্যান্য উপকরণ এসে পৌঁছবার পর ১৮৯৪ বা ১৮৯৫-এ তিনি সপরিবারে উঠে এলেন ৩৮/১ শিবনারায়ণ দাস লেনে। ১৮৯৫-এ এই ঠিকানায় স্থাপিত হলো 'ইউ. রায়' নামক সংস্থা।

১০০ গড়পার রোডের সেই ঐতিহাসিক বাড়িটির উপর অনেক ঝড় বয়ে গেছে, তবু আজও রাস্তায় দাঁড়িয়ে একতলা ও দোতলার মাঝখানে চোখ রাখলে সিমেন্টের মধ্যে খোদাই করা কয়েকটা হরফ পড়া যায়—

FOUNDED—GRAPHIC ARTS & PHOTO PROCESS—1895

শিবনারায়ণ দাস লেনের ঠিকানায় প্রকাশিত 'ইউ রায়'-এর বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় হাফটোন ব্লক তৈরির সঙ্গে তখন ব্রোমাইড এনলার্জমেন্টের কাজও নেওয়া হত। অর্থাৎ উপেন্দ্রকিশোর তখনও পেশা হিসাবে ফোটোগ্রাফি-চর্চা করছেন।

১৯০১ নাগাদ ব্যবসার সম্প্রসারণের দরুন ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে আরও বড় একটি বাড়িতে আবার স্থানান্তরিত হল উপেন্দ্রকিশোরের বাসস্থান সমেত কর্মক্ষেত্র। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই কুলদারঞ্জন দুই মেয়েকে নিয়ে এই বাড়িতেই উঠে আসেন এবং সম্ভবত তারপরেই

কোনও এক সময়ে উপেন্দ্রকিশোরের উৎসাহে তিনি পেশা হিসাবে ব্রোমাইড এনলার্জমেন্টের কাজ শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় শেষ বয়সেও কুলদারঞ্জন এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন।

২২ নম্বর বাড়িতেই ১৯১০-এ আত্মপ্রকাশ করে 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স'। এবং শুধু ব্লক তৈরি নয় প্রকাশন সংস্থা রূপেও কাজ শুরু হয়। 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্স' থেকে প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ 'টুনটুনির বই'। অবশ্য তখনও নিজস্ব ছাপাখানা ছিল না। ১৯১৩-র প্রবাসীতে জিওত্তো-র দান্তে ছবিটির নীচে প্রথম দেখা যায় রঙিন ছবির মুদ্রণের কাজ হচ্ছে 'ইউ. রায় অ্যান্ড সন্সে' থেকে।

সম্ভবত ১৯১৩/১৪ নাগাদ উপেন্দ্রকিশোরের নিজের প্ল্যান অনুযায়ী নির্মিত ১০০ গড়পার রোডে রায় পরিবার উঠে এলেন। উঠে এল 'ইউ.রায় অ্যান্ড সন্সে'র প্রসেস বিভাগ আর স্থাপিত হল নিজস্ব বই ছাপার প্রেস। প্রকাশিত হল 'সন্দেশ'। আর ঠিক এই ব্যবসা সম্প্রসারণের ও বাড়ি নির্মাণের পূর্বলগ্নে বিলেতে এলেন সুকুমার—শুধু কারিগরি বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্যই নয়, উপেন্দ্রকিশোর তথা নিজেদের সংস্থার প্রতিনিধি রূপেও।

ফোটো এনগ্রেভিং বা হাফটোন ছবি ছাপার ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার মারফত উপেন্দ্রকিশোর বাংলা গ্রন্থচিত্রণের জগতে একটা চাঞ্চল্যকর যুগান্তর ঘটিয়েছিলেন। হাফটোনের আগের যুগে কোনও বইয়ে শিল্পকর্মের বহুসংখ্যক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির প্রয়োজন থাকলে শিল্পীকে শরণাপন্ন হতে হ'ত কাঠ কি ধাতু খোদাইয়ের বা এচিঙের। শিল্পী তাই কখনই কারিগরি বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করে সৃষ্টির কথা ভাবতে পারতেন না। যেমন, কাঠের ব্লকে ছবি ছাপা হবে জানলে চিত্রকর কখনও সাদা জমিতে সূক্ষ্ম কালো রেখা টানতেন না। কারণ কাঠ কেটে অত সরু উঁচু উঁচু ফালি তৈরি করা বা ছাপার সময়ে তা রক্ষা করা সম্ভব নয়। উডকাটে তাই সরু রেখা যা দেখা যায় সবই কালো জমির উপর সাদা রেখা অর্থাৎ কাঠের মধ্যেই আঁচড়।

এইজন্য কাঠ ও ধাতুখোদাই বা লিথোগ্রাফি— শেষ বিচারে মুদ্রিত চিত্রের সাফল্যের সমান ভাগীদার ছিলেন শিল্পী ও খোদাইকার বা লিথোগ্রাফার। ফোটোগ্রাফির সাহায্যে মূল ছবির প্রতিচ্ছবি ছাপার ব্যবস্থা—বিশেষ করে 'হাফটোনে'র প্রবর্তন গ্রন্থচিত্রণের ক্ষেত্রে শিল্পীকে অবাধ স্বাধীনতার স্বাদ দিল। উপেন্দ্রকিশোর শুধু নিজের বইয়ে বা 'সন্দেশে' ভাল ছবি ছেপেছেন তা নয় —ব্যাপারটা তারও চেয়ে গভীর। নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শিল্পীদের কাজের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রথম ব্যাপক পরিচয় প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ পত্রিকার পাতায়— এবং সেখানেও উপেন্দ্রকিশোর, সুকুমার ও ইউ. রায় অ্যান্ড সন্সে'র অনিবার্য উপস্থিতি।

হাফটোন পদ্ধতিতে ছবি ছাপার উন্নতি দেখে উৎসাহিত হয়ে ১৯২২-এ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' বই হিসাবে বেরোবার আগে তার জন্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর অসামান্য কিছু ছবি এঁকেছিলেন। কমলকুমার মজুমদার বলেছেন, 'প্রসেস ব্লক আসাতে অসামান্য কাজ গগনবাবুর, তাঁহার মতো মহত্ত্ব বিরল, জীবনস্মৃতিতে যে কাজ রাখিয়াছেন; তাহা আমাদের কল্পনা সুউচ্চ মার্গে লইয়াছে.... ইহা এই কলকাতা নগরীর সৌন্দর্য্যের কথা, আলোই এখানে বাস্তবতা, সাধারণ realism হইতে কেমন করিয়া ছবিত্বে যাইতে হয় সেই চাতুর্য তিনি জানিতেন।' 'জীবনস্মৃতি'র ব্লকগুলি উপেন্দ্রকিশোরের তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়। বিলেত থেকেও সুকুমার সে সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন পিতার কাছে।

উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের মৌলিক গবেষণার বিষয়টি ছিল হাফটোন ব্লক নির্মাণের সঙ্গে সম্পর্কিত ফোটোগ্রাফি সংক্রান্ত। সে-কথা বলার আগে সাধারণভাবে হাফটোন ছবির বৈশিষ্ট্য ও সাধারণ ক্যামেরার সঙ্গে প্রসেস ক্যামেরার পার্থক্যের ব্যাপারটা একটু বলে নেওয়া দরকার। সাধারণ ফোটোগ্রাফ যাকে আমরা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বলি আসলে তার মধ্যে একেবারে সাদা থেকে ঘন কালো এবং তার মধ্যে অসংখ্য সাদা কালোর আমেজ বা টোন আছে। তুলি দিয়ে ছবি আঁকার সময় কালো বা যে-কোনও রঙের সঙ্গে ইচ্ছামতো জল মিশিয়ে রঙটি ফিকে করে তোলা যায়। ফোটোগ্রাফের নেগেটিভে বা প্রিন্টেও রাসায়নিক আবরণের ঘনত্বের হেরফের ঘটিয়ে রঙের বিভিন্ন আমেজকে ধরা হয়। কিন্তু বই ছাপার জন্য যে মুদ্রণযন্ত্র—তাতে মুদ্রক বিশেষ একটি ব্লক থেকে ছাপ নেওয়ার সময়ে ব্লকটির স্থান বিশেষে ছাপার কালির ঘনত্বের হেরফের ঘটাতে পারেন না। এই রিলিফ পদ্ধতির মুদ্রণ-ব্যবস্থায় হরফ বা খোদাই করা ধাতব প্লেটের যে-যে অংশ উঁচু হয়ে থাকে তার গায়েই কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপ নেওয়া হয়। এই জন্য সাধারণ নেগেটিভ যাকে বলা হয় কনটিনিউয়াস টোন— তার থেকে ব্লক তৈরি হয় না। দরকার হয় হাফটোন নেগেটিভ। একটি হাফটোন ছবিকে আতস কাচের নীচে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সেটি আসলে অজস্র ছোট বড় কালো কালো বিন্দুর সমাহার। ছবির ফরসা বা highlight অংশে বিন্দুগুলোর আকার সবচেয়ে ছোট আর অন্ধকার বা shadow অংশে তা ক্রমেই বড় হয়ে একটা বিন্দু অন্যের গায়ে এসে ঠেকে এবং শেষে কালো জমির মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট সাদা বিন্দুর জন্ম দেয়। বিশেষ একটি হাফটোন ছবির যে কোনও অংশে আকার যাই হোক না, যে কোনও দুটি ডটের কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্বটি সমানই থাকে। এবং সেই দূরত্ব অথবা ছবিতে ইঞ্চি পিছু কয়টি করে ডট থাকবে তা নির্দিষ্ট করে দেয় নেগেটিভ প্রস্তুতের সময় ব্যবহৃত স্ক্রিনটি।

সাধারণ ক্যামেরার সঙ্গে প্রসেস ক্যামেরার মৌলিক পার্থক্যও এই স্ক্রিনের ব্যবহার। প্রসেস ক্যামেরায় ফিল্ম বা প্লেটের সামনে একটি স্ক্রিন স্থাপন করার ব্যবস্থা থাকে এবং এই স্ক্রিনের দৌলতেই মূল চিত্রটিকে ডট-বিশিষ্ট প্রতিচ্ছবিতে রূপান্তরিত করা হয়। উপেন্দ্রকিশোর সুকুমারের কালে কাচের তৈরি স্ক্রিন ব্যবহার হত। সাধারণ স্ক্রিনে অতি সূক্ষ্ম দু'গুচ্ছ সমান্তরাল রেখা টানা থাকে যাতে কাচের পাতটি একটি জাফরিতে পরিণত হয়। রেখাগুলি হয় অস্বচ্ছ আর দুটি রেখার মধ্যবর্তী স্থান স্বচ্ছ। স্ক্রিনে ইঞ্চি পিছু লাইনের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই তা দিয়ে সূক্ষ্ম কাজ করা যায়, ছবি মোলায়েম হয়। মোটা কাজ যেমন খবরের কাগজে ছাপা ছবিতে ইঞ্চি পিছু ৬০টি বিন্দু দেখা যায়—অর্থাৎ 60 lines screen-এর ব্যবহার করে নেগেটিভ তৈরি হয়। খুব সূক্ষ্ম কাজে বর্তমান অফসেটের যুগেও ১৫০ লাইনের চেয়ে সূক্ষ্ম screen এর ব্যবহার বিরল।

সাধারণ ক্যামেরায় ছবি তুলতে হলে সাধারণত তিনটি জিনিস নিয়ন্ত্রণ করতে হয়— ফোকাস, অ্যাপারচার ও সাটার স্পিড। কিন্তু প্রসেস ক্যামেরায় অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ দাবি করে স্ক্রিন দূরত্ব নির্ধারণ। স্ক্রিনটিকে প্লেট বা নেগেটিভের ঠিক কতটা সামনে স্থাপন করা দরকার, এই বিষয়টি বেশ জটিল অর্থাৎ গণিত ও পদার্থবিদ্যার অনেকগুলি বিচার্য অনুসারেই স্ক্রিন দূরত্ব নির্ধারিত হয়।

প্রসেস ক্যামেরায় ছবি তোলার আরেকটি অভিনব ব্যাপার হল একাধিক এক্সপোজার। একই ছবির একাধিক শট নেওয়া হয় একটি নেগেটিভের উপর বিভিন্ন অ্যাপারচারে ও বিভিন্ন শাটার স্পিডে। এই অ্যাপারচার নিয়ন্ত্রণ বা লেন্সের আলোক প্রবেশের দ্বারের আকারের

হ্রাসবৃদ্ধি, স্ক্রিনের লাইনসংখ্যা ও স্ক্রিন দূরত্ব—সব ক'টিই একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্কিত—Interelated।

উপেন্দ্রকিশোর তথা সুকুমারের মুখ্য অবদান, হাফটোন নেগেটিভ তৈরির ক্ষেত্রে সে যুগে যে অভিজ্ঞতাসর্বস্ব hit অ্যান্ড miss পদ্ধতিতে কাজ হত তার অবসান ঘটিয়ে একটা নিয়মের প্রবর্তন করা—সুসংহত রূপ দেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কলকাতা থেকে প্রকাশিত জার্নাল অফ ফোটোগ্রাফিকসোসাইটি অব ইন্ডিয়ায়, ১৮৯০ থেকে ১৯২৪-এর মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরই একমাত্র ভারতীয় যাঁর মৌলিক গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। ১৯০৯-এর মার্চ থেকে আগস্ট অবধি ধারাবাহিকভাবে উপেন্দ্রকিশোরের 'Screen & their Uses' প্রকাশের প্রাক্কালে জার্নালের সম্পাদক জানিয়েছিলেন 'এত দিন আমাদের দৃঢ় সিদ্ধান্ত ছিল জার্নালের পাতায় এমন কোনও রচনা প্রকাশিত হবে যা সাধারণ ফোটোগ্রাফারদের কাজে লাগতে পারে। কিন্তু মিস্টার ইউ .কে . রায়ের এই পেপার কিছু ব্যাখ্যা দাবি করে। লেখাটি যদি মামুলি ধরনের হত, পাঠ্যপুস্তকের বিষয়েরই হেরফের মাত্র তাহলে নিশ্চয় সম্পাদকরা সদয় হতেন না। কিন্তু সবাই যেখানে ব্যর্থ, হাফটোন কাজকে সাধারণ অপেশাদারদেরও আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসতে সফল হয়েছেন মিস্টার রায়। যে নেগেটিভ তৈরি করতে জানে তার এখন প্রিন্টিং ব্লকও তৈরি করতে না-পারার কোনো কারণ নেই। মিস্টার রায় বৈজ্ঞানিক ও গাণিতিক সূত্র অনুসরণ করে সতর্কভাবে সমস্যার সমাধান করেছেন এবং এখন তার ফল এমন লোকেও ভোগ করতে পারবে যে নির্ভুলভাবে গুণ অবধি করতে পারে না।'

সেকালের মুদ্রণ বিশারদদের কাছে বাইবেল স্বরূপ পেনরোজেস পিকটোরিয়াল অ্যানুয়ালে ১৮৯৭ থেকে ১৯১১-র মধ্যে উপেন্দ্রকিশোরের ৯টি পেপার ছাপা হয়। আর ১৯১২ ও ১৯১৩-য় বিলেতে থাকার সময়েই সুকুমারেরও দুটি পেপার প্রকাশিত হয়। এইসব গবেষণাপত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার যোগ্যতা আমার নেই, তবে পিতাপুত্রের গবেষণার ultimate result বা মুখ্য অবদান নিয়ে দু'চারটি কথা বলা যেতে পারে।

১৮৯৭-এ ইংলিশম্যান পত্রিকার একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় উপেন্দ্রকিশোর তখন ইঞ্চি পিছু ৭৫, ৮৫, ১২০, ১৩৩, ১৭০, ২৪০ এমনকী ২৬৬ ডট বিশিষ্ট হাফটোন ব্লক প্রস্তুত করছেন। আগেও বলেছি এ যুগেও ১৫০ ডটের বেশি ছবি বিরল। আরও বিস্ময়কর সে যুগে ১৭০, ২৪৪ বা ২৬৬ লাইনের স্ক্রিন তৈরিই হত না। তাহলে তিনি ১৭০, ২৪৪ বা ২৬৬ ডট পেলেন কী করে?

খুব ছোট ছিদ্র পেরিয়ে যাওয়ার সময় আলো তার সরলরেখা-চরিত্র থেকে কিঞ্চিৎ বিচ্যুত হয়, অর্থাৎ ঈষৎ বেঁকে যায়। এই ঘটনাটি ডিফ্র্যাকশন নামে পরিচিত। হাফটোন নেগেটিভ তৈরির সময়ে ডিফ্র্যাকশনজনিত কিছু প্রভাব পড়ে এ-কথা সকলেরই জানা ছিল। কিন্তু প্রক্রিয়াটি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক জ্ঞান না থাকায় সেযুগে সকলেই বড় আকারের ডায়াফ্রাম অর্থাৎ লেন্সের আলোকপ্রবেশের, বড় আকারের দ্বার ব্যবহার করে এই অনাচার থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করতেন। উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু আলোর এই ডিফ্র্যাকশন ধর্মকেই কাজে লাগিয়ে স্ক্রিন লাইনের দ্বিগুণ এমনকী চতুর্গুণ সংখ্যার ডটবিশিষ্ট প্রতিচ্ছবি সৃষ্টি করতে সফল হয়েছিলেন। পেনরোজ পত্রিকায় তাঁর এমনি একটি কাজের নমুনা ছাপা হয়েছিল—Witch of Ghoom নামে ২০০ ডট সমৃদ্ধ এই ছবিটি 100 lines screen ব্যবহার করে নির্মিত।

তাছাড়া সেকালে ডিফ্র্যাকশনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই ব্যবহার হত লং ফোকাস লেন্স যার ডেপথ ফিল্ড এত কম যে চ্যাপ্টা বা সমতল বস্তু, যেমন কাগজে আঁকা ছবি ছাড়া কোনও ত্রিমাত্রিক বস্তু থেকে সরাসরি তার হাফটোন ছবি তোলা সম্ভব হত না। উপেন্দ্রকিশোর প্রথম সর্ট ফোকাস লেন্স দিয়ে হাফটোন ছবি তুললেন ত্রিমাত্রিক বস্তুর। তারও উদাহরণ ছাপা হয়েছিল পেনরোজ পত্রিকার 'Halftone taken direct from nature' শিরোনামে।

উপেন্দ্রকিশোরের আরেকটি অবদান অটোমেটিক স্ক্রিন অ্যাডজাস্টমেন্ট ইন্ডিকেটর যন্ত্র। স্ক্রিনটিকে প্লেটের ঠিক কতটা সামনে স্থাপন করতে হবে সেটা স্বয়ংক্রিয় ভাবে নির্দেশ করত এই যন্ত্র। পেনরোজ কোম্পানি থেকে উপেন্দ্রকিশোর উদ্ভাবিত এই যন্ত্র তৈরি হয়ে তাদের প্রসেস ক্যামেরার অ্যাটাচমেন্ট হিসাবে বিক্রি হত। পরবর্তীকালে সুকুমার উদ্ভাবন করেন প্রায় একই প্রয়োজন মেটাবার জন্য আরও সহজ এবং শস্তা স্ক্রিন ডিসট্যান্স ক্যালকুলেটার। সেটিও পেনরোজ তৈরি ও বিক্রি করত।

আগে বলেছি স্ক্রিনে সাধারণত দু'গুচ্ছ সমান্তরাল রেখা বিশিষ্ট জাফরি থাকে। এই দু'গুচ্ছের অবস্থান পরস্পরের সঙ্গে ৯০ ডিগ্রি কোণে। উপেন্দ্রকিশোর নতুন দু'ধরনের স্ক্রিন নির্মাণের প্রস্তাব করেন ও তার বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা প্রকাশিত হয় পেনরোজে। এর মধ্যে একটি ৬০ ডিগ্রি স্ক্রিন ও অন্যটি থ্রি লাইন স্ক্রিন। অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে ৬০ ডিগ্রিতে আনত দু'গুচ্ছ রেখা ও তিনগুচ্ছ রেখা বিশিষ্ট স্ক্রিন। মনে রাখা দরকার এ ধরনের কোনও স্ক্রিন তৈরি হওয়ার আগে, ও তাই দিয়ে হাতেনাতে কাজ করার আগেই উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় এবং তারই পুরো সদ্ব্যবহার ক'রে সুলৎজে নামে এক প্রতারক এরকম একটি স্ক্রিন তৈরি ক'রে নিজের নামে পেটেন্ট গ্রহণ করে। পেনরোজের সম্পাদক স্বয়ং গ্যাম্বেলও স্বীকার করেছিলেন যে 'Mr. Ray is able to prove that he anticipated by some years the 60° screen patented by Schulze & described in the process year book for 1903-4। যাই হোক প্রতারিত হয়েও উপেন্দ্রকিশোর যে উক্তিটি করেছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে: To the craft it matters little who gets the credit for a particular invention. What directly concerns them is the addition of a valuable resourse to their equipment.'

উপেন্দ্রকিশোরের আরেকটি অসামান্য অবদান Multiple Diaphragms। আগে উল্লেখ করেছি প্রসেস ক্যামেরায় ছবি তোলার সময়ে বিভিন্ন অ্যাপারচারে একাধিক এক্সপোজার দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এই অ্যাপারচার (লেন্সের আলোকপ্রবেশের দ্বার) বাড়ানো-কমানো যাই হোক তার আকৃতি সাধারণত গোল হয়। সাধারণ ক্যামেরাতেও তাই। উপেন্দ্রকিশোর প্রথম, গোল ছাড়াও একাধিক বিভিন্ন আকৃতির ও আকারের ছিদ্র বিশিষ্ট অ্যাপারচারের ব্যবহারবিধি নির্দিষ্ট করলেন। কাজের সূক্ষ্মতা ছাড়াও তাতে আরেক লাভ হল—এই মাল্টিপল স্টপ্‌স ব্যবহার করে সাধারণ ক্যামেরার মতো মাত্র একটি এক্সপোজারেই — মানে একবার শাটার টিপেই কাজ করা সম্ভব হল।

উপেন্দ্রকিশোর স্বদেশে একবারই পুরস্কৃত হয়েছিলেন কারিগরি অবদানের জন্য। ১৯০৬-৭ সালের কলকাতার Industrial Exhibition-এ তাঁর স্ক্রিন ইন্ডিকেটর যন্ত্রের জন্য তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেছিলেন। তাছাড়া গ্রাফিক ডিজাইন — কমার্শিয়াল ডিজাইনের জন্যও তিনি পেয়েছিলেন স্বর্ণপদক। পেনরোজের পাতায় তাঁর গবেষণাপত্রগুলির সঙ্গে মুদ্রিত কিছু অপূর্ব গ্রাফিক ডিজাইন তথা হাফটোন ওয়ার্কের নিদর্শন আছে।

সুকুমার যখন বিলেতে এলেন তখন U. Roy & Sons -এর সম্প্রসারণের যুগ। নিজেদের বাড়ি তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে, নিজস্ব ছাপাখানা ও 'সন্দেশ' প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। তাই দেখি লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টারে সুকুমার মুদ্রণ বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষালাভ গ্রহণ ছাড়াও অবিরাম অনুসন্ধান করছেন নিজেদের প্রেস ও প্রসেস বিভাগের জন্য যন্ত্র ও কৌশল নির্বাচনের। পিতাকে লেখা তাঁর বহু চিঠির ছত্রে ছত্রে তার বর্ণনা রয়েছে। 'সন্দেশ' প্রথম প্রকাশের সময়েও সুকুমার চিন্তা করেছেন লিথোগ্রাফিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে কেমন হয়। সন্ধান করেছেন উপযুক্ত মুদ্রণযন্ত্রের। সার্থক শিশুপত্রিকার অতিরিক্ত সন্দেশকে আমার U. Ray & sons -এর হাউস জার্নাল বলেও মনে হয়।

সুকুমার বিলেতে প্রতিচ্ছবি মুদ্রণের তৎকালীন সব পদ্ধতি বিষয়েই শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন— লিথোগ্রাফি, অফসেট, ফোটোগ্র্যাভিওর, ইনট্যালিও , কলোটাইপ ইত্যাদি। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হয়েছিল বিলেতের মুদ্রণ বিষয়ক সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও। হাফটোন নেগেটিভ তৈরির ব্যাপারে বিলেতে সুকুমার, উপেন্দ্রকিশোর তথা U. Ray & sons -এর প্রতিনিধি হিসাবেই হাতেকলমে কাজ করে প্রসেস জগৎকে দেখিয়ে, দিয়েছিলেন 'মাল্টিপল স্টপস'* ইত্যাদির উৎকর্ষ ও উপযোগিতা। একটি চিঠিতে সুকুমার লিখছেন: 'হাফটোন আর Three colour work এরা যা করে সে কিছুই নয়। দু'তিনটা Three colour-এর প্রুফ তুলল একটাও রং ঠিক হয়নি। সেইগুলোই Touch ক'রে কাজ করতে লাগল। আমাকে বলল, প্রথম প্রুফে এর চেয়ে ভাল রং হয় না। আমি বললাম নেগেটিভ ঠিক হলে প্রথম ছবির মতো প্রুফ হওয়া উচিত।' সবচেয়ে বিস্ময়কর এই চিঠি তিনি বাবাকে লিখছেন না, লিখছেন মা—বিধুমুখী দেবীকে।

উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণা তাত্ত্বিক মহলে স্বীকৃত হলেও প্রসেস কর্মীদের গড্ডলিকা প্রবাহ অব্যাহত দেখে তার বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়েছিলেন সুকুমার। পেনরোজ-এ প্রকাশিত স্ট্যান্ডার্ডাইজিং দা অরিজিনাল' ও 'হাফটোন ফ্যাক্টস সামারাইজড'—তারই সাক্ষী।

সাধারণ ফোটোগ্রাফি চর্চাতেও নিশ্চয় বাল্যকাল থেকেই পিতা তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন। উপেন্দ্রকিশোর স্বয়ং দক্ষ ফোটোগ্রাফার ছিলেন। পেনরোজে প্রকাশিত রচনার সঙ্গে তাঁর তোলা ফোটোগ্রাফের প্রতিচ্ছবি ছাপা হয়েছিল। তাছাড়া কারাগার থেকে মুক্তি লাভের পর অরবিন্দ ঘোষের একটি ঐতিহাসিক ছবি তুলেছিলেন তিনি প্রবাসীর জন্য। 'সন্দেশ'-এর পাতাতেও রয়েছে তাঁর ফোটোগ্রাফি কর্মের কিছু নিদর্শন। পুণ্যলতা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় ছেলেবেলা থেকেই সুকুমার পাড়াপড়শিদের ছবি তুলতেন। বিলেতের 'চাম্‌স্‌', 'বয়েজ ওন পেপার' ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর তোলা ছবি প্রকাশিত ও পুরস্কৃত হয়েছিল।

সুকুমার রায়ের আরেকটি কৃতিত্ব—বাংলায় প্রথম ফোটোগ্রাফির নন্দনতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা। ইতিপূর্বে উপেন্দ্রকিশোরও ফোটোগ্রাফি বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন কিন্তু সেখানে তিনি ব্যবহারিক কাজে বিশেষ ক'রে ডকুমেন্টেশনের কাজে ফোটোগ্রাফির উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেন। ফোটোগ্রাফাররা যখন চিত্রশিল্পীদের সঙ্গে অলীক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Pictorialism নিয়ে ব্যতিব্যস্ত সুকুমার স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ক্যামেরা নামক যন্ত্রের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়েই সৌন্দর্যচর্চায় ব্রতী হতে হবে। এবং তেল বা জল রঙের শিল্পকর্মের অনুকরণ বা অনুসরণ নয়, স্বতন্ত্র একটি শিল্পমাধ্যম রূপেই ফোটোগ্রাফি অগ্রসর হবে।

বিলেত থেকে লেখা সুকুমারের অনেক চিঠিতেই দেখা যায়, তিনি নিজের ডার্করুমে ছবি ছাপার কাজে ব্যস্ত। দু'তিনটি ভারতীয় ছাত্রও জুটেছিল তাঁর। একটি পোস্টাল পোর্টফোলিও ক্লাবের সদস্য ছিলেন তিনি। নির্ধারিত ব্যবধানে যার প্রত্যেক সদস্যকে কয়েকটি ছবি পাঠাতে হত ও অন্যের ছবি সম্বন্ধে সমালোচনা করতে হত। প্রবাসেই ১৯১২-তে তিনি সদস্য হন Royal Photographic Society-র এবং ১৯২২-এ লাভ করেন ফেলোশিপ। প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এই সম্মান লাভ করেন।

বিলেতে তিনি Society of Colour Photographer-দের প্রদর্শনী দেখেছিলেন। কালার ফোটোগ্রাফির তখন শৈশব। সুকুমারের মৃত্যুর পর Welfare পত্রিকায় অশোক চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন : 'He made valuable contributions to colour photography'। ১৯১২-য় লেখা তাঁর একটি চিঠি থেকে জানা যায় উপেন্দ্রকিশোর Three colour ক্যামেরা নির্মাণের একটি আইডিয়া পাঠাবার পর সুকুমার সে বিষয়ে পেটেন্ট নেওয়ার সম্ভাবনা যাচাই করার জন্য খোঁজ নিচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য সৌম্যদর্শন পোর্ট্রেট আছে কিন্তু দৃপ্তভঙ্গির সার্থক পোর্ট্রেট বোধহয় একটি। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে একবারই রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন— সেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়েই ১৯০৫-৬ নাগাদ এটি তুলেছিলেন সুকুমার। এই সুপরিচিত ফোটোগ্রাফের গ্রহীতার নাম কিন্তু অল্প লোকেই জানেন।

১৩১২-র শ্রাবণ সংখ্যা 'প্রবাসী'র প্রচ্ছদে ব্যবহারের জন্য সুকুমার একটি ফোটো তুলেছিলেন। তাঁর তোলা আরও কিছু ফোটোগ্রাফ অবলম্বনে প্রবাসীর প্রচ্ছদ রচিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

পিতাপুত্রের ফোটোগ্রাফি সম্পর্কিত আরও একটি অসামান্য কাজ— microphotograph গ্রহণ। 'সন্দেশ'-এর পাতাতেই প্রথম বছরে প্রকাশিত হয়েছিল মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে তোলা 'মাকড়শা যদি বড় হতো'। এটি ছিল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি। আর সুকুমারের সম্পাদনার কালে প্রকাশিত হয়েছিল 'মাছি'র রঙিন মাইক্রোফোটোগ্রাফ। ভারতীয় কোনও পত্রিকায় ইতিপূর্বে microphotograph গ্রহণ ও তার প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

১৯২৩-এ সুকুমারের অকালমৃত্যুর আড়াই বছরের মধ্যে U. Ray & Sons উঠে যায় শুধু এটুকু বললেই কথাটা শেষ হয় না। বাড়ি বিক্রি হয়ে গেল— 'ইউ রায় অ্যান্ড সন্স'-কে তার গুডউইল সমেত নিলামে নামমাত্র মূল্যে কিনে নিলেন এই কোম্পানিরই প্রাক্তন ম্যানেজার করুণাবিন্দু বিশ্বাস, যাকে একদা গাফিলতির জন্য অপসারিত করেছিলেন সুকুমার ও সুবিনয়। শুধু ছাপাখানা আর প্রসেস বিভাগ নয়— U. Ray & Sons থেকে প্রকাশিত উপেন্দ্রকিশোর, সুখলতা, কুলদারঞ্জন ও সুকুমারের যাবতীয় গ্রন্থের স্বত্বও পেয়ে গেলেন করুণাবিন্দু। ১১৭/১ বৌবাজার স্ট্রিটে জাঁকিয়ে বসল করুণাবিন্দুর U. Ray & Sons। ব্যবসা চলতে লাগল খুবই ভালভাবে। অন্যদিকে উপেন্দ্রকিশোরের কাছে ব্যক্তিগতভাবে যারা কাজ শিখেছিলেন —U. Ray & Sons -এর সেইসব দক্ষ কর্মী যেমন ললিতমোহন গুপ্ত, পূর্ণেন্দু সেন, ফণিভূষণ ঘোষ, অশ্রুময় দাশগুপ্ত প্রমুখেরা ইন্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং, ভারত ফটোটাইপ, বেঙ্গল

'পেনরোজ' পত্রিকায় প্রকাশিত *'Multiple stops'* এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হল।

অটোটাইপ ইত্যাদি স্বতন্ত্র নানা সংস্থা খুললেন। প্রত্যেকটিই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করল। চলল না শুধু U. Ray & Sons। U. Ray & Sons থেকে যার সূত্রপাত এবং তারপর উপরোক্ত নানা সংস্থার দৌলতে চেন-রিঅ্যাকশনের মতো হাফটোনের কাজ কলকাতায় প্রায় কুটিরশিল্পে পরিণত হল। হাফটোন ব্লকের আগমনে জীবিকাচ্যুত কাঠখোদাইকারদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি মানুষ গ্রহণ করলেন নতুন বৃত্তি—নতুন পেশা।

কিন্তু পথিকৃৎ উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমারের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণের পথ শুধু লেখাজোকা আর সেমিনার আয়োজন নয়। তাঁদের গবেষণার কিছু কিছু ক্ষেত্র নিয়ে আজও এই ইলেকট্রনিক যুগেও নতুন কাজ শুরু করা যায়। বিশেষ করে মাল্টিপল ডায়াফ্রাম ও ম্যানিপুলেটেড ডটস নিয়ে নতুন ক'রে চিন্তাভাবনা করার প্রচুর সুযোগ আজও রয়েছে।

নির্দেশিকা : সুকুমার সাহিত্য সমগ্র, ৩ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স।
সিদ্ধার্থ ঘোষ, কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ, দে'জ।

হাফটোন্ ছবি

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

ফটোগ্রাফীর সাহায্যে পুস্তকাদিতে ছাপিবার জন্য ছবি খোদাই হইবার কথা অনেকেই জানেন। হাফ্‌টোন্ নামক যে সকল ছবি আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়,তাহা এই প্রণালীতে খোদিত।

নিজের ব্যবসায়ের কথা লইয়া সাধারণের সময় নষ্ট করিতে যাওয়া কতদূর সঙ্গত তাহা জানি না। কিছুদিন পূর্ব্বে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে গিয়া তিরস্কৃত হইয়াছিলাম। তিরস্কর্ত্তা স্বয়ং একজন দেশীয় হাকিম। দুনিয়ার সকল বিষয় তাঁহার বিচারাধীন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, হাফ্‌টোন্ নামক এই একটা অজ্ঞাত কুলশীল বিদেশী জিনিস এতদিন যাবৎ এদেশে আমদানী হইয়াও তাঁহার ঘরে পৌঁছায় নাই। সুতরাং তিনি পত্রিকাস্থ বিজ্ঞাপনে হাফ্‌টোনের বিস্তারিত বিবরণের অভাব দেখিয়া গরীবকে অপরাধী সাব্যস্ত করতঃ পোস্টকার্ডে পরওয়ানা প্রেরণ করিয়াছেন —you ought to have &c (&c = and see)। তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, যেরূপই হউক, এ সম্বন্ধে সাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতেই হইবে।

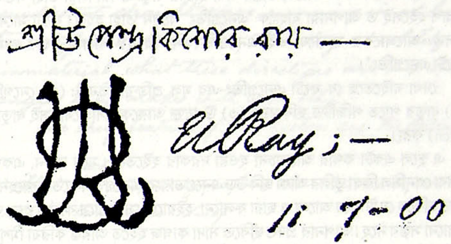
শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় —
URay ; —
11.7-00

চিত্রে অথবা ব্লকে উপেন্দ্রকিশোরের ইনিশিয়াল-কে বড় করে (নীচে বাঁদিকে) দেখানো হয়েছে।
সেইসঙ্গে ইংরেজি ও বাংলায় তাঁর স্বাক্ষর।

কোন জিনিসের ছবি তুলিতে হইলে ফটোওয়ালারা তাহার সামনে ক্যামেরা স্থাপন করিয়া কত প্রকারের কসরৎ করে, তাহা সকলেই দেখিয়াছে। ক্যামেরার ভিতরে যে তখনই ঝাঁ করিয়া একটা জিনিসের ছবি আঁকা হইয়া যায়, তাহা কিন্তু নহে। ক্যামেরার ভিতরে একখানা মসলা মাখানো কাঁচে সামনের জিনিসের একটা ছবি পড়ে। সেই ছবি পড়ার দরুণ সেই কাঁচে মাখানো মসলাটাতে কেমন একটা পরিবর্ত্তন হয়। সে পরিবর্ত্তন তখন দেখা যায় না, কিন্তু তার পর সেই কাঁচ খণ্ডকে আর কতকগুলি প্রক্রিয়ার অধীন করিলে তাহার পৃষ্ঠে জিনিসের একটা উল্টা ছবি (negative) ফুটিয়া উঠে। উল্টা ছবি বলিবার অর্থ এ নয়, যে আপনার পদদ্বয় উর্দ্ধে উঠিবে, আর শিরোব্রজে গমনাগমনের ব্যবস্থা হইবে। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, ঐ কাঁচে অঙ্কিত ছবিতে আলোকের স্থানে অন্ধকার, এবং অন্ধকারের স্থানে আলোক দেখা

যাইবে। প্রকৃত ছবির যে স্থান যত কাল হওয়ার দরকার নেগেটিভের সেই স্থানটি ততই স্বচ্ছ হইবে, আর প্রকৃত ছবির যে স্থান যত ফরসা হওয়ার দরকার, নেগেটিভের সেই স্থান ততই কাল হইবে।

এখন এই নেগেটিভকে একখণ্ড মসলা মাখান কাগজের অথবা অন্য কোন উপযোগী জিনিসের উপরে স্থাপন করিয়া আলোতে ধরিলে সেই কাগজে একখানি প্রকৃত (Positive) ছবি (অর্থাৎ যাহাতে আলো ও ছায়া যথাযথ রূপে ব্যক্ত হইয়াছে সেইরূপ ছবি) পাওয়া যাইবে। ইহাকেই আমরা ফটোগ্রাফ বলি।

কথাটাকে নিতান্তই মোটামুটি বলা হইল। কিন্তু যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তাঁহাদের পক্ষে এ সকল কথা অনাবশ্যক এবং বিরক্তিকর হইতে পারে। আর যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, তাঁহাদিগকে সাময়িক পত্রের প্রবন্ধে দুকথা বলিয়া ইহার চাইতে পরিষ্কার জ্ঞান দেওয়া খুব কঠিন বোধহয়। উপযুক্ত নেগেটিভ, আর উপযুক্ত মসলা মাখানো ধাতুর পাত হইলে সেই ধাতুর পাতে পজিটিভ ছবি মুদ্রিত করা যায়। আর সেই ছবির এমন গুণ হইতে পারে যে, যে আরকে ডুবাইলে ধাতুর পাত গলিয়া যায়, সে আরকে এই ছবিখানির কোন অনিষ্ট হয় না ছবি অক্ষত থাকে, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানের ধাতু গলিয়া গিয়া তাহা গর্ত্ত হইয়া যায়। এরূপ হইলেই ত আপনারা যাহাকে 'এনগ্রেভিং' বলেন তাহা হইল। ফটো মানে আলোক। মূলত: আলোকের সাহায্যে এই এনগ্রেভিং নিষ্পন্ন হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে 'ফটো এনগ্রেভিং'।

দেখা যাইতেছে যে ফটো এনগ্রেভিং-এর মূল প্রক্রিয়া তিনটি: (১) নেগেটিভ প্রস্তুত (২) ধাতুর পাতে পজিটিভ ছবি মুদ্রণ (৩) উপযুক্ত আরকের সাহায্যে সেই ধাতুকে খোদাই (etch) করা।

এ স্থলে একটা কথার আলোচনা হওয়া দরকার হইতেছে। মনে করুন, একখানা ফটো অথবা পেন্সিল কিম্বা তুলির আঁকা ছবি উড্ এনগ্রেভারকে এনগ্রেভ করতে দিয়েছেন। আপনার প্রদত্ত ছবিতে যে উপায়ে আলো ও ছায়া ফলানো হইয়াছে, সে উপায়ে কাঠের ব্লকে আলোছায়া ফলানো সম্ভব নহে। আপনার প্রদত্ত ছবিতে সাদা কাগজ হইতে আরম্ভ করিয়া মিশ্‌মিশে কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য প্রকারের শেড্ রহিয়াছে। এই অসংখ্য প্রকারের নয় সাদা নয় কাল শেড্‌কে ইংরেজী ভাষায় 'হাফ্‌টোন্' বলে। [*উপেন্দ্রকিশোরের ফুটনোট* : ক্রমাগত ইংরেজী কথা ব্যবহারের ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন। এই সকল কথার এক একটা বাংলা প্রতিশব্দ ভাবিয়া স্থির করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাদের অর্থ আর খানিক পরে স্বয়ং বুঝিতে পারিব কিনা, সে বিষয়েই গভীর সন্দেহ হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।]

যাহা বলিতে ছিলাম। তুলিতে ছবি আঁকিবার সময় চিত্রকর যে উপায়ে হাফটোন্ ফলান, এনগ্রেভারের সে উপায় অবলম্বন করা অসম্ভব। তুলির কাজে কাল রঙে যথেচ্ছ জল মিশাইয়া তদ্দ্বারা যেরূপ যেরূপ শেড্ ইচ্ছা প্রস্তুত করা যায়। এনগ্রেভার কি তাহা পারেন? এনগ্রেভারের ব্লক একই কাগজে একই কালীতে ছাপা হইবে—জল মিশাইয়া সেই কালীকে আবশ্যক মত একস্থানে পাতলা অপর স্থানে গাঢ় করিবার ব্যবস্থা হাতে খাটিবে না। ব্লকের যে সকল স্থান গর্ত্ত, তাহা একেবারে সাদাই থাকিবে, আর যে সকল স্থান উঁচু তাহা একেবারে কালই হইবে। অথচ আপনার চাই যে, সাদা হইতে কাল পর্য্যন্ত যত প্রকারের মাঝামাঝি শেড্ মূল ছবিতে আছে, ব্লক হইতে ঠিক তেমনটি ছাপা হয়—নইলে সে জিনিস্‌টি হইবে না। সুতরাং

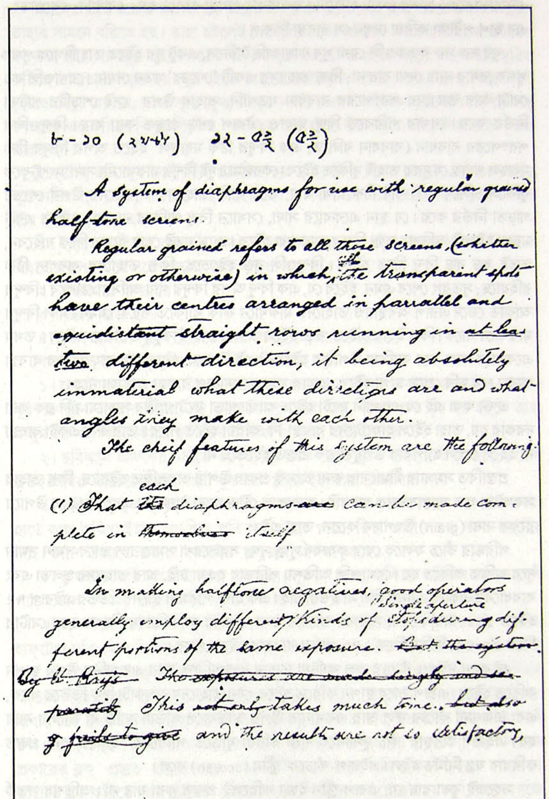

৮ - ১০ (২৮৮৮)   ১২ - ৫½ (৫½)

A system of diaphragms for use with regular grained half-tone screens.

Regular grained refers to all those screens (whether existing or otherwise) in which, with the transparent spots have their centres arranged in parallel and equidistant straight rows running in at least two different direction, it being absolutely immaterial what these directions are and what angles they make with each other.

The chief features of this system are the following:

(1) That ~~the~~ each diaphragms ~~are~~ can be made complete in ~~themselves~~ itself

In making halftone negatives, good operators generally employ different single aperture kinds of stops during different portions of the same exposure. ~~But the system by U. Arys~~ ~~The exposures are made singly and separately~~ This ~~not only~~ takes much time. ~~but also fails to give~~ and the results are not so satisfactory,

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী'র ইংরেজি হস্তলিপি

এন্‌গ্রেভারকেও সকল প্রকার হাফ্‌টোন ফলাইবার ব্যবস্থা করিতে হয়। একখানি এন্‌গ্রেভিং-এর ছাপ পরীক্ষা করিয়া দেখুন সে ব্যবস্থা কিরূপ।

খুব সরু সরু কতকগুলি রেখা খুব কাছাকাছি টানিলে, একটু দূর হইতে তাহাদিগকে পৃথক পৃথকরেখার ন্যায় দেখা যায় না; কিন্তু তাহাদের একটি 'শেডের' মতন দেখায়। রেখাগুলি যত মোটা আর তাহাদের পরস্পরের ব্যবধান যতখানি, তাহার উপর সেই শেড্‌টির গাঢ়তা নির্ভর করে। রেখার পরিবর্ত্তে বিন্দু দ্বারাও ঐরূপ শেড্ প্রস্তুত করা যায়। বিন্দুগুলির পরস্পরের ব্যবধান (ব্যবধান বলিতে, এক বিন্দুর ঠিক মধ্যস্থল হইতে অপর বিন্দুর ঠিক মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যে দূরত্ব তাহাই বুঝিতে হইবে। কেবলমাত্র দুই বিন্দুর মাঝখানের সাদা অংশটুকুকে বুঝিলে চলিবে না।) যদি ঠিক রাখা যায়, তবে খালি তাহাদের আয়তনের উপর শেডের গাঢ়তা নির্ভর করে। যে স্থান একেবারে সাদা, সেখানে বিন্দু থাকিবে না, তার চাইতে একটু ময়লা হইলেই অতিশয় সূক্ষ্ম বিন্দুর আবশ্যক হইবে। ক্রমে যতই ঘোর রঙ্গের দিকে যাইবেন, ততই বড় বড় বিন্দু দিতে হইবে। বিন্দুগুলি বড় হইতেছে, কিন্তু তাহাদের ব্যবধান ঠিক রহিয়াছে; সুতরাং শেষে এমন হইবে যে, এক বিন্দু অপর বিন্দুর গায় আসিয়া ঠেকিবে। বিন্দুর আকৃতি ভেদে এরূপ অবস্থায়ও তাহাদের মাঝখানে ফাঁক থাকিতে পারে, যেমন গোল বিন্দুর মাঝখানে থাকে। কিন্তু ইহার চাইতে বড় হইলে আবার সেই ফাঁকটুকুও চলিয়া যাইবে। তখন একেবারে কাল রঙে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। এই উপায়ে এন্‌গ্রেভার হাফ্‌টোনের ব্যবস্থা করেন। যে ছবি প্রেসে ছাপা হইবে, তাহার সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য নহে।

এখন কথা এই যে একখানি ফটো হইতে আগাগোড়া ফটোগ্রাফীর সাহায্যে যদি ব্লক করা দরকার হয়, তাহা হইলে হাফ্‌টোনের ব্যবস্থা কি করিয়া হইতে পারে? তার জন্য একটা ব্যবস্থা না হইলে প্রেসে ছাপিবার উপযুক্ত ব্লক প্রস্তুত হইতেছে না।

প্রস্তাবিত সমস্যার মীমাংসার জন্য অনেক প্রকার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার সকলটার ফল সন্তোষজনক হয় নাই। আজকাল চৌদ্দ আনা হাফ্‌টোন্ এন্‌গ্রেভার যে উপায়ে ব্লকের দানা (grain) উৎপাদন করেন, তাহা এই।

পরিষ্কার কাঁচে ফলকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সরলরেখা সমান্তরাল ভাবে সমান সমান দূরে অঙ্কিত করিতে হয়। রেখাগুলি অতিশয় পরিষ্কার হওয়া চাই, আর তাহাদের স্থূলতা এবং ব্যবধানের একটুও উনিশ বিশ না হওয়া চাই। এক ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের ভিতর এইরূপ ৭৫ হইতে ১৭৫ অবধি রেখা সাধারণ কার্য্যের জন্য ব্যবহার হয়। বিশেষ বিশেষ স্থলে মোটার দিকে ৫০ এবং মিহির দিকে ২৪০ পর্য্যন্ত ব্যবহার হইতে পারে।

এইরূপে দুইখণ্ড কাঁচের রুল কাটিয়া তাহার একখানিকে আর একখানির উপর স্থাপন করিতে হইবে। এরূপ ভাবে স্থাপন করিতে হইবে, যেন তাহাদের রুলকাটা দিক ভিতরে থাকে, এবং একখানা কাঁচের রুল আর একখানার উপর আড়বাগে পড়িয়া জাফ্রি বা জালের ন্যায় হয়। এইরূপ অবস্থায় কাঁচ দুখানিকে শক্ত করিয়া যুড়িতে পারিলেই ছবিতে দানা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র নির্মিত হইল। এইরূপ কাঁচকে স্ক্রীন (screen) বলে।

সহজেই বুঝা যায় যে, এরূপ স্ক্রীন ইচ্ছা করিলেই প্রস্তুত করা যায় না। অতিশয় সতর্ক এবং বুদ্ধিমান লোক বহুমূল্য যন্ত্রাদির সাহায্যে হীরের দ্বারা কাঁচের উপরে ঐরূপ লাইন কাটিতে পারেন। কিন্তু এ কার্য্য এত কঠিন যে, পৃথিবীতে তিনটি মাত্র লোক সম্প্রতি ইহা করিতেছেন। তন্মধ্যে আমেরিকার ম্যাক্স লেভিই প্রধান।

ক্যামেরার ভিতরে মসলা মাখান কাঁচের উপর যে ছবি পড়ে, সেই সময়ে একখানা স্ক্রীন তাহার সামনে ধরিতে হয়। তাহা হইলেই নেগেটিভ খানা সাধারণ ফটোগ্রাফীর নেগেটিভের মতন না হইয়া দানাযুক্ত হইয়া পড়ে। এই দানাযুক্ত নেগেটিভ হইতে ধাতুর পাতে ছবি মুদ্রিত করিলে তাহাও দানাযুক্ত হয়। দূর হইতে তাহাকে মোটামুটি ফটোর মতন দেখায়, কিন্তু নিকট দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, তাহা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দুর সমষ্টি। এখন এই দানাযুক্ত ছবি বিশিষ্ট ধাতু ফলককে এচ্ করিলে বিন্দুগুলি ভিন্ন অন্য স্থল গর্ত্ত হইয়া যায়। তাহা হইলেই হাফ্‌টোন্ ব্লক প্রস্তুত হয়।

হাফ্‌টোন্ ছবি খুব বেশী দিন প্রচারিত হয় নাই; কিন্তু ইহার মধ্যেই এতদ্দ্বারা সচিত্র পুস্তকাদির ব্যবসায়ে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যে সকল গুণে এই শ্রেণীর ছবি লোকের এত প্রিয় হইয়াছে, তাহা এই—

১। ইহাতে অবিকল আদর্শের অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। উড্ এন্‌গ্রেভারের নিকট এ বিষয়ে সকল সময়ে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় না।

২। অল্পসময়ে কাজ হয়।

৩। সস্তায় কাজ হয়।

৪। ভাল হাফ্‌টোন্ ছবি দেখিতে যারপরনাই মোলায়েম হয়।

পক্ষান্তরে হাফ্‌টোন্ ছবির কতগুলি ত্রুটি আছে যথা—

১। হাফ্‌টোন্ ছবির দানা ঐরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়াতে দেখিতে একটু অস্বাভাবিক দেখায়। খুব সরু স্ক্রীন ব্যবহার করিয়া এই দোষ নিবারণ করা যায়, কারণ দানা খুব সরু হইলে তাহা মালুম হয় না। কিন্তু ইহাতে ছাপিবার হাঙ্গামা ও খরচা বাড়িয়া যায়।

২। ছবিখানি আদর্শের চাইতে ঝাপ্‌সা হয়। যত মোটা স্ক্রীন ব্যবহার করা যায়, এ দোষ ততই অধিক পরিমাণে দেখা যায়। খুব সরু স্ক্রীনে ইহা প্রায় দেখা যায় না।

৩। ছবির উজ্জ্বল স্থানগুলিতে আলো ও ছায়ার তারতম্য তেমন ভাবে রাখা যায় না। হাতে কাজ করিয়া ইহার আংশিক প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকল সময় বাঞ্ছনীয় নহে। কারণ তাহাতে চেহারা বদলাইয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

৪। হাফ্‌টোন্ ছবি মাত্রেরই কাজ খুব সূক্ষ্ম; সুতরাং তাহা ছাপিতে পরিশ্রম ও ব্যয় বেশী পড়ে। ভাল কাগজ, ভাল কালী, ভাল ছাপা না হইলে ভাল হাফ্‌টোন্ ছবি হয় না।

এই সকল দোষগুণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সহজেই বোঝা যাইতে পারে যে উড্‌কাট্ অপেক্ষা হাফ্‌টোন্ ছবি কোন্ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, আর কোন্ বিষয়ে নিকৃষ্ট। উড্‌কাট্ ছাপিতে মুস্কিল নাই, আর তাহাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সহজেই দেখান যায়। সুতরাং ছোট ছোট জিনিসের পরিষ্কার আভাস দিতে হইলে, আর অল্প ব্যয়ে ছাপিবার দরকার হইলে, উড্‌কাট্ ব্যবহার করাই প্রশস্ত। সাধারণতঃ, দোকানদারের ক্যাটালগে, অল্প মূল্যের স্কুলপাঠ্য বহি, ইত্যাদিতে উড্‌কাট্‌ই বেশী ফল দেয়। (এ স্থলে একটা কথা বলা আবশ্যক। ফটোগ্রাফির সাহায্যে হাফ্‌টোন্ ভিন্ন অন্য এক প্রকারের ব্লক প্রস্তুত হইতে পারে। আদর্শটি এরূপভাবে অঙ্কিত করা যাইতে পারে যে, তাহাতে ব্লক করিতে আর স্ক্রীনের সাহায্যে দানা ফলাইবার প্রয়োজন হয় না। সাদা কাগজে, গাঢ় কৃষ্ণ কালীতে কলমের দ্বারা ছবি আঁকিলে, সে ছবি এই শ্রেণীর হয়। ফটো এন্‌গ্রেভিং প্রণালীতে এইরূপ ছবি হইতে অবিকল আদর্শের অনুরূপ ব্লক প্রস্তুত হয়; তেমন ব্লক উড্ এন্‌গ্রেভিং দ্বারা হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য ইহাকে হাফ্‌টোন্ ব্লক বলে না; ইহার নাম 'লাইন

ব্লক'। ভাল 'কালী কলমের' ছবি আদর্শ হইলে তাহা হইতে উড্‌কাট্ না করাইয়া লাইন ব্লক করাইলে অধিকতর সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়।)

কিন্তু যেখানে সুন্দর মোলায়েম ছবি চাই, চেহারা অক্ষুণ্ণ থাকা চাই, খরচপত্র পরিশ্রমে আপত্তি নাই, একটু ঝাপসা হইলেও ক্ষতি নাই, সেখানে হাফ্‌টোনেরই দরকার।।

অবশেষে, যদি বেয়াদবি না হয়, তবে হাফ্‌টোন্ ব্লকের ভাল মন্দ কিসে হয় তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। আদর্শের শেড্‌লাইট—বিশেষতঃ উজ্জ্বল স্থানগুলিতে — যে পরিমাণে রক্ষিত হইবে, সেই পরিমাণে ব্লকটিকে ভাল বলিব। ইহার উপরে ছবিখানি দেখিতে যত মোলায়েম হইবে, ততই তাহা আরও উঁচুদরের হইবে। অতঃপর (মুদ্রাকরের দিক হইতে) ছাপিবার সময় যে ব্লকখানি যত কম নাকাল করিবে, অবশ্য তাহা এক হিসাবে ততই প্রশংসনীয় হইবে। কিন্তু এই শেষ কথাটার সম্বন্ধে একটু বক্তব্য এই যে, ছবি খুব মোলায়েম রাখা, আর মুদ্রাকরকে ষোল আনা সন্তুষ্ট করা, এ দুটি ব্যাপার এক সময়ে ঘটান সুকঠিন। মুদ্রাকরের যন্ত্র, মালমসলা এবং যোগ্যতা যথোচিত হইলে এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তার কারণ থাকে না বটে, কিন্তু এ দেশকালে তাহা সচরাচর ঘটে কই?

যেমন তেমন একটা হাফ্‌টোন্ ব্লক প্রস্তুত করা অতি সহজ কাজ কিন্তু আদর্শের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ছবিখানিকে মোলায়েম করা একটু বেশী রকমের কঠিন।

প্রদীপ, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩০৬

(দু একটি অনিবার্য মুদ্রণপ্রমাদ সংশোধন ছাড়া উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ব্যবহৃত মূল বানান ও যতিচিহ্ন হুবহু অক্ষুণ্ণ রাখা হল।)

গবেষণাপত্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়

প্রথম খসড়া

A system of lens stops or diaphragms for use in conjunction with such half tone screens, as are composed of regularly disposed transparent spots on an opaque ground. The said diaphragm are made on the following principles, applied either singly or any number of them jointly according to the needs of a case.

I. The Principle, that "the quality of a halftone dot as obtained in the negatives depends largely on the absolute brightness of the screen hole projection", representing the "dot images" as applied to the manufacture of a diaphragm. This application is made in the following manner

In making a negative, good operators employ stops with apertures of different sizes and shapes during different portions of an exposure. The stops are employed singly, one after the other. But if it can be made possible for these several apertures to be used simultaneously so that the projections due to each and all of them falls together on each dot image on the sensitive plate, the brightness of the image will of course increase in proportion. Then as a result not only will the total length of the exposure be very much shortened, but a much crisper and denser dot will be obtained in the negative. (i.e. the patch of light which corresponds to a halftone dot).

This falling together of projections is regulated by the following principles, viz:—

II. The Principle that a 'regular', or 'geometrical' arrangement of screen openings necessitates that the centres of the same openings should be disposed in parallel and equidistant straight rows running into at last *two* different directions.

It does not matter what these directions are, or what angle they make with each other, but at least two such directions can be found in every geometrical screen. These directions should be accurately determined and the diaphragm apertures cut in such a manner as to satisfy the following principle, viz, —

III. The principle that each dot image on the sensitive plate will receive a projection from each of two apertures cut on the same diaphragm if the line joining the centres of the said apertures runs parallel to a row of screen openings and if at the same time the length of this line is equal to $N\frac{\varepsilon D}{S}$, where ε is the camera extension, D is the distance between the centres of two consecutive screen openings in the same row and *S* is the screen distance employed.

If N is given a fractional value, the effect will be to place the projection of the aperture thus indicated in a position intermediate between two dot images, the fractional part of the value exactly determining the distance of the projection from each dot image.

It is obvious that for directions parallel to different rows of screen openings and for different values of *N*, different positions for stop aperture can be found. A single diaphragm can thus be made to carry a very large number of apertures. But, in practice the number of apertures that can be cut in a diaphragm becomes limited by considerations due chiefly to the following principle — viz, —

IV. The principle that the absolute value of the screen distance should not be smaller than about double of that at which in the case of a small lens aperture a black cross appears to divide each screen hole projection. Nor should it be greater than about three times the same distance. It is only between these limits that the effects of diffraction are beneficial to good gradation.

These limits vary with different sized screen openings, lens apertures and camera extension. But by cutting a number of very small different sized apertures according to principle No II,on the same diaphragm plate it is possible to ensure that diffraction effects shall always be good within certain fairly wide limits.

In adjusting the screen Indicator for the first time, the only points to be attended to are

(1) the points A & B should be on the same horizontal line, i.e., they should be at exactly the same height from the base of the camera.

(2) that the distance between the point A and the Screen Indicator of the camera should be exactly equal to that between the ground glass and the screen ruling.

The first of these two conditions can be very easily satisfied. But the second requires to be explained.

In the first place the Screen Indicator of the camera is really the *vertical line* engraved on the piece of brass visible through the hole on the side of the camera, and the horizontal distance from the line to the point A is to be taken.

The distance between the ground glass and the screen ruling can be determined by first focussing the microscope sharply on the screen ruling, and then on the grain of the ground glass and noting carefully the length of microscope tube drawn out.

It is important to note that all screens employed should be of the same thickness. If this is not the case, then the thinner screens should be brought up to the level of the thickest by gluing strips of paper on their edges.

দ্বিতীয় খসড়া

A system of diaphragms for use with regular grained halftone screens.

Regular grained refers to all those screens (whether existing or otherwise) in which all the transparent spots have their centres arranged in parallel and equidistant straight rows running in at least two different directions, it being absolutely immaterial what these directions are & what angles they make with each other.

The chief features of this system are the following :

(1) *That each diaphragm can be made complete in itself.*

In making halftone negatives good operators generally employ different kinds of single aperture stops during different portions of the same exposure. This takes much time and the results are not so satisfactory owing to the fact that single apertures do not give very brightly illuminated or powerfully graduated dot images (that is the patches of light on the sensitive plate, which correspond to the halftone dot in the negative), yet it is a well-known fact that the brightness of the dot images is a great factor in determining the quality of the halftone dot as obtained in the negative.

By U. Ray's method it is possible to cut all the necessary apertures on the same diaphragm plate so that each dot image shall receive a projection from each of these apertures at one and the same time. The results is a great reduction in the total length of an exposure, and also very bright dot images giving very good halftone dots.

(2) *That each diaphragm is self-adjusting.*

No separate adjusting stop is necessary. The diaphragm itself is used in making the adjustment, which may be done mechanically by means of the Screen Adjustment Indicator, or by actual observation by a microscope.

(3) *These diaphragms are interchangable.*

The screen once adjusted for any of these diaphragms, is also adjusted for all the rest of them, so that the operator can use any of them at pleasure either singly or in combination (by putting two very thin stops together in the diaphragm slot), or in succession, one after the other. [By this means very striking dot effects can often be produced].

The principles chiefly involved in the production of these diaphragms are the following, used either singly or any number of them jointly according to the needs of a case.

I. The Principles that regulate the position of the projection of a given stop aperture on the sensitive plate.

Mathematically, these principles can be embodied in the following propositions.

If A and B are two points in the diaphragm and A' & B' the centres of their respective projections in the sensitive plate through any given screen opening, then AB shall be parallel to A' B', and the length of AB shall be to the length of A'B' as the difference between the camera extension and the screen distance is to the screen distance.

If A & B are two points on the diaphragm then their projection (through different screen openings) will coincide on the sensitive plate if the line AB is parallel to one of the rows in which the screen openings are arranged and if the length of this line is $N\frac{\varepsilon D}{S}$, where ε is the camera extension, D the distance between the centres of two consecutive, screen openings in the row in question and S the screen distance employed, and N is any whole number.

The procedure is to draw sets of parallel lines on the diaphragm is such a manner that when the diaphragm is put in position, these lines shall be parallel to the rows of screen openings and the distance between the lines shall be proportional to the distances between the rows of screen openings. If the apertures have their centres on these intersections, the stop will be self adjusting. That is to say, with such a stop in the lens slot, it is possible to find a position for the Screen, at which each dot image receives a projection from each of the apertures.

Further, all diaphragms with the centres of their apertures arranged in parallel rows exactly similar to each other as to direction and spacing, will be interchangable. That is to say the screen once adjusted for any of them will be adjusted for all the rest of them.

The above plan applies to the cutting of simple multiple diaphragms. But multiple diaphragms are often complex. More than one pair of sets of parallel lines are used as the bases for these stops, but of course the different pairs have to be identical to direction and spacing, and can differ only in position. Such complexity arises when in addition to the principal apertures, closure holes have to be bored for joining up or when the number of dots has to be modified. In some cases the shape of dots also can be modified.

II. The principles that regulate the gradation of a dot.

Gradation can be divided into four different Classes—

(1) Gradation due to the law of geometrical projection.

(2) ... ... diffraction of light.

(3) ... arising from simple multiplicity of projection.

(4) ... by reversal of projections.

The laws of geometrical projections (as far as gradation is concerned) are applicable chiefly to the larger apertures. In the case of very small apertures, the laws of diffraction of light predominate over those of geometrical projection.

According to the laws of geometrical projections, a well graduated dot image is obtained by placing the screen between two limits.

The shorter of these limits is the screen distance at which the lens aperture, viewed from a point in the image plane seems to be inscribed within the screen opening.

The longer of these limits is the screen distance at which the lens aperture viewed from a point in the image plane seems to be circumscribed about the screen opening.

The conditions of diffraction will be favourable to good gradation if the screen is placed anywhere between twice & three times the distance at which a black cross appears in the dot image.

Gradation from multiplicity of projections arises in two ways.

(1) The mere superimposition of different sized projections gives a graduated dot, even though the projections themselves may not be graduated. It is conducive to good gradation to use apertures gradually diminishing in size.

(2) A number of projections can be used in such a way that they give two or more dots in the halftone picture in the place of a single dot as ordinarily obtained. The effect of this will be better gradation in the negative, and this gradation will improve in the etching.

Gradation by reversal of projections is obtained in the following way —

Two or more projections preferably of an elongated shape, are shown on the same dot image in such a manner that their centres coincide, but their extremities fall apart from each other. In this manner the centre of dot image becomes much more strongly illuminated in comparison with the margins, improved gradation being the result. In a multiple diaphragm the mere cutting of the principal apertures with their lengths running in different directions will produce this effect.

III. The principles that regulate joining up.

If two dots fail to join up, it means that more light is wanted at the place where the joining up is needed — this defficiency may be easily supplied by cutting apertures in the diaphragm in such a position as to throw projections on the point requiring illumination.

It can also be made up by increasing the sizes of some of the apertures so that their projections may reach the place in question. But the first method is much to be preferred.

Joining up may also often be influenced by bearing in mind the fact that diffraction has a tendency to spread the light in the direction perpendicular ot the sides of a Screen opening.

এই খসড়া দুটি থেকে প্রস্তুত ***'Multiple Stops'*** *শীর্ষক মূল লেখাটি* ***'Penrose'*** *পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মূল লেখাটি এর পরে পুনর্মুদ্রিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সত্যজিৎ রায়ের কাছে সুরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে এই খসড়া দুটির কপি প্রস্তুত করেছিলেন সিদ্ধার্থ ঘোষ।*

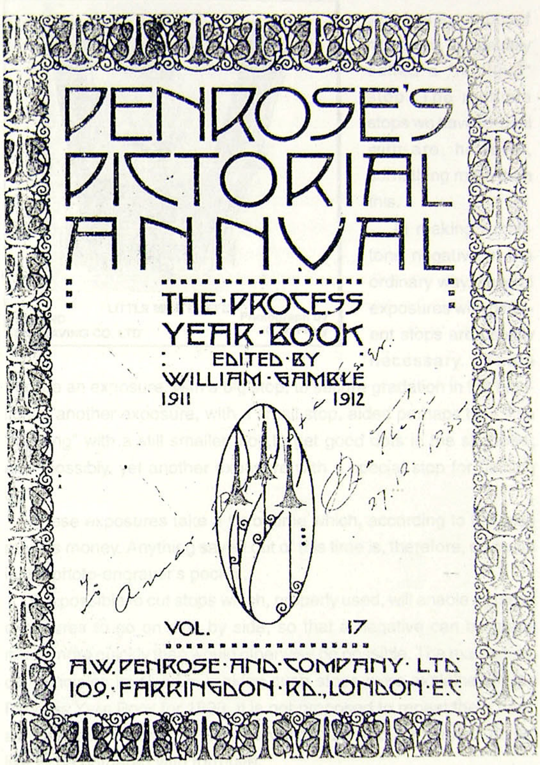

PENROSE'S
PICTORIAL
ANNUAL

THE·PROCESS
YEAR·BOOK
EDITED·BY
WILLIAM·GAMBLE
1911 1912

VOL. 17

A.W. PENROSE·AND·COMPANY·LTD
109, FARRINGDON·RD., LONDON·E.C

To Amar

27.12.

MULTIPLE STOPS

By UPENDRAKISOR RAY, B.A., Calcutta

LITTLE MISS MUFFET

Photograph by C.W. Perry

STRAND ENGRAVING CO. LTD.

WHEN a half-tone stop has a number of holes in it, it is usually called a "multiple" stop. The multiple stops we have to deal with are, however, something more than this.

In making a half-tone negative in the ordinary way, several exposures with different stops are usually necessary. There may be an exposure, with a big stop, to secure gradation in the high-lights; another exposure, with a small stop, aided perhaps by a little "flashing" with a still smaller stop,to get good dots in the shadows; and, possibly, yet another exposure with a special stop for "joining up".

These exposures take a lot of time which, according to the wise men, is money. Anything saved out of this time is, therefore, so much in the photo-engraver's pocket.

It is possible to cut stops which, properly used, will enable all these exposures to go on side by side, so that a negative can be made much more quickly than would otherwise be possible. The mathematical principles involved in making such stops were explained in the PROCESS YEAR BOOK for 1898. It is not proposed to repeat them here, as this article is intended for practical people who, I am afraid, do not like to be bothered with formulæ.

The subject is a very big one, and would require a thick volume to do it justice. Within the limits of an article like this it is only possible to give a brief outline of it.

The key to the whole thing is the fact that the white half-tone dot is a picture of the stop. It was known long before multiple stops were invented, and is being daily made use of in the three-colour process. It is also used in the Turati stop for adjusting the screen (Fig.1). This is a stop with two tiny holes (about *f/200*) running along the screen lines. Such a stop can be easily made. Cut a diaphragm out of a thin sheet of brass or ferrotype plate. Bore two very small holes in it in the same direction as the screen lines (any of the two sets of screen lines will do). The distance between the holes will depend on the size of the lens. The distance between opposite corners of a half-inch square will suit a 20-inch lens. For other sizes reduce or enlarge in proportion. It does not matter where you bore the holes as long as they are accurately in the direction of either set of the screen lines, and are well within the full aperture of the lens. But the most useful position for them would be at equal distances from the centre of the diaphragm.

With this stop in the lens, and a brightly lighted sheet of white paper on the copy board, and the screen touching the ground glass of the camera, we put our midget microscope against the clear centre of the ground glass and try to see how the dots look. We have, of course,

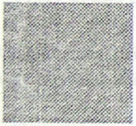
1

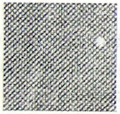
2

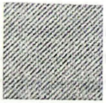
3

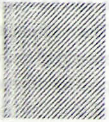
4

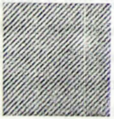
5

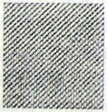
6

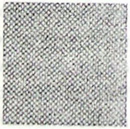
7

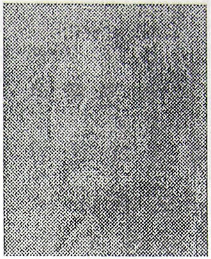
1. Round Stop at normal distance

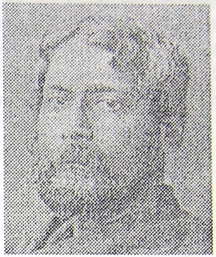
2. Multiple Stop (Fig. 11)

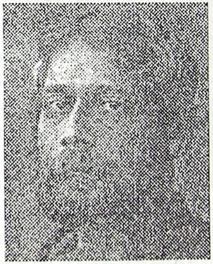
3. Multiple Stop (Fig. 15)

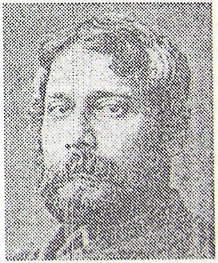
4. Multiple Stop (Fig. 14)

Rabindra Nath Tagore

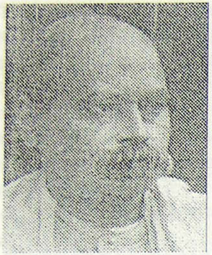
5. With Shadow Stop
(Fig. 10)

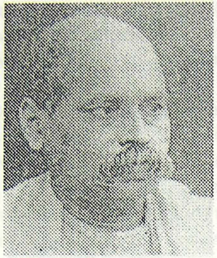
6. Modified Single Line

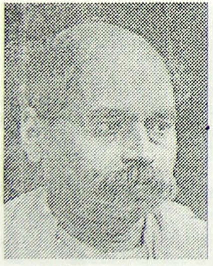
7. With Multiple Stop
(Fig. 12)

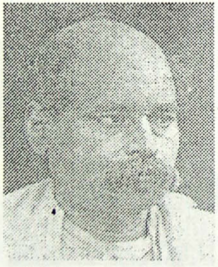
8. 60^0 (1:1) and Multiple Stop

Heramba Chandra Moitra

previously taken care to have our microscope focussed on the grain of the ground glass, which is now touching the screen.

In this position perhaps the microscope shows only the screen holes more or less sharp. We then begin to move the screen away from the ground glass, very slowly (say, $\frac{1}{32}$ of an inch at a time) and carefully note what takes place. A number of pretty effects will follow in regular order, all of which we must carefully note and get thoroughly familiar with :-

1) We see the screen holes sharp and clear (Fig.2).
2) The screen holes become fuzzy and oval (Fig.3).
3) Each of these holes splits up into a pair of tiny dots, so that there are now twice as many dots as there are screen holes (Fig.4).
4) These tiny dots range themselves up into fine beaded lines, uniformly spaced (Fig.5).
5) The dots again form pairs (Fig.6).
6) The pairs close up and become single oval dots again, the number of these oval dots being the same as that of the screen holes (Fig.7).
7) The oval dots become round (Fig.8).

At this stage it appears as if we were looking at the dots in the shadows of a half-tone picture. As soon as this takes place, we have reached our goal — our screen is "adjusted". That is to say, we must place the screen exactly in this position if we want to do successful work with the stops described in this article.[1] This adjustment is not at all difficult, and does not take more than five or six seconds to get through; once we have mastered it, we can never make any mistakes.

It is, I think, hardly necessary to explain how all these effects observed under the microscope can be due to the dots being pictures of the stop. It does not take much thinking to realize that those pairs of dots are pictures of the stop which has a *pair* of holes. If the stop had three four or more holes, the screen holes would break up into three, four or more tiny dots instead of pairs, and these tiny dots would be grouped exactly like the holes in the stop. Let us keep our eyes on any of those pairs of dots, and watch its behaviour, and the mystery will solve itself.

---

[1] This is, therefore, a very important position. The distance between the ground glass and the screen ruling in this position is called the "twice-normal " distance. It will be well to remember this name.

I am sorry I have no space to say more in the present article. Besides, it is only practical results we are now concerned with, so we can afford to do without explanations. We have a stop with two holes and have seen that with a suitable screen distance these *two* holes give a single dot. And if we have used our microscope to any purpose we have also realized that this single dot is brighter and nicer than what can be obtained from a one-hole stop.

Let us extend our knowledge a little by making a stop with four holes (Fig.9). In this stop there are four holes, a, b, c and d. The distance between a and b, and b and c, and c and d, and d and a, is *the same as the distance between the two holes in our first stop* (Fig.I)., (this is very important) ; a and b, and c and d, run parallel to one set of screen lines; b and c, and a and d, run parallel to the other set of screen lines.

Thus the four holes are exactly on the four corners of a square with its sides parallel to the screen lines. We also observe that these holes are arranged like half-tone dots.

Although this stop has four holes, and with close screen distances shows bewildering patterns under the microscope, yet at the twice-normal distance it gives exactly the same result as the stop we have already tried. We have dots like the regular shadow dots, as before, but brighter still.

We have noted that the holes in this stop are arranged like half-tone dots. From this we may infer that *a stop with any number of holes arranged like half-tone dots will produce the regular half-tone dot effect at the twice-normal distance,* just such dots as a single hole would give, only much superior in brightness and gradation, and commanding a much greater range of tones. Also, such a stop will adjust itself, it being unnecessary to use the two-hole stop to find the twice-normal distance.

On the scale adopted in the stops illustrated, we can easily bore nine holes within the full aperture of an *f/8* lens, provided we have one of these holes on the centre of the diaphragm (Fig.I0). The late Mr. W.B. Bolton made some experiments with a stop like this, and praised it very highly in *Process Work.* I am sorry I have forgotten the date of this communication. If it could be reproduced here it would prove interesting.

This is the multiple stop in its simplest form. It is an excellent stop for subjects with great contrasts. As a general shadow stop it is unrivalled. It is essentially a "diffraction" stop, that is to say, its brilliancy and penetrating power are due to diffraction.

As I have said, this is a simple or elementary multiple stop. In Fig. II we have an example of a more advanced stop, a study of which will make my meaning clear.

In this stop the big square hole in the centre stands for the usual high-light stop — the stop to whose twice-normal distance the screen is adjusted. The smaller squares correspond to the ordinary shadow stop, to whose normal distance our screen is adjusted. Usually, the exposure with this stop has to be double that with the high-light stop, hence there are two of these squares. The little round holes are to secure good dense dots in the deepest shadows (by virtue of diffraction), thus doing away with the necessity of "flashing", which is not a good practice, and should be avoided in ordinary work. There are six of those little holes in the stop, providing for an exposure six times that with the high-light stop.

The chief effect of using a stop like this would be materially to shorten the exposure. It would also improve the dots in the negative. "Bright illumination and short exposures," says the old maxim. With multiple stops good negatives can be made in a light that would be considered hopelessly dull for the single stop.

In Fig.I2 we have a stop for oval dots. This stop has seventeen holes of which the nine bigger ones are the principal apertures. The eight very small holes are "closure holes" for joining up. It is a good all-round stop, commanding a wide range of tones.

Fig.I3 shows a stop for producing single line effects. It gives continuous lines, without any tendency to break up into dots, which have a nice decorative look, but are injurious to detail. By reversing the stop during part of the exposure, a combined single and cross-line effect, with good gradation, can be secured.

Special attention is invited to Figs.I4 and I5. In these we have the most advanced type of multiple stops. They are rather limited in range, but give results impossible to obtain with the single stops ordinarily used.

Fig.I4 gives four dots to each screen hole, so that a I00-line screen can be made to do the work of a 200-line screen, with the additional advantage of securing finer tone detail.

Fig.I5 gives rings instead of dots in the high-lights. These dots, while greatly improving the tone detail, impart a very distinguished appearance to the picture.

These two stops are particularly recommended to wet plate workers. A word of caution is necessary in the case of these and other similar stops — I mean stops that give patterns different from that of the ordinary half-tone. In these cases it will be better for the novice to adjust his screen with the Turati stop, then put in the new stop at the time of the exposure.

I think these examples, properly studied and practically tested, will prove the usefulness of multiple stops. There is no limit to the number and variety of such stops. I have not the space to describe a large number of them, but if the few I have given are tried and found useful I shall be quite satisfied.

To some workers the adjustment of the screen with the microscope might appear to be a troublesome business. But there is really no need to take this trouble, as there is a machine which automatically adjusts the screen. You focus your camera, put the dark slide in position, cap the lens, push the screen back just as usual. Then you draw the screen inwards till the tip of indicator comes between two marks. That is all. You do all this without leaving your position behind the camera, as the tip of the indicator and the marks are plainly visible from this position.

Those who are in the habit of varying the screen distance to suit the copy might naturally look with suspicion on any proposal to keep the screen fixed. But there is nothing like trying. With multiple stops you vary your *exposure* to suit the subject, except in extreme cases where a special stop may be necessary. For average subjects Fig. II or I2 will be sufficient. In direct work Fig.I0 and with very soft subjects Fig.I4 or I5 will give good results.

It is not claimed that multiple stops possess every virtue. But if I had to choose between single and multiple stops I should certainly have the latter. They are more powerful than single stops, do quicker work, command a greater range of tones and give better gradation. They are more accommodating. Almost any decent light is good enough for them, any plate will give a printable negative with them, any photographer with ordinary intelligence can at once use them without previous practice. They lend themselves to the production of a variety of beautiful effects much more readily than single stops. A fair trial of the stop illustrated in Fig.I5 will convince earnest operators that it gives results unobtainable in the usual way. These results are not mere fancy work, curious but useless. On the contrary, they are the highest form of half-tone reproduction, much more artistic and faithful than the ordinary half-tone. And these modified dots help to preserve the gradation in the etching in a way that must be seen to be appreciated.

Courtesy :
Ashish Pathak

পরিশিষ্ট

উপেন্দ্রকিশোরের গবেষণাধর্মী রচনাপঞ্জি

Penrose's Pictorial Annual'-এ প্রকাশিত হয় নিম্নলিখিত রচনাগুলি:

1. Focussing the Screen, PP. 108 -111, 1897
2. The Theory of the Half-tone Dot, PP. 33-40, 1898
3. The Half–tone Theory Graphically Explained, PP. 49-53, 1899
4. Automatic Adjustment of the Half-tone Screen, PP. 76-80, 1901
5. How Many Dots? PP. 81, 1901
6. Diffraction in Half-tone, PP. 81-91, 1902-3
7. More About the Half-tone Theory, PP. 17-23, 1903
8. The 60° Cross-line Screen, PP. 97-102, 1905-6
9. Multiple Stops, PP. 81-88, 1911-12

ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার জার্নাল - এ (কলকাতা) প্রকাশিত হয় দুটি রচনা:

1. Half-tone Photography, March 1901
2. Screens and their Uses, April to August, 1901

ক্রোড়পত্র-২

উপন্যাসিকা: কল্যাণ মজুমদার

কোন বাড়ি, কার দেশ

কল্যাণ মজুমদার

প্রস্তাবনা

সারারাত প্রবল বৃষ্টির পর সকালের চোখ ফোটার মুখে আকাশ জিরিয়ে নেবার জন্য একটু থম ধরে। ব্যাঙের কীর্তনের উচ্চনাদ কমে না। ঝামর হাওয়ায় গন্ধরাজ ফুলের বুক-নিঙড়ানো বিভূতি পাঠায়। সকালটা মনোরম হবার স্বপ্ন তৈরি করে। বর্শার রেখার মতো সূর্যকিরণ আম-কাঁঠালের প্রহরা এড়িয়ে পেঁপে ফুলের হাসি জানলার গ্রিলে ছড়িয়ে দেয়। এইরকম সময়ে মানুষের শৈশব-কৈশোরের কথা মনে আসে। সকাল, আকাশ, আলো আর বৃষ্টির সঙ্গে গড়ে-ওঠা পরিচয়ের কথা, ধীর অথচ নিশ্চিতভাবে গাঢ় হওয়া আত্মীয়তার কথা। চোখের পাতায় কেঁপে কেঁপে বয়ে যায় কাগজের নৌকা। বড় নৌকাগুলো হাঁসের মতোই হেলেদুলে ভাসত। পঞ্চাশ বা ষাট বছর পরেও এসব দাবিগুলো স্মৃতিতে অবিকল থাকে। শিলালিপির মতো — কখনও প্রাচীন হয় না। অথচ কত গুরুতর বিষয়, প্রিয় মানুষের মুখ, আত্মার আর্তনাদ, ঠিকঠিক না হোক আবছাভাবেও মনে পড়ে না। বয়স! বয়স মানুষকে প্রবীণ করে, অনেক দীনও করে। স্মৃতি হারানোর দীনতা কি জন্মের সঞ্চয় হারানোর শূন্যতার চেয়ে কম বেদনাদায়ক। বেদনার কথায় মনে আসে, এক জীবনে কত বেদনা জমে, কত জমা বেদনা নিয়ে একটা জীবন কাটানো যায়— এসবের নিরূপণ হয়নি বোধহয়।

রোদের বর্শারেখা জানলার গ্রিল পেরিয়ে বিছানায় ঝাঁপ দেয়। শরীরে হানা দেবার আগেই উঠে পড়লেন প্রণতি। শাড়িটা সাব্যস্ত করে চুল গোছালেন। রাই এখনও অঘোর ঘুমে। অন্যদিন নিজে উঠে ওকেও ডাকেন। ফুল তুলে ঠাকুর ঘরে রাখা ওর বরাদ্দ। গাই দোয়াতে হারানের মা এলে গোয়ালে ঢুকে তার ব্যবস্থা করা ও হারানের মাকে দুধের হিসেব বুঝিয়ে দেওয়াটা ওর অবশ্যকর্তব্য। এসব সেরে একটু গলা সাধবে। তারপর পড়তে বসবে।

ততক্ষণে প্রণতি স্নান পুজো সেরে এসে রান্নাঘরে ঢুকবেন। রাই-এর জন্য দুধ, নিজের জন্য চা। আবার একটা দিনের আগ্রাসী দাবি মেটানোর প্রস্তুতি শুরু। আজও ব্যতিক্রম হবে না। তবে ছুটছুট করে নয়, একটু অলসভাবে। এমন সুন্দর সকালের কিছু আলস্য প্রাপ্যই থাকে। তার উপর আজ রবিবার। রাইকে কলেজে যেতে হবে না। প্রণতি তো কবেই রিটায়ার করেছেন। অবশ্য তা বলে কাজ কমেনি। কাজ - কাজই তাঁর একমাত্র পাথেয় যা দেশ দেশান্তর পেরিয়ে তাঁকে এখানে পৌঁছে দিয়েছে। দেশ শব্দটা মাথায় বুজকুড়ি কাটলেই অনুভবে হা-রে-রে-রে ধ্বনিত হয়। জিজ্ঞাসা করো কার দেশ? কোন দেশ? চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে, চোখে জ্বলে দাহহীন আগুন।

সকালের বাধ্যতামূলক রুটিন অনেকটাই সেরে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই মনে হল, দিন তার মুখের ছবি বদলাচ্ছে। গোমড়া ভারি ভাবটা কেটে গিয়ে হাল্কা হাসি খেলছে। রোদের রং থকথকে। প্রকৃতির প্রসন্নতা মানুষকে সরাসরি প্রভাবিত করে। রাই এখনো ওঠেনি বা হারানের মা আসেনি বলে কোন বিরক্তি এল না মনে। বরং নিজেই গোয়ালে ঢুকবেন ভাবলেন। গরুটার ডাক শোনা যায়নি। গরুর ডাকটা প্রণতির কানে সময়ে সময়ে বিভিন্ন ব্যঞ্জনা নিয়ে

ধরা পড়ে। কখনও মনে হয় মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ : ডাক দেয় ভোর হল মাঠে চলো। আবার কখনও মনে হয় ঘরমুখী রাখালের ডাক : বেলা যে পড়ে এল, সাঙ্গ হল দিন। একেকসময় আকুল আর্তনাদের মতো শোনায়, যেন শঙ্খনাদের সিগন্যাল।

— কত বেলা হয়ে গেল আমাকে ডাকোনি কেন — চোখ মুছতে মুছতে রাই বেরিয়ে এল।

খয়েরি ফুল-পাতা আঁকা ম্যাক্সিপরা রাই বারান্দার চৌকাঠে যেন ফ্রেমে-বাঁধা ছবি। চুলগুলো এলোমেলো। শরীর থেকে ঘুমের জমানো আমেজের টুকরোগুলো ঝেড়ে ফেলছে।

— ডেকে কী লাভ হত! একটু আগেও যা বৃষ্টি ছিল! মুখ-টুখ ধুয়ে আয়। হারানের মা আসেনি এখনো। আমি চা করছি।

— তুমি যাবে না। আমি এসেই চা করব। তোমার পুজো হয়ে গেছে?

উত্তরের অপেক্ষা না-করেই বাথরুমের দিকে চলে যায় রাই। প্রণতির ঠোঁটের ভাঁজে স্নেহময় হাসি উজিয়ে ওঠে। কিশোরীবেলার নিজেকে দেখতে পান কি? না। এমন সপ্রতিভ সরল সরস কৈশোর তাঁর ছিল না। কিন্তু একটা সুন্দর স্বপ্ন ছিল। স্বপ্নটা স্মৃতিতেও সম্পূর্ণ রূপ পায়নি। অথচ ছিল ঠিকই। যেন তারই টুকরো টুকরো অংশ দিনে দিনে দেখেন। টুকরো জুড়ে জুড়ে কোলাজ হয়, সম্পূর্ণ মৌলিক ছবি? হয় কি?

বৃষ্টি নেই, তবু মাথায় রং-ওঠা ছাতা নিয়ে হারানের মা আসে। ছাতার দুটো শিকের থেকে কাপড় সরে গেছে। সবুজ তাঁতের শাড়ি প্রায় হাঁটু ছুঁই-ছুঁই। ওর ভারি শরীরের পক্ষে ব্লাউজটা বোধহয় একটু ছোট।

প্রণতি কিছু বলতে পারার আগেই হারানের মা ব্যাখ্যা করে — যা বৃষ্টি — আমাদের ওদিকে তো হাঁটু সমান জল। দেখছ না শাড়িটা কোথায় বেঁধেছি! ঘরের চালে ফুটো হয়ে যা অবস্থা, তোমাকে আর কি বলব! রাই দিদিমণি গোয়ালে এসো গো—

শব্দ করে হাসতে পারতেন। হাসলেন না। মুখে তবু হাসিটা ধরা রইল। প্রশ্রয়ের হাসি। হারানের মা প্রায় রোজই এমন কোনও না কোনও কথা শোনায়। মানুষের দুঃখ ও অভাবের কথার তো শেষ নেই।

সকালের চা-পর্ব শেষে নিজের ঘরে বসে খাতাপত্র দেখছেন প্রণতি। পাওনা-গণ্ডা কোথায় কী আছে, কাদের জিনিসপত্র এখনও দেওয়া হয়নি, মহাজনের কাছে কতটা ঋণ রয়েছে এখনও। পড়ার ঘরে রাই বই খুলে বসেছে। ওর আজ আর রেওয়াজ করতে ইচ্ছে করছে না। তবু মাঝে মাঝেই ওর গুনগুন শুনতে পাচ্ছেন। একটুকরো টোড়ি। একটু ভৈরবী। কিংবা হঠাৎই সাধের লাউ বানাইল মোরে —

নিজের মনে হাসেন। মেয়েটার মাথায় নির্ঘাত ছিট আছে। ছিট নাকি অস্থিরতা? কখন যে কী করবে প্রণতি তো ধারণা করতেই পারেন না, ও নিজেও আগাম জানতে পায় কিনা সন্দেহ আছে। গানের গলা এত ভাল যে পণ্ডিত কুযাণ চক্রবর্তী নিজে আগ্রহ দেখালেও রাই ওঁর শিষ্যত্ব গ্রহণে রাজি হল না। ঝোঁক হল, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবে শুধু। কিন্তু কোনও স্কুলে বা নির্দিষ্ট সঙ্গীতগুরুর কাছে যাবে না। কেন? তার কোন উত্তর নেই। খুব চাপ দিলে বলে ভাল লাগে না আমার।

তবু একজন গানের মাস্টার রেখেছেন প্রণতি। গুরুদাস বসু নামী শিল্পী নন, কিন্তু একজন গুণী শিক্ষক যিনি ক্লাসিকালের সঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত নিয়েও চর্চা করেন। প্রায় অপত্যস্নেহে রাইকে শেখাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন গত দু-তিন বছর ধরে। অবশ্য গুরুদাসের টিকে যাওয়ার একটা কারণ হতে পারে যে তিনি ঘড়ি ধরে নির্দিষ্ট দিন বা সময়ে আসেন না। আসেন অনেকটাই আপন খেয়ালে — কখনও সকালে, কখনও সন্ধ্যায়। বলেন — যখনই তোমার কথা মনে হয়, রাই চলে আসি। বলো আজ কি শুনতে চাও — অতুলপ্রসাদ না পল্লিগীতি?

অবধারিতভাবে রাই বলে, না। আগের দিন যে দরবারি কানাড়া গাইছিলেন সেটা আরেকবার যদি —

— হ্যাঁ-হ্যাঁ। নিশ্চয় - নিশ্চয়।

গুরুদাসের আপাত-নিয়মশৃঙ্খলাহীন শিক্ষণপ্রয়াসেও যে একটা নিপুন শৃঙ্খলা গোপন আছে তা বোঝার সময় রাইয়ের না-হলেও প্রণতি ঠিকই বোঝেন। গুরুদাসের আন্তরিকতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও নিজের সংশয় থেকে, উদ্বেগ থেকে রেহাই পান না প্রণতি। একাগ্রতা ও মানসশৃঙ্খলা না থাকলে জীবনের কোনও ক্ষেত্রেই কি সাফল্য আসে! ওর বাবাও তো, সকলের মতে, প্রতিভাবান ছিল। কিন্তু কী যে অস্থিরতা ওকে গ্রাস করল, — কোথায় যে নিয়ে গেল

— বউদি আছেন নাকি — বউদি —

গেটের বাইরে থেকে উচ্চকণ্ঠের ডাক শুনে ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়ান প্রণতি। বারান্দা থেকে নামলেই এক চিলতে উঠোন। রাস্তার পার থেকে উঠোন ঘিরে কাঁটাতারের ঘেরা। ছোট্ট কাঠের গেট। পাতাবাহারের সবুজ ঢেকে রেখেছে কাঁটাতারের শাসন। গেটের একধারে করবী, এখানে বলে কল্কে ফুল।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা মানিক সেনকে অনেক দিন ধরেই চেনেন। সঙ্গের ছেলেটাকে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারেন না প্রণতি।

গেটের পাল্লাটা ভেতরের দিকে খুলে প্রণতি বললেন, কী ব্যাপার! এই বৃষ্টির দিনে হঠাৎ

— আসুন — আসুন —

বারান্দায় তিনটে বেতের চেয়ার অতএব চিহ্নের মত ও একটা কাঠের চেয়ার দাঁড়ি-র মতো পাতা ছিল। পাখাটা চালিয়ে দিয়ে প্রণতি বললেন, বসুন।

একটা বেতের চেয়ার একটু টেনে বসতে বসতে মানিক সেন বলেন, ঠিকই বলেছেন, অনেকদিন আসা হয়নি। আজও হয়ত আসা হত না, কিন্তু আমার এই ভাইটি — কবীর হায়দার, নাছোড়বান্দা — জোর করে ধরে এনেছে। ওকে চেনেন তো বউদি —

মাথা নাড়েন প্রণতি - না। আগে দেখেছি কিনা বলতে পারছি না।

কবীর বলে — আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি মাসিমা। আমি অবশ্য আপনাকে চিনি।

— ওটা কোনও বলার কথা নয়। বউদিকে এখানে সবাই চেনে। বউদি, কবীর অতি সজ্জন ছেলে — অধ্যাপনা করে। অনেকদিন দেশের বাইরে ছিল তাই দেখেননি। ইয়ংম্যান — মাথায় অনেক নতুন আইডিয়া ঘুরছে। মানুষের জন্যে সমাজের জন্যে — সাহিত্য সংস্কৃতির জন্যে কিছু করতে চায়।

প্রণতি এবার ভাল করে কবীরের দিকে তাকান। বয়েস তিরিশের নীচেই হবে। মুখটা লম্বাটে। গায়ের রং একেবারেই দূর্বাদলশ্যাম। একঝাঁক চুল মাথায়। জিনসের ওপরে বাদামি কুর্তা। ঝকমকে দাঁতে সুস্বাস্থ্যের দীপ্তি। মুখের রেখায় উষ্ণ প্রাণের আভা। নিজের বুকের মধ্যে

স্নেহসঞ্চারের আভাস লাগে। তবু মুসলমান ছেলে বলেই মনের দরজা-জানালায় ঝড়ো স্মৃতির জিজ্ঞাসু হাওয়া ঝাপটা মারে। এত বছর পেরিয়ে এখন আর অর্ধ-শতাব্দী প্রাচীন উষ্মা বা দ্বেষ অনুভবে করতালি দেয় না। এই দীর্ঘ সময়ে অনেক আত্মীয়প্রতিম মুসলমানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রথম পরিচয়ে সত্তার গভীরে কোথাও যেন একটা ব্যাখ্যাহীন ধাক্কা লাগেই। অন্তরের ক্ষত শুকিয়েও শুকোয় না যেন!

বললেন, খুব ভাল। কিন্তু আমার কাছে — মানে আমি কীভাবে কাজে লাগতে পারি?

মানিক সেন বললেন, আমি বুঝিয়ে বলছি, বউদি। এবছর তো আমাদের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হল। সেই উপলক্ষে এই বিবেকনগর প্রগতি পরিষদ একটা তিনদিনের অনুষ্ঠান করতে চায়। কবীর এবার এই পরিষদের সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছে। মহিলাদের অধিবেশনে আপনার উপস্থিতি চাই। আর রাইকে তো গান গাইতেই হবে — ও আমাদের স্টার আর্টিস্ট!

এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন প্রণতি। এবার কাঠের চেয়ারটা টেনে সম্ভ্রান্ত দূরত্ব বজায় রেখে ওদের মুখোমুখি বসলেন। কবীরের মুখের ওপর চোখ রেখে বলেন, তোমার বয়েস কম, আমার কথায় কিছু মনে কোরো না। তবে তোমরা যাকে স্বাধীনতার অর্ধশতক বলছ আমার কাছে তা বৈধব্যের অর্ধশতক। বাস্তুহারা — উদ্বাস্তু হবার অর্ধশতক। দেশভাগের অর্ধশতক।

— ঠিক বলেছেন, বউদি। — মানিক সেন বলেন — আমিও ওদের এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম। বলেছি এই স্বাধীনতার জন্য উৎসব করাটা বসনিয়ায় শান্তিস্বস্ত্যয়ন বা ইথিওপিয়ায় সবুজ বিপ্লবের কথা বলার মতো হাস্যকর। — বলেই যেন একটা দারুণ রসিকতাপূর্ণ কথা বলেছেন ভেবে হেসে ওঠেন মানিক সেন।

গভীর গলায় প্রণতি বলেন, এটা হাসির ব্যাপার নয় মানিকবাবু। আপনিও, আমি জানি, দেশভাগের পরই ওপার থেকে এখানে এসেছেন। তবে সেইসব দুঃস্বপ্নের দিনগুলোর কথা আপনি সম্ভবত ভুলে গেছেন। ভুলে যাওয়াটাই এখন সুবিধাজনক। কিন্তু কবীর, ওতো বোধহয় জানেই না কাকে বলে ছিন্নমূল। কী লাঞ্ছনা, নৈতিক অবমাননা, মৃত্যু, ধ্বংস ও মূল্যবোধহীনতা কত লক্ষ মানুষকে মানবতাবোধহীন মানুষ পশু হয়ে শুধু বেঁচে থাকতে বাধ্য করেছে তা কে বুঝবে! কে তার হিসেব দেবে? এই পঞ্চাশ বছরে আমি তার কোনও উদ্যোগ দেখিনি, তা নিয়ে কোনও আন্দোলনও হয়নি। কেবল অনেকের মত আমি বারবার বাস্তুহারা হয়েছি। কবীর, এই পঞ্চাশ বছরে — তোমাদের মহান স্বাধীনতার মধ্যে আমি পাঁচ-পাঁচবার বাস্তুহারা হয়েছি। কুকুরের মতো ছুটে বেড়িয়েছি এক ঘর থেকে অন্য ঘরে আশ্রয়ের জন্য — শুধু বেঁচে থাকার জন্য — সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। এখান থেকেও আবার কোনও একদিন ঘরপোড়া গরু হয়ে চলে যেতে হয় কিনা তারও কোনও গ্যারান্টি নেই।

কবীরের মুখে কথা সরে না। ওর চোখে বিস্ময় বিহ্বলতা। প্রণতিকে দেখে ওর মনে হয়েছিল আটপৌরে একজন বাঙালি ঠাকুমা যাঁর শুধু চোখে নয় অবয়ব বেয়েও স্নেহ চুঁইয়ে পড়ে। তিনি স্বাবলম্বী, পরিশ্রমী ও শিক্ষিত মহিলা শুনেছিল। মানিকদা ওকে উপযুক্ত সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু ওঁর মধ্যে, এই আপাতনিরীহ ষাটোর্ধ মহিলার ভেতরে যে এক জ্যান্ত আগ্নেয়গিরি সুপ্ত হয়ে আছে, ভাবতে পারার কোনও সুযোগও ছিল না। কিছু বলার জন্য শব্দ খোঁজে কবীর কিন্তু মুখে জোগায় না।

আঁচলে মুখ মুছে প্রণতি আবার বলেন, অনেক কথা বলে ফেললাম। তবে বুঝতেই পারছ তোমাদের অধিবেশনে আমার যাওয়া সম্ভব নয়। আমাকে মাফ করো। রাইকে কেন চাও বলো।

কবীর বলে, শুনেছি ও খুব ভাল গান গায় — সব রকম গানই নাকি পারে।

— কোথায় শুনেছ? ওতো কোনও ফাংশনে গায়নি কখনও।

মানিক বলেন, সেজন্যই তো আপনার অনুমতি চাই। কবীররা জানে না, আমি তো জানি আপনি কীভাবে ওকে মানুষ করেছেন, তালিম দিচ্ছেন আবার শৃঙ্খলার মধ্যে ধরেও রেখেছেন। ও এত ভাল গায় এবার ওর একটু আধটু প্রচার হওয়া তো দরকারই।

— আপনি শুনেছেন ওর গান?

— শুনেছি সামান্যই। ওই ওদের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে। তবে গুরুদাস রাই সম্পর্কে খুবই আশাবাদী।

চোখ ঘুরিয়ে প্রণতি দেখেন ঘরের চৌকাঠে রাই। কখন পড়া থেকে উঠে এসেছে খেয়াল করেননি। দূর থেকেই ওর মুখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করলেন। কিছু বোঝা গেল না। একটু ভেবে বললেন, ঠিক আছে বসুমশাই আসুন। তাঁর সঙ্গে কথা বলি। রাইর মতটাও জানতে হবে। দিন দুয়েক পরে যোগাযোগ করবেন। এখন শুধু এটুকু বলতে পারি, ওর গুরুজি যদি অনুমতি দেন আর ও নিজে রাজি থাকে আমি বাধা দেব না। ওর ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত না করা পর্যন্ত আমার তো মুক্তি নেই।

যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে কবীর হঠাৎ প্রণতিকে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রণাম করতে উদ্যোগী হয়। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে প্রণতি বলেন, ওকি-কি করছ।—

— মাসিমা, আমি তো আপনার সন্তানেরই মতো। না-জেনে যদি দুঃখ দিয়ে থাকি আমাকে ক্ষমা করবেন। না করলেও আমি কিন্তু আবার আসব।

মানিক সেনও হাতজোড় করে বলেন, আজ আসি বউদি।

ওদের চলে যাওয়ার দিকে ভাষাহীন চোখে তাকিয়ে থাকেন প্রণতি। জানেন মানিক সেন এখানকার মান্য নেতা। এবার এম.এল.এ হবার চেষ্টা করছেন। তাই একদা নকশাল-নেতা স্বাধীন চৌধুরির মাকে মনে পড়েছে অনেক বছর পেরিয়ে।

কিন্তু কবীরকে দেখে আচমকাই আরেকজন মানুষের কথা মনে এল — তাও যেন যুগান্ত পেরিয়ে। ঠিক অর্ধশতক পেরিয়েই। ঠিক এমনি গেট পেরিয়ে যাচ্ছিল ওর বাবার সঙ্গে — ওই মানুষটার শ্বশুর। শুধু সময়টা ছিল সন্ধ্যায় আকাশ-সীমান্তে সিঁদুর লাগার মুহূর্ত। বাতাসে ভেজা করবীর গন্ধ। একটু আগেই চকিত চুমু খেয়ে মানুষটা বলেছিল, ভাবছ কেন যাব আর আসব। আমার ফলারটা যেন তৈরি থাকে।

— ধ্যাৎ — অসভ্য কোথাকার।

তবু ফলার তো তৈরি ছিল, মানুষটা এল না। বলেছিল আসবে।

আসা হয়নি।

আশা — আশা —

প্রণতির চোখের ওপর হামলে পড়ে তরঙ্গ—তরঙ্গের পর তরঙ্গ। স্মৃতির। অশ্রুর। জীবনের।

মাত্রই পাঁচদিন পর ফিরেছে আজন্মের বাড়িতে। এখন এটা বাপের বাড়ি। সঙ্গে সেই মানুষটা যাকে আটদিন আগেও চেনা তো দূরের কথা, চাক্ষুসও করেনি। অথচ এই আটদিনেই একেবারে অজানা অচেনা মানুষটাই হয়ে উঠেছে আত্মার আত্মীয়। তারই বাড়িতে, যা আসলে এখন নিজেরই বাড়ি — লোকের কথায় স্বামীর বাড়ি / শ্বশুরের বাড়ি — পাঁচটা দিন কী অবিশ্বাস্য দ্রুততায় যেন স্বপ্নের মধ্যে, কেটে গেল। অনুভবে, অভিজ্ঞতায় দেহ ও মনে যা ঘটল তা আগের আঠারো বছরের আবদ্ধ চরকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে উন্মুখ শ্যামলিমায় ভরে দিয়েছে। এত আদর, এত ভালবাসা, এত সুখ, এত নতুন শাড়ি এত অলঙ্কার ওরই জন্য — শুধু ওরই জন্য, গোপনে জমানো ছিল কোনওদিন ভাবতেও পারেনি।

অস্বীকার করে না মনে অনেক ভয় ছিল। স্বামীকে নিয়ে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে নিয়ে। কত কথাই তো শুনেছে। কিছু যে আশেপাশে দেখেনি তাও না। তবু ওর তো ভয়ংকর কিছু লাগল না। মা বলে দিয়েছিল নতুন বউয়ের চেহারা, রূপলাবণ্য নিয়ে ঠেস-দেওয়া কথা বলা লৌকিক নিয়মের মধ্যেই পড়ে। কুরূপাও নতুন বউয়ের খুঁত বাছতে পারঙ্গম। জানতই ও রূপসী না। তবে মুখশ্রী সকলেরই প্রশংসা কুড়িয়েছে ছেলেবেলা থেকেই। সেজন্য মনে শঙ্কা থাকলেও প্রত্যয়ের অভাব ছিল না। কিন্তু ওর মুখ দেখে বিনোদের ঠাকুমা যেই বলে উঠলেন ও বাবা বিনোদ, তুই যে এক্কেরে লক্ষ্মীপিতিমে উঠাইয়্যা আনছস! — ওর বুক জুড়ে থইথই করে প্রসন্ন রোদ্দুর। যেটুকু ভার ছিল ফুৎকারে উড়ে গেল।

শ্বশুরমশাই বিধুশেখর বলেন, ক্যামন পছন্দ করছি হ্যাইডা কও মা।

— তুই কিছুই করস নাই। সব আমাগো বিনোদের ভাইগ্য। আর আমার ঠাকুরের আশীর্বাদ।

এই পাঁচদিনে নিজের কাছে বসিয়ে শুইয়ে অজস্র গল্প করেছেন ঠাকুমা — পরিবারের গল্প, বিনোদের ছেলেবেলার গল্প। মাঝেমাঝেই বলতেন, বুইঝলা টুনুমা, আমার নাতিটা ঠাউরদার স্বভাব পাইছে। শরীরে বড় মায়া। তবে তোমার কোনও অসুবিধা হইলে আমারে কবা। লজ্জা করবা না।

নিজের ঠাকুমাকে মনে নেই, ওর দুবছর বয়সের সময়েই তাঁর জীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। এই শ্বাশুড়ি-ঠাকুমাকে এতই ভাল লেগে যায় যে মনেই হয় না তাঁর স্নেহ-আদরের পরিমিতি মাত্র পাঁচদিনের। আসার আগে বললেন, পরানডা চাইতাছে না তোমারে যাইতে দিই। কিন্তু দ্বিরাগমনে যাইতে তো হইবই। তোমার মা-বাপও কত আশা লইয়্যা রইছে। তবে টুনুমা, কথা দ্যাও, তিনদিনের বেশি থাইকবা না। আমি তোমার পথ চাইয়া থাকুম।

ওঁর গলায় এমন স্নেহার্দ্র আন্তরিকতা ছিল যে মুহূর্তের জন্য বুকটা কেঁপে উঠে চোখের কোণে জ্বালা ধরায়।

বিধুশেখর ছেলেকে বললেন, সাবধানে — সব দেখেশুনে চলিস। যা দিনকাল — ফিরা না আসা পর্যন্ত শান্তি পামু না।

প্রায় দু'সপ্তাহ পরে টুনুর বাইরের জগৎ ও পরিস্থিতির কথা মনে এল। গায়ে হলুদ, উলু, শঙ্খ প্রিয় মানুষের আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং প্রথম পুরুষ — অভিজ্ঞতা ওকে যেন এক অলৌকিক ভুবনে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে জীবনের ভয় নেই, অতর্কিত মৃত্যু নেই। মাত্রই তো মাস কয়েক আগে মর্মন্তুদ, প্রায় অবিশ্বাস্য দাঙ্গা-মৃত্যু ঘটে গেছে নোয়াখালিতে। গান্ধিজি নিজে এসে ক্যাম্প করে থেকেছেন। ঘুরেছেন গ্রামে গ্রামে।

দেশটা ভাগ হবে। এটা হবে পাকিস্তান — মুসলমানদের দেশ। হিন্দুরা ব্রাত্য এখানে। তাই ওদের এদেশ থেকে উৎখাত করার জন্য খুব দাঙ্গা, খুন। এখন কিছুদিন এই অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করলেও, মাঝেমাঝেই নানা গুজব ছড়ায়। কলকাতায়ও নাকি ভয়াবহ দাঙ্গা হয়েছে। ঘর-বাড়ি পুড়েছে বহু মুসলমানের। খুনও হয়েছে। হিন্দুও নাকি মারা গেছে বহু। কোন খবর কতটা সত্য টুনু জানে না। কেউ কেউ বলে স্বাধীনতার জন্য এ-মূল্য নাকি দিতেই হয়। রক্তাঞ্জলি ছাড়া স্বাধীনতার অর্ঘ হয় না। এইসব মৃত্যু-খুন-বর্বরতা নাকি স্বাধীনতার প্রসব আর্তনাদ!

ট্রেনে বিনোদের কাঁধে মুখ লুকিয়ে থাকলেও নানা টুকরো কথা কানে এসেছে। যাত্রীদের মধ্যে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও। নিজেদের মধ্যে সহজভাবে কথাবার্তা বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না কোথাও যেন সন্দিগ্ধতা অবিশ্বাস ওত পেতে আছে। ঘোমটায় আকণ্ঠ ঢাকা থাকলেও টুনু টের পায় ট্রেনের মানুষগুলোর চোখে এই নতুন বউকে নিয়ে অনেক কৌতূহল। দু'একজন বিনোদকে জিজ্ঞাসা না করে পারেনি। বিনোদ নম্রস্বরে অল্প কথায় জবাব দিয়েছে।

একজন বয়স্ক মুসলমান বললেন, তাইলে তুমারে আমি জামাই-ই কই। মুজপুরের পাশের গাঁয়ে আমি থাকি। তুমার শ্বশুর হরিশ দত্ত আমার বিশেষ চেনা। কইও তাঁরে — আমারে সব্বাই বদরু শেখ নামে চেনে।

বিনোদ সম্মতিতে মাথা নাড়ে। বা ট্রেনের ঝাঁকুনিতে মাথাটা কেঁপে ওঠে। টুনুর হাতের মুঠো ওর কাঁধ খামচায়।

— তা জামাইয়ের কি করা হয়? নাকি চাষবাস, জমি-জিরেত নিয়েই —

— আজ্ঞে আমাদের জমি-জিরেত কিছু নেই বললেই চলে। বাবা চিরকাল স্কুলে পড়িয়েছেন, আমি সবে ওকালতি পাশ করেছি।

— কোর্টে যাইতেছ নাকি?

— হ্যাঁ - এই কেবল শুরু করেছি।

— পসার কেমন বুঝতেছ —

— না এখনও তেমন —

— হইয়ে যাবে — হইয়ে যাবে — হরিশ দত্তর জামাই তুমি — তুমারে ঠ্যাকাইবে কে! তবে কিনা অহন সময়ডা —

— খুবই চিন্তার ব্যাপার।

— না, না। আমাগো ইখানে কিছু অইবো না। এইসব দুই চারদিনের — চ্যাংড়া-ব্যাংড়ার কাম — স্বাধীনতার ঘোষণাটা হইলেই সব ঠাণ্ডা হইয়ে যাবে।

ওঁর পাশের কেউ বলল, শুনলাম আজ কাইলের মধ্যেই নাকি এহানে পাকিস্তান অইব!

— হ। পাকিস্তান তো অইবই।

ঘোমটার আড়ালে, একটা ছড়া মনে পড়ায়, আপনমনে হাসে টুনু। গ্রামের ছেলেদের ডাংগুলি খেলতে খেলতে বলতে শুনেছে —

কানে বিড়ি মুখে পান
লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান

মনের মধ্যে হাসিটা বুদ্বুদের মত ফুটেই মিলিয়ে গেল। টুনু জানে এখন, লড়াইটা পান বিড়ি নিয়ে হচ্ছে না; হচ্ছে জান-ধন-জমি নিয়ে।

ট্রেন থেকে নেমে গরুর গাড়ির নিভৃতিতে টুনু বলল, ঐ লোকটার কথা বাবাকে বোলো না।

— কেন?

— লোকটা ভাল না। লিগের লোকজনের সঙ্গে খুব দহরম নাকি।

বিনোদ ওর পিঠে হাত দিয়ে আশ্বস্ত করে। পিঠে হাতের আশ্লেষ লাগতেই টুনুর মন থেকে সব জাগতিক শব্দ, শঙ্কা, প্রশ্ন মুছে যায়। মাথার মধ্যে চোখের তারায় খেলে বেড়ায় এক পরীর পৃথিবী। সেখানে গন্ধর্বকুমার বিনোদের, কণ্ঠলগ্না টুনু নামের এক অপ্সরা কন্যা, যে কিছুতেই ভেবে পায় না তার বুকভরা প্রেম ভালোবাসা কীভাবে গন্ধর্বকুমারকে উজাড় করে দেবে। গাড়ির ঝাঁকুনি সামলাতে ও শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরে বিনোদকে। অন্তর্গত লজ্জাবোধ আড়ষ্ট করে একটু, বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা লাফাতে থাকে। গাড়ির ক্যাঁচোর-কোঁচর শব্দ না থাকলে নির্ঘাত বিনোদ ওর হৃৎপিণ্ডের হট্টগোল শুনতে পেত। দাঁতে ঠোঁট চেপে টুনু ঘোমটা আরও একটু বেশি মুখের ওপর টানে।

একটু পড়ে ঘোমটা ঈষৎ সরিয়ে টুনু দেখে বিনোদের চোখ ছইয়ের বাইরের উদাস দিগন্তে পড়ে আছে। কপালে ভাঁজ।

— কি ভাবছ?

— না - কিছু না।

— ভাবছ তো! বলো না কি ভাবছ।

— তুমি কি শুনেছ একটা লোক ট্রেনে বলছিল নবাবপুরে নাকি দিন তিনেক আগে খুব গোলমাল হয়েছে। ওখানকার জমিদার বাড়ি লুঠ হয়েছে নাকি! নবাবপুর তোমাদের সুজাপুরের পুবদিকে মাইল দশেক দূরে। আমি একবার গিয়েছিলাম ওই বাড়িতে। ও বাড়ির একটা ছেলে পড়ত আমার সঙ্গে কলকাতার কলেজে। কোথায় আছে — কেমন আছে — কে জানে।

— সত্যি নাও হতে পারে। কতইতো গুজব রটছে।

— হুঁ, তা বটে।

গুজবের নৃশংস নখরতা সত্যের চেয়ে অনেকই বেশি। বিনোদ জানে। এও জানে, গুজবের সবটাই উন্মাদের রচনা নয়।

ক্রমশ চেনা পরিচিত প্রকৃতি চোখে ধরা দেয় টুনুর। পাটিবন পেরিয়ে, ভূত্তো বটগাছ ছাড়িয়ে পালেদের দিঘির পাশ দিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ে শৈশবের কথা। বন্ধুদের কথা। এই পথ ধরেই স্কুলে গেছে। খেলেছে এলাটিন-বেলাটিন, গোল্লাছুট। এই পথ দিয়েই গিয়েছিল, শ্বশুরবাড়ি। সে পথেই ফিরছে বাপের বাড়ি। আশ্চর্য! আগে যখন অন্য কোথাও থেকে, যেমন মামা বা মাসির বাড়ি, ফিরেছে কখনও তো মনে হয়নি বাপের বাড়ি ফিরছে বলে। আজ হচ্ছে কেন? তিনদিনই থাকবে কেবল। আজন্মের বাড়িতে মাত্র তিনদিন! কেন?

বাবা-মা, আত্মীয়স্বজন যারা এখনো রয়ে গেছে, সবাই গাড়ির কাছে ছুটে এল। টুনু নেমেই মুখ লুকালো মার বুকে। বিনোদ শ্বশুরকে প্রণাম করে শ্বাশুড়ির দিকেও মাথা নিচু করে।

— থাক, বাবা, থাক। আসো, ভেতরে আসো। — টুনুর মা যমুনা, মেয়ে-জামাইকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন।

— হামিদ। — হরিশ ডাকেন — মালপত্রগুলা ভিতরে তুইল্যা দে।

সেদিন কতবার করে যে শ্বশুরবাড়ির কথা বলতে হল। মা তো বারেবারেই জানতে চান ও-বাড়ির লোকজন টুনুকে কেমনভাবে নিয়েছে। ঘরদোরের বন্দোবস্ত ওর পছন্দ হয়েছে কি না। বিনোদের বাপ মানুষটা কেমন। টুনুকে কোন কটু বা কূট কথা শোনায়নি তো কেউ! এবং অবশ্যই বিনোদ কেমন লোক - কেমন ব্যবহার করছে?

দু'একজন এমন প্রশ্ন করল যে টুনুর মুখ লাল আর কান ঝনঝন করে ওঠে। ছিঃ ছিঃ ওসব কথা মুখ ফুটে বলা যায় না কি!

শুধু মামাতো বোন সীমাদিকে, যার বছর তিনেক আগে বিয়ে হয়েছে, গোপনে বলেছিল, এখন বুঝছি তুই কেন জামাইবাবুকে ছেড়ে একদিনও থাকতে চাস না।

— কি করে বুঝলি?

— ন্যাকামি করিস না সীমাদি। সত্যি করে বল তো পুরুষদের শরীরে কী আছে যে এমন করে মেয়েদের টেনে ধরে রাখে। কাবু করে রাখে।

— টের পাসনি এখনো?

— কি জানি বুঝতে পারি না। কিন্তু ছেড়ে থাকতেও ইচ্ছে করে না। মনে হয় সারাক্ষণ কাছে থাকুক।

— কাছে থাকুক না জাপ্টে থাকুক?

— ধ্যাৎ! বল না কেন এমন হয়।

— ওদের গায়ের ভুসো গন্ধের জন্য।

সশব্দে হেসে ওঠে দুজনে। হাসি থামিয়ে সীমা আবার বলে, ব'লে এসব বোঝানো যায় না। ওটা তোকে নিজেকেই জানতে হবে, শিখতে হবে। আবিষ্কারও বলতে পারিস। প্রত্যেক মেয়ের নিজস্ব গোপন আবিষ্কার।

পালা বদলের হাওয়া এই প্রত্যন্ত গ্রামে মৃদুভাবে হলেও আছড়ে পড়ে। মানুষের মনে অনিশ্চিতি — কিছু যেন একটা ঘটবে। কি ঘটবে, কখন ঘটবে জানা নেই। অথচ একটা শঙ্কাকুল প্রতীক্ষা যেন অনুভবে মোমের আলোর মত জ্বলছে।

সেদিন ১৩ই আগস্ট, সন্ধ্যের আগেই দত্তবাড়ি প্রায় খালি হয়ে গেল। টুনুর ফেরার জন্য যারা অপেক্ষা করছিল সেইসব আত্মীয়স্বজন ফিরে গেল নিজেদের বাড়িতে। সজল চোখে বিদায় নিল সীমাও। ওরা আগামীকালই আসামে চলে যাবে। ওর স্বামী রেলে চাকরি করে।

বিকেলটা যেন দ্রুতই কালো হয়ে উঠল। আকাশের এমাথা ওমাথা জুড়ে ঘন মেঘ। যে-কোনও সময়েই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়তে পারে।

— হামিদ! — হরিশ ডাকেন।

— বাবু...

— কলকেটা পাইলটে দে।

নতুন করে সাজানো হুঁকোতে টান দিয়ে তৃপ্তি পান হরিশ। হামিদ তামাকটা সাজে ভাল। সেই ছেলেবেলা থেকে এ বাড়িতে কাজ করছে হামিদ। বয়েস কম করেও পঁয়তাল্লিশ হবে। শরীরটা বলতে নেই বলবর্দী আছে। খাটেও খুব। জায়গা-জমি, গরু-বাছুর সবই ও সামলায়।

— সুরেনরে দেখছিনা—

— দাদাবাবু গাড়ির লগে গ্যালেন। সীমাদিদিদের এগোয়ে দেবেন বলে —

— হ্যাঁ রে, গোয়াল বাঁধা হয়েছে? আকাশের অবস্থা তো ভাল দেখছি না।

— হ বাবু। আমি নিজে দেইখ্যা আইছি। — বাবু, সুরেন দাদাবাবু অহন কদিন এহানে থাইকবে তো।

সুরেন হরিশের ভাগনে। সবচেয়ে ছোটবোনের ছেলে, ওঁর খুবই প্রিয়। অপুত্রক হরিশ ওকে আপন পুত্রবৎই দেখেন। কিন্তু ছেলেটা, তাঁর মতে, আধপাগল। তিরিশ বছর বয়েস হলেও কোনও কিছুতে থিতু হতে চায় না। বিয়েও করল না। নিজের খেয়াল-খুশিমতো নিজেদের বাড়ি কুতুবপুর আর মামাবাড়ি সুজাপুরের মধ্যে চরকি দিয়ে বেড়ায়। চাষের কাজকর্ম ভাল বোঝে। হিসেবের মাথাটাও পাকা। শুভঙ্করের অঙ্ক মুখেমুখে করে। যদি অবশ্য মাথার মধ্যে পোষা পোকাটা না নড়েচড়ে। কখন উধাও হয়ে গিয়ে কবে ফিরবে ও নিজেই জানে না। টুনুরা যেদিন গেল সেদিন সুরেনও চলে গেছিল। গতকালই ফিরেছে।

হরিশ জানতে চান — ক্যান, কাম আছে কিছু?

— না, ত্যামন কিছু না — তবে দিনকাল তো, আমি মুখ্যু মানুষ কি আর কমু — দাদাবাবু থাইকলে এট্টু ভরসা লাগে।

— তোর কি ভয় লাগতেছে? এহানে কিছু অইব নাকি? আমারে যে মৌলবিসাহেব কইলেন, চিন্তার কিছু নাই। এই গেরামে কোন হাঙ্গামা হইতে দিবেন না।

— আমার আর ভয় কি বাবু। আমি আপনাদের জন্যই — মাইনষের তো বিশ্বাস নাই — হাচা কথা হইল, আমি খানিক ভয়েই আছি।

বাইর-বাড়ির বৈঠকখানাতে বসে কথা বলছিলেন হরিশ। উঠে দাঁড়িয়ে একবার চারদিক দেখে নিয়ে ডাকেন — হামিদ, কাছে আয়।

গলা নামিয়ে বলেন — কিছু শুনছস তুই?

— নির্দিষ্ট কিছু শুনি নাই, বাবু। ধারে-ধুরে মানুষজন যা কয় আমার ভাল লাগতেছে না। অপরাধ নিবেন না, বাবু। আমার জান থাইকতে আপনাগো কেউ ছুঁইতে পারবো না। আমার পোলা ইদ্রিসও অহন সা-জোয়ান। তারও জান কবুল। কিন্তু বাবু আপনে এট্টু সাবধান হইবেন, সাবধানে থাইকবেন। বিধি-ব্যবস্থা করবেন। সাবধান থাইকতে তো কোনও লুকসান নাই। বাবু, এই দ্যাশের মানুষ সিরাজদৌল্লারেও পলাইতে বাধ্য করছে, তারপর খুঁইজ্যা খুন করছে।

নিঃশব্দে হুঁকো টানেন হরিশ। হামিদের বলা প্রতিটি শব্দ নিয়ে আপনমনে বিচার করেন। হরিশ দত্ত ডাকাবুকো মানুষ। নইলে ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে দাপিয়ে কাজ করতে পারতেন না। পৈতৃক সূত্রে যা পেয়েছিলেন তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পত্তি করেছেন নিজের রোজগারে। তবে বাঙালি জন্মগতভাবেই পরশ্রীকাতর। সুতরাং তাঁর খ্যাতি, প্রতিপত্তি, রোজগার, সম্পত্তি যে বহু কাতর বুকে তুষের আগুন ধরাবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

হামিদ পালাবার কথা বলছে? কেন পালাবেন? কোথায় পালাবেন? কলকাতায় তাঁর স্বজন কেউ নেই। এক ভাই রেঙ্গুনে গিয়েছিল। তার কোনও খবর নেই গত পাঁচ বছর। সম্ভবত বেঁচে নেই। এক দিদি ছিল নাগপুরে। সেও মারা গেছে গত বছর। অন্য দুই বোন আশেপাশেই থাকে। না-হরিশ কোথাও যাবেন না।

কিন্তু যমুনা - টুনু - জামাই — হরিশের বুকের মধ্যে কালবৈশাখির ঘূর্ণি ওঠে। পরমুহূর্তেই ভাবেন তিনি গ্রামে সম্মানিত ব্যক্তি। মুসলমানরাও তাঁকে সমীহ শ্রদ্ধা করে। মৌলবিসাহেব নিজে তাঁকে বলেছেন, ভয়ের কিছু নেই এখানে। তবে? হামিদ অবশ্য বলল, সাবধানের মার নেই। সাবধানে থাকতে ক্ষতি কি! কীভাবে সাবধান হবে? হরিশের তো পুরানো দিনের মত লেঠেল বা পাইক নেই। গুলি-বন্দুক ও নেই!

— হামিদ

— বাবু

— মেয়ে-জামাইয়ের বিদায় পর্যন্ত — এই তিনটা দিন একটু সামলে রাখিস — এই তিনটা দিন — বুঝছিস তো, টুনু এখন পরের ধন — আমাগো জিম্মায়— কিছু হইলে মুখ দেখাইতে পারুম না।

— কইছি তো বাবু, আমার জান থাইকতে আপনাগোরে কোন সুমুন্দি ছুঁইতে পারব না।

— মামা — বাইরে থেকে সুরেনের গলা শোনা যায় — কই গেলা —

বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে আসেন হরিশ। পেছনে হুঁকো হাতে হামিদ। — কলকেটা পাইলটে দিমু?

— না। এখন রেখে দে।

সুরেনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কোথায় গেছিলি —

— এই যে হামুদাদাও আছ। তা দুইজনে মিলা বৈঠকখানায় কি সলা করতাছিলা।

— সলা কিসের সলা —

—— ক্যান, সুরেনরে ক্যামনে টাইট দেওয়া যায়। হামুদাদার তো ওই এট্টাই পয়েন্ট।

— কি যে কও দাদাবাবু — তুমারে টাইট দেবে? তুমিই তো সবাইরে টাইট রাখো। তুমি না-থাইকলে বাবু তো দুই চোখে আঁধার দ্যাখেন। তাই কইতেছিলাম, তুমারে য্যান আর যাইতে না দেয়।

— হামুদাদা — তবে তো তোমারে, এট্টা চুমা খাইতে লাগে। কিন্তু তোমার ওই খোঁচা খোঁচা দাড়িটা আগে কামাও।

সুরেন হাহা করে হেসে ওঠে। হাসি হরিশ আর হামিদের মুখেও। হামিদের মুখে প্রসন্নতাও ফোটে।

সুরেন বলল, হামুদা কাল একবার জাল দিবে নাকি —

— ক্যান? আইজ তো কত মাছ ধরা হইল। তিনখান রুই অহনো জিয়ানো আছে।

— জানি। রুইয়ে অরুচি ধরছে। কাল এট্টা বোয়াল সঙ্গে কিছু পুঁটি আর বড় ইঁছা (চিংড়ি) পাও কিনা দ্যাখো। জম্পেস কইর‍্যা কলাইয়ের ডাইল দিয়া —

ডানদিকের ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসেন যমুনা। হাতে হারিকেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে বললেন, সুরেন, তুই কবে থেইক্যা রান্নার ব্যাপারে —

— না, না, মামি, আসলে তোমার জামাইয়ের লাইগ্যাই হামুদারে কইতেছিলাম। নবীন উকিল তো, কলাইয়ের ডাইলে গলাটা সরল হইত আর বোয়ালের ঝালে আইনের কুযুক্তিগুলা ঝাঁঝালো — মানে মামার মতোই —

— হারামজাদা! — হরিশ গর্জন করেন — মারব এক থাপ্পড় — আমারে নিয়া ইয়ার্কি! — ওঁর কণ্ঠের সরসতায় সবাই হেসে ওঠে।

যমুনা বলেন, হামিদ, এদিকে আসো তো —

সুরেন বলল, মামা চলো বৈঠকখানায় যাই।

বৈঠকখানায় হারিকেন দিয়ে গেছে কেউ। ঘরে ঢুকতেই করোগেট টিনের ওপর নূপুরের শব্দ। বৃষ্টি পড়ছে। খুব জোরে নয়। তবে বাতাসের ছাঁট খুব তীব্র।

— ভালই হল, এখন আর এদিকে কেউ আসবে না, মামা, এই যে তিন চারদিন ঘুরে এলাম অবস্থা খুব ভাল দ্যাখলাম না। হিজলবাড়ি, বীজপুর, রানিডাঙা, কলাইকান্দি সর্বত্রই হিন্দুরা খুব ভয়ে ভয়ে আছে। যারা পারতেছে কইলকাতা, ত্রিপুরা বা আসামে যাওনের চেষ্টা করতেছে। নবাবপুরের খবর শুনছ তো? একেবারে নোয়াখালির রায়চৌধুরি বাড়ির মতই অবস্থা হইছে।

— কেন শান্তই তো ছিল। হঠাৎ যে আবার এমন গরম হয়ে উঠবে — ব্যাপারটা বুঝতেছি না —

— মামা, কাইলই সম্ভবত পাকিস্তান হইব, ইখানে কখন যে কি হয় —

— এই গেরামে শুনলি কিছু?

— কওনের মত শুনি নাই। তবে কিছু মানুষের চোখের চাউনি, মুখের কথা ভাল ঠেকতেছে না।

— হামিদও বলতেছিল। কিন্তু মৌলবিসাহেব, হেডমাস্টার আসফাকউদ্দিন গত কাইলই আমারে কইল, হরিশদা আপনে কোনও চিন্তা করবেন না। আমরা সবাই বংশপরম্পরায় ভাই বন্ধু পরিজনের মত বাস করতেছি। এইখানে কোনও হাঙ্গামা হইতে দিমু না।

— মামা, এঁরা হয়ত কিছু করলেন না। কিন্তু আশেপাশের গ্রামের কি অবস্থা তাতো জানা নাই। পাশের গ্রাম হরিপুরে তো লিগের খুবই রমরমা। চাইরদিকেই ওরা। আপনের মত হিন্দুঘর তো হাতগুনতি।

— হুঁ। কিন্তু টুনু-জামাই না-যাওয়া ইস্তক কি করি! ওগোরে না-আনাইলেই ঠিক হইত।

— তা ক্যামনে হয়। দ্বিরাগমনে তো আসতেই লাগে।

— হের লাইগ্যাই তো। অহন কি করা যায়?

— হামুদা কি কইল?

— হ্যা তো জান কবুল করব। কইলো ওর পোলা ইদ্রিসও থাইকব। বাপরে, হামলা হইলে দুই-তিনজনে মিলা আমরা কি জান-ইজ্জত বাঁচাইতে পারুম!

— তবু মামা অল্পসল্প গোছ-গাছ করে রাখা ভাল। হঠাৎ করে কিছু হইলে যাতে —

— বুঝেছি। হামিদও বলতেছিল ওইরকমই কিছু। কিন্তু তোর মামিরে কইলেই তো হুলুস্থুল লাগাইবো।

— অখন না। তুমি আলাদা কইর‍্যা ধীরে ধীরে বুঝাইয়া কইও। আমি এট্টুখানি আভাস দিয়া রাখুম।

সে রাতে খেতে বসে এমন মজা করে যে হরিশ চেষ্টা করেও নিজের গাম্ভীর্য রাখতে পারেন না। নতুন জামাইয়ের সামনে তাঁকে নিয়ে করা রসিকতাতেও তাঁকে হাসতে হয়। যমুনা একবার বলে ওঠেন, চুপ কর সুরেন। নাইলে খাবে ক্যামনে! অত হাসলে নাকতালা (বিষম) লাইগতে পারে।

সেই রাত টুনুর জীবনে অবিস্মরণীয়। খেয়ে দেয়ে, মার সঙ্গে ঘরের কাজে হাত লাগিয়ে, দরজায় আগল দিয়ে যখন শুতে এল, বাইরে তুমুল বর্ষা নামে। গুমোট শুষে নেয় শীকরসিক্ত বাতাস। ঘরে খেলতে থাকে ধূপগন্ধময় কোমল হাওয়া। বাইরে ব্যাঙের কোরাস যেন বায়োস্কোপের আবহসংগীত। টুনুর শরীরে অনুভব — সারা অস্তিত্ব রেণু-রেণু হয়ে গলে যায়। চেনা ঘর, চেনা বিছানা, আজন্মের আপন পরিবেশ নিজের ভেতরে অতিরিক্ত আস্থা

সৃষ্টি করে যাতে ও সার্বিকভাবে বাধাবন্ধহীন হতে পারে। জীবনের পরম পুরুষকে আর কখনও এমন ভাবে আঁকড়াতে পারবে কি! পারবে কি তার দ্বারা এমন দলিত মথিত হতে। নিজেকে এমন নির্বাধ ঢেলে দেওয়াকেই কি সমর্পণ বলে? সমর্পণে এত আনন্দ কেউ তো শেখায়নি।

বারংবার বানভাসির পর বিনোদ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখনও টুনু ওর হাত দুটো নিজের বুকের মধ্যে টেনে ওরই বুকে মাথা গুঁজে দিয়ে ভাবে, রাত তো এখনও বাকি; সারা জীবনইতো ঘুমাবে, কিন্তু এমন বৃষ্টিভরা হিমহিম রাত, বুকের মধ্যে ক্রমাগত সমুদ্রের ঢেউ-ভাঙা আবার কবে পাবে?

দালানের অন্যধারে কর্তাঘরের বিশাল বিছানায় হরিশ একটু একটু করে যমুনাকে করণীয় বিষয়গুলি বোঝাবার চেষ্টা করেন। যমুনা একেকবার আঁতকে ওঠেন। কখনও কান্নায় ভেঙে পড়েন। হরিশ বুকে চেপে আশ্বস্ত করেন। কিছু ঘটবেই তাতো বলা যাচ্ছে না — শুধু সাবধানে থাকা, প্রস্তুত থাকা। অতর্কিতে কিছু হলে যেন নিজেকে একেবারে অগোছালো, অসহায় না লাগে। টুনুকে বা অন্য কাউকেই কিছু বলার দরকার নেই। শুধু গয়নাপত্র, টাকাপয়সা যা আছে তা গোপনে গুছিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনীয় জামাকাপড়ও। সুরেন একটা গরুর গাড়ি ও নৌকার ব্যবস্থা করে রাখবে। দু'চারদিন কেবল সতর্ক থাকা। হরিশের বিশ্বাস, কিছুই হবে না।

পরদিন, ১৪ই আগস্ট, সকালের রূপ দেখে বোঝবার বা ভাবার কোনও কারণ ছিল না যে এটা অন্যদিনের থেকে আলাদা — ভিন্নতর কিছু। আকাশ ছেঁকে রোদ শিউলি-শাখায় ঝিকমিক করছিল। শালিক-চড়ুইয়ের এক্কা-দোক্কা খেলা ছিল অব্যাহত। গরুর ডাকে ছিল না কোনও বিশেষ আহ্বান। দোওয়া দুধের পরিমাণে কম বা বেশি হয়নি।

হরিশ অভ্যাসমতো হামিদকে সঙ্গে নিয়ে জমি-জমা তদারকিতে বেরিয়েছেন। ইদ্রিস গোয়াল পরিষ্কার করে গরু বেঁধেছে মাঠে। সুরেন বেরিয়েছে ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে — শুধু ওর অক্ষরেখা কারও জানা নেই।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টুনুর মনে নেই। ঘুম ভাঙতে জানালার বিভা দেখে বুঝল বেলা খুব কাঁচা নেই। তড়িঘড়ি উঠবে ভেবে নিজের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় হিহি করে ওঠে। সারারাত এইভাবে শুয়েছিল! ভাগ্যিস বিনোদ এখনও ঘুমোচ্ছে। জেগে দেখলে ওকে যে কী ভাবত তা চিন্তা করেও আঁতকে ওঠে টুনু। শাড়িটা খুঁজে বের করে শায়া-ব্লাউজ পরে বিনোদের মুখের ওপর ঝুঁকতে গিয়ে চোখ যায় দোমড়ানো মোচড়ানো কাঁচুমাচু বিছানার চাদরে। চাদরের অবস্থা দেখে শিউরে ওঠে। সারারাতের প্রণয়চিহ্ন নদী-পাহাড়-সমুদ্র-পর্বতের ছবির মত ছড়িয়ে আছে। অন্য কেউ দেখার আগেই ওটা বদলে দিতে হবে। এসব কীর্তি যাঁর তিনি তো অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। পুরুষেরা পারেও—নষ্টামি এবং ঘুম — দুইয়ে সমান দড়। ভাবল বটে, আবার বুকটা মমতায় উদ্বেলও হল। কী নিষ্পাপ সরল মুখ — যেন শিশু। এই মুখ দেখে ভাবাই যাবে না যে ওরই আড়ালে আছে এক দয়ালু দস্যু। দয়ালু না-হলে টুনুকে কি কেউ অত ভালবাসতে পারে।

বিনোদকে জাগাবার জন্য নিজের মুখ ওর মাথার কাছে নিয়ে খুব আস্তে কানে ফুঁ দেয় টুনু। বার তিনেক দিতেই মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানায় বিনোদ। টুনু নাছোড়। আচমকা চোখ খোলে বিনোদ। চোখ ভরে দেখে টুনুর টলটলে মুখ। ঠোঁটের ভাঁজে হাসির কুঁড়ি। বিনোদ

দু'হাত বাড়িয়ে ওকে নিজের বুকে আকর্ষণ করে। টুনু অস্ফুটে আপত্তি করে — কি হচ্ছে। ছাড়ো-ছাড়ো — এখন ওঠো — বেলা হয়েছে অনেক।

— হোক। আমি তো আর কোর্টে যাব না।

— হিঃ হিঃ বাড়ির সবাই কখন উঠে পড়েছে — কী জানি কি ভাবছে, ওঠো — ওঠো—

ছাড়বে বলে আঁকড়ায়নি বিনোদ। ওকে বাধা দিতে পারে তেমন শক্তিও নেই টুনুর শরীরটাও কী নিলাজ। বিনোদের খ্যাপা-আদর পেয়ে যেন মোমের মত গলে যায়।

খানিক পরে বিছানাপত্র গোছগাছ করে ঘরের বাইরে আসে টুনু খুব সন্তর্পণে। মাকে খোঁজে এদিক-ওদিক। চোখে পড়ে না। ও ছুটে কলতলায় চলে যায়। ইঙ্গিতে বিনোদকে বলে পুকুরের দিকে যেতে।

তাড়াতাড়ি স্নান সেরে কাপড়জামা বদলে ভীরু পায়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ায়। যমুনা আনাজ কোটার সঙ্গে সঙ্গে কাজের লোকেদের তদারকি করছিলেন। ওকে দেখে বললেন —

— জামাইবাবাজি উঠেছে? ওকে চা-টা দে। হ্যাঁরে রাতে কোনও অসুবিধা হয়নি তো।

রান্নার মেয়ে স্বর্ণ শব্দ করে হাসে — মা'র য্যামন কথা।

— ক্যান ভুল বলেছি কিছু?

— না — ভুল বল নাই; বুঝেছ ভুল। জামাইর খুব কষ্ট গেছে, হের লাইগ্যা এত বেলায় উঠছে।

অপ্রস্তুত যমুনা কপট ধমক দেন — তরকারিটা দ্যাখ — পুড়ল নাকি —

চা-জলখাবার শেষ করে বিনোদ ভাবল আশেপাশে একটু ঘুরে আসবে। একা ঘরে বসে করবেই বা কি। টুনুকে বলল — তোমার দাদাকে দেখছি না। কোথাও গেছেন নাকি?

— সুরেনদার কথা বলছ? ও কখন কোথায় যায় কেউ জানে না। বাবাও বলে বলে হাল ছেড়ে দিয়েছে। কেন, কিছু দরকার আছে?

— না, তেমন কিছু না। একটু ঘুরে আসবো ভাবছিলাম, নতুন জায়গা তো। কেউ সঙ্গে থাকলে সুবিধে হয়।

ঠিক তখনই দূর থেকে অস্পষ্ট কোলাহলের আভাস ভেসে এল। অনেক মানুষ একসঙ্গে যেন চিৎকার করছে। শব্দের আবহ চলতে থাকে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে বোঝার চেষ্টা করে কোলাহলের কারণ।

যমুনা ব্যস্ত হয় ওঠেন — কি হইছেরে! চিৎকার কিসের? হরিপদ — ইদ্রিস — কোথায় গেলি — ডাইকলে যদি কারুকে পাওয়া যায়। হরি — কানাই —

বাড়ির সব কাজের লোকের নাম ধরে ডাকতে থাকেন যমুনা। ওরা সব যে নিজের নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত তা মনে থাকে না। ভেতরের উদ্বেগ তাঁকে তাড়না করে।

কোলাহলের শব্দের কোনও পরিবর্তন নেই। যেন এক জায়গায় থমকে আছে। আওয়াজ বাড়ছেও না। নড়ছেও না। থামছেও না।

— আমি বরং একটু দেখি গিয়ে। — বিনোদ বলে।

— না বাবা, তুমি যাবে না। তুমি ভিতরে গিয়া বস। ও টুনু, জামাইরে ভিতরে নিয়ে যা। — যমুনা কর্তৃত্বের সঙ্গে বলেন। — স্বর্ণ — ও স্বর্ণ — দ্যাখ তো কানাইডা কোথায় গেল —

কোলাহলের আবছা আভাস বাতাসে ভেসে আসে। বিনোদ প্রাণপণ চেষ্টা করে একটা কোনও শব্দ বোঝার। পারে না। মনে হয় দূরে কোথাও সমাবেশ হয়েছে।

অকস্মাৎ চরাচর কাঁপিয়ে বজ্রপাত হয়। শব্দের গুমগুম অনুরণনের সঙ্গে আকাশ ফালা ফালা করে বিদ্যুৎ চমকায়। গাছের পাতায় পাতায় শিহরন। পুকুরে এক ঝাঁক হাঁস কোরাসে ডেকে ওঠে। আকাশ নতুন করে বাদলের সাজ পরে। হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ঢোকে সুরেন। পরনের ধুতিতে কাদামাটি। ঘামে ভেজা শার্ট গায়ে লেপ্টে আছে। উচ্ছৃঙ্খল চুল হাওয়ায় কাঁপে।

— মামা কোথায়?

— বিহানে বার হইছে। অখনো আসে নাই। এত হল্লা কিসের জানস?

— তোমরা শোনো নাই? পাকিস্তান হইয়া গেছে। বাংলা দু'ভাগ। পূর্ববাংলা পাকিস্তান। হাজি বাড়ির সামনে জমায়েতে — পাকিস্তান জিন্দাবাদ, কায়েদ-এ-আজম জিন্দাবাদ চলছে।

স্বস্তি বোধ করেন যমুনা — যাক। ভয়ের কিছু নাই তো?

সুরেন উত্তর দেয় না। ভয়ের কারণ কি হতে পারে, কেন ভয় পাবে ও জানে না। রাজা যায় রাজা আসে — সাধারণ মানুষের অবস্থার হেরফের ঘটে না। এই তো ইতিহাসের অভিজ্ঞতা। দেশের একটা নতুন নাম দেওয়া হল বলে গ্রামের শস্য-শ্যামলিমায় তো কোনও বদল ঘটবে না। নদীর প্রবাহ একই থাকবে। মানুষের ব্যবহার, আবেগ কি বদলাবে? পারস্পরিক সম্পর্ক? হঠাৎই প্রিয়জনেরা, শৈশব-কৈশোরের সাথিরা শত্রু হবে? সভ্যতার ইতিহাস অধিকার ও দখলের কাহিনী। তারই জন্য যুদ্ধ, হত্যা। মহাভারতের শিক্ষাও তাই।

—আমি দেখি মামা কোথায়। — সুরেন আবার বেরিয়ে যায়।

যমুনা ফিরে যান রান্নাঘরে। ঘাড় ঘুরিয়ে বিনোদকে দেখে টুনু যায় মার পিছনে। বিনোদ উঠোন পেরিয়ে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে। ভাবার চেষ্টা করে দেশের নতুন নাম, দেশভাগ-এর তাৎক্ষণিক ফল কি হতে পারে। কাগজে পত্রে, লোকমুখে যা জেনেছে তা থেকে স্পষ্ট কোনও ধারণা করা বেশ কঠিন। একদিকে বলছে সব ঠিক থাকবে। মানুষের সম্পর্ক, নিরাপত্তা কিছুই বিঘ্নিত হবে না। আবার শোনা যাচ্ছে, অন্তত কোনও কোনও মহলে, এই দেশটা মুসলমানদের। হিন্দুদের এখানে ঠাঁই নেই। কেন? কোন সুবাদে? কোন আইনে?

এখনও তেমন ভালভাবে জমে না উঠলেও ওর পশার উঠতি। ধীরে ধীরে পশার জমিয়ে নিতে পারবে — এ বিশ্বাস আছে বিনোদের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওর বেশির ভাগ মক্কেলই মুসলমান। এরপর কি ওরা আসবে না? উকিলের তো কোনও জাত হয় না — সে তো উকিল, জাতধর্ম নির্বিশেষে। কোকিলের কি জাত আছে? শালিক বা দোয়েলের — কথাটা ভাবতেই গোমড়া মনে এক ঝিলিক হাসি খেলে যায়।

পরমুহূর্তেই ভাবল, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা উচিত। আজ তো আর হবে না। আগামীকাল চলে গেলে কেমন হয়? এঁরা কি অরাজি হবেন? টুনু না হয় থেকে যাক আরও কয়েকদিন। কিন্তু বিনোদের যাওয়ার গুরুত্বটা শ্বশুরমশাই কি বুঝবেন না? ওখানে বাবাও নিশ্চয় খুবই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। ওদের পরিবার অবশ্য বড়। খুড়ো-জ্যাঠা মিলিয়ে অনেক মানুষই এক চৌহদ্দিতে থাকে। বিশ্বাসী কাজের লোকজনও আছে। তবু বাবা তো ওর জন্য চিন্তা করবেনই।

এইসব আনকথা ভাবতে ভাবতে ইজিচেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়েছিল বিনোদ। কখন ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝতেও পারেনি। ঘুম ভাঙল ভেতরের শোরগোল শুনে। উঠোনে উঁচু গলায় কথা বলছে। সবাই। যমুনার তীক্ষ্ণ গলা কুম্ভকর্ণকেও জাগাতে পারে।

— কি আক্কেল তোমার! সব শুইন্যাও বাড়িত আইলে না। আমরা যে চিন্তায় মরতেছি

সে-খেয়ালও নাই?

তার মানে হরিশ ফিরেছেন।

বিনোদ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। তখন আকাশের আয়োজন দেখে মনে হয়েছিল জবর বৃষ্টি হবে। অথচ বাইরে খর রোদ। শুকনো উঠোন বুঝিয়ে দেয় বৃষ্টি হয়নি আর। গতরাতের জেরে যেটুকু সোঁদা ভাব রয়েছে।

ওকে দেখে হরিশ এগিয়ে এসে বলেন, এই যে বাবা, শুনেছ তো সব —

— হ্যাঁ, কিন্তু আপনি এতক্ষণ —

— সেটাই কইতেছি। তো শোনে কে। খবরটা পাইয়্যা আমি গেলাম হেডমাস্টারের কাছে। তিনিও কইলেন যে হাচাই পাকিস্তান ঘোষণা হইয়া গেছে। তারপরে গেলাম মৌলবি সাহেবের কাছে। তাঁর সঙ্গেই গেলাম হাজির বাড়িতে। সেখানে তো বিশাল ভিড়। মৌলবি সাহেব, হাজি সাহেব দুইজনেই কইলেন, সবাই যেন শান্ত থাকে, এই গেরামে যেন কোনও গোলমাল না হয়। আমাগো শত বছরের সম্প্রীতি অটুট রাখতে লাগব। এর লাইগ্যাই বেলা হইয়া গেল। হামিদ সারাক্ষণ ছিল আমার লগে। কিরে হামিদ, আমি সব ঠিক কইলাম তো?

— হ,-বাবু। অখন আপনে গোসলে যান — খাওয়া-দাওয়া কইর‍্যা বিশ্রাম করেন। বেবাক বইয়্যা রইছে আপনের লাইগ্যা। আমি এট্টু কলাবাগান ঘুইর‍্যা আসি।

সুরেন বলল, হামুদাদা, চলো, আমিও যাই।

যমুনা হাঁক দেন, ও টুনু, জামাইবাবার চানের জোগাড় দে। যাও বাবা, চানটা সাইর‍্যা আ'স।

কলাবাগান থেকে ফেরার পথে পুকুরে ডুব দিয়ে আসে সুরেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে ডাকে — কানাই — আমার লুঙ্গি আর গামছাটা দে।

রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে যমুনা বললেন — ও কিরে তুই ধুতি-জামা পরেই চান করলি।

— তুমি তো আবার পুকুরে পাঠাতে - তাই একবারেই সেরে ফেলেছি।

— দ্যাখ - দ্যাখ, পুষ্প, এই পোলারে আমি কি করি! দাঁড়া তোর মায়েরে খবর পাঠাইতাছি।—

মামির সঙ্গে এই খুনসুটি রোজকার। মামির ধারণা ও মাকে ভয় পায় কারণ মা খালি বলে মামিই আদর দিয়ে দিয়ে ওকে এমন উড়নচণ্ডী করেছে।

খেতে বসে আজকের ঐতিহাসিক বিষয় নিয়েই আলোচনা চলে। ওরা যে ইতিহাসের সাক্ষি হয়ে পড়েছে এ-বোধ অবশ্য মাথায় দানা বাঁধেনি।

বিনোদ জানতে চায় — হাজি সাহেব, মৌলবি সাহেবের কথা কতদূর পর্যন্ত বিশ্বাস করা উচিত হবে।

হরিশ বলেন, সন্দেহ ক্যান করুম। কোনও কারণ ঘটে নাই আজ পর্যন্ত। আমার লগে কারও কোন দুশমনি নাই, ঝগড়াঝাঁটিও নাই।

যমুনা বলেন — তোমার নাই, তাগো তো থাইকতে পারে। কিরে সুরেন বল না —

— মামা, কার মনে কী আছে কে কইতে পারে। ধর সেবারে জিলাবোর্ডের মিটিংয়ে তুমি হাজি সাহেবের বদলে দীনেশ পালরে ভোট দিলা, হাজি সাহেব দুঃখ পাইয়্যা কইছিলেন, হরিশ, তুমি আমারে ভোট দিলা না আমি মোছলমান বইল্যা।

— মোটেই না। দীনেশ পাল কত শিক্ষিত, সজ্জন মানুষ — স্কুল ফান্ডে কত টাকা দিছিলেন, এর লাইগ্যাই তারে ভোট দিছি, হিন্দু বইল্যা না।

— এটা তোমার কথা। তিনি তা ভাবেন নাই। এখন পুরানো কথা মনে কইর‍্যা যদি কিছু করেন তুমি কি করবা?

— কথায় বলে, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। — যমুনা বলেন, কিন্তু এইখানের কাউরে তো আমি দুরাত্মা কইতে পারি না।

— তোমরা সবাই প্যাচাল পাড়তাছ, বিনা কারণে। সবাই আমারে কথা দিছে কিচ্ছু অইব না। দাও দেখি — কী মাছ পাক করছ।

খাওয়া-দাওয়া সেরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে দেন হরিশ। অনেকখানি হাঁটা হয়েছে আজ। শরীর এখন আরাম চাইছে। হাঁক দেন — হামিদ —

দ্রুত পায়ে হামিদ এগিয়ে আসে। যেন আড়ালে অপেক্ষা করছিল।

— খাওয়া হইছে?

— জি।

— এট্টু তামাক দে।

কলকে সাজিয়ে হুঁকোটা বাড়িয়ে ধরে হামিদ। হরিশ ঘনঘন টান দেন। টের পান চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। অন্যদিন হলে হামিদকে পা টিপতে লাগিয়ে দিতেন। আজ ভাবলেন একটু ঘুমাবেন। অথচ কত কাজের চিন্তা মাথায়।

— আলমটা তো অনেকদিন আসে না, না'রে। বহুত নারকেল জইম্যা গেছে। খবর দিস নাই?

— না, বাবু। ওনিজেই আইব। দুই চারদিন যাক না।

— হারু বাগদি জমি বেচার কথা বলেছিল। আর তো খবর দিল না। বেইচ্যা ফ্যালছে না কি?

— না বোধহয়। তাইলে খবর পাইতাম। হ্যার ছোট মাইয়াডার না কী খুব অসুখ।

— তাই না কি। কস নাই তো? চল আইজ বিকালেই একবার দেইখা আসি। ডাক্তার ডাকছে?

হরিশ শখের হোমিওপ্যাথি করেন। নিছক বই-পড়া বিদ্যা। কিছু ওষুধ রাখেন। কারও অসুখের খবর পেলে নিজে থেকেই কয়েক পুরিয়া ওষুধ দেন। অনেকে সেরেও ওঠে। রোগী সুস্থ হবার খবর পেলে তাঁর আনন্দ কোনও বাধা মানে না। পথ্য হিসেবে নিজের বাড়ি থেকে ফলমূল পাঠিয়ে দেন। পুকুর থেকে শিঙি-মাগুর ধরে দেন। এসব মাছ শিশুদের খুব উপকারী। শরীরে রক্ত বাড়ে। সঠিক পথ্য ছাড়া শুধু ওষুধে রোগ সারে না। হ্যানিম্যান সাহেব না লিখলেও হরিশ এমনই বিশ্বাস করেন।

— হ্যাঁরে অসুখটা কি জানস নাকি?

— কার — কি অসুখ বাবু —

— হারুর মাইয়্যার অসুখ কইলি না

— কি অসুখ জানি না ঠিক। ম্যালোরি বোধহয়।

ম্যালেরিয়া! এদেশের ঘরে ঘরে যেন মহোৎসবের মত লেগে আছে। লোকে কথাও শোনে না। মাগনা ওষুধও নিয়ম করে খেতে চায় না। মশারির কথা বললে কঁকিয়ে ওঠে — চাল

কেনার পয়সা নেই তো মশারি। ম্যালেরিয়ায় ভুগলে চাল কিনে হবেটা কী — কোনও হারামজাদা বুঝতে চায় না।

আমেজে চোখের পাতা জড়িয়ে আসে হরিশের। হামিদ কোলের ওপর ওঁর পা রেখে আস্তে আস্তে হাত বোলায়।

— দত্তবাবু আছেন নাকি — দত্তবাবু —

বাইরে থেকে ডাক শোনা যায়। হরিশ কিছু বলার আগেই হামিদ হরিণ-গতিতে ছুটে যায়। পর মুহূর্তেই ফিরে এসে বলে — বাবু, রানিডাঙার মেজকত্তা। খুব জরুরি দরকার কইলেন।

— বৈঠকখানায় বসা। চোখে এট্টু জল দিয়া আসতেছি।

খড়মের খটখট শব্দ তুলে বৈঠকখানায় ঢোকেন হরিশ। রানিডাঙার মেজকত্তা শরৎ ঘোষ চেয়ারে বসে অস্থিরভাবে পা নাচাচ্ছেন। বাইরে দুজন পাইক।

— কী ব্যাপার — এইসময়ে হঠাৎ — খারাপ কিছু —

— আর কী খারাপ হবে! আমার সব্বনাশ কইর‍্যা ছাড়ছে।

শরৎ ঘোষ বয়সে হরিশেরই সমসাময়িক। খুবই অবস্থাপন্ন মানুষ। হরিশের দীর্ঘদিনের মক্কেল। দুজনেই পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল।

— বসেন, একটু জিরান। জল খান। সব শুনব। হামিদ ডাব আন দেখি কয়ডা।

শরৎ ঘোষের কথা শুনে হরিশের মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। একদিনেই এমন? শুধুই পুরোনো শত্রুতার জের? ওদের গ্রামের মজিদ আলির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছে শরৎ ঘোষের। কয়েকটা মামলাও আছে। সবই জায়গা জমি নিয়ে। মজিদ উঠতি নবাব। পাটের ব্যবসায় ভালই টাকা করেছে। ও এখন গ্রামের মাতব্বর হতে চায়। কিন্তু পুরুষানুক্রমে সেই কাঙ্ক্ষিত স্থান দখল করে আছে ঘোষ পরিবার। শরতের দাদা সরকারি চাকরি করে কলকাতায়। ওর ছোটভাই পাঁচ গাঁয়ের প্রথম এম.বি. ডাক্তার। হৈ হৈ পসার। সিভিল সার্জেনও খাতির করে। শরতের ঠাকুর্দার নামে স্কুল আছে। ঠাকুমার নামে ফ্রি ডিসপেনসারি। স্কুল কমিটি, ইউনিয়ন বোর্ড — সব জায়গায় প্রধান কর্তা শরৎ ঘোষ, মজিদ আলি কোথাও কলকে পায় না। সুতরাং ও সহজ পথ ধরে। লিগের স্থানীয় কমিটির প্রধান হয়। নানা ইস্যু নিয়ে শরতের সঙ্গে টক্কর চলে।

ঘোষেদের রাধামাধবের মন্দির এই অঞ্চলের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির। প্রতিবছর রাসে বিপুল ভীড় হয়। সারা বছরই নানা অনুষ্ঠানে লোকসমাগম ঘটে। ঠিক মন্দিরের উল্টোদিকে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ঘেঁষে তিন বিঘে নাবাল জমি মজিদরা আজই দখল করে নিয়েছে। ওখানে মসজিদ বা মাদ্রাসা করবে। এ তো পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করার সামিল। জোর করে সংঘাত ডেকে আনা।

— জমিটা বড় না, অবস্থাটা কি হবে বুঝতেছেন? — ডাব খেয়েও বুকের দাহ শান্ত হয় না শরতের। — যেমন করে হোক আপনাকে একটা ইনজাংশন আনতে হবেই। আমাদের হকের জমি, দেবোত্তরও নয়।

— এফ.আই.আর করছেন?

আমাদের থানার দারোগা মজিদের ফুফা। কইল আইজ আনন্দের দিনে এসব নাই করলেন।

দারোগা আতাউরকে ভালই চেনেন হরিশ। লোকটার খ্যাতি-অখ্যাতি দুই-ই আছে। তবে শরতের কথা ঠিক হলে বুঝতে হবে গোপনে সুড়ঙ্গ কাটা হয়েই আছে। হরিশ ও তাঁর মতো

আত্মমগ্ন মানুষ তার হদিশ পায়নি। বললেন, মনডারে শান্ত কইর‍্যা বাড়ি যান। আমি কোর্টে গিয়ে দেখব কি করা যায়। মাথা গরম করবেন না। সাবধানে থাকবেন। ভুলেও কোনও প্ররোচনায় পা দেবেন না। কয়েকটা দিন যাক।

মোটেই খুশি হন না শরৎ ঘোষ। তবু হরিশের কথায় বাড়ি ফিরে যান। মাথায় ভাবনা খেলে — অবস্থা তাহলে আগের মতো থাকবে না। নতুন ভাবে চিন্তা করতে হবে? রাধামাধব! রাধামাধবের যে কি ইচ্ছা!

ঠিক সন্ধের মুখে জামাকাপড় বদলে ধোওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হন হরিশ। খোঁজ করেন সুরেনের। ও তো বিকেলে বেরিয়ে গেছে। একাই যাবেন তবে।

— অখন আবার কই যাও?

— পালবাবুর কাছে।

— আইজ আর নাই গেলা। কাইল দিনে যাইও।

— বেশিক্ষণ লাগবে না। বীরেন চক্কোত্তি, মহাদেব নাগও আসবে। নিজেদের মধ্যে এট্টু সলা করা দরকার।

— তাইলে হামিদ সঙ্গে যাক।

— হামিদ! — ভাবেন হরিশ। ওকে নিয়ে যাওয়া কী উচিত হবে? বাইরে বসে শুধু মশার খাবার হবে।

বিনোদ বলল, চলেন — আমিও যাই। ঘরে বসে আর ভাল্লাগছেনা।

— তুমি অতটা পথ হাঁটবে?

— কতদূর —

— দূর বেশি না — আধ মাইলেরও কম — তবে রাইতের বেলা তো! তুমি গেলে অবশ্য দীনেশ পাল খুবই খুশি হইব। সকালেও কইছিল — মানে তোমার প্রশংসাই করছিল — তোমাদের কোর্টেও ওঁদের অনেক মামলা আছে। আলাপ থাকা ভাল।

দীনেশ পালকে এককথায় গ্রামের প্রধান বলা চলে। জিলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। গ্রামের স্কুল প্রতিষ্ঠায় ওঁদেরই দান সর্বাধিক। বিষয়সম্পত্তিও পালেদের বিপুল। এ ছাড়া গঞ্জে শহরে ব্যাবসাও আছে। দোতলা পাকাবাড়ি। গ্রামের একমাত্র মোটরগাড়ি পালেদেরই। বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় চারদিন গ্রামের সব মানুষের নিমন্ত্রণ থাকে।

বীরেন চক্কোত্তি, মহাদের নাগও অবস্থাপন্ন এবং সম্মানিত মানুষ। প্রভাবশালী তো বটেই।

পোষাক বদলাতে ঘরের ভিতরে গেলে টুনু বলল, তোমারে আগ বাড়িয়ে যেতে কে বলেছে? তুমি যাবে না। বাবা হামিদকে নিয়ে যাক।

— বলেছি যখন যাবই। সত্যি একটু ঘুরে আসলে ভাল লাগবে। বাবার সঙ্গেই তো যাচ্ছি — ভাবছ কেন?

চকিতে চুমু খেয়ে বলল বিনোদ, যাব আর আসব। ফিরে যেন দেখি আমার ফলার রেডি।

টুনুর কপট ক্রোধ পিছনে রেখে বেরিয়ে আসে বিনোদ। হরিশ হাঁক দেন — হামিদ — আয়রে —

রাত নিজের নিয়মে জড়িয়ে গেছে। ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের পালাগান ছাড়া চারদিকে প্রায় নিস্তব্ধতা। রান্নাঘরে স্বর্ণ নিজের কাজে ব্যস্ত। যমুনা ঠাকুরঘরের কাজ সেরে বারান্দায়

হ্যারিকেনের আলোতে আপনমনে গুনগুন করেন — ভবসাগর তারণ কারণ হে —।

টুনু নিজেদের ঘরে বিছানাপাটি গোছগাছ করে নিজেকেও সাজায়। জানালার কাছে দাঁড়িয়ে দেখে ঢেউহীন কালো সমুদ্র। জোনাকির উড়ে যাওয়া। বিনোদের আবদারের কথা মনে করতেই ঠোঁটের ভাঁজে সলাজ আহ্লাদ নাচতে থাকে।

আচমকা একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার আকাশে লাফিয়ে ওঠে। বহু মানুষের চিৎকার। কিন্তু দূরে। ঠিক কোন দিন থেকে শব্দ আসছে বোঝার জন্য টুনু বারান্দায় বেরিয়ে আসে। যমুনা কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করেন। মোটামুটি ধরতে পারেন — আল্লাহো আকবর।

— কানাই — যমুনা ডাকেন। — স্বর্ণ, পাক শ্যাষ হইল তোর?

কানাই এসে বলল — মা ঠাকরুন!

— কই আছিলি? আমার সামনে বইয়্যা থাক।

আল্লাহো আকবর ধ্বনি ক্রমাগত ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়ে।

যমুনা উচ্চারণ করেন — এত রাইত হইল এরা অহনও আইল না ক্যান।

রাত বাড়ে। চিৎকারও বাড়তে থাকে। একটু পরেই নৈঋত কোণের আকাশে লাল আলোর ঝলকানি দেখা যায়। প্রথম চোখে পড়ে টুনুর।

— মা — আগুন — ওই যে — ওইদিকে —

— ওইদিকে বামুনপাড়া না! — প্রবল আতঙ্ক যমুনার গলা আঁকড়ে ধরে। বিমূঢ়তায় অস্থির হয়ে ওঠেন বাড়ির পুরুষরা এখনও ফিরল না কেন! অথচ আগুনটা যেন বাড়ছেই। সেই সঙ্গে ভেসে আসছে নানা চিৎকার, শব্দ। যেন কালীপূজার রাতের উৎসব।

স্বর্ণ এসে বলল — আমি বাড়ি যাই?

— একলা যাইতে পারবি? যমুনা জিজ্ঞাসা করেন। যদিও ওর বাড়ি এবাড়ির পিছনেই অল্প দূরে।

— পারুম।

— না। কানাই আগাইয়া দিব। কানাই, যা — স্বর্ণরে বাড়ির দরজায় ছাইড়্যা ছুটে আইবি।

ওরা যাবার পরেই বাইরের অন্ধকার থেকে মৃদু ডাক আসে — টুনুদিদি—

— কে? — ভীতস্বরে কাঁপা গলায় বলেন যমুনা।

— ইদ্রিস মা ঠাকরুন। আপনে ডরাইবেন না। আমি আছি ইখানে। আব্বা না-আসা পর্যন্ত থাকুম।

ইদ্রিস! স্বস্তিবোধ করেন যমুনা। অন্তত একজন শক্ত সমর্থ পুরুষ আছে বাড়িতে।

— আয় — বারান্দায় উইঠ্যা বস। — যমুনা দরাজ হন।

— না। এই দাওয়াতেই ঠিক আছে। এত বিষ্টি তবু গরম কমতেছে না।

হাঁফাতে হাঁফাতে কানাই ফিরে আসে। বারান্দায় উঠেই বলে, মা ঠাকরুন — কি আগুন কি আগুন — পিছনের জমি থেইকা পরিষ্কার দেখা যায় — দাউ দাউ জ্বলতেছে —

— কোনদিকে — কাদের বাড়ি বোঝা গেল?

— বামুনপাড়ার দিকেই। খুব চিৎকার হল্লা —

— থাক। চুপ কইর‍্যা বয়।

একটু পড়েই যমুনা ডাকেন — ইদ্রিস —

— বলেন মা ঠাকরুন —

— এট্টু আগাইয়া দ্যাখবা নাকি, তোমার বাপ, টুনুর বাপ আইল নাকি — কখন গ্যাছে — কত বারণ করলাম — শুইনল না — দ্যাখ না বাপ —

ইদ্রিস জানে ওর এগিয়ে দেখা কত্তাবাবুর আসা কোনও মতেই ত্বরান্বিত করবে না। পৌঁছে গেলে এসেই যাবেন। এই ঘন অন্ধকারে দূরে কোনও ছায়াও দেখা যাবে না। তবু অবুঝ মন সবসময় এগিয়ে দেখার নিষ্ফল দাবি জানায়।

কিছুক্ষণ পরপরই যমুনা ইদ্রিসকে এগিয়ে দেখার জন্য বলেন। অগত্যা ও উঠে বৈঠকখানা পেরিয়ে সদরের দিকে এগিয়ে যায়। একটু যেতেই ছুটন্ত পায়ের শব্দ পায়। অন্ধকারে এক জোড়া ছায়া দৌড়ে আসছে। হাতের লাঠিটা শক্ত মুঠোয় ধরে ইদ্রিস হাঁকে - কে - কে তোমরা

— কে ইদ্রিস! আমি তোর বাপরে —

— তুমি — কত্তাবাবু কই — জামাইদাদা —

মুহূর্তেই ওরা সামনে এসে পড়ে। ইদ্রিস ঠাওর করতে পারে বাপের সঙ্গে সুরেনচাচা।

সুরেন ছুটন্ত অবস্থাতেই বলে — হামিদ দাদা তুমি যেমন কইছি ব্যবস্থা কর। আমি মামিরে বলতেছি। একদম দেরি করবা না।

— হ। আপনে ওদিকটা সামলান। ইদ্রিস-দৌড় লাগা। গাড়িটা জোত। জলদি যা।

সুরেনকে দেখে আঁতকে ওঠেন যমুনা। জামা কাপড়ে কাদা, ঘামে জ্যাবজ্যাবে শরীর, চোখ উদ্‌ভ্রান্ত।

— কি হইছে — তোর মামা আইল না —

— মামার লগে আমার দেখা হয় নাই, পাল বাড়িতে আছে জানি। কিন্তু এখন ঘোর বিপদ। কথা না বাড়াইয়্যা যা পার গুছাইয়্যা লও। অখনই বাইর হইয়া পড়তে হইব। হামিদ গাড়ি আনতেছে।

— কি কস তুই — তোর মামারে ছাইড়্যা —

— তোমাগো ব্যবস্থা কইর‍্যা আমি যামু মামার কাছে। ওইখানে থেকেই মামারে লইয়া খেয়াঘাটে যামু। এখন কথা কইও না। তাড়াতাড়ি কর।

টুনু বলল — মা — ও তো —

সুরেন বলে — মামার সঙ্গে আছে, চিন্তা করিস না। দেরি করিস না, তাড়াতাড়ি তৈরি হ। টাকা, গয়না, জামাকাপড় যা হাতের কাছে পাস —

যমুনা টুনু দুজনেরই চোখে জল। কণ্ঠে প্রতিবাদ এবং কৌতূহল।

সুরেন ধমকে ওঠে নিরুপায় হয়ে — কথা না শুনলে তোমাদের বাঁচাতে পারব না। তোমরা গোছাও, আমি বলতেছি বাইরে কি হইতেছে।

সংক্ষেপে সুরেন জানায় — সন্ধেবেলা মহাদেব নাগের বাড়িতে লুঠ হয়েছে। ওদের বাড়ির পাশেই বামুনপাড়া। সেখানকার ছেলেরা বাধা দিতে গেলে মারপিট হয়। তরোয়াল বল্লম চলে। তারপরেই আগুন। বেশ কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে। তারপর ওই দল স্কুলের মাঠে নিজেদের মধ্যে মিটিং করে। সুরেনের এক বিশ্বস্ত শাগরেদ ওকে গোপনে খবর দিয়েছে যে আজ রাতেই পালবাড়ি, দত্তবাড়ি দখল করে নেবে। খবর পেয়ে ও পাল বাড়িতে যায়। হরিশের সঙ্গে দেখা হয় না। কেন না ওঁরা বেশ কয়েকজন ভিতরে কোথাও জরুরি মিটিং করছেন। দেরি এড়াবার জন্য ও হামিদকে নিয়ে দৌড়ে এসেছে। ওদিকে স্কুলের মাঠে আল্লাহো আকবর বহুজন তেজে গর্জন করছে। হয়তো আধঘন্টার মধ্যেই এদিকে এসে যেতে পারে।

সেজন্য সুরেন মামি আর টুনুকে খেয়াঘাটে পাঠিয়ে পাল বাড়ি যাবে। সেখান থেকে মামা আর বিনোদকে নিয়ে সরাসরি ঘাটে চলে আসবে। একবার নৌকায় উঠতে পারলে আপাতত নিশ্চিন্ত। সঙ্গে হামিদ-ইদ্রিস তো থাকবেই।

— তারপর কি হবে?

মামার সঙ্গে সুরেনের এই সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। খেয়া পেরিয়ে স্টেশনঘাটা থেকে ট্রেন ধরে ত্রিপুরায় যাওয়া। ত্রিপুরায় যমুনার বোন আছে, সুরেনেরও এক দিদি থাকে। কোনওরকমে পৌঁছাতে পারলে প্রাণ ও সম্মান বাঁচানো যাবে। এখন এখানে যে ক্ষমতামত্ত অন্ধ উন্মাদনা চলছে তাতে জেদ ধরে থাকলে ধনসম্পত্তি তো যাবেই, ইজ্জতও বাঁচবে না।

— এই ঘরবাড়ি — জিনিসপত্র —

হামিদ দেখবে এখন। অবস্থার উন্নতি হলে ফিরে আসা যাবে। কিন্তু এখন আর দেরি করা উচিত হবে না।

— আব্বা, গাড়ি আনসি। — বাইরে থেকে ইদ্রিসের গলা শোনা যায়।

সুরেন বলে, হামুদাদা, জিনিসগুলো তোলো।— কিরে টুনু — তোর হল — মামি —

— ওরে ছাইড়্যা আমি যাইতে পারুম না।

— টুনু অবুঝ হোস না এখন। কোনও উপায় নাই। কইলাম তো তোদের রওনা করিয়েই আমি মামাদের খোঁজে ছুটব।

গোটা কয়েক স্যুটকেস ও ট্রাঙ্ক গরুর গাড়িতে ওঠে। যমুনা কখন কানাইকে বলেছিল কিছু খাবার-দাবার আর জলের ব্যবস্থা করতে। কানাই সেসব গাড়িতে তুলে দেয়।

সব দরজায় তালা দিয়ে যমুনা চোখের জল মুছতে মুছতে ভীরু পায়ে বেরিয়ে আসে। টুনুকে টেনে নিয়ে সুরেন বলে — উঠে পড়। মামি তুমিও।

অন্ধকারেও চোখ যায় পিছনে। গোয়াল থেকে হঠাৎই হাম্বা ডাকে প্রাণের আর্তি বাজে।

যমুনা কান্নাভাঙা গলায় বলেন — ও ইদ্রিস, গরুগুলারে ঠিকমতো যত্ন করিস, বাপ!

সুরেন বলল — হামুদাদা রওনা দাও। সোজা খেয়াঘাটে যাবে — তারপর ইস্টিশনে আখাউড়ার টিকিট কাইট্যা উঠাইয়া দিবা। ততক্ষণে আমি এসে যাব হয়তো। আর শোনো, বাঁশতলার কাঁচা রাস্তা দিয়ে যাও। ওইদিকে রাইতে লোকজন বেশি যায় না।

কানাই যমুনার হাত ধরে বলে — মা ঠাকরুন, আমি — আমি যামুগা আপনের লগে —

যমুনা ভেজা চোখে সুরেনের দিকের তাকান। হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় কানাইয়ের চোখেমুখে ফাঁসির আসামির প্রাণভিক্ষার আবেদনের ভাষা পড়তে ভুল হয় না সুরেনের। — যাবি তো উঠে পড়।

এক লাফে গাড়ির ভিতরে ঢুকে যায় কানাই। ওর হাতে একটা বাজারের থলি।

— এটা কী?

— আমার জামা-প্যান্ট-লুঙ্গি-গামছা।

যমুনার বুকটা হু হু করে ওঠে। কানাইয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে ভবিষ্যতের দিকচিহ্ন হদিশ করার চেষ্টা করেন।

গাড়ি চলতে শুরু করে।

সুরেন বলল — মামি — আমি যাই — ইস্টিশানে দেখা হবে।

স্টেশনে পৌঁছানো পর্যন্ত কোনও অসুবিধে হল না। হামিদ-ইদ্রিস অতি সতর্কতার সঙ্গে

ওদের নিয়ে আসে। কিন্তু মানুষের ভিড় দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায় যমুনা-টুনু। এত মানুষ কোথায় যাবে? কেন যাবে? প্রশ্নও জাগে, এদের সবাই কী ওদেরই মতো জীবন নিয়ে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। সবাই সন্ত্রস্ত। মুখে শঙ্কা। চোখে জল। অনেকেই শোকার্ত। কে কাকে সান্ত্বনা দেবে? মানবতার এই বিপুল বিবশ, ভাগ্যলাঞ্ছিত আর্তরূপের কাছে নিজের দুঃখ কষ্ট অনেক ছোট মনে হয়। তবু শেষ বিচারে নিজের সুরক্ষাই সবচেয়ে জরুরি, আপন নিরাপত্তা সবচেয়ে মূল্যবান।

যমুনা বারেবারে কানাইকে বলেন, সারাক্ষণ দিদির কাছে কাছে থাকবি।

হামিদ জানিয়ে গেছে ট্রেন ভোররাতে আসবে। টিকিট কেটেছে যদিও, কিন্তু উঠতে পারবে কিনা বলা যাচ্ছে না।

— সবই কি আখাউড়া যাবে? — টুনু জানতে চায়।

— না, না। কেউ চাঁদপুর, কেউ ঢাকা, কেউ চাটগাঁ — নানা জায়গায় যাবে।

যখন টুনু-যমুনা-কানাই রাতের, অন্ধকার চাদর, গায়ে দিয়ে এক তিমিরবিনাশী আলোর প্রত্যাশায় বুকে পাথর বেঁধে নদী পাড়ি দিচ্ছিল, তখন বহুদূরে রাজধানী দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিশ্ববিখ্যাত 'ট্রাইস্ট উইথ ডেসটিনি' বক্তৃতা দেওয়া শেষ করে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার গৌরবে ডেসটিনির কি ট্রাইস্ট হবে তা ভাবা বা বলার সুযোগ পাননি। স্টেশনে স্টেশনে অপেক্ষারত হাজার - লক্ষ মানুষের অবশ্য ওই নিলাজ ভাষণ শোনার দুর্ভাগ্যও হয়নি।

হঠাৎ একটা শোরগোল শোনা গেল। ট্রেন আসছে। হামিদ ছুটে গিয়ে খবর নিয়ে এল কোথাকার ট্রেন। ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে দেয় কীভাবে থামার সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে উঠে জায়গা দখল করতে হবে। মালপত্রও সাবধানে রাখতে হবে। যমুনা বলেন, সুরেন তো আইল না। ও কইছিল যে — হামিদ, সুরেন না-আইলে কিন্তু যামু না।

মাথা ঝাঁকিয়ে হামিদ বলে — মা, অবস্থা তো দেখতেছেন। সুরেন দাদা না-আইলেও আপনে ভাববেন না। আমি তো আছি।

— কিন্তু তোমাদের কত্তাবাবু — জামাইদাদা —

— মা — বলে টুনু মুখে কাপড়চাপা দেয়।

এরই মধ্যে অতিকায় দানবের মত হুড়মুড় করে ট্রেন ঢুকে পড়ে। চিৎকার, ধাক্কা, মালপত্রের গুঁতো সহজেই মানুষকে ছিটকে ফেলার চেষ্টা করে। হামিদ দু-হাতের বেষ্টনে যমুনা-টুনু-কানাইকে আড়াল দেবার চেষ্টা করে। ইদ্রিস জানালা দিয়ে শরীর গলিয়ে গাড়ির ভিতরে ঢুকে ডাক দেয় - আব্বা -

হামিদ দ্রুতপায়ে, দরজার কাছে ওদের নিয়ে বলে — উইঠ্যা পড়েন মা — ঠেইল্যাই উঠতে লাগব। কানাই, দিদিরে পিছনে রাইখ্যা ওঠ। আমি মালগুলো তুলি।

এত কঠিন কাজ যমুনা বা টুনু জীবনে কখনও করেনি। কানাইটা হঠাৎই যেন চতুর হয়ে উঠেছে। এক হাতে দিদিকে ধরে অন্যহাতে সামনের লোককে চকিত ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যায়। ইদ্রিস ডাকে — মা ঠাকরুন — এই যে — আমার হাত ধরেন — আসেন — আসেন — এই — এইখানে বসেন। জায়গা লইয়্যা বসেন।

ওদের বসিয়ে একে একে মালপত্র ওঠায়। সব সিটের তলায় জমা করে ইদ্রিস বলে — কানাই মালগুলা দেইখ্যা রাখ। এই দ্যাখ-এক-দুই-তিন-মোট সাতটা।

কানাই নিজের থলি দেখিয়ে বলে, না — আটটা।

— নামার সময় ঠিক কইর‍্যা গুইনা নামাবি।

— মা ঠাকরুন, আমি নামি - গাড়ি অখনই ছাড়ব — ভিতরে ততক্ষণে থিকথিকে ভিড়। চিৎকার, কোলাহল, বাদানুবাদ তো আছেই। তারই মধ্যে লাফিয়ে, শরীর বেঁকিয়ে — ঝুঁকিয়ে কোনওরকমে বেরিয়ে আসে ইদ্রিস।

প্ল্যাটফরমে জ়ানালার ধারে দাঁড়িয়ে হামিদ চলমান ভিড়ের মধ্যে সুরেন — কত্তাবাবু— জামাইদাদার তল্লাস করে। যমুনা বারবার একই কথা বলে যাচ্ছেন। — ওরা তো এল না! আর কখন আসবে? টুনু বোবা চোখে বাইরে দেখার চেষ্টা করে। বাঞ্ছিত চেনা মুখ কোথাও নেই। ও মার কাঁধে মাথা গোঁজে।

হঠাৎ ইদ্রিস বলে ওঠে — আব্বা — সুরেনদাদা —

বলেই ও ছোটে — সুরেনদাদা — ইদিকে — ইদিকে — সুরেনদাদা — সুরেনদাদা — ইদ্রিস শরীরের সব শক্তি গলায় ঢালে।

সুরেনের চোখ পড়ে ছুটন্ত ইদ্রিসের ওপর। হাত নাড়িয়ে ওরই দিকে ধাবমান হয়। মানুষের ভিড় কাটিয়ে আসা সহজ হয় না। আঁকাবাঁকা দৌড়ে কোনওরকমে যমুনার জানলার কাছে পৌঁছাতেই দিগন্ত কাঁপিয়ে হুইস্‌ল বাজে? ইঞ্জিনের ঘসঘস ঘসঘস শব্দ।।

— কী রে তোর মামা — তারপরেই চিৎকার করে ওঠেন যমুনা — তোর কাঁধে রক্ত কেন? কি হইছে?

— মামি — মামিগো — জানলা ধরে সুরেন বলে — পারলাম না — পারলাম না মামি — মামা নাই — টুনুরে তোরও সব্বনাশ হইছে — বিনোদও আর নাই — মামিগো — আমি কি করুম — কই যামু —

সুরেনের আর্তনাদ যমুনা ও টুনু ঠিক ঠিক মাথায় ধরতে পারার আগেই ট্রেন চলা শুরু করে। হামিদ দু'হাতে সুরেনকে বুকে জড়িয়ে সরিয়ে আনে। হুইস্‌লের তীক্ষ্নস্বর শকুনের কান্নার মতো আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে।

ট্রেনের মধ্যে যমুনা ও টুনু অবিশ্বাস ভরা চোখে ভাষাহীন বোধহীন মূক প্রাণীর মত একে অন্যের সান্ত্বনা হবার চেষ্টা করে। যমুনা শক্ত হাতে টুনুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

কানাই হঠাৎ বলে ওঠে — মা ঠাকরুন, এই দ্যাশটা আমাগো না — এতগুলো মানুষেরও না — তবে দ্যাশটা কার?

অবশেষে

প্রকৃত অর্থেই শিকড়ছেঁড়া বাস্তুছাড়া হওয়ার সেই দিনগুলো এই পঞ্চাশ বছর পেরিয়েও স্মৃতিতে জাজ্বল্যমান। সেদিন ট্রেনে বসে জানা ছিল না যে এক জীবনাবসানের সঙ্গে এক নবজীবনসম্ভাবনাও কুঁড়ি হয়ে উঠছে। যেমন জানা ছিল না ওই প্রায় অনুরূপ রাত আরও কয়েকবারই ফিরে আসবে জীবনে।

সে-রাতে আহত সুরেনকে ছেড়ে আসার কষ্ট টের পাওয়া যায়নি। তখন মনপ্রাণ অনুভূতি অসাড় হয়েছিল স্বামী হারানোর অসহ্য বেদনায়। অনেক বছর পরে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নিজের নাড়ি-ছেঁড়া শিবরাত্রির সলতেকেও অনুরূপ আহত অবস্থায় ছেড়ে আসার কথা অবশ্য মনের মধ্যে এখনও জ্বলন্ত অঙ্গার।

প্রণতির কাছে জীবন এক ঘূর্ণিবৃত্ত। যেন কোনও জাগলার তাঁকে নিয়ে জীবনান্তক খেলায় মগ্ন। ইতিহাসের ছেঁড়া পাতাগুলো জুড়ে জুড়ে অবসরে বসে চেষ্টা করেন নিয়তির সঙ্গে তাঁর জীবনের 'ট্যুইস্ট' বোঝার।

রাই প্রায়ই বলে, ঠাম্মা, তুমি এত সুন্দর গল্প বলো, লেখো না কেন?

— লিখব। তোর বাবা ফিরে এলে।

— বাবা কি আসবে কোনওদিন?

— হ্যাঁ মা। আসবে। আমি যে ওর নাম রেখেছি স্বাধীন।

মানিক, কবীরের স্বাধীনতার পঞ্চাশবছর পূর্তির অনুষ্ঠানের উচ্ছ্বাস উদাত্ত মাইকে ভেসে আসছে। কোন কিশোরীর কণ্ঠে বাজছে — 'এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার —'

কোন ঘর — কার ঘর — এক জীবনেও যে জানা হল না!

ক্রোড়পত্র-৩

কৃত্তিবাস

(সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত সম্পাদিত কৃত্তিবাস থেকে)

একসময় কয়েকবছর আমি কৃত্তিবাস সম্পাদনা করেছিলাম। সেদিন পুরোনো বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার কয়েকটি সংখ্যা পেলাম। ইতিপূর্বে সুনীল সম্পাদিত কবিতা কৃত্তিবাস গ্রন্থিত হয়ে গ্রন্থাকারে বেরিয়েছে। তারপরেও বন্ধ হওয়া ও পুনরায় শুরু হওয়া অ-মর কৃত্তিবাসের নানা সময়ে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও কৃত্তিবাস সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। যে কোনও কাগজের ইতিবৃত্ত সর্বাঙ্গীণ ভাবে জানতে গেলে তার পূর্বাপর ইতিহাসটিও স্মরণে রাখা অত্যাবশ্যক। না হলে পাঠককে বঞ্চনা করা হয়। তাছাড়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পরবর্তী পর্বেও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য রচনাও প্রকাশিত হয়েছে। গত এক দশকে অসংখ্য তরুণ পাঠক আমার সম্পাদিত কৃত্তিবাস সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। যদিও কৃত্তিবাস সুনীল সম্পাদনায় যে মহতী গৌরব অর্জন করেছিল, তারই অনুসরণ পরবর্তী কালের বিভিন্ন সময়ের কৃত্তিবাস।

এতদিন পরে আমার সম্পাদনায় প্রকাশিত পুরনো কৃত্তিবাসগুলি খুঁজে পেয়ে মনে হল এগুলো পাঠকের গোচরে না আনাটা অসমীচীন। তাই সূচনা হিসেবে বিভাবের এই সংখ্যায় বেছে নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ মাত্র ছাপা হল। পরে সুযোগ-সুবিধে মতো কিছু কিছু পুণর্মুদ্রণের চেষ্টা করব।

শুরু থেকে শুধু তরুণদের জন্য বিজ্ঞাপিত হলেও অনেক প্রথিতযশা লেখকের প্রবন্ধ কৃত্তিবাসে ছাপা হয়েছে। যেমন সমর সেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র অম্লান দত্ত ও আরও বেশ কয়েকজনের লেখা।

এবারে আমরা শুধু নামী লেখকদের রচনাই ছাপলাম। আরেকটি কথাও জানানো দরকার। কৃত্তিবাস আমি যখন সম্পাদনা করতাম তখন সুকবি প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় আমাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করতেন সহযোগী সম্পাদক হিসেবে।

পুনর্মুদ্রণের সময় তৎকালীন ব্যবহৃত বানানরীতি আমরা অপরিবর্তিত রেখেছি। — সম্পাদক

সৈয়দ মুজতবা আলী / কাব্যলোক

আধুনিক, ক্লাসিক, তার চেয়ে প্রাচীন কাব্য, অতি সনাতন তথা চিরপুরাতন সাঁওতাল, বেদুইন প্রেমগীতি, সব কাব্যই রস সৃষ্টি করে। আমি আধুনিক কাব্যলোকে নিতান্তই অপাঙক্তেয় — ব্যক্তিগত এ-তত্ত্বটি আমাকে এ-স্থলে নিবেদন করতে হল অতিশয় অনিচ্ছায়, ভবিষ্যতের ভয়ে। কাজেই হলপ করে বলতে পারবো না, কোনো আধুনিক কবি এ-সত্যটি অস্বীকার করেছেন কিনা। হ্যাঁ, অতি অবশ্যই মেনে নিতেই হবে — মাদৃশ সনাতনীদেরও — যদি আধুনিকরা বলেন, যে তাঁরা, রস পাঁচ প্রকারেই হোক আর নয় প্রকারেরই হোক, আলঙ্কারিকদের সে বিধান লঙ্ঘন করে দশম একাদশ রস সৃষ্টি করবেন তবে সে-অধিকার নিশ্চয়ই তাঁদের আছে। এবং এটা আধুনিকদের কোনো আজগুবি বায়নাক্কা নয়। যুগ যুগ ধরে ক্লাসিক কবিরা আলঙ্কারিকদের কত না অচলায়তন ভঙ্গ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। গভীরে না গিয়ে আমি সামান্য একটি টেকনিকাল উদাহরণ নিবেদন করি :

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে, অলঙ্কারশাস্ত্র যখন গৌড়ভূমিতে মৃতপ্রায়, সেই যুগেও বিদ্যাসাগর অলঙ্কারের চর্চা করেছেন। এবং সেটার সদ্ব্যবহারও করেছেন, যদিও সনাতন আধুনিক বহু রুচিবান রসজ্ঞজন এই ''সদ্ব্যবহার'' সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন।....ঐ সময়ে বিদ্যাসাগর উঠে পড়ে লেগেছিলেন বিধবাবিবাহের প্রধানতম বৈরী মহেশ ন্যায়রত্নকে সর্বার্থে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। সেই মর্মে তিনি একদা লেখেন, তিনি পণ্ডিত মহেশকে যে-সভায় সম্মানসূচক একটি উপাধি দেওয়া হয় সে-সভায় ঈষৎ বিলম্বে উপস্থিত হওয়ায় উপাধিদাতার স্ব-কণ্ঠে উচ্চারিত সে-উপাধির নামটি শুনতে পাননি। এদিক ওদিক জিজ্ঞেস করে শুনতে পেলেন, কেউ বলছে ''কবিরত্ন'' কেউ বা বলছে ''কপিরত্ন''। অতঃপর বিদ্যাসাগর বহুতর অলৌকিক গবেষণার পর স্থির করলেন, উপাধিটি কপিরত্নই বটেক্। তিনি স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র দ্বারা কপিরত্নের সত্যতা সপ্রমাণ করার পর অবশেষে অলঙ্কারশাস্ত্রে অবতীর্ণ হয়ে একটি আপ্তবাক্যের পুনরাবৃত্তি করে বললেন, 'প' অক্ষরটি মোলায়েম, 'ব' অক্ষরটি তদ্বৎ নয়। অতএব অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী আমরা কপিরত্ন উপাধিরই প্রাধান্য দেব।

উত্তম প্রস্তাব। কারণ সর্বযুগেই 'প' মোলায়েম অক্ষররূপে সম্মানিত হয়েছে। কিন্তু হায়, বিদ্যাসাগর মশাই তখন তাঁর সমসাময়িক অন্তরঙ্গ একজন কবির কথা আদৌ স্মরণে আনেননি। ''অকস্মাৎ দেখিলা সম্মুখে'' মাইকেল যেন স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের — সকলশাস্ত্র বিচারদক্ষ বিদ্যাসাগরকে প্রচলিতার্থে একদারনিষ্ঠ আলঙ্কারিক বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে — সব্বাইকে বেকুব বানাবার তরে লিখে বসে আছেন

'' — শুনিয়াছি বীণাধ্বনি দাসী
পিকবর রব নব পল্লব মাঝারে —''

সর্বনাশ! সর্বনাশ! অপাঙক্তেয় 'ব' অক্ষরের অনুপ্রাস! এ ও কখনো হয়? কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, বিস্তর বিদগ্ধ জন কিঞ্চিন্মাত্র প্রয়োজনীয় গ্রীবা কণ্ডূয়ন করেই বললেন, ''তেমন কি আর মন্দটাই বা হয়েছে। যা চেয়েছে লোকটা তা তো করতে পেরেছে। যা ইচ্ছে তাই রচেছে, ''যাচ্ছেতাই'' তো লেখেনি।''

কিন্তু একশ' বছর পূর্বে যাবারই বা কী প্রয়োজন?

বললে পেত্যয় যাবেন না, অদ্যাবধি বিস্তর বাঙালীর কাছে দণ্ডবিধির একটা নৃশংস আইন

যে চল্লিশাধিক বৎসর পূর্বে আগাপাস্তলা মকুব হয়ে গিয়েছে সেটা সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। এটির উল্লেখ অধম মাত্র একবারই করেছে, এবং তার দৃঢ় বিশ্বাস ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করলে শত শত আধুনিক উদ্বাহু হয়ে পুনঃপুনঃ সহুঙ্কার আমাকে আদেশ দেবেন : “একবার কেন শতবার পুনরাবৃত্তি করো। এ-হেন মহামূল্যবান কাঞ্চন খণ্ডটি শতধৌতেন সুবর্ণত্বং ন মুঞ্চতি।”

ঝাড়া ত্রিশটি বছর চলতি বাঙলার নাচনকুদন, এবং নিশ্চিত পরাজয় জেনেও সাধু ভাষার নিষ্ফল সংগ্রাম প্রচেষ্টা দেখার পর কবিগুরু ছাড়লেন এক আজব ফরমান! তখন মনে পড়ল এক রসনাশীর কাহিনী। ঔরঙ্গজেব যখন শুনলেন, তাঁকে ব্যঙ্গ করার জন্য রাজদরবার থেকে বহিষ্কৃত তাবত গায়ক নর্তক গায়িকা নর্তকী সঙ্গীতনৃত্যকলার প্রতীকরূপে একটি বাদ্যযন্ত্রকে বহ্বাড়ম্বরসহ শবযাত্রার শেষাঙ্কে প্রকাশ্য ময়দানে গোর দেবেন এবং শেষ যাত্রার স্লোগান গাইছেন “মুজীকী মুর্দ্” ম্যুজিকের মৃত্যু হয়েছে, “ইয়া লতীফ, হে সুন্দর, (আল্লা)! সঙ্গীতকে গোর দিতে হবে”, তখন ঔরঙ্গজেব নাকি সোল্লাসে চিৎকার করে উঠেছিলেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, গোর দাও, কবর খোঁড়ো, কিন্তু খোঁড়ো গভীরতম নিম্নস্তরের পাতালপুরী পর্যন্ত, যাতে করে সে আবার না গা ঝাড়া দিয়ে উঠে যায়।”

বাঙলা ভাষার কর্ণধার যে রবীন্দ্রনাথ একদা সাধু ভাষায় সর্বপ্রসাদগুণ প্রতিভা ও নিষ্ঠা দ্বারা অন্তঃস্থল সংহরণ করে লিখেছিলেন, অতুলনীয় গদ্য কাব্য যেন সুদৃঢ় নিটোল মুক্তামঞ্জরী:

“দ্রৌপদীর নাম যদি ধর্মিলা হইত তবে সেই পঞ্চবীর পতিগর্বিতা ক্ষত্র নারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।” সংস্কৃতে এহেন দার্ঢ্যপ্রসাদসম্পন্ন গদ্যরূপী কাব্য বিরল।

তারপর কুড়িটি বছর যেতে না যেতেই দেখি তিনি লিখছেন :

“কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ প্রশ্নকে ঠেকানো যায় না, (ইংরেজের) ‘খাজনা দেব কিসে’।”

এইবারে শুনুন :

“শ্মশান থেকে মশান থেকে ঝোড়ো হাওয়ায় হাহা ক’রে উত্তর আসে, ‘আব্রু দিয়ে, ইজ্জত দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে’।” এ-ভাষার গতিবেগ, বিচরণ ভূমি।

কিন্তু এ-রকম দুটো ভাষা যদি একে অন্যকে সম্পূর্ণ বর্জন না করে তবে সংমিশ্রণ, বর্ণসঙ্কর, গুরুচণ্ডালি ঠেকাবে কোন্ খোজা প্রহরী?

তাই দেখি, কুড়িটি বচ্ছর যেতে না যেতে ভাষার জহুরী, সাধু চলতি উভয়েরই সব্যসাচী তো “দোভাষী”, আধুনিক গৌড়ীয় সর্বকলার প্রথম আলঙ্কারিক তাঁর সুতীক্ষ্ণ তরবারি কোষবদ্ধ করে নম্র কণ্ঠে বলছেন,

“সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারা থেকে গুরুচণ্ডালি-অপরাধের কোঠা উঠেই গেছে।” কবিগুরু তার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। কিন্তু আরো একটি কারণ সম্বন্ধে আমি সচেতন। আধুনিক কবিদের বিরুদ্ধে গোড়ার থেকেই একটা ঘোরতর কুৎসা ছিল যে তারা খামোখা গুরুচণ্ডালি করে, কিংবা সুদ্দুমাত্র পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য যত্রতত্র নানারকম শব্দের জগাখিচুড়ি পাকায়। আমরা ঔরঙ্গজেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলি “গুরুচণ্ডালিকে গোর দাও গভীরতম গহ্বরে, চিরতরে।”

এস্থলে প্রথমেই বলে রাখা ভালো, রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলাতে গুরুচণ্ডালি কোনোকালেই অপরাধ বলে স্বীকার করতেন না। গুরুচণ্ডালি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে উদ্ধৃতিটি দিয়েছি সেটা ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের , কিন্তু যাঁরা তাঁর দর্শন,

শব্দতত্ত্ব, সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি ইত্যাদি প্রবন্ধ পড়েছেন, তাঁরাই জানেন তাঁর এসব গুরুগম্ভীর প্রবন্ধে প্রচুর গুরুচণ্ডালি রয়েছে গত শতাব্দী থেকে। ১৯৩৮-এর সতেরো বৎসর পূর্বে, আমি তখন সবে কলেজে ভর্তি হয়েছি, একদিন তিনি আমার একটি রচনা পড়ে বললেন, “উত্তম হয়েছে, চমৎকার লিখেছ।” আমি তদ্দণ্ডেই বুঝতে পারলুম, সৃষ্টিকর্তা তাঁকে সেই অসাধারণ গুণটি দিয়েছেন যার প্রসাদাৎ তিনি নিতান্ত নিরেস বস্তু থেকেও দু’একটি সামান্য সাধারণ জিনিস আপন প্রতিভাদ্বারা আবিষ্কার করে আনন্দ পেতে জানেন। “কিস্মৎ যদি তোমাকে তোমার ভালোবাসার সামগ্রী না দিয়ে থাকেন, তবে যা দিয়েছেন সেইটেকে ভালোবাসতে শেখ।” দ্বিজেন্দ্রনাথকে কিন্তু শিখতে হয়নি।....আমাকে শুধোলেন, “আচ্ছা, তোমার লেখাটি পড়ে আমার মনে একটি প্রাচীন প্রশ্নের উদয় হল; তুমি কি গুরুচণ্ডালি মানো?” আমি সোৎসাহে বললুম, “নিশ্চয়ই”। আমার মুখের শব্দটি শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি যেন আমার জিভটা আড়ষ্ট করে দিয়ে, রাজার রাজা যেন হুকুম দিচ্ছেন — বললেন, “আলবত মানবে না।” আমার মাথায় যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত একটা ডাঙস পড়লো। আমি ইডিয়েটের মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলুম। তিনি অনেকক্ষণ ধরে, নানা দৃষ্টিবিন্দু থেকে, বিশেষ করে লাতিন-মুক্ত ইংরিজি (আই উয়েন্ট ইনটু এ্যান ইন্ন্) এবং লাতিন-সমৃদ্ধ ইংরিজি (আই এন্টার্ড্ এ রেস্টরেন্ট্) থেকে দুনিয়ার যত উদাহরণ তুলে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, “বাঙলা ভাষা এখনো এমন দুর্বল যে এর দ্বারা সূক্ষ্ম চিন্তা প্রকাশ করা বড় কঠিন। তাই আমাদের প্রধান কাজ হবে : টু বি কনসাইজ, টু বি প্রিসাইজ, টু বি ক্লিয়ার। সেটা করতে গিয়ে যদি একটি কঠিন সংস্কৃত শব্দের পরই একটি জুৎসই — most juste — সহজ বাঙলা শব্দ আসে তবে সেটা নির্ভয়ে ব্যবহার করবে। ভাষার লালিত্যের তরে তুমি এমন কোনো শব্দ গ্রহণ করবে না, যার ফলে তোমার চিন্তার সামান্যতম শেড্, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র nuance বিসর্জন দিতে হয়।”

আধুনিক কবিদের যারা সুদ্দুমাত্র চীপ স্টান্টের জন্য গুরুচণ্ডালির ডিগবাজি খান তাদের কথা তুলে কোনো নূতন সত্য আবিষ্কৃত হবে না। সনাতনদের ভিতরও হুদো হুদো “কবি” আছেন যাঁরা চীপস্য চীপ এই স্টান্ট মেরেছেন বিস্তরে বিস্তর। নইলে “গুরুচণ্ডালি” কথাটাই বা এল কবে, কোত্থেকে? এটা তো আর আধুনিক শব্দ নয় যে সনাতনীরা বলবেন, এ-টুপিটা আমাদের মাথায় ফিট করে না, ওটা দাও ব্যাটা গরিবদের মুণ্ডুতে চাপিয়ে।

কিন্তু বিস্তর আধুনিক কবি “সাহিত্যিক দণ্ডনীতির ধারাতে যে-গুরুচণ্ডালির কোঠ” তার তর্জনী সঙ্কেতে গর্জন করতো তাকে উপেক্ষা করেছেন স্টান্ট মারার জন্য নয়। তাঁরা অনুভূতির ক্ষেত্রে কোনো shade , কোনো nuance বর্জন করতে রাজী ছিলেন না, নিছক ভাষা-লালিত্যের কৃপাদৃষ্টি লাভ করার জন্য। বরঞ্চ বলবো, বিস্তর স্পর্শকাতর কাব্যরসিকজন ক্লাসিক কবিতা উপভোগ করার সময় বহুবার লক্ষ্য করেছেন যে ক্লাসিক কবি ভাষাকে ললিত মধুর করার লোভে (মিল এবং ছন্দ শাস্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে নিটোল, অব্রণ রাখার জন্য) সূক্ষ্ম অনুভূতির নুয়াঁস, আভাস বিসর্জন দিয়েছেন অকাতরে, হয়তো বা পীড়িত হৃদয়ের দংশন সহ্য করে নিয়ে।

পরবর্তীকালে সে-সব কবি, কি দেশে কি বিদেশে অলঙ্কারের এ-সব বিধিবিধান তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কাব্যলোকে অনুভূতির সূক্ষ্ম বিন্দু থেকে যাত্রারম্ভ করে সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অণু পরমাণু দ্বারা আপন আপন গোপনতম — যুগ যুগ ধরে লুক্কায়িত — হৃদয়ের আলেখ্য অঙ্কন করে দরদী জনের সন্ধানে বেরুলেন তাদের মধ্যে অল্প ব্যক্তিই ভাগ্যবান হতে পেরেছেন।

তার কারণ: উভয় পক্ষের অক্ষমতা। কবিদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে : কাব্যে কোনো অনুভূতি বা বিশেষ রসাভাব যে-ব্যক্তি তাঁর অপূর্ব প্রতিভা, স্পর্শকাতরতা দ্বারা সর্বপ্রথম. আবিষ্কার করতে সক্ষম হন তিনিই যে সে-অভাব মোচন করতে পারবেন এমন কোনো সর্বজনগ্রাহ্য নজীর কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন কোনো বিষয়ের ইতিহাসেই আমরা পাই না। পক্ষান্তরে দরদী পাঠকও তার সনাতন অভ্যাস—ভাষার লালিত্য, ছন্দের বৈচিত্র্য, মিলের মিতালী — সহজে বর্জন করতে পারে না, যদিও ক্লাসিকদের কোন্ রসাভাব ঘোচাবার জন্য নবীন কবি অভিনব ছন্দহীন ''ছন্দে'', অ-মিলের ''মিতালী'' সহ রসসৃষ্টি করেছেন সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ সচেতন।

কিন্তু এহ বাহ্য। অতিশয় বাহ্য।

কাব্যলোকে আধুনিক আন্দোলন সম্বন্ধে প্রচুর আলোচনা হয়েছে। কিন্তু সে-আলোচনা বিচিত্র হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক কাব্য-স্থাপত্যের জন্য কোনো দৃঢ়ভূমি নির্মাণ করতে পারেনি। অর্থাৎ আধুনিক কাব্যরসের প্রাথমিক অলঙ্কার শাস্ত্রের অবতরণিকা যে কোথায় তারও সন্ধান পাইনি। আমি সর্বোপরি বাঙলা কাব্যের কথাই বলছি। কারণ বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আরম্ভ করে তাবৎ কাব্য রসধারার উপর দিয়ে আমি নির্ভয়ে আমার ''ভাঙা নৈকা'' চালিয়েছি, ধারা যেখানে অচঞ্চল সেখানে ফুল তুলেছি, যেখানে গতিশীলা সেখানে আঁজলা আঁজলা জল খেয়েছি, — কভু কর্দমাক্ত কভু বা নির্মল স্বচ্ছ —, অকস্মাৎ সবিস্ময়ে দেখেছি, ''কেন পান্থ ক্ষান্ত হও'', ''চিরসুখীজন ভ্রমে কি কখন''-এর এক ফার্সী ধারা বেমালুম মিশে গিয়েছে বাংলার ডিঙি-বজরা-ভাওয়ালি-ভর্তি বড় ধারার সঙ্গে, আউল-বাউল, গম্ভীরা, কবিগান, তরজার পঙ্কিলতম দু'আঁজলা খেতেও আমার বাধেনি। বাঙলা ভাষা সাহিত্যের জয়ধ্বনি গাইবার সময় আমার যে হেড়ে গলা লাফাতে লাফাতে তারসপ্তকে পৌঁছয় তার সঙ্গে হে, সশ্রদ্ধ এ বঙ্গের অলঙ্কার কীর্তিবাস ''কৃত্তিবাস'' সম্পাদক, অধিকারী হেন হাড়ি-ডোম পাবেন না যার গলা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। ভাষা বাবদে আমার মত আক্রমণশীল, হিংস্র, বিবেকবিচারহীন, ধর্মান্ধেতর ভাষান্ধ, বাঙলা ভাষা-সাহিত্য-কাব্যের নিরেসতম যে কোনো তুচ্ছ প্রচেষ্টার প্রতি যদি সমকালীন কোনো সাহিত্য সম্রাট — গ্রাঁ ম্যাৎর্ — সামান্যতম কটাক্ষপাত করেন তবে এই যবন তার সদামুক্ত, সদ্যশাণিত তরবারি দ্বারা সে কাফিরস্য কাফিরকে নিধন করে গাজী হবে, ফাঁসী চড়ে শহীদকুলে বরমাল্য পাবে। এক কথায় আমার মতো কাণ্ডজ্ঞানহীন, ভাষাপাগল শভিনিস্ট্ জিঙ্গোইস্ট স্যাব্র্ র‍্যাটলিং ডন্ কুইকসট্ আপনারা পাবেন না। তাই আমার কি গভীর মনস্তাপ হয় না, যখন আমি আপনাদের ধারায় স্বচ্ছন্দে ভরা পাল তুলে আপনাদের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে ''আধুনিক সারিগান'' গেয়ে গেয়ে, ঐ হোথা নীরেন চক্র, (চক্র আমার প্রশস্তিকে বুড়োহাবড়ার সার্টিফিকেট ভেবে চটে গেছেন) এই তো হেথা আনকোরা নৌকায় শমসুর রহমান, ওদের পানে দেখন-হাসি, ডাকাডাকি করতে করতে এগিয়ে যেতে পারিনে কাব্যরসসিন্ধু পানে?

তাই এ-বৃদ্ধ বাণীকে নিবেদন জানায়, আসুন, ত্বরায় আসুন, বেগে আসুন বিরাট মহাজনী নৌকা বেয়ে — যাতে আছে কাব্যরসের নব বৈভব, সর্ববৈভব — কবিরাজ মহাকবি কবিসম্রাট!

কৃত্তিবাস
বিংশতিবর্ষ
বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা ১৩৮০

আবু সয়ীদ আইয়ুব / রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান

(কল্যাণীয়া নীলিমা সেনকে শ্রদ্ধাঞ্জলি)

কোনো দূর দেশের এবং দূরতর কালের এক তরুণ কবি — অধুনা 'অর্বাচীন' বলে ঈষৎ অবহেলিত—বলেছিলেন : ''আমাদের মধুরতম গান তাই যাতে ব্যক্ত হয় বিষণ্ণতম ভাব।' রবীন্দ্রনাথকে অবশ্য বিশেষভাবে দুঃখের কবি বলা যায় না, যদিও তাঁর অপরিণত বয়সে প্রকাশিত প্রথম কাব্যসংকলন 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' দুঃখবিলাসী, প্রথম প্রতিভাদীপ্ত কাব্য 'মানসী'-র সুর মোটের উপর বিষণ্ণই, 'সোনার তরী' আর 'কল্পনা'র প্রথম ও সম্ভবত শ্রেষ্ঠ কবিতাদ্বয় নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায় ঢাকা। শেষ দশকের কবিতায় দুঃখের ভাব গভীরতায় ও ব্যাপ্তিতে অন্য সব ভাবকে ছাড়িয়ে গেছে। তবে তাঁর সবচেয়ে বিশ্ববিশ্রুত কাব্যপর্বটি শান্ত মধুর, দুঃখের অনুভূতিও তখন মধুর রসে ডোবা। রবীন্দ্রনাথ নিজেও নিজেকে আনন্দের কবি বলে ভাবতে ও বলতে ভালোবাসতেন; তাঁর প্রিয়তম উপনিষদের শ্লোক বোধ করি ''আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমাণি ভূতানি জায়ন্তে'' ইত্যাদি; তাঁর ভক্তিগীতির পৌনঃপুনিক বাণী

আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
দিনরজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।।

কিংবা

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন।।

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবচ্ছবিটি সাধারণ পাঠক ও সমালোচকের চিত্তে বেশ উজ্জ্বল রেখায় আঁকা রয়েছে। অযথার্থ নয় এ ছবি, বিশেষত গানের ক্ষেত্রে, এবং এ প্রবন্ধের বিষয় রবীন্দ্রনাথের গানই। তাঁর আনন্দের গান বৈচিত্র্যে ও সংখ্যায় দুঃখের গানকে ছাড়িয়ে গেছে, তথ্য হিসাবে এটা মানতেই হবে। কিন্তু আর্টের বিচারে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব সামান্যই। সংখ্যায় কম হলেও গুণের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানই অগ্রগণ্য—অন্তত আমার মূল্যায়নে। কেন দুঃখের গান আমার মনকে, খুব সম্ভব আরো অনেক শ্রোতার মনকে, নিবিড় ভাবে স্পর্শ করে—সে প্রশ্নটি আপাতত এড়িয়ে গেলাম। একটি সহজ উত্তর — দুঃখ দিয়েই যে আমাদের জীবন গড়া এবং জীবনের প্রতিবিম্বই তো আর্ট—আমার মনঃপূত নয়। কে হিসাব করে বলতে পারে কার জীবনে দুঃখের পরিমাণ সুখের চেয়ে বেশি না কম। সমস্যাটা ভিন্ন। জানি না কেন দুঃখের প্রতি আমাদের মর্যাদাবোধ গভীর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুর্ভাগিনী কন্যার চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তে বলেছিলেন :

তোমার সন্মুখে এসে, দুর্ভাগিনী, দাঁড়াই যখন
নত হয় মন।

এমন কথা কি তিনি বলতে পারতেন কোনো সৌভাগ্যবতীর চরম সুখের মুহূর্তে ? দুঃখের শ্রদ্ধেয়তার কারণ কি তবে এই যে দুঃখের হাতুড়ি দিয়ে পিটে পিটে মানবচরিত্র গঠন করা হয় এই মর্ত্যধামে, গঠন করেন বাউলদের সেই নিঠুর দরদী? অথচ কোনো দুঃখ (যথা অ্যাসিডে

পোড়া মুখ বা অনারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি), এবং সব দুঃখই একটা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে, দুঃখীর চরিত্রকে শিল্পীর হাতে খোদাই-করা দেবপ্রতিমার মতো সুন্দর তো করেই না, বরঞ্চ আরও দুর্বল ও কুশ্রী ক'রে ফেলে। এটি মানবজ়ীবনের একটি গভীর জিজ্ঞাসা। তাই বলছিলাম আপাতত থাক সে প্রশ্নপরম্পরা।

রবীন্দ্রনাথের বেলাতে শেলীর উদ্ধৃত পংক্তিটি মোটের উপর যদিও সত্য তবু এই সব অবিস্মরণীয় দুঃখের গানের রচয়িতা যেহেতু রবীন্দ্রনাথ, তাই দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অনুভূতির কালিমা কোথাও নিরেট নয়, অন্ধকার ঘন হলেও অভেদ্য নয়, কোনো কোনো গানে দুঃখের পার দেখা না গেলেও তার স্নিগ্ধ পবিত্রতা অনুভব করা যায়, কোনো গানই বিশ্ববিধানের প্রতি ক্রোধ, ঘৃণা, তিক্ততা বা বিদ্রোহভাব জাগায় না আমাদের মনে। মানববিধানের কথা আলাদা। কিন্তু যেসব গানে বা কবিতায় কবি মানবিক—বিশেষত সামাজিক, রাষ্ট্রজাতিক বা রাষ্ট্রবিধাতাদের অন্যায় অত্যাচারের প্রতি অবিমিশ্র ধিক্কার বর্ষণ করেছেন সেগুলি স্বভাবতই নান্দনিক স্তর থেকে সরে গেছে নৈতিক স্তরে—যথা 'নৈবেদ্য' - এর “ অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে” , এবং প্রান্তিক-এর ১৭ সংখ্যক কবিতা।

গোড়াতেই বলে রাখা ভালো যে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন ভাবের গানের মধ্যে যেমন দুঃখের গানই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানে, তেমনি তাঁর বহুবিচিত্র সৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যে গানের ফসলকেই আমি সবচেয়ে মূল্যবান এবং কালজয়ী জ্ঞান করি। অবশ্য আমি ভুলে যাচ্ছি না যে রবীন্দ্রনাথের গান কথাপ্রধান, সুরপ্রধান নয়। তার একটি কারণ স্পষ্টত এই যে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরকার পৃথিবীর মহত্তম কবিদের অন্যতম। অতুলপ্রসাদও উঁচুদরের সুরস্রষ্টা, এবং রবীন্দ্রনাথের সুরশৈলীর খুব কাছে এসেও আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কিন্তু তাঁর গানের কাব্যশক্তি এতই সীমিত যে কথার দিকে মনোনিবেশ ঘটলে খানিকটা রসভঙ্গ হয়। প্রায় সব মার্গসঙ্গীতে কথা এমন সোচ্চার ভাবে অকিঞ্চিৎকর যে সেদিকে মনোযোগ করার প্রশ্নই ওঠে না, মনে হয় যেন কথা ছেঁড়া কাঁথা প'রে ভিখারী সেজেছে নিজেকে আড়ালে রেখে রাগরাগিণীর রাজকীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ করবার জন্যই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু বলব সুর সেখানে রথ, সারথী নয়; কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও আদিগন্ত বিস্তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছিয়ে দেওয়া তার কাজ। অবশ্য এমন কিছু সংখ্যক গানও রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাতে সুর ও কথা পরস্পর-স্পর্ধী; আমাদের মুগ্ধ মনোযোগ গোড়ার দিকে দোলা খেতে থাকে কথা থেকে সুরে, সুর থেকে কথায় এবং রসানুভূতি চরমে পৌঁছোয় তখনই যখন গীতশিল্পের দুই অঙ্গে আমরা আর ভেদ দেখতে পাই না, উপলব্ধি করি একই দেবতার মহিমা যিনি একাধারে হরি এবং হর। সম্ভবত এগুলিই তাঁর সর্বোৎকৃষ্ট গান। উদাহরণ দিতে গিয়ে মনে জাগে “চিরসখা হে, ছেড়ো না মোরে ছেড়ো না”, “আছ অন্তরে চিরদিন”, “এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ ” , “ কী রাগিণী বাজালে হৃদয়ে ”। আবার এমনও গান তিনি রচনা করেছেন যাতে সুরের শক্তি অসাধারণ হলেও কথার প্রাধান্য অনস্বীকার্য। উদাহরণ : “শুধু তোমার বাণী নয় গো, হে বন্ধু, হে প্রিয়”, “ সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া ”, “ আরো আঘাত সইবে আমার”, চিনিলে না আমারে কি ”, “আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা ”, ইত্যাদি। আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত এদের দিকেই, হয়ত এই জন্যেই যে আমি সুরের চেয়ে কথা অনেক বেশি বুঝি এবং একটু বেশি ভালোবাসি।

রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে তাঁর গান গাইবার সময়ে কণ্ঠশিল্পীরা সুরের খাতিরে যেন কথার অমর্যাদা না করেন। যাঁরা প্রধানত সুরের রসিক এবং সাধক, কথার প্রেমে পড়তে শেখেন নি, তাঁরা গায়কই হন আর শ্রোতাই হন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠিক তাঁদের জন্য নয়। “ আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি/অভিশাপ গেল লেখি ”, “ হায় মম পথ-চাওয়া বাতি/ ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে ”, “ আমার না-বলা বাণীর ঘন যামিনীর মাঝে / তোমার ভাবনা তারার মতন রাজে ”, “ আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান ”, “আমি এ প্রাণের রুদ্ধদ্বারে / ব্যাকুল কর হানি বারে বারে ”, “প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে ”, “বিরস দিন, বিরল কাজ, প্রবল বিদ্রোহে / এসেছ প্রেম, এসেছ আজ কী মহা সমারোহে ”, “দিনগুলি মোর এমনি ভাবে / তোমার হাতে ছিঁড়ে ছিঁড়ে হারিয়ে যাবে ”, “ হাল-ভাঙ্গা, পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে ”, —এমন শত শত পংক্তি রবীন্দ্রনাথের গানে ছড়ানো রয়েছে। যাঁরা তাঁর অলৌকিক শক্তি রক্তের শিরায় শিরায় অনুভব করেন না, এবং সেই অনুভূতিকে কণ্ঠস্বরের দরদে ও শব্দের মমতাপূর্ণ উচ্চারণে ফুটিয়ে তুলতে পারেন না, পারার আবশ্যকতা পর্য্যন্ত বোধ করেন না, তাঁদের গলা যতই পরিশীলিত হোক এবং সুরজ্ঞান প্রশ্নাতীত, রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। শুনেছি রূপালী পর্দার কিংবা আধুনিক গানের এই সব নামজাদা গায়করা নাকি রবীন্দ্রসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করে দিয়েছেন। জনপ্রিয়তা অর্জন করবার জন্য যদি আপন সত্য মূল্য এবং অমূল্য বৈশিষ্ট্য হারাতে হয় তবে রবীন্দ্রনাথের গান অতখানি জনপ্রিয় নাই বা হল।

প্রতিভাবান শিল্পী এবং সাধারণ শিল্পরসিক ভিন্নতলের বাসিন্দা—এটা অস্বীকার করবার জো নেই । শিল্পী যদি কয়েক ধাপ নেমে আসেন তবে তিনি তাঁর সামাজিকতারই পরিচয় দেবেন। শিল্পকর্মকে খামখেয়ালী বা কালোয়াতি (craft fetishist) দুর্বোধ্যতার অত্যন্ত দুরারোহ শিখরে তুলে নিয়ে যাওয়াতে শিল্পীর গৌরব বাড়ে না। রসগ্রাহীকেও কিন্তু কয়েক ধাপ উপরে উঠবার পরিশ্রম স্বীকার করতে হবে। সুরুচি ও সহৃদয়তা জন্মসূত্রে কেউ লাভ করে না; কৃষিক্ষেত্রে যেমন, কৃষ্টিক্ষেত্রেও তেমনি কঠিন নিয়মিত ভূমিকর্ষণ অত্যাবশ্যক। একপক্ষের অভিমান একটু কম এবং অন্য পক্ষের সাধনা একটু বেশি হোক, এই আমার আবেদন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা এতই উত্তুঙ্গ ছিল যে কয়েক ধাপ নেমে আসতে তাঁর আত্মমর্যাদায় বাধে নি, সৃষ্টিকর্মেরও তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। তাঁকে একেবারে ফিল্মী বা আধুনিক গানের সমতলে নামিয়ে আনার চেষ্টা সকলের পক্ষে ক্ষতিকর। নিন্দিত হোক এ অপচেষ্টা।

দুঃখের গান রবীন্দ্রনাথ কম রচনা করেন নি। সর্বপ্রথমে সেই গানের কথা বলি যাতে দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজাগতিক; যাতে কবির বা যে-কোনো বিরহীর অন্তর্বেদনা একাকার হয়ে মিলেছে বিশ্ববেদনার সঙ্গে, এবং সারা জগতের বেদনা একটি

ব্যক্তির হৃদয়ে জমাট বেঁধে অসাধারণ তীব্রতা লাভ করেছে :

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা।।
চলিছে ছুটিয়া অশান্ত বায়,
ক্রন্দন কার তার গানে ধ্বনিছে—
করে কে সে বিরহী বিফল সাধনা।।

আমাদের মনে ছবি জাগে এমন এক ভাগ্যহতের যার বিরহ কোনো কালে শেষ হবার নয়; সে বিরহের কারণ প্রিয়ার মৃত্যুও হতে পারে, অথবা প্রাকৃতিক বা সামাজিক বাধা-ঘটিত এমন বিচ্ছেদ যা মৃত্যুর চেয়ে কম দুঃসহ নয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি ছবিও জেগে ওঠে। ঠিক ছবি নয়, কারণ এই দ্বিতীয় ভাবটি চিত্রগ্রাহ্য নয়। বরঞ্চ মনে হয় প্রথম চিত্রটি প্রতীক মাত্র। পারমার্থিক পূর্ণতা এবং পার্থিব অপূর্ণতার মধ্যে অপার বিচ্ছেদ। মিলন প্রত্যাসন্ন নয়, সহজসাধ্য নয়, আদৌ সম্ভব কিনা তা নিয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাই কামনা এমন ব্যথাতুর, ব্যথা এমন মর্মন্তুদ এবং দিগন্তব্যাপী। এ যন্ত্রণা জগৎসৃষ্টিরই প্রসব-যন্ত্রণা। 'দুঃখ' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"দুঃখের যত প্রকার ব্যাখ্যাই করি না কেন, দুঃখ তো দুঃখই থাকিয়া যায়। না থাকিয়া যে জো নাই। দুঃখের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব যে একেবারে একসঙ্গে বাঁধা। কারণ অপূর্ণতাই তো দুঃখ এবং সৃষ্টিই যে অপূর্ণ।"

জগতের মধ্যে যে নানা দোষত্রুটি কুশ্রীতা-কদর্যতা-কর্কশতা রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন না। বিশ্বের ঐকতান সঙ্গীত রচিত হয় নি এখনো; সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সমস্ত বেসুরকে বুকে টেনে নিয়ে সঙ্গীত-রচনার মহড়া চলছে জগৎ জুড়ে, ইতিহাস জুড়ে। মাঝে মাঝেই তার ছিঁড়ে যায়, তাল কেটে যায়। স্বাধীন মানুষ এবং সুস্থ মানবসমাজ গড়ে তুলবার পথে এমন পর্বতপ্রমাণ বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয় যে আমরা শিউরে উঠে ভাবি এতকালের সব সাধনাই বুঝি বিফল হয়েছে, সব পথই হারিয়ে গেছে চির অন্ধকারে।

উপনিষদ বলেন, ব্রহ্ম তপস্যার দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সে সৃষ্টি কোনো ধারাবাহিক মহৎ উপন্যাসের মতো এখনো ক্রমশ প্রকাশ্য, বরঞ্চ বলা উচিত ক্রমশ লেখ্য। ক্লিষ্ট রচনার পংক্তির পর পংক্তি কেটে দেওয়া পাতাগুলি, একটার পর একটা বাতিল-করা খসড়াগুলি বিশেষভাবে দেখা যায় মানুষের মধ্যে, মানবসমাজের মধ্যে। তাই তপস্যাও চলছে এবং তপস্যা-নিঃসৃত বেদনারও শেষ নেই। সেই বেদনা "চঞ্চল বেগে বিশ্বে দিল দোলা।" তবে কি তপস্যা ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে এবং বেদনা বদ্ধমূল ও সর্বব্যাপী ? না, অতখানি নৈরাশ্যবাদী নন রবীন্দ্রনাথ। " অশ্রুভরা বেদনা " ও " বেদনা কী ভাষায় রে " গান দুটিতে ভাবগত ঐক্য আছে, দুটির বেদনাই জগৎজোড়া। কিন্তু প্রথমটি অশ্রুভরা বেদনাতে শুরু এবং শেষ। দ্বিতীয় গানের শেষে শুনি—

মনোমোহন বন্ধু —
আকুল প্রাণে
পারিজাতমালা সুগন্ধ হানে।।

কিছুই দেখা যায় না, কিছুই বোঝা যায় না, তবু আকুল প্রাণে কোথা থেকে যেন একটা সুগন্ধ আসে, জাগিয়ে তোলে আমাদের ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী শক্তিগুলিকে, বাঁচিয়ে রাখে বেঁচে থাকার — মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার—ইচ্ছাটাকে। একে বলা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্থায়ী ভাব। এরই অন্যতম এবং উৎকৃষ্টতর উদারণ :

সহসা দারুণ দুখতাপে   সকল ভুবন যবে কাঁপে
সকল পথের ঘোচে চিহ্ন   সকল বাঁধন যবে ছিন্ন;
মৃত্যু-আঘাত লাগে প্রাণে—
তোমার পরশ আসে কখন কে জানে।।

ক্বচিৎ কখনো অন্ধকার আরো ঘন হয়েছে, নৈরাশ্য আরো দুরভিভব, আরো দুর্বিসহ! অনেক বেশি সংখ্যক গানে অবশ্য আনন্দধারা বয়ে চলেছে—প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যে আনন্দ, মানুষের অপরাজেয় শক্তিতে আনন্দ, ঈশ্বরের অনন্ত মঙ্গলবিধানে আনন্দ। কিন্তু সংখ্যাগণনার দ্বারা তো কবির মনের সত্য পরিচয় পাওয়া যায় না। তাই আমি বলতে সাহস পাই যে গীতিরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়মন যে-দুই প্রত্যন্ত রেখার মধ্যে দোদুল্যমান ছিল তাদের মধ্যবর্তী সুস্থিতি-বিন্দু অধিকার করে আছে উপরে অংশত উদ্ধৃত এই হৃদয়গ্রাহী গানটি ("পথে চলে যেতে যেতে কোথা কোন্‌খানে")।

বিপরীত নাটকীয় পরিস্থিতি এবং অনুভূতির রূপকল্প (pattern) দেখি " তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায় " গানটিতে। দুঃসহ দুঃখ-আঘাতে নৈরাশ্যের অন্ধকার যখন এত ঘন যে "সকল পথের ঘোচে চিহ্ন " তখন যেমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে সান্ত্বনা ও শান্তি নেমে আসে, তেমনি যখন সবই শুভ্র সুন্দর মধুর, কোনও দিক থেকে বিপদপাতের লেশমাত্র সম্ভাবনা নেই, সমস্ত আকাশ নির্মল নীল, জল অগভীর, নিস্তরঙ্গ, ঠিক তখনই

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্‌খানে রে কোন্‌ পাষাণের ঘায়।
নবীন তরী নতুন চলে,   দিই নি পাড়ি অগাধ জলে—
বাহি তারে খেলার ছলে   কিনার-কিনারায়।।
ভেসেছিল স্রোতের ভরে,   একা ছিলেম কর্ণ ধ'রে,
লেগেছিল পালের 'পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন-মনে,   মেঘ ছিল না গগনকোণে—
লাগবে তরী কুসুমবনে ছিলেম সেই আশায়।।

যে-পাষাণের ঘায়েই হোক তরী হটাৎ ডুবে যাচ্ছে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে—এ কোন্‌ তরী, কিসের প্রতীক এ-তরী? মনে তো হয় না এ কোনো ব্যক্তিগত ছোটোখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষার তরী? গানের ইঙ্গিত আরো অতল-গভীর, নিমেষে জীবনের কোনো প্রান্তিক পরিস্থিতির উদ্বেগ জাগিয়ে তোলে শ্রোতার মনে। মানবজীবনের সবচেয়ে বড় আশার তরী ডুবে যাওয়ার ট্র্যাজিক চিত্রই ফুটে উঠেছে এই গানে। কোনো কঠোর অভিজ্ঞতার আঘাতে জগৎপিতার যে পিতৃপুরুষাগত স্নেহকরুণাকল্যাণময় মূর্তিতে আশৈশব আস্থা রবীন্দ্রনাথের মনে এতদিন সহজ মধুর ও নিরুদ্বেগ ছিল সেই জাগতিক মঙ্গলবিধানের প্রতি ভরসার

তরীখানাই কি আজ হঠাৎ ডুবে যাচ্ছে? সে তরী ডুবে যাওয়ার অর্থ যে কী মর্মবিদারক, যাঁরা কীর্কেগার্ডের লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। রবীন্দ্রনাথ কির্কেগার্ডের লেখার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কি না জানি না, সম্ভবত ছিলেন না। তবে কীর্কেগার্ডীয় আধ্যাত্মিক যন্ত্রণা তাঁর অজানা ছিল না — এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি।

"If God does not exist, then every thing is permitted"।না কিন্তু। ঈশ্বরে বিশ্বাস চলে গেলেও আমাদের হৃদয়কক্ষে বহুযত্নে লালিত মূল্যবিচারের একটি প্রতিমান থেকে যায়, তার নির্দেশ আমরা এড়াতে পারি না। ঠিক সময়ে সেই বলে দেয় জীবনে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে কোন্‌টা হেয় কোন্‌টা শ্রদ্ধেয়। সার্বজনীনতার দাবী সে রাখে না, তবু আমার পক্ষে আমার অন্তরতম মূল্যবিচারই চরম। কিন্তু কোনো নিদারুণ পরিস্থিতিতে এই মাপকাঠিও যদি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়, ভালোমন্দ সব একাকার হয়ে যায়? সত্য শ্রেয় ও সুন্দরের প্রতি যে-অনুরাগ ও শ্রদ্ধা মানুষের জীবনকে নিছক জৈবিকতার গ্লানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে তার সাময়িক কিন্তু সম্পূর্ণ বিলয় — সেই অনির্বচনীয় ভয়ঙ্কর সম্ভাব্যতার মুখোমুখি দাঁড়ানোটাকেই বলে "encounter with nothingness ”। নাস্তিকতার চেয়েও নিদারুণতর যে চূড়ান্ত নাস্তি তার সঙ্গে ভীম পরিচয় ভক্ত ও প্রেমিক রবীন্দ্রনাথের, শুভ্র ও সুন্দরের বেদীতে আত্মনিবেদিত রবীন্দ্রনাথের যে কখনো ঘটে নি তা নয়। না ঘটলে তিনি এত বড় কবি হতে পারতেন না, তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার থাকত ভাববর্ণালীর সংকীর্ণতর সীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে। তাঁর দীর্ঘ কবি জীবন তিনি একই শ্যামছায়াঘন তীরে বসে কাটান নি, বারে বারে তাঁর অন্তর্যামীর কাছ থেকে নোঙর তুলে নেওয়ার নির্দেশ পেয়েছেন, পাড়ি দিয়েছেন অজানা দুর্নাব্য সমুদ্রে, কখনো বা 'বীথিকার' দুর্ভাগিনীর মতন খুঁজেছেন ''কাছের বিশ্ব মুহূর্তে যা চলে গেল দূরে'' — এত দূরে যে ভয় হয়েছে বুঝি বা ডুবে যাবে অতল অন্ধকারে।

অনুভূতির বিশ্বব্যাপ্তি এবং কস্‌মিক তাৎপর্য আরো সুস্পষ্ট অন্য একটি গানে। রবীন্দ্রনাথ অভয় বা নির্ভয়ের গান অনেক বেঁধেছেন, ভয়ের গান বিরল। আমি অবশ্য ''জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না'' বা ''আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে / আমি তাইতে কি ভয় মানি'' গোছের মধুর কোমল ভয়ের কথা ভাবছি না, যা প্রেমিক হৃদয়কে সর্বদাই অল্পবিস্তর আন্দোলিত করে; ভাবছি সেই দুর্বার অনুভূতির কথা যা প্রবল বন্যার মতো সকল্ বাঁধ ভেঙে দিগন্ত থেকে দিগন্ত প্লাবিত করে ফেলে :

পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে।।
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি —
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।।
ভয় হয়, পাছে ঘুরে ঘুরে
যত আমি যাই তত যাই চলে দূরে —
মনে করি আছ কাছে, তবু ভয় হয়, পাছে
আমি আছি, তুমি নাই কাল নিশিভোরে।।

''সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে'' — এই আর্ত প্রার্থনার মধ্যে আশার প্রকাশ যত করুণ, ''আমি আছি তুমি নাই'' — এ ভয়ের ব্যঞ্জনা তার চেয়ে তীব্র। আর কী নিদারুণ সে ভয় — মনকে যতই ভোলাই যে ঘুরে ঘুরে তোমার কাছে যাচ্ছি ততই দূরত্ব যায় বেড়ে, অন্ধকার হয় ঘন; শুধু দৃষ্টির নয়, ধ্যানেরও বাইরে সরে যাচ্ছ তুমি। এই অন্ধকারে, নিবিড় নিশীথে আমি যদি বা বাঁচি, আমার প্রেমকে বাঁচিয়ে রাখব কেমন করে।

সঁভল্‌নে দে অয় না-উমীদী, কেয়া কেয়ামৎ হৈ,
কেহ্ দামনে খেয়ালে ইয়ার ছুটা যায় হৈ মুঝ্‌সে।
(হে নৈরাশ্য, এ কী প্রলয় কাণ্ড! একটু সামলে নিতে দাও,
বন্ধুর ধ্যানের আঁচলের যে শেষ প্রান্তটুকু আমার হাতে রয়েছে
তাও ফসকে যাচ্ছে। গালিব)

নৈরাশ্য আরো নগ্ন, আরো অন্তিম রূপ ধারণ করেছে সেই গানে 'চণ্ডালিকার' শেষে যার উপযোগিতা তর্ক সাপেক্ষ। কেবলমাত্র চণ্ডালিনীর ঝি-র অনুতপ্ত বিক্ষোভ প্রকাশ করতে হলে এই গানের ব্যঞ্জনাকে অনেকখানি ছোট করে নিতে হয়। ''মা, ভয় হচ্ছে। তাঁর পথ আসছে শেষ হয়ে — তার পরে? তার পরে কী। শুধু এই আমি, আর কিছুই না! এত দিনের নিষ্ঠুর দুঃখ কি এতেই ভরবে? শুধু আমি? কিসের জন্য এত দীর্ঘ, এত দুর্গম পথ! শেষ কোথায় এর! শুধু এই আমাতে!'' অথচ গানের প্রতিটি পংক্তি জানিয়ে দেয় যে তার অনুভূতি এর চেয়ে অনেক বড়ো, অনেক গভীর। সেই জন্যে বোধ হয় আরো কয়েক বছর পরে রচিত নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা থেকে গানটিকে বাদ দেওয়া হয়েছিল :

পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে!
এত কামনা, এত সাধনা কোথায় মেশে।।
ঢেউ ওঠে পড়ে কাঁদার, সম্মুখে ঘন আঁধার,
পার আছে কোন্ দেশে।।
আজ ভাবি মনে মনে   মরীচিকা-অন্বেষণে
বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই।   মনে ভয় লাগে সেই —
হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে।।

এ পথ জীবনেরই পথ, কিন্তু জীবনমাত্রের নয়, উদ্দেশ্যবিহীন, ক্ষণবিলাসী, প্রাত্যহিকতার স্রোতে-ভেসে যাওয়া জীবনের পথ নয়। যে-পথের শেষ কোথাও নেই বলে রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যাকুলতা ও নৈরাশ্যের উদয় হয়েছে এ গানে, তা নিশ্চয়ই পরমের দিকে এগুবার পথ, পরমেশ্বরকে পাওয়ার পথ। এই পথে চলাকে মরীচিকা-অন্বেষণের সঙ্গে তুলনা করার অর্থ কি এই যে রবীন্দ্রনাথের মনে ব্যথিত ব্যাকুল সন্দেহ জেগেছে হয়তো ঈশ্বরকে ভুল পথে সন্ধান করেছেন এতদিন; নাকি ভয়ের কারণ আরো গভীর? ভুল পথে চলেছে বুঝতে পারলে মানুষ ঠিক পথের সন্ধান পেতেও পারে একদিন। কিন্তু সে যদি ক্রমশ উপলব্ধি করে যে সব পথই ভুল পথ তখন তার কি দশা হবে? সে কী গতিশক্তি হারিয়ে বসে পড়বে পথের মাঝখানে, আর দেখবে তার হাল-ভাঙা পাল-ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে, তাকে পিছনে ফেলে?

''সম্মুখে ঘন আঁধার'', তাই কাতর প্রার্থনা — হয় তো বা বৈদিক প্রার্থনারই অনুরণন:

''আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।

... ...

স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চিরজীবন শূন্য খোঁজা —
যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে
আমায় দেখতে দাও।।''

যে-আলোর ক্ষীণতম আভাসটুকুও দেখা যাচ্ছে না, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা স্থাপন করে বলছেন ''যে মোর আলো''। কিন্তু সে আলো লুকিয়ে আছে তো রাতের পারে? খোঁজা কি কোনো দিন শেষ হবে, রাত্রি কি কখনো প্রভাত হবে? ''শূন্য খোঁজা'' — কী ভয়ানক তার দ্যোতনা। হতাশা কতদূর মর্মঘাতী হলে মানুষ বলতে পারে — খুঁজবার উপযুক্ত কোনো লক্ষ্যই খুঁজে পেলাম না, তাই শূন্যকেই খুঁজছি! এ খোঁজা যে শেষ হবে না শুধু তাই নয়, শেষ হবে এমন চিন্তাই আত্মবিখণ্ডিত (self-contradictory)।

এই ট্র্যাজিক উপলব্ধির সুন্দরতর প্রকাশ বর্ষার একটি গানে। গোড়াতেই আমরা অনুভব করি সেই আতঙ্ক যার বিষয় কোনো ঘটনা বা বস্তুবিশেষ নয়, বিষয় শূন্যতা, nothingness :

যায় দিন, শ্রাবণদিন যায়।
আঁধারিল মন মোর আশঙ্কায়,
মিলনের বৃথা প্রত্যাশায় মায়াবিনী এই সন্ধ্যা ছলিছে।।
আসন্ন নির্জন রাতি, হায় মম পথ-চাওয়া বাতি
ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে।

রাত্রি এখনও আসে নি, কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে সন্ধ্যার প্রদোষান্ধকার ইতিমধ্যেই গাঢ় হয়ে গেছে মেঘে বৃষ্টিতে। মিলনের কাল অবশ্য রাত্রি, কিন্তু সন্ধ্যার লগ্নেই বিরহিণী বুঝতে পেরেছে যে তার প্রত্যাশা বৃথা, মায়াবিনী সন্ধ্যার ছলনা মাত্র। কেমন করে বুঝল সে? সে কি সন্দেহ করছে যার সঙ্গে মিলনের জন্য সে আকুল সে শুধু অনুপস্থিত নয়, অবাস্তব, সেও সন্ধ্যারই ছলনা অথবা তারই প্রেম-বিহ্বল মনের অভিক্ষেপ (projection)? ''ব্যাকুলিছে'' ক্রিয়ার প্রয়োগ এখানে অভিনব, অপ্রত্যাশিত, এবং সেই কারণে এত মর্মস্পর্শী। রেডিওতে শুনেছি কোনো কোনো কণ্ঠশিল্পী সম্ভবত ব্যাপারটাকে সহজবোধ্য করে নেওয়ার জন্য গান করেন, ''মম পথ-চাওয়া বাতি/ব্যাকুলিছে শূন্যেরে কোন্ প্রশ্নে।'' ''শূন্যেরে''-কে ''শূন্যের'' বললে অর্থ যায় উল্টে এবং রসের বারো আনাই মাটি হয়। নির্জন ঘরে প্রতীক্ষমানা হতভাগিনীর হয়ে প্রদীপের কম্পমান শিখা প্রশ্ন করছে — সে কি আসবে না, সে কি বুঝবে না আমার ব্যথা? কিন্তু বাতিও জানে প্রশ্নটি কত অর্থহীন; এমন কেউ কোথাও নেই যার কাছে প্রশ্ন পৌঁছতে পারে, সাড়া পাওয়া তো অনেক দূরের কথা। প্রশ্ন শূন্যেই হারিয়ে যাবে। শূন্যকে ব্যাকুল করার চেষ্টার চেয়ে বৃথা এবং নিষ্করুণ আর কোন্ চেষ্টা হতে পারে?

নাকি কবির মনে এমন শিশুসুলভ অবাস্তব আশা জাগে যে প্রশ্নের ব্যাকুলতাই — যে-ব্যাকুলতা বৃষ্টিমুখরিত শ্রাবণ সন্ধ্যার পর থেকে তীব্রতর হতে থাকবে রাত্রির গভীরতার সঙ্গে — শূন্যের মধ্যে জাগিয়ে তুলবে অনন্ত প্রাণ মন হৃদয়, যে-হৃদয়ে এই ব্যাকুলতার সামান্যতম সংক্রাম লাগবে? অসম্ভব, এ অসম্ভব। তবে অসম্ভবের কাছে হার মানেন নি এক বিশ্ববিশ্রুত সেনানায়ক, বিশ্ববিশ্রুত কবিই বা পেছিয়ে থাকবেন কেন।

এই গানটি গীতবিতানে 'প্রকৃতি' পর্যায়ের গানের অন্তর্ভুক্ত; প্রেমের গান বললে পরিচয়টা আরো সঠিক হত। আমার কিন্তু ভাবতে ভালো লাগে গানটিকে ভক্তিরসের গান রূপে। বলা বাহুল্য যে-রবীন্দ্রনাথকে আমি নিবিড়ভাবে চিনি তাঁর মনের ভক্তি সাধুসন্তদের ভক্তির মতো বিশুদ্ধ বিমূর্ত, অনির্বাচ্য ভক্তি নয়, অত্যাশ্চর্য বচনে প্রকাশ পেয়েছে রসরূপে — যদিও ভক্তিরস নবরসের তালিকাভুক্ত নয়। ভক্তির শ্বাসরোধ ক'রে মাঝে মাঝে নেমে আসে যে-ঘনান্ধকার রাত্রি — dark night of the soul — তারি কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ এ গানে। তখন ভক্তের অন্তরের অন্ধকার আর বাইরের অন্ধকার একাকার হয়ে যায়:

নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত-আশা
ব্যথিতা যামিনী খোঁজে ভাষা—

মনে হয় মেঘ নয়, ঘন-নৈরাশ্যই ঢেকে দিয়েছে আকাশের সব তারা; নিরালোক যামিনী হারিয়েছে তার সব ভাষা।

দিকে দিকে কোথাও নাহি সাড়া,
ফিরে খ্যাপা হাওয়া গৃহছাড়া।

ভক্ত-প্রেমিকার খ্যাপামি ঘরের শান্ত হাওয়াকে খেপিয়ে গৃহছাড়া করেছে, কিন্তু ভক্তির ব্যাকুলতা কি দিগন্তব্যাপী শূন্যে কোনো সাড়া জাগাতে পারবে?

ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। প্রেমময় ভগবান খোঁজেন তাঁর মনের মতো ভক্তকে; পিপাসিত ভক্তি খোঁজে তার মনের মতো পাত্রকে। খোঁজার শেষ নেই, তবে পথে চলতে চলতে কিছু তো পায় পান্থজনেরা, নইলে অন্ধকার রাত্রিতে উপলবন্ধুর কণ্টকসমাকীর্ণ পথে ক্ষতবিক্ষত পায়ে চলবার শক্তি সে পাবে কোথা থেকে। যদি বলি এই কুড়িয়ে বা খুঁজে পাওয়ার মধ্যে আবিষ্কারের চেয়ে সৃষ্টির ভাগ কিছু কম নয়, তবে খুব ভুল বলা হয় না। প্রেমিক রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমাস্পদকে বলেছিলেন — ''অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা।'' ভক্ত কি ভগবানকে বলতে পারেন না — অর্ধেক সত্য তুমি, অর্ধেক আমারি রচনা? এই রচনার উৎস কিন্তু শিশুমন্য মানুষের বাসনা-পূরণ নয়, অন্তত রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের ক্ষেত্রে নয়। দশ হাজার বছর আগের মানুষের বা দশ বছর বয়সের বালকের মনের উপাদান দিয়ে আজকের দিনের সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে যাঁরা আরোহণ করেছেন তাঁদের মন বোঝার চেষ্টায় কতকটা বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি, কতকটা বিদ্বানী ছেলেমানুষী রয়েছে। পূর্বোক্ত 'অর্ধেক আমারি রচনার' উৎস খুঁজতে হবে কবি-মনের গভীর জ্বালাময় ব্যাকুলতায়। প্রেমের বেলা যেমন অর্ধেক সত্যের উপরই প্রেমিকের কল্পনা রঙ বোলাতে পারে, শূন্য ক্যানভাসের উপর নয়, ভক্তির বেলায়ও তেমনি মানবিক ও প্রাকৃতিক জগতের অভিজ্ঞতায় ঐশী গুণের আভাস না পেলে ভক্তের ব্যাকুলতা কিছুই রচনা করতে পারবে না। কিছু যদি উদঘাটিত না হয়, সবই মনগড়া হয়, তবে তেমন রচনার সঙ্গে আফিমখোরের দিবাস্বপ্নের

তফাৎ থাকবে না।

এ সব সত্য হলেও—যদি সত্য হয় — আলোচ্য গানের অনুভূতি ''নিবিড়-তমিস্র-বিলুপ্ত আশার''ই অনুভূতি। মনের ভিতরের ও ঘরের বাইরের অন্ধকার এমনই ঘন যে পথের শেষ কোথায় জানা তো দূরের কথা, পথের কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না কোনো দিকে; সন্ধ্যা মায়াবিনী, রাত্রি মমতাহীনা, আকাশ ''উষা-দিশা-হারা।''

''যায় দিন শ্রাবণ দিন যায়'' এবং ''পথের শেষ কোথায়'' গান দুটিতে যে অন্তিম নৈরাশ্য-বিষাদের ভাব ব্যক্ত হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানের ভাববর্ণালির প্রান্তবর্তী, প্রায় প্রান্তবহির্ভূত। গীতাঞ্জলি পর্বের যতগুলি দুঃখের গান আমরা পাই তার একটি দুটি বাদে সবগুলিই স্পেকট্রামের অন্য প্রান্তে অবস্থিত। সে দুঃখ অসীম পাথার পার হয়, সে দুঃখের তিমিরেই জ্বলে মঙ্গল আলোক, সে দুঃখের বেশ ধারণ করেই পরম প্রিয় নেমে আসেন ঊর্ধ্বলোক থেকে, দাঁড়ান দুঃখিনীর পাশে, সমস্ত ভয়ডর ভুলে গিয়ে এগিয়ে আসে প্রতীক্ষায় অধীর প্রণয়িনী, তাঁকে এই লৌহকঠিন বেশেই বুকে চেপে ধরে। ক্ষতবিক্ষত হয় তার কোমল বুক, কিন্তু সে কি প্রচণ্ড পুলক। আরো কঠিন আঘাত সইবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে তার জীবনের কম্পিত তারগুলি। এই প্রাণান্তিক যন্ত্রণা দিয়েই প্রাণোজ্জীবনী প্রেমসুধা পান করানো — এও সেই নিঠুর দরদীর এক খেয়াল, এক প্রকার আধ্যাত্মিক রতিরঙ্গ, যদিও দাম্পত্য মিলনের মধুর খেলার সঙ্গে এ কোনো মতে তুলনীয় নয়।

নয় এ মধুর খেলা—
তোমায় আমায় সারাজীবন সকাল-সন্ধ্যাবেলা
নয় এ মধুর খেলা।।
কতবার যে নিবল বাতি,
গর্জে এল ঝড়ের রাতি —
সংসারের এই দোলায় দিল সংশয়েরই ঠেলা।।
বারে বারে বাঁধ ভাঙিয়া বন্যা ছুটেছে।
দারুণ দিনে দিকে দিকে কান্না উঠেছে।
ওগো রুদ্র, দুঃখে সুখে
এই কথাটি বাজল বুকে —
তোমার প্রেমে আঘাত আছে, নাইকো অবহেলা ।।

''তোমার প্রেমে আঘাত আছে নাইকো অবহেলা'' — এই শেষের পংক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। হালের অভিজাত সাহিত্যিক পরিভাষায় যাকে বলে alienation, বিচ্ছিন্নতা-বোধ — এ তার বিপরীত-বোধ। শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ ''উদাসীন জগতের (তার মানেই জগদীশ্বরের, কারণ জগৎকে জগদীশ্বর থেকে ভিন্ন করে দেখা রবীন্দ্র-মানস বিরুদ্ধ) ভীষণ স্তব্ধতা''-র কথা বলবেন, বলেছিলেন কাদম্বরী দেবীর মৃত্যুর বছর চারেকের মধ্যে প্রকাশিত মানসী কাব্যেও। কিন্তু মধ্যপর্বে আঘাত যতই নিদারুণ হোক, তা অবহেলা নয়, অবহেলার চেয়ে অনেক বেশি বরণীয় ও সহনীয়। এমন আঘাতের মধ্যে জগদীশ্বরের বিশেষ একটি উদ্দেশ্য লুকানো রয়েছে, সে

উদ্দেশ্যের মধ্যে প্রেম নাতিপ্রচ্ছন্ন।

যদিও রবীন্দ্রনাথ বললেন এ খেলা মধুর নয়, তবু গানের পর গানে আমরা বুঝতে পারি যে দুঃখ দেওয়া-নেওয়ার খেলা সুখের খেলার চেয়ে কম মনোহর নয়। ''কুড়িয়ে আনা, ছড়িয়ে ফেলা, এই কি তোমার একই খেলা'' — এ ভাবখানা রবীন্দ্রসঙ্গীতে যেমন, তাঁর পূর্বসূরী মরমিয়াদের গানেও তেমনি সুন্দর ফুটেছে। কিন্তু ভগবানের এই লীলায় ভক্ত নিজেও সমান তালে যোগ দিয়েছে, পাল্টা জবাব দিচ্ছে প্রথাসম্মত লীলার ভাষাতেই কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সন্ত্রাসের বিহ্বলতা বোধ না করে, তার আশ্চর্য প্রকাশ আমার সেই প্রিয় গানে :

সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া,
কাঁদি কাঁদাই তোরে, ও মোর দরদিয়া।।
আছ হৃদয়-মাঝে
সেথা কতই ব্যথা বাজে,
ওগো এ কি তোমায় সাজে,
ও মোর দরদিয়া।।
এই দুয়ার-দেওয়া ঘরে
কভু আঁধার নাহি সরে,
তবু আছ তারি' পরে
ও মোর দরদিয়া।
সেথা আসন হয়নি পাতা
সেথা মালা হয়নি গাঁথা,
আমার লজ্জাতে হেঁট মাথা
ও মোর দরদিয়া।।

গানটি — বিশেষ করে গানের প্রথম দুটি কলি — শুনলে মনে হয় দাম্পত্য-প্রেমের গান। সে প্রেমের গভীরতা ও মাধুর্য যতই থাক, দিনানুদৈনিক সংসারযাত্রার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে দুটি একটির অভিঘাতে দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার স্বাতন্ত্র্য অনিবার্যত অল্পস্বল্প ক্ষুণ্ণ হওয়ার দরুণ মাঝে মাঝে তিক্ততা এসেই পড়ে। মানসপ্রিয়া বিয়াত্রিচের বেলা কাঁদাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টার সম্বৎসরের সঙ্গিনীর বেলা সে সম্ভাবনা একেবারে এড়িয়ে যাওয়া শক্ত। সে যাই হোক, গানটি কিন্তু গীতবিতানের ভক্তিপর্বে সন্নিবেশিত, ভক্তিগীতি রূপেই সাধারণত এবং সঙ্গত ভাবেই গাওয়া হয়। অথচ ভক্তের মুখে কি ভগবানকে বলা সাজে — কাঁদাই তোরে? ভক্ত নিজে কাঁদতে পারে হাজারো কারণে, সে কারণগুলি আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি, কিন্তু ভগবানকে সে কাঁদাবে তার এত বড় শক্তি বা মর্যাদা ঠিক ধারণা করতে পারি না। এত মানুষের যাবতীয় মানবিক দুর্বলতা, তার নৈতিক দুর্গতি, পদে পদে পদস্খলন, এমন কি প্রেমধর্মেও অধর্মাচরণ পরম প্রিয়ের দুঃখের কারণ হতে পারে, অন্তত এ কথা আমরা ভাবতে পারি।

অর্থাৎ আমি তোমার মনের মতনটি হতে পারি নি ব'লে তোমাকে দুঃখ দিই, কাঁদাই।

কাঁদিও কি অনুরূপ কারণে? ভগবান, তুমি যত বড়ই হও, যত ভালোই হও, ঠিক আমার মনের মতনটি তো নও, এই দুঃখেই কি আমি কাঁদি? তোমার সৃষ্টিতে এত জ্বালা যন্ত্রণা এত অনাচার, অবিচার, অত্যাচার কেন? তুমি কি পরম মঙ্গলবিধাতা নও? নাকি তোমার ক্রমবিবর্তনশীল সৃষ্টিতে মঙ্গলবিধান সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংকল্প আছে, পরিকল্পনা আছে কিন্তু কারয়িত্রী শক্তি সীমিত; তাই পদে পদে ছন্দপতন ঘটে, অশ্রুধারার বন্যা ছোটে? অর্থাৎ ভগবান যদি মঙ্গলময় প্রেমময় হন তবে তিনি সর্বশক্তিমান নন; আর যদি তাঁর শক্তি কোনো দিক থেকে সীমিত বা বিঘ্নিত না হয় তবে তিনি মানব ভাগ্যের প্রতি উদাসীন, তাঁর পতাকায় রয়েছে পদ্মের মাঝখানে বজ্র। সে বজ্র কখন কার মাথায় পড়ে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। প্রকৃতি চলে বিজ্ঞানগম্য নিয়মমত, কিন্তু মানুষের সুখ দুঃখ ঘটে মানবভাগ্য বিধাতার একান্ত খেয়াল-খুশিমত, কোনোই অর্থ বা তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না তার। কাঁদি বলতে যদি এই বোঝায় তবে কাঁদি-কাঁদাই শব্দদুটির ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সমাসবদ্ধ পদটাকে খুব স্বাভাবিক করে তোলে। নইলে এমন অর্থ যদি করি যে আমি কাঁদি তুমি অনেক দূরে অনেক উর্ধ্বে বলে, এবং তুমি কাঁদো আমি অনেক নীচ প্রবৃত্তিযুক্ত অথচ আত্মশোধনে নিশ্চেষ্ট কিংবা অক্ষম বলে, তাহলে, কাঁদি ও কাঁদাই-এর যুগলবন্দিতে ব্যাকরণ ক্ষুন্ন না হলেও ভাষার সুর কেটে যায়। ''কাঁদি কাঁদাই তোরে''? — এই স্পর্ধাই রবীন্দ্রনাথের ভক্তিগীতির বৈশিষ্ট্য। কত বিচিত্র ও কী অপরূপ এই স্পর্ধার প্রকাশ তাঁর গানে। আমার তো মনে হয় প্রধানত এই কারণেই তাঁর ভক্তিপর্বের ও প্রেমপর্বের গানের মাঝখানে কোনো স্পষ্ট সীমারেখা টানা যায় না। প্রেম অলক্ষ্যে উঠে গিয়ে মিলেছে ভক্তির সঙ্গে, ভক্তি অলক্ষ্যে নেমে এসে ঘর করছে প্রেমের সঙ্গে।

''সকল জনম ভরে'' গানের গোড়াটা যেমন আমাদের ভাবিয়ে তোলে ভক্তি পর্বের আর একটি গানের শেষে পৌঁছেও আমরা তেমনি চমকে উঠি:

> হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।
> বেদন-বাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে।।
> এই-যে আলোর আকুলতা, আমারি এ আপন কথা,
> উদাস হয়ে প্রাণে আমার আবার ফিরে আসে।।
> বাইরে তুমি নানা বেশে ফেরো নানান ছলে;
> জানি নে তো আমার মালা দিয়েছি কার গলে।
> আজ কী দেখি পরান-মাঝে, তোমার গলায় সব মালা যে—,
> সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে।
> সেই কথা আজ প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।।

শুরুতেই শুনি বেদনার বাঁশি, হৃদয়ের কথা উদাস হয়ে হৃদয়েই ফিরে আসছে। কিন্তু গানের অব্যর্থ গতি পূর্ণতম সার্থকতম মিলনের অভিমুখে। ঈশ্বরের প্রকাশ জগতে নানা বেশে, নানা ছলে — এটা খুবই পরিচিত কথা, রবীন্দ্র সাহিত্য-পাঠকের কাছে তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ আজীবন প্রকৃতিকে এবং মানুষকে ভালোবেসেছেন, গল্পে গানে কাব্যে চিত্রে এমন

কি প্রবন্ধেও তাদের গলায় মালা পরিয়েছেন, এটাও আমাদের অজানা নেই। সেই সব মালা শেষ অবধি ঈশ্বরের গলায় পৌঁচেছে — এত বড় সুখবর আর কী হতে পারে? কেবল খবর নয় পরোক্ষ জ্ঞান নয়, এ এক প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। এই চরম সার্থকতার মুহূর্তে কবি-প্রেমিক আমাদের স্তম্ভিত করে দিয়ে বলছেন — ঈশ্বরকে সম্বোধন করেই বলছেন — আমার দেওয়া সব মালা গলায় ধারণ করে তুমি ''শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে।'' কী বলতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ? কোনো রক্তমাংসের প্রিয়াকে বলা যায় বটে আমার সব ভালোবাসা বুকে ধারণ করে তুমি আমার সর্বনাশ করেছ। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ''তোমার চোখে দেখেছিলেম আমার সর্বনাশ''; কিন্তু মানবীকেই বলেছেন, দেবতাকে নয়। ভগবান যদি ভক্তের সব প্রেম ভক্তি আত্মনিবেদন গ্রহণ করেন এবং সে কথা প্রকাশ করেন অনন্ত আকাশে — তবে সেটা তো ভক্তের জীবনের পরিপূর্ণতা, সর্বনাশ হতে যাবে কেন?

অবশ্য মধ্যযুগীয় খৃষ্টান পাদ্রীদের মতো যাঁরা মনে করেন ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে অসেতুবন্ধ্য ব্যবধান, যাঁরা পরিবার-সংসার ছেড়ে প্রকৃতি ও সমাজের দিকে পিঠ ফিরিয়ে ঈশ্বর-সাধনা করেন, বহিরিন্দ্রিয় ও বাহ্যজ্ঞান এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বিশ্বপ্রেম প্রত্যাহৃত ক'রে একান্ত ভাবে অন্তর্মুখীন করেন তাঁদের যাবতীয় বোধ চিন্তা ও অনুভূতিকে, তাঁদের বেলা হয়তো ভাবা যায় যে সাধনা সফল হলেও অন্যদিক থেকে তাঁদের সর্বনাশ ঘটেছে; ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ''এ সুন্দর ভুবন''-কে হারাতে হয়েছে তাঁদের, তাঁরা ঈশ্বরকে সর্বনেশে এবং ঈশ্বরপ্রেমকে নেশা বললে বলতেও পারেন। অমিয় চক্রবর্তী প্রিয়াবিচ্ছেদের একটি অপূর্ব কবিতায় ''তার বদলে'' কী কী পাওয়া যায় তার সুন্দর ফিরিস্তি দিয়েছেন, বলেছেন ''একলা বুকে সবই মেলে।'' কিন্তু যে বুকে ঈশ্বরের বাস তাকে শূন্য করতে হয় না সেখানে জাগতিক সৌন্দর্যের স্থান সংকুলান করবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেমের সঙ্গে বিশ্বপ্রেমের ভেদ নেই কোথাও, বিরোধের তো প্রশ্নই ওঠে না; তিনি ''হৃদয়ের অসংখ্য অদৃশ্য পত্রপুট'' মেলে জগতকেও পান করেন, জগদীশ্বরকেও। তাঁর হাতে পরানো সব মালা যদি ঈশ্বরের গলায় পৌঁছে থাকে, তবে তাতে ক'রে এই অভূতপূর্ব সাধনায় সিদ্ধকাম ভক্তের সর্বনাশ ঘটবে আমরা এমন কথা ভাবতে পারি না।

অথবা এক দিক থেকে পারি হয় তো। ঐ যে উপান্ত পংক্তিতে বলা হয়েছে — ''সব নিয়ে শেষ ধরা দিলে গভীর সর্বনাশে'' — এখানে 'সব' শব্দটার উপর একটু স্বরাঘাত আছে। 'সব' মানে আক্ষরিক অর্থে সব, মায় আমাকে সুদ্ধ। আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, আমার ব্যক্তিস্বরূপ, সবই নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে তোমাতে যদি আমার এ প্রেম পৌঁছয় সার্থকতার মোহানায়। তখন বিন্দু যেমন সিন্ধুতে সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, কিছুই তার বাকি থাকে না, তেমনি করে আমার আমিত্বের সবটুকুই কি কেড়ে নেবে তুমি? এই সম্ভাবনা কবির চোখে সর্বনাশ বলে গণ্য হতেই পারে। প্রথমত, পূর্ব সাধকরা, যাঁরা পুরোপুরি মরমিয়া সাধক বা মিষ্টিক ছিলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো কাব্যসাধনা ও ঈশ্বরসাধনাকে পরস্পর-অবিচ্ছিন্ন করে তোলেন নি, তাঁরা অনেকেই ঠিক এই পরিণতির কথাই বলে গেছেন; উপরন্তু সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুবৎ আত্মবিলোপকেই তাঁদের একনিষ্ঠ সাধনার চরম লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু কবির কাছে তাঁর স্বকীয়তার

এবং অনন্য ব্যক্তিত্বের মূল্য অন্য কোনো মূল্য অপেক্ষা হেয় হতে পারে না। তিনি যে-ঈশ্বরপ্রেমে নিমজ্জিত হতে চান তার মধ্যে রয়েছে ''সারা জনম ভরে কাঁদি কাঁদাই তোরে''-র দ্বৈতসাধনা, রয়েছে সকাল-সন্ধ্যাবেলা সেই খেলা যা মধুর নয়, তবু তীব্র তার বেদানাবিদ্ধ সুখ। কবি অনেক দিতে পারেন কিন্তু সব দিতে পারেন না। ''আমার যে সব দিতে হবে'' যখন বলেন তখনও 'সব'-এর মধ্যে 'আমি' পড়ে না; বরঞ্চ কী কী দিতে হবে তার তালিকা শেষ করে গানের শেষে বলছেন :

আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার করে দেব তখন তারা আমার হবে—

স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই সব-দেওয়াতে 'আমি' নিজেকে রিক্ত ক'রে বিলীন ক'রে দিচ্ছে না, বরঞ্চ তার পরিণাম 'আমি'র পূর্ণতাই।

একটি সুপরিচিত গানে আছে —

তোমার অভিসারে যাব অগম-পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথা পায়ে।।

অভিসারে যাওয়ার জন্য পথের যাবতীয় কষ্ট অগ্রাহ্য ক'রে এগিয়ে চলার সংকল্প দ্বিধাহীন, তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোনই কারণ নেই। একটা 'কিন্তু' আছে তবু :

সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে —
মন সরে না যেতে, ফেলিলে এ কি দায়ে।।

সকলি — খ্যাতি কীর্তি ধনমান — নেবার পরও নিস্তার নেই, আমার আমিত্বও চাই তার। এই চূড়ান্ত আত্মদানের জন্য কোনো নারী-প্রেমিক প্রস্তুত নয়;

রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বর-প্রেমিকও দ্বিধাগ্রস্ত, মন সরে না অতদূর যেতে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো এমন বিশুদ্ধ ভক্তের কথাও শুনেছি যিনি নিজের ভক্তিরসের দ্বৈতভাব বোঝাবার জন্য বলেছিলেন, ''আমি চিনি খেতে চাই, চিনি হতে চাই না।'' বিশুদ্ধ ভক্তের মুখে একথা একটু চমকপ্রদ, কিন্তু কবিভক্তের মুখে এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, এটাই প্রত্যাশিত।

প্রেমের ব্যর্থতার বেদনা, বিরহ-বিচ্ছেদের বেদনা, প্রিয়তমার মৃত্যুশোক ইত্যাদি পরম্পরাগত ভাব রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে খুব বেশি জায়গা জোড়ে নি। হয় তো বা এ জাতীয় অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক দুঃখ প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁর স্বভাবের মধ্যেই কিছু প্রতিরোধ ছিল। তবু এমন গানের সংখ্যাও খুব কম নয় এবং কয়েকটি তার অসাধারণ রসোত্তীর্ণ। কিন্তু সেসব গান বিষয়ে ''তুমি কেমন করে গান করো হে গুণী, আমি অবাক্ হয়ে শুনি কেবল শুনি'' ছাড়া আর কিছু বলার নেই আমার।

প্রেমের গানে দুঃখ একটু নতুন রূপ ধারণ করেছে যে দু-একটি গানে, তারই কথা এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথমটি হল —

কিছুই তো হল না।
সেই সব — সেই সব — সেই হাহাকাররব,
সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা।।

কিছুতে মনের মাঝে শান্তি নাহি পাই,
কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।
ভালো তো গো বাসিলাম,
ভালোবাসা পাইলাম,
এখনো তো ভালোবাসি — তবুও কী নাই।।

যাকে ভালোবাসলাম তার কাছ থেকে ভালোবাসা পেলাম — দুর্লভ অভিজ্ঞতা; আরো দুর্ঘট যে সে ভালোবাসায় কোথাও ঘাটতি পড়েনি, একটুও চিড় ধরেনি, বছরের পর বছর (গানের ভাষা থেকে তো তাই মনে হয়) তা অক্ষয় অম্লান রয়েছে। এর চেয়ে অধিক পরিতৃপ্তি মানুষের তৃষিত জীবনে আর কী হতে পারে? তবু প্রেমিক কবি বলছেন — কথার উপর বেশ একটু জোর দিয়েই বলছেন — ''কিছুই তো হল না''; শোনাতে চাইছেন তাঁর হৃদয়ের সাহানা রাগিণী নয়, ''হাহাকার রব''। কোনো এক পারস্য কবি দুঃখ করেছিলেন:

সুখের সব সরঞ্জামই মজুদ, কিন্তু
বন্ধু কোথায়, বন্ধু বিনা আবার সুখ কী।

রবীন্দ্রনাথের গানে বন্ধু অত্যন্ত উপস্থিত, সম্ভবত বক্ষলগ্নই। এমন পরিপূর্ণ সুখের অবস্থায় এত তীব্র বিষাদ এবং ব্যর্থতার অনুভূতি একটু আশ্চর্য।

তবু আশ্চর্য নয়। প্রেমের পরিমিত অভিজ্ঞতায় প্রেমিক খুঁজছে অপরিমিত কিছু, অপার্থিব কিছু। যার মাধুরী জীবনের পাত্রে ধরা যাবে না, যাকে ধ্যানের ধন বললেও একটু বাড়িয়ে বলা হয় কারণ তা সম্পূর্ণ ধ্যেয় নয়, তাকেই সে খুঁজছে একটি সীমিত, সামান্য, রক্তমাংসের ক্ষুদ্র মানবিক বেষ্টনীতে। পুকুরের চৌহদ্দির মধ্যে অকূল সমুদ্র খোঁজা কেন? তবু মানুষ খোঁজে, অন্তত রোমাণ্টিক কবিরা খোঁজেন। কিছু যে পান না তা নয়, পুষ্করিণীও রত্নগর্ভা হতে পারে। কিন্তু চাওয়া পাওয়ার মাঝখানে ধু ধু করছে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, তাই অনিবার্যত তাঁরা ভাবেন ''কিছুই না পাইলাম''। একেই বলে রোম্যান্টিক অ্যাগনি। শিল্পীকে তো বটেই, সব সুকুমারহৃদয় এবং কল্পনাপ্রবণ মানুষকে এ ব্যর্থতাবোধ অল্পবিস্তর পীড়া দেয়। রবীন্দ্রনাথ এই দুর্নিবার হতাশার বেদনাকে আরো তীব্র করে তুলেছেন ঘরোয়া দাম্পত্য প্রেমের পটভূমিকার উপর তাকে চিত্রার্পিত ক'রে। সফল প্রেমের মধ্যেও এই রোমাণ্টিক্ অতৃপ্তির বেদনা ব্যক্ত হয়েছিল 'মানসী'র সুপরিচিত ''নিষ্ফল কামনা'' শীর্ষক কবিতাটিতে। গানের ক্ষুদ্র পরিসরে সুরের সাহায্যে তার প্রকাশ আরও রসঘন, ছড়িয়ে বাড়িয়ে বলার অবকাশ এখানে ছিল না।

অন্য যে প্রেমের গানের কথা বলতে যাচ্ছি তার দুঃখও প্রথম গানের মতই ভালোবাসা না পাওয়ার দুঃখ নয়, পাওয়ারই দুঃখ; এবং পাওয়ার পর তীব্র ঝংকারে বুকে বেজে ওঠে সে-দুঃখ যে মৃত্যুকে ডাকতে হয় সকল পরাজয়ের গ্লানি ঘুচিয়ে দেবার জন্য।

তুমি মোর পাও নাই পরিচয়।
তুমি যারে জান সে যে কেহ নয়, কেহ নয়।।
মালা দাও তারি গলে, শুকায় তা পলে পলে,
আলো তার ভয়ে ভয়ে রয় —
বায়ুপরশন নাহি সয়।।

এসো এসো দুঃখ, জ্বালো শিখা,
দাও ভালে অগ্নিময়ী টিকা।
মরণ আসুক চুপে পরমপ্রকাশরূপে,
সব আবরণ হোক লয় —
ঘুচুক সকল পরাজয়।।

এই গানটিকে পূর্ববর্তী গানের গীতি-নাটকীয় প্রত্যুত্তর ভাবা যেতে পারে। নায়কের দুঃখ — ''কিছুই না পাইলাম''। নায়িকার বিক্ষোভ — ''তুমি স্বর্গের পারিজাত চেয়েছিলে, তোমার বাড়ির আঙিনায় যে ভুঁইচাঁপা ফুটেছে তার দিকে ফিরেও তাকাওনি''। 'ঘুচুক সকল পরাজয়' — কিন্তু কিসের পরাজয়? কারো অকৃপণ করে জীবন পূরণ না হবার গ্লানি নয়; পরিত্যক্ত, অবহেলিত, অপমানিত হবার আত্মধিক্কার নয়। আক্ষেপ এই নয় যে রূপে গুণে ব্যক্তিত্বে কৃতিত্বে তুমি আমাকে ছোটো করে দেখেছ, আমার সব মূল্য তোমার চোখে ধরা দেয়নি। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টো। দুঃখ এই, পরাজয় এই, যে তুমি আমাকে রক্তমাংসের মানুষ, সামান্য মানুষ, ছোটো-বড়ো নানা দোষে ত্রুটিতে ভরা মানুষ রূপে দেখে ভালোবাসোনি। আমি সত্যিই যা তার পরিচয় পাও নি, তাকে দেখতেই চাওনি। আমি যা নই তাকেই দেখেছ স্বপ্নের ঘোরে, তোমার আপন মনের মোহ ও মাধুর্য মিশিয়ে গড়েছ এক প্রতিমা, তারি গলায় মালা দিয়েছ। সে মালা বৃথাই শুকায়, আমার গলায় পৌঁছায় না, পৌঁছলেও মানাতো না। ''আলো তার ভয়ে ভয়ে রয়'' — কবিতার ভাষা। খুব সম্ভব উল্টো করে বলা হয়েছে, অর্থাৎ সে মালাই আলোর ভয়ে দোদুল্যমান। যদি আলো পড়ত মুখের উপর। উদ্‌ঘাটিত হত আমার সত্য রূপ, আমার সত্য 'আমি', তবে কি সে মালা লজ্জা পেত না আমার গলায়? যে সত্যিকার 'কেহ নহে', মানসী প্রতিমা মাত্র, তার কাছেই আমি পরাজিত; এ পরাজয়ের দুঃখ আমি কাউকে বোঝাতে পারব না।

গানের নায়িকার দুঃখ 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকের নায়িকার দুঃখের সঙ্গে প্রতিতুলনীয়। অর্জুন-বিজয় অভিযানের প্রাথমিক সাফল্যের পর চিত্রাঙ্গদার বুকও পরাজয়ের তীব্র বেদনায় বেজে উঠেছিল, কিন্তু বিপরীত সে পরাজয়ের রূপ। অর্জুন প্রেমে পড়লেন তার অপরূপ দেহের; তার মনের অধিকতর ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের কোনো পরিচয় পান নি, পাওয়ার কোনো প্রয়োজনও বোধ করেন নি। ''তুমি মোর পাও নাই পরিচয়'' না বলে চিত্রাঙ্গদা যা বললো তাতে নৈরাশ্য অন্তিম ছিল না কিন্তু অভিমান আরো প্রখর ছিল এবং তিরস্কার মিশ্রিত:

সে আমি যে আমি নই, আমি নই —
হায় পার্থ হায়

……………………

শৌর্য্য বীর্য্য মহত্ত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পায়।

পূর্বোক্ত গানের ভগ্নহৃদয় নায়িকা ভাবছে আমার প্রাপ্য মালা পরিয়েছে তোমার মনগড়া প্রতিমার গলায়; চিত্রাঙ্গদার মনঃপীড়া এই যে তার প্রাপ্য ''প্রেমসঙ্গম'' কেড়ে নিয়েছে তার ''সতীন'', তার নিজের মনোমোহিনী দেহলাবণ্য। দুই বল্লভ-বিজয়িনী প্রেমিকাই সতীনের কাছে পরাজিত; সতীন নির্বস্তুক হলেও (একজনের সতীন একেবারেই অশরীরী, প্রেমিকের খেয়ালী মনের উপাদান দিয়ে গড়া; অন্যজনের সতীন নিজেরই অনিন্দ্য সুন্দর শরীর মাত্র, প্রেমিকের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাইরে সে মনোবিচ্ছিন্ন শরীরের অস্তিত্ব গৌরব যৎসামান্য) পরাজয়টা দুজনের বুকেই নিদারুণরূপে বাস্তবিক।

এ গানের ব্যঞ্জনার প্রচ্ছন্ন স্তরে অন্য এক আবছা ব্যাপক ইঙ্গিত জেগে ওঠে আমার মনে, অনুভূতিকে জিজ্ঞাসু ক'রে তোলে। স্বপ্নপ্রিয় রোমান্টিক কি কঠোর রিয়ালিস্ট হতে চাইছেন: তরুণ রোমান্টিকতার রঙিন আবেশ কি পীড়া দিচ্ছে রবীন্দ্রনাথকে? শুধু অপরিচিতা প্রিয়া নয়, সমগ্র বিশ্ব চরাচর তো একদিন তাঁকে বলবেই: ''তুমি মোর পাও নাই পরিচয়'', যত শুভ্র শুভ ও সুন্দর তুমি আমাকে ভাবছ তোমার নিজেরই ভাবের ঘোরে, আমি সত্যি তো তা নই। সেই দিনের পূর্বাভাস কি এই গানে? কঠিন দুঃখ যে-আলো বিকিরণ করবে তাতেই বিশ্বপ্রেমিক বিশ্বের সত্য পরিচয় পাবেন, তার সব আবরণ তখনই লয় হবে। জগতের কালো কঠিন বাস্তব রূপ স্পষ্ট করে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশকে, শেষ পর্বের কাব্যে। কিন্তু জগতের এই বজ্রপরিচয় তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত ও বিষণ্ণ করলেও জগৎ-বিমুখ করে নি কোনো অর্থেই।

''তুমি মোর পাও নাই পরিচয়'' এবং ''চিনিলে না আমারে কি'' — দুটি গানের শুধু প্রথম পংক্তি পড়লে মনে হতে পারে যে গান দুটির ভাব ও বিষয়বস্তু একই। কিন্তু মোটেই তা নয়। প্রথমটি মানবিক স্কেলে রচিত, দ্বিতীয়টির স্কেল শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বজাগতিক।

চিনিলে না, আমারে কি।
দীপহারা কোণে ছিনু অন্য মনে,
ফিরে গেলে কারেও না দেখি।।
দ্বারে এসে গেলে ভুলে— পরশনে দ্বার যেত খুলে,
মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি।।
ঝড়ের রাতে ছিনু প্রহর গণি।
হায় শুনি নাই তব রথের ধ্বনি।
গুরু গুরু গরজনে কাঁপি বক্ষ ধরিয়াছিনু চাপি,
আকাশে বিদ্যুৎবহ্নি অভিশাপ গেল লেখি।।

এই গানের সঙ্গে বরঞ্চ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা আছে কল্পনার 'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতার। অধীর প্রেমিক যাকে পৃথিবীময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে কাছে পেয়েও চিনতে পারল না, তাকেই জিজ্ঞাসা করল ''সে কোথায় সে কোথায়?'' এই না-চেনার লজ্জায় প্রতীক্ষমানা প্রেয়সীর হৃদয়ে যে-কথা তোলপাড় করছিল সে কথা কিছুতেই মুখে এল না — ''শ্রান্ত পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।'' চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান অনেক, তার বেদনা রবীন্দ্রনাথ অনেক গানে ও কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ব্যবধান যখন প্রায় কিছুই নেই ব্যাকুল পথিক যখন পৌঁছেছে তার গন্তব্যে, প্রেমিক যখন প্রিয়ার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন শেষ মুহূর্তে সামান্যতম

বাধাটা কেন যে পর্বতপ্রমাণ হয়ে ওঠে (''মোর ভাগ্যতরী এটুকু বাধায় গেল ঠেকি'') — কিছুই বোঝা যায় না। ওমর খৈয়াম একটি রুবাইতে বলেছেন — ''মদের পাত্র যখন ঠোঁটের কাছে তুলে ধরেছি ঠিক সেই মুহূর্তে পাত্রটি হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলে চুরমার করে দিলে। হে ঈশ্বর, বলতে নেই, তুমিও কিন্তু আমারই মতন মাতাল।'' 'রোগশয্যায়'-এর ৫ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথও ''বিধাতার প্রচণ্ড মত্ততার'' কথা বলবেন — যে-মত্ততা যোগ দিয়েছে ''বিশ্বের ভৈরবী চক্রে।'' কিন্তু কেন? বঞ্চিত মানুষের যন্ত্রণাকে আরো তীব্র আরো অসহনীয় ক'রে তুলবার জন্যই কি দেবতাদের মধ্যে চক্রান্ত চলছে আকাশে আকাশে, বিদ্যুৎলেখায় কি সেই নির্মম চক্রান্তের কথা নির্ঘোষিত?

মানুষের সাধনার পথে পৃথিবীর কখনো উদাসীন কখনো সচেতন প্রতিকূলতার ইঙ্গিত আরো ট্র্যাজিক আয়তন লাভ করেছে যে-গানে তারই আলোচনাতে দুঃখের গানের প্রসঙ্গটা শেষ করব। এই গানটিও রবীন্দ্রনাথের দুঃখকে ভাববর্ণালির সেই প্রান্তরেখায় নিয়ে যায় যার অভিব্যক্তি আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি ''যায় দিন শ্রাবণদিন যায়'' এবং ''পথের শেষ কোথায়''-তে।

ঝরঝর বরিষে বারিধারা।
হায় পথবাসী, হায় গতিহীন, হায় গৃহহারা।।
ফিরে বায়ু হাহাস্বরে,
ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে—
রজনী আঁধারা।।
অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে,
তিমিরদুকুলা রে।
নিবিড় নীরদ গগনে
গরগর গরজে সঘনে,
চঞ্চলচপলা চমকে— নাহি শশীতারা।।

ঝরঝর বৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বেশ কয়েকটি গানের পটভূমিকা রচনা করে। প্রায় সব কটিতে দেখা যায় গানগুলি মধুর রসের, বিষাদের ছায়া পড়লেও সে ছায়া অঘন এবং ঈষৎ রঙিন — ''আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে'', ''আজ আকাশের মনের কথা ঝরো ঝরো বাজে'', ''বাদল বাউল বাজায় রে একতারা—/ সারা বেলা ধরে ঝরো ঝরো ঝরো ধারা'' ইত্যাদি।

আলোচ্য গানে কিন্তু 'ঝরো ঝরো বারিধারা-র ভূমিকা সম্পূর্ণ বিপরীত। নিশ্চয়ই কোনো কঠিন দুর্মদ সাধনা গীতরচয়িতাকে কিংবা গীতির নায়ককে ঘরে থাকতে দেয় নি, পথে টেনে এনেছে; ঘরে ফেরা আর নয়, 'পথবাসী' শব্দটা জানিয়ে দেয় যে তার বাকি জীবন পথে পথেই কাটবে। পথ মানেই তো চলার পথ, চলতেই হবে তাকে, পথ যত দুর্গম হোক, গন্তব্য যতো দূরে থাক। এমন পথসর্বস্ব মানুষের গতিশক্তি যদি হারিয়ে যায় তবে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে? প্রথমে পংক্তিটি পূর্ব-অভ্যাসমত মধুর রসের খানিকটা প্রত্যাশা জাগায় আমাদের মনে, তাই দ্বিতীয় পংক্তিতে অকস্মাৎ ট্র্যাজিক সুর শুনে আমরা চমকে উঠি। ক্রমশ বুঝতে পারি

মুষলধারা বৃষ্টির সঙ্গে যোগ দিয়েছে উন্মত্ত বাতাস, উত্তাল নদী, বজ্রের গরগর হুংকার এবং পূর্ববর্তী গানের বিদ্যুৎবহ্নি। পঞ্চভূতের শক্তিমদমত্ত দেবতারা কি একজোট হয়ে কোনো হতভাগাকে ঘরছাড়া করে তার গতিশক্তি কেড়ে নিয়েছেন? মনে হয় বিশেষ কোনো বা কতিপয় মানুষের ভাগ্য নয়, সকল মানুষের এই নিদারুণ পরিস্থিতির কথা ভেবেই কবি ব্যাকুল হয়েছেন।

প্রথম দুটি পংক্তির অনভ্যস্ত বিন্যাস শ্রোতার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। কিন্তু এরপর থেকে একটু যেন শক্তিমান্দ্য ঘটেছে গানের ভাষায়। বিশেষত ''অধীরা যমুনা তরঙ্গ-আকুলা অকূলা রে, তিমির দুকুলা রে'' — এই পংক্তিটির লঘু চাল সমস্ত গানের গভীর গম্ভীর ব্যঞ্জনার সহযোগী নয়, অন্য কয়েকটি শব্দ এবং বাক্যও দুর্বল। আমার এই ধারণা সমর্থন লাভ করে ইংরেজি অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করলে। 'ফিরে বায়ু হাহাস্বরে/ডাকে কারে জনহীন অসীম প্রান্তরে'-র ব্যঞ্জনা-শক্তি কম নয়, তবু সে ব্যঞ্জনায় ক্ষীণ আশা অবশিষ্ট রয়েছে; — হয়তো একদিন ডাক শুনবে সে আজ যে আছে দর্শন-শ্রবণাতীত। কিন্তু 'The shrieks of the wind die away in sobs and sighs'-এর ঘন নৈরাশ্যে মৃত্যুশোকের ছায়া দেখা যায়। কে মারা গেল যার জন্য পৃথিবীময় এমন হাহাকার — কোনো মহাপুরুষ, নাকি কোনো মহৎ আদর্শ? ''রজনী আঁধারা''-র অনুবাদ করেছেন '' The night is hopeless like the eyes of the blind'। অসাধারণ লক্ষবেধী এই উপমা। যত ঘুটঘুটে অন্ধকারই কল্পনা করি না কেন, তা চক্ষুষ্মানের অভিজ্ঞতা পরিধির কাছাকাছিই থাকবে। জন্মান্ধের চোখের অন্ধকার তার চেয়ে অনেক গুণে ভয়ংকর এবং কোনো দিন সে অন্ধকার ঘুচবে বা কমবে, তার ক্ষীণতম সম্ভাবনা নেই। গানের শেষ বাক্যটি ''নাহি শশিতারা'' খুব বেশি কিছু বলে না; বর্ষার ঘন মেঘ আকাশের সব আলো ঢেকে দিয়েছে — এর চেয়ে পরিব্যাপ্ত অর্থ অনেকের মনে নাও জাগতে পারে। কিন্তু '' The lights of the stars are dead' পংক্তিটির মধ্যে জাগতিক প্রলয়ের ইঙ্গিত রয়েছে!

অনুবাদ কবিকৃত, তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে — ইংরেজি অনুবাদটি মূল বাংলার চেয়ে জোরদার হল কেমন করে? এটা তো সন্দেহাতীত যে বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রকাশশক্তি একেবারে ঐন্দ্রজালিক। এমন অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বিত ক্ষমতার অধিপতিকে কবিসম্রাট বলা যায় বই কি। পক্ষান্তরে, ইংরেজি ভাষার উপর রবীন্দ্রনাথের দখল সামান্যই ছিল, প্রতিভাবান কবি বলে সেই স্বল্পায়ত্ত ভাষাতেও তিনি বেশ কয়েকটি রসোত্তীর্ণ অনুবাদ-কবিতা লিখে গেছেন। কিন্তু প্রকাশ-শক্তিতে ইংরেজি অনুবাদ মূল বাংলাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, — এই আশ্চর্য কৃতিত্বের দৃষ্টান্ত আরোও দুটো চারটে খুঁজে বার করা যায়।

সমস্যাটি ছোটো হলেও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কৌতূহল জাগায়। আসলে আলোচ্য গান ও তার অনুবাদে তফাৎ এই নয় যে একই ভাবের প্রকাশ ইংরেজিতে জোরালো হয়েছে এবং বাংলায় মৃদু; তফাৎ ভাব এবং তার অনুভূতিমণ্ডলেই। বাংলা গানের ভাষায় রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবাবেগটি প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ করেননি তা খুব সম্ভব তাঁর মনের আনাচে-কানাচে আত্মগোপন করেছিল এতদিন; অনুবাদ করবার সময়ে চৈতন্যের

তলা থেকে ভেসে উঠে আসা আশ্চর্য নয়। সেই ঈষৎ অনভ্যস্ত ভাবের তীব্রতাকে তিনি ইংরেজি গদ্যছন্দে যথাযথ রূপ দিতে পেরেছেন। কিন্তু বাংলায় ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে গান হয়ে; সুরের খাতিরে ভাবকে খানিকটা করুণ কোমল করে নিতে হয়েছে, তার আগ্নেয় প্রচণ্ডতা খানিকটা উপশমিত করতে হয়েছে। 'আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছিলাম 'সানাই'-এর 'ব্যথিতা' কবিতাখানি গানে রূপান্তরিত হবার পথে তার রুদ্রতা হারিয়েছিল; ''ক্রূর বিধাতা'' ''ইতর বঞ্চনা'' জাতীয় শব্দগুলি গানে বর্জিত। প্রথম যৌবনে লেখা ''তবু মনে রেখ'' কবিতাটিরও গীতিরূপ ভাষার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত গতানুগতিক। বলতে পারেন, সুরের; বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সুরের, চাহিদা এবং তাগিদ এই মৃদুভাষিতা।

আমার মনে কিন্তু সন্দেহ থেকে যায় যে কবি রবীন্দ্রনাথ এবং গীতিরচয়িতা রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিস্বরূপ, বিশেষত অনুভূতির স্বরূপ খাপে খাপে মেলে না। অনেকটা মেলে অবশ্য এবং অনিবার্যতই (দুই রবীন্দ্রনাথ যখন মোটামুটি একই ব্যক্তি), তবু লক্ষ্য করবার মতো গরমিল পাওয়া যায় সমগ্রভাবে তাঁর গানের সঙ্গে কবিতার তুলনা করলে। রবীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতে শুরু করেন তখন তাঁর বয়স সত্তর পার হয়েছে। ঐ সময়কার কবিতায় তিনি রৌদ্র রাগিণীতে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তবে সহজ হয়নি সে দীক্ষা; তপস্যা করতে হয়েছিল এই নতুন রাগিণী আয়ত্ত করবার জন্য, এবং তপস্যা সত্ত্বেও সে-রাগিণী খুব বেশি শোনা যায় না তাঁর কণ্ঠে। শরৎকালের মাঠে যেমন আলোছায়ার খেলা, তেনি রুদ্র-মধুরের পালা-বদল দেখি রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের কাব্যে। চিত্রে দেখা যায় রুদ্রের প্রকাশ আরও বলিষ্ঠ, এবং অক্লেশে বেরিয়ে আসছে তাঁর তুলির মুখে; মনে হয় চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ স্বভাবগুণেই রুদ্রের মন্ত্রশিষ্য।

আরো একটু সাহস সঞ্চয় করে বলতে চাই যে আমার মতে সঙ্গীতকার রবীন্দ্রনাথ, কবি রবীন্দ্রনাথ, নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ, কথাসাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ, চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ, প্রবন্ধ লেখক ও ভাষণকার রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-বেদনা ঠিক একই ছাঁচে ঢালাই করা নয়। এই সব ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমের ভিতর দিয়ে ন্যূনাধিক ভিন্ন ভিন্ন রবীন্দ্রনাথকে আমরা পাই; তাঁদের মধ্যে আত্মীয়তা আছে কিন্তু তাদাত্ম্য (identity) নেই। শিল্পী বেছে নেন প্রকাশের মাধ্যম, আবার মাধ্যমের স্বধর্মও কতকটা নির্ধারিত করে প্রকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ। বাছাই ঢালাই পেটাই দুদিক থেকে চলে। হয়তো অনেক রবীন্দ্রপ্রেমিকই আমার এ মতে সায় দেবেন। তবে দুঃখের বিষয় যে শিল্পমাধ্যম-ভেদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতো বহু শিল্পদক্ষ ব্যক্তির ব্যক্তিস্বরূপ-ভেদের যথাযোগ্য আলোচনা হয়নি এ পর্যন্ত। কে এতো বড়ো কাজের দায়িত্ব নিতে পারবেন জানি না। সঙ্গীত সাহিত্য চিত্র—তিনটি শিল্পে তাঁর অল্পবিস্তর শিক্ষা সমঝদারিতা ও সংবেদনশীলতা থাকা চাই।

নাস্তি গহ্বরের মুখোমুখি দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা (encounter with nothingness) রবীন্দ্রনাথের হয়েছিল বলাতে কোনো এক শ্রদ্ধেয় লেখক বিস্মিত হয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন। অথচ এই অভিজ্ঞতার (dramatized) রূপ এমন সুন্দর সরল ভাষার ফুটিয়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথ 'বীথিকা'-র 'দুর্ভাগিনী' কবিতাটিতে যে সেখানে ভুল বুঝবার কোনো অবকাশই

নেই :

সব সান্ত্বনার শেষে সব পথ একেবারে
মিলেছে শূন্যের অন্ধকারে
....
সর্বশূন্যতার ধারে
জীবনের পোড়া ঘরে অবরুদ্ধ দ্বারে
দাও নাড়া;
ভিতরে কে দিবে সাড়া,
মূর্ছাতুর আঁধারের উঠিছে নিঃশ্বাসে।
ভাঙা বিশ্বে পড়ে আছে ভেঙে-পড়া বিপুল বিশ্বাস।

'রোগশয্যায়'-র ৭ এবং ৩৯ সংখ্যক কবিতায় দেখি এই নিদারুণ উপলব্ধির লিরিক আভাস। শেষ পর্বের আরো বেশ কয়েকটি কবিতায় তার কথা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে বলা আছে; এবং মধ্যপর্বে 'কল্পনা-র' প্রথম কবিতায়, উৎসর্গের ৩১ সংখ্যক কবিতায় ('আজিকে গহন কালিমা লেগেছে গগনে'') গদ্যের ভাষাটা আরো স্পষ্ট স্বভাবতই। চব্বিশ বছর বয়সে যে মৃত্যুশোকের বর্ণনা দিয়েছেন জীবনস্মৃতিতে তা ভুলতে পারেন না কোনো রবীন্দ্রপ্রেমিক। দীর্ঘ বর্ণনার এক জায়গায় পড়ি : মৃত্যু যখন মনের চারিদিকে হঠাৎ একটা 'নাই' অন্ধকারের বেড়া গাড়িয়া দিল, তখন সমস্ত মনপ্রাণ অহোরাত্র দুঃসাধ্য চেষ্টায় তাহারই ভিতর দিয়া কেবলই 'আছে'-আলোকের মধ্যে বাহির হইতে চাহিল। কিন্তু, সেই অন্ধকারকে অতিক্রম করিবার পথ অন্ধকারের মধ্যে যখন দেখা যায় না তখন তাহার মতো দুঃখ আর কী আছে। এ প্রচণ্ড সাক্ষাৎকার তত্ত্বকথা নয়, অভিজ্ঞতার ব্যাপার।

বলা বাহুল্য, এই ''নাই অন্ধকারের'' উপলব্ধি রবীন্দ্রসাহিত্যের শেষ কথা নয়, একমাত্র কথা তো নয়ই। পার আছে তার, কিন্তু ওপারে পৌঁছাবার জন্য এই গহ্বর পার হতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথকে একাধিকবার।

কৃত্তিবাস
বিংশতিবর্ষ
বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা ১৩৮০

বুদ্ধদেব বসু/রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও তাঁর গান : ভুমিকা

[কল্যাণীয়েষু,

সমরেন্দ্র, 'কবিতা'র আষাঢ়, ১৩৪৮-এর রবীন্দ্র-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের গান বিষয়ে আমার একটা লেখা বেরিয়েছিলো; সেটা তোমাকে পুনর্মুদ্রণের জন্য দেবো বলেছিলাম। কিন্তু লেখাটি প'ড়ে সেই ইচ্ছে তৎক্ষণাৎ নির্বাপিত হ'লো। বলার কিছু কথা আমার ছিলো না তা নয়, কিন্তু ঠিকমতো কিছুই বলতে পারিনি; আমার এখনকার ধারণায় সেটা ভদ্রলোকের পাতে দেবার যোগ্য নয়। অগত্যা, তার সারাংশটুকু ছেঁকে নিয়ে একেবারে নতুন ক'রে দু-চার পৃষ্ঠা লিখলাম। এ-লেখাটাও শোচনীয়ভাবে অপর্যাপ্ত, এর শিরোনামায় যে-সম্ভাবনা আছে তার একটি ভূমিকামাত্র বলা যায় একে; গত তিরিশ বছরে আমি রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে যা-কিছু নতুন অনুভব করেছি তা স্পর্শ করারও সময় হ'লো না। তবু, এর চেয়ে ভালো কিছু হাতে নেই ব'লে, এবং 'কৃত্তিবাসে'র প্রতি আমার শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ, এই ভগ্নাংশটুকুই তোমাকে পাঠালাম।—বু. ব.]

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনার মধ্যে তাঁর গানগুলি সবচেয়ে রাবীন্দ্রিক, তাঁর লিরিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ব্যঞ্জনা তাঁর গান। তাঁর কবিতাকে সব অর্ঘ্য নিবেদন ক'রেও মেনে নিতে হয় যে তিনি মাঝে-মাঝে — শেলির মতো, হুইটম্যানের মতো — উচ্ছ্বাসে ভেসে যান, বক্তব্যকে অতিক্রম ক'রেও চালনা করেন কবিতাকে। তাঁর সেই বাণীবিলাস গানের মধ্যে শমিত হয়েছিলো, তাঁর হৃদয় পেয়েছিলো এমন একটি নীড় যা যথেষ্ট এবং যথেষ্টর চেয়ে একটুও বেশি নয়, যার স্বল্প পরিসরে কোনো অতিরিক্তের জন্য স্থান নেই, এবং যা দাবি করে শুধু ঘনিষ্ঠতা, শুধু অন্তঃসার। সন্দেহ নেই, তাঁর কণ্ঠে সুর না-থাকলে কবিতায় তাঁর আরোহণরেখা এমন তুঙ্গ হ'তো না।

আমরা সকলেই জানি, সংগীতের পক্ষে ভাষা অপরিহার্য নয়। উত্তরভারতীয় রাগসংগীতে ভাষার ভূমিকা নগণ্য, য়োরোপীয় সংগীতের প্রধান ধারাটি যন্ত্রসমবায়ে ঐশ্বর্যবান। এবং এও আমরা সকলেই জানি যে বাংলা গান আবহমানভাবে ভাষানির্ভর ও কবিতায় আশ্রিত; বাংলা গানে যত ভিন্ন-ভিন্ন শ্রেণী উৎপন্ন হয়েছে — কীর্তন বাউল টপ্পা ভাটিয়ালি শ্যামাসংগীত — তাদের মধ্যে সামান্য লক্ষণ হ'লো কবিতার সঙ্গে সহযোগ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ কোনো প্রতিভার মধ্যে সুর এবং কাব্যের বিবাহ আর কখনো সাধিত হয়নি — হয়তো কোনো দেশেই না, আমাদের দেশে তো নিশ্চয়ই নয়।

কেননা, বাংলা গানের যা স্বাভাবিক প্রবণতা, তাকে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি পূর্ণতা দিয়েছেন যা তাঁর আগে অকল্পনীয় ছিলো, এবং তাঁর মৃত্যুর পরে যার প্রভাব ক্রমশ পরিবর্ধমান। এমনও বলা যায় যে তাঁর উত্তরসাধকদের জন্য কবিতায় যদি বা দু-একটি অবিস্মরণীয় গুপ্ত পথ ছিলো, গানে তিনি এক শতাব্দীর জন্য সব সম্ভাবনা নিঃশেষ ক'রে গিয়েছেন — তাঁর

প্রাচুর্য দিয়ে, বৈচিত্র্য দিয়ে, অফুরন্ত উদ্ভাবনা দিয়ে, আর সর্বোপরি তাঁর কাব্যের অমৃতস্পর্শ দিয়ে। এমন নয় যে অন্য কোনো কণ্ঠ শোনা যায়নি, কিন্তু তাদের অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে ওঠেনি নতুন কোনো ধারা যা ভবিষ্যতের দিকে জীবন্তভাবে উন্মুখ। বরং বাংলা গানের সাম্প্রতিক বন্ধ্যাত্বকে বিপুলভাবে বিজ্ঞাপিত করছে তথাকথিত 'আধুনিক' গান।

বিস্ময় এই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান — প্রতিটি না হোক দু-হাজারের উর্ধ্বসংখ্যার মধ্যে অন্তত এক হাজার গান — শতকরা-একশো পরিমাণে কবিতাও। কবিতা যা করতে পারে তা-ই তারা করে আমাদের জন্য — তাদের অপ্রসর সত্ত্বেও, তাদের 'উপাদানে'র ন্যূনতা সত্ত্বেও। এবং কবিতার মতোই তারা দুর্বোধ্যভাবে সুন্দর হ'তে পারে।

আমি পাঠকের আপত্তি শুনতে পাচ্ছি : 'রবীন্দ্রনাথের গান অপ্রশস্ত নয়, তাঁর সুরের মধ্যে যে-বিস্তার আছে তা কি ভোলা যায়?' ভোলা যায় না — তা আমিও মানি — তা ভুলে থাকা সম্ভবও নয় আজকের দিনে, যখন রেডিও থেকে, রেকর্ড থেকে, সহস্রাধিক শিক্ষার্থিনী বালিকার কণ্ঠ থেকে, পাড়ায়-পাড়ায় যে-কোনো 'ফাঙ্কশন'-এ লাউডস্পীকার থেকে, ধ্বনিত হচ্ছে অবিরাম 'রবীন্দ্র-সংগীত'—ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত ও পুনরাবৃত্ত। 'রবীন্দ্র-সংগীত' — যেমন আমরা বলি 'সনেট', 'নাটক', তেমনি একটা শ্রেণীবাচক অর্থ দাঁড়িয়েছে কথাটার : 'আমি ভাবছি রবীন্দ্রসংগীত লিখবো'— এ-রকম কথা শুনতে পাওয়াও এখন অসম্ভব নয়।

তবু : এমন এক সময় ছিলো যখন আমি ছাপার অক্ষরে পড়েছিলাম 'গীতাঞ্জলি', 'গীতালি', 'গীতিমাল্য', পড়েছিলাম 'গান' ও 'প্রবাহিণী' নামে দুটি কবিতার বই—হ্যাঁ, আমার কাছে কবিতাই ছিলো তারা, কেননা তখনও রবীন্দ্র-সংগীত ছিলো 'রবিবাবুর গান', বিশেষ একটি ক্ষুদ্র সমাজে সীমাবদ্ধ। পড়েছিলাম, পেয়েছিলাম, ভালোবেসেছিলাম—তাও আমি ভুলতে পারি না।

আজকের দিনেও যদি আমরা কখনো খুলে বসি রবীন্দ্রনাথের পুরোনো কোনো 'গানের বহি', নিবিষ্ট হই কোনো নীরব সময়ে 'গীতবিতানে', তাহ'লে—যদি না আমরা কবিতা বিষয়ে নিঃসাড় হই—তাহ'লে দেখবো সুর থেকে বিশ্লিষ্ট ক'রে নিলেও এই কবি-সংগীত নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে—শুধু ভাবনার গৌরবে নয়, কাব্যকলার নমুনা হিশেবেও। সেদিক থেকে লক্ষিত ও আলোচিত হবার অধিকারী তারা, অন্তত এই কথাটি, —যতই না আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরকে অবিচ্ছেদ্য ব'লে ভাবি—কারোরই স্বীকার না-ক'রে উপায় নেই।

প্রথমেই চোখে পড়ে রূপকল্প। একাধারে এত সরল, এত ঋজু, এত গভীর, এবং অল্প কয়েকটি পঙক্তির মধ্যে সুসম্পূর্ণ : এই সমন্বয় তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ-গুলিতেও অধিকবার ঘটেনি। অথচ, কারুকার্য বলতে যা বুঝি, 'মানসী' থেকে 'মহুয়া' পর্যন্ত যার শতবিচিত্র বিকিরণ আমাদের নিশ্বাস কেড়ে নিয়েছিলো—সে-সবের মধ্যে কিছু নেই যা তাঁর গানেও আমরা খুঁজে না পাবো। সবই আছে সেখানে : পয়ার ও ছড়ার ছন্দ, জোড়-মাত্রা ও বিজোড়-মাত্রা, মধ্যমিল অর্ধমিল স্বরানুপ্রাস অমিত্রাক্ষর, কথ্য ভাষার স্বচ্ছতা থেকে সংস্কৃতবহুল গাম্ভীর্য পর্যন্ত, এবং আছে নতুন একটি সামগ্রী—বাউল-ছন্দ, তাঁর 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায়ের সেই আবিষ্কার, যাকে রামপ্রসাদ ও লৌকিক কবিদের হাত থেকে ভ্রূণাবস্থায় তুলে নিয়ে তিনি নতুনভাবে সঞ্জাত করেছিলেন, পাঠ্য ছন্দের গণিতের মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রায় বেঁধে দিয়ে — এবং পরবর্তী বাংলা

কবিতায় যার ব্যবহার অন্য সব ছন্দের চেয়ে বিরল। নেই এমন কোনো ধ্বনি, ভঙ্গি, রশ্মি, এমন কোনো আলো-ছায়ার সম্পাত, এমন কোনো মীড় অথবা ঝংকার যা বাংলা ভাষার কাব্যছন্দে সম্ভবপর, অথচ রবীন্দ্রনাথের গানে যা ধরা পড়েনি। আর তবু : তাঁর গানের কারুকৃতি তেমন প্রবলভাবে আঘাত করে না আমাদের, যেমন করে আজ পর্যন্ত 'চিত্রা' অথবা 'কল্পনা'র কলাবৈদগ্ধ্য — এখানে নেই কোনো উদাত্ত তান, কোনো বিশাল পক্ষবিধূনন : বিনম্র, মৃদুভাষী, অর্ধাবগুণ্ঠিত, তাঁর গানগুলি যেন অলক্ষিতে স্পর্শ ক'রে যায় আমাদের, হৃদয়ের গভীরতম স্তরে ধীরে-ধীরে প্রবিষ্ট হয়, আমাদের সঙ্গ নেয় চিরকালের জন্য। রবীন্দ্রনাথের কোনো-না-কোনো কাব্যগ্রন্থ বিষয়ে এ-কথা বলা যায় যে আমরা সেটিকে 'উত্তীর্ণ' হয়েছি, অন্তত এ মুহূর্তে তা না-হ'লেও চলে আমাদের; কিন্তু তাঁর গান আমরা হারিয়ে ফেলি না কখনো, জীবনের যে-কোনো ঋতুতে, যে-কোনো বয়সে বা অবস্থায়, কোনো বিপরীত প্রয়াসে ব্যাপৃত হ'য়েও, রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের প্রয়োজন। 'আমার গান বাঙালিকে গাইতেই হবে' — তাঁর শেষ জীবনের এই ভবিষ্যৎবাণী দ্বিগুণ চৌগুণ সফল হয়েছে — শুধু গাইতে হচ্ছে তা নয়, শুধু শুনতে হচ্ছে তাও নয় — পড়তে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে, থামতে হচ্ছে নিত্য-নতুন রহস্যের সামনে। তত্ত্বকথা লুকিয়ে আছে তাঁর গানে, আছে মানুষীর জন্য, ঈশ্বরের জন্য প্রেম, আছে দেশপ্রেম, ঋতুরঙ্গ, ক্বচিৎ দু-একটা ঐতিহাসিক ঘটনাও — কিন্তু এই সবই মনে হয় যেন উপলক্ষ্য মাত্র, যা দ্রব হ'য়ে যায় এক নামহীন ও বিস্তীর্ণমাণ অনুভূতির মধ্যে — এবং সেই অর্থে আমরা একে 'বিশুদ্ধ' কবিতা বললে হয়তো ভুল করব না।

কৃত্তিবাস
বিংশতিবর্ষ
বিশেষ বৈশাখ সংখ্যা, ১৩৮০

কমলকুমার মজুমদার / রেখো মা দাসেরে মনে

মাধবায়ঃ রামকৃষ্ণায় নমঃ; এখন যাহা আমরা লিখিতে ভাবস্থ করি, তাহাই অব্যাভিচারিণী কৃতজ্ঞতাতে হউক, তাহা শুদ্ধতাতে হউক, যে এবং সুন্দর ভক্তিতে হউক, যে কোন সেয়ানা চমক না থাকে, এমন হইল মনস্কামনার; যে যাঁহার বিষয়তে এই পাট, তিনি নিশ্চিত হয়েন পুণ্যশ্লোক! আমাদের সমক্ষেতে, তদীয় আলেখ্য, বটে যে পত্রিকা মুদ্রিত, রহিয়াছে যাহা আমরা নির্নিমেষে প্রত্যক্ষিতেছি তাঁহাতে দিব্যত্ব যে এবং ঐ আমাদের দশের মনে জরিত হইবেক!

স্পর্শ স্পর্শ
আগুনের শাঁস
ঈশ্বরের শরীর।

ইহাটি টানা সুর বর্জ্জিয়া, ইহা আপ্লুত স্বরে, ইহা বুদ্ধি সুচিন্তিত কণ্ঠে, — পাঠক কবিতা পড়িবার — যে বিন্যাসেই উচ্চারিব একই নাটকীয়তার বৈপরীত্য (কনট্রাষ্টনহে) আমাদিগতে ছাইবেই! ইনি সেই যাঁহার অঙ্কুরিতকাল, ইহা নিজস্ব, হইতে আরাধ্য পরিণতি দেখিবার! প্রথমেতে নাটকীয়তা হইতে শান্ত অবস্থায় অর্থাৎ আর্ট লক্ষ্যে ধাবিত আছে (এখানে নাটকীয়তা বলিতে সাধারণ অর্থ)।

'আমি যে রচিবো কাব্য এ উদ্দেশ্য ছিল না স্রষ্টার।
এখানে, মানে যে এই বিষয় লইয়া যাহা 'মানুষ' নামক কবিতা।
তবু কাব্য রচিলাম। এ গর্ব বিদ্রোহ আমার।'

যে বিচার তাঁহারে চালিত করিয়াছে, ক্লান্তি, পরিণতি, ভাবনা তাহা রুখে নাই; নিজ সৌন্দর্য্য অনুভব তাঁহাতে বিদগ্ধ মতে, ধীরেতে সাড় আনিয়াছে। এখন যে সকল অনুভূতি তাঁহারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে তাহা হয় নিছক বাঙালিত্ব, যাঁহার স্নেহ — ঘুমন্ত কন্যার শিয়রে তিনি যাইলেন, ওষ্ঠ দংশিত হইল : 'ওকি জন্ম থেকেই মন্দ (১০১)' এমনিই, মায়া বাৎসল্য মমতা ভালবাসা ভক্তি যে মুখমণ্ডলে অনবরত তাথিয়া উঠিতে আছে!

ইহাতেই যে এবং মার্ব্বেলের সহিত, তাঁহার অনুরাগীদের বিশ্বাস ত বটেই, তুফান জিত্তাল খেলাতে তদীয় ললাটে স্বেদ বর্ত্তাইল, মার্ব্বেল নিজ খোঁজ হারাইয়া ইদানীং সুদারুণ ছটার মাংসল; কেননা 'তাঁহার অপরাজিতা পরিক্রমণ করা তুলসীমঞ্চ' হয় আপনার, অশ্বত্থ বড় স্নেহাস্পদ! উহাদের মনেতে, মানে, সাহিত্যেতে এই মানুষটি বুদ্ধদেব বসু শীষটান রহিবেন —! আঃ আমাদের আনুভূমিকত্বে সচন্দন ফুল সকল বর্ষিতে আছে। এমতঅভিমান অনেকেরই থাকে।

যে ইনি কি লিখিতেছেন, সেই বিষয় পরিষ্কার! এই মানুষটি হয়েন, এখন মানুষ একটি শব্দ, না কথা, না সংজ্ঞা, না আইডিয়া কি কহিব যে, যে কিছু অর্থান্তরে, তাহার যে মনোরম্যত্ব আছিল, তাহাই, ঐ নিপাট বাঙালিত্ব মানে বুদ্ধি ও শ্রদ্ধা যেখানে যে জাতির অন্য না, ইহাই উহাদের প্রতিভা '....মনের গাঢ়তর, সম্ভাব্য রূপে ভয়াবহতার অন্ধকারেও চোখের পলক পড়েনি মানুষের মোহহীন দৃষ্টি মেলে সে দেখেছে আসিসি-র সেণ্ট ফ্রান্সিস (১) অর্লীন্সের কুমারী জোন (২) দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণঠাকুর যে ধরণের চরিত্র, মানুষের মধ্যে মিরাকাল-এর মতো, যাঁদের দুর্ব্বোধ্যতার উপর দেবত্ব কি ডাইনিত্ব (একই কথা) আরোপ না

করে উপায় ছিল না, তাঁদের সম্পূর্ণরূপে একান্তরূপে মানুষ হিসাবে দেখা আজ আমাদের পক্ষে কঠিন নয় তাঁদের মনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল তাঁদের আপাতত অমানবিক চরিত্র, ধৈর্য্যশীল অন্বেষণ প্রয়োগে আমরা বুঝতে পারি মানুষের মধ্যে যাঁরা বড়ো, মানুষ বলেই, মানুষের হবার জন্যেই তাঁরা বড়ো। (হঠাৎ আ ঝ)

তিনি, বুদ্ধদেববাবু, এই মির‍্যাকাল, সরলতাকে, গূঢ় ধর্ম্ম বিশ্বাস লইয়া ঘর করিতে চাহিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহার উচ্চশ্রেণী মহৎ বংশে জন্মাইবার সুকৃতি নিশ্চয় বলিতে পারি; ইনি পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা জিলার মালখানগরস্থ সম্ভ্রান্ত অভিজাত ধার্ম্মিক কায়স্থ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বিশেষ কারণ ভরে, আরও মানিবার যে, মোহহীন, মন, অন্বেষণ শব্দগুলি কিবা অনৈসর্গিক রকমে তাঁহারে সতেজ করিয়াছে, এখানে মোহহীন শব্দটি হয় ভারী সূক্ষ্মতা; একাধারে সাধকের, অন্যদিকে তাহা ইতিহাস ক্রম — মানে এতাবৎ যে ভাবে দৃষ্টিভঙ্গী প্রচলিত আছে উহার ফের তাঁহাতে উপজিয়াছে!

ঐ সকল শব্দগুলি কোন নৈতিক, চলতি অর্থে, আদল আমাদের দেয় না, অথচ এমন এক উদ্‌ঘাটন আনিল যে আমরা নিজেরে, সকলেই, যাচাই করিতে অত্রাহি হইব। ঐ হয় তদীয় যন্ত্রণা যাহা শেষ অবধি তিলেক সংস্কারে! আইসে না; এতই যে কি, অনিত্য সামান্যতম পার্থিব কষ্টতেও ঐ হিরোইক ব্রাহ্মণ্য বুঝিয়া থাকি প্রসারিয়াছে, যখন তিনি অভিশাপিয়াছেন :

'কালের কুটিল গতি গর্ভবতী করিবে কঙ্কালে'।

এখানে ঘোর অভিসম্পাত, রুদ্রও বটেই, যাহাতে আমাদের দৃষ্টি বিদ্রাবিত হইল এবং অনুপ্রাস বুঝিতেই দিবে না! এই ম্যাকৌওবার চাপ আমাদিগে আতান্তরে নিক্ষেপিল; আরিঃবাস! সেই গল্প, যাহারে কুকুরে কামড়ায়াছিল, তাহার খবর লইতে সূত্রে বৌদি কহিলেন, বাঃ কামড়াইবার পর সে দারুণ ভীষণ স্বাস্থ্যবান হইয়াছে, চাকরীর অভাব হইবে না। ইস কি ভৌতিক! অনেক অংশে ত্রৈলোক্যবাবুর মতই তাজ্জব!

সেই দিবস, ঐ মানুষেরে তাঁহার দক্ষিণ ঘরে শায়িত দেখি; হায় এরূপ বিশ্বস্ত অভিব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমের কোথাও নাই! নিঃশব্দে ও নিঃশব্দে বড় এক মহিমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে! আমরা সকলেই মীনবৎ, আমাদের আজ নাই, আমাদের কল্য নাই! কি অলৌকিক পরিচিতিতে অনুপস্থিত তিনি রহিয়াছেন কিন্তু! যাহাতে আমাদের মধ্যে সিঞ্চিড়ে উপজিল এবং তাঁহার সেই, সকলে কর্ত্তৃক অতি দেখা, নিকোটিন'এ তামাটে সমুজ্জ্বল তর্জ্জনীটি — কি ভল যে আমরা খুবই নিম্ন স্বরে আপনাকে প্রকাশিতে পারি — নেহারিতে উদ্বেলিয়াছি, যে খানি হয় সম্প্রতি অসহ্য ফুল সকলের মধ্যে, কোথাও স্থানে নির্ঘাৎ আছে! ঐটি এতদিন, সকলেই সাক্ষাতিয়াছে, সনাক্তে দিকনির্ণয়ে তারতম্যে বৈপরীত্য আদি রকমারি মীমাংসাতে তৎপর আছিল।

১। সেন্ট ফ্রান্সিস (১১৮২-১২২৬) এক মহাপুরুষ, ফ্রানসিক্যান সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক!

২। জিন দ্য-আর্ক ১৪১২ দ্যমর‍্যমী'তে (ফ্রান্সের) জন্ম ১৪৩১ ভিয়েনার্সে'তে ডাইনি ভাবিয়া এই কুমারীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়; কারণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধে ইনি ভগবতাদ্দিষ্ট রণাঙ্গণে যান। ভোলতের-এর ল্য সিয়েক্যল দ্য লুই ১৪—পৃ ৫৪তে আছে। জেরাবদ্যা বলেন, '....জিন দ্য আর্ক ইংরাজ বিরুদ্ধেই ফরাসীদের এক জাতিতে পরিণত করেন....' অতএব, সাধারণ জীব হইলেন।

বকুল বাগানের রাস্তা ধরিয়া যখন আসিতাম, প্রত্যহই একজনেরে নিবিষ্টচেতা প্রত্যক্ষিয়াছি, যিনি লিখিতে আছেন; অবশ্য সেই সময়েতে, যুবা বয়সেই, ঐ তিনি নামজাদা কবি! জাঁদরেল উজান ঠেলিয়া তাঁহারে চলিতে হইতেছিল! অদ্যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরকাল যাবৎ তিনি বঙ্গীয় সংস্কৃতির কারণে আপনারে নিঙ্গড়াইয়া বটে নির্ভীক করিয়াছিলেন, '....আমাদের রাষ্ট্রিক দাসত্বের জন্যই আমাদের সাহিত্য এখনো তার পুরা মূল্য পাচ্ছে না সে জন্য অভিমান করে লাভ নেই। আমাদের সৃষ্টির স্রোত বয়ে চলুক, যদি তার মধ্যে কোন সত্য থাকে তাহলে একদিন পৃথিবীর লোক আমাদের সাহিত্য পড়বার জন্যই আমাদের ভাষা শিখবে এবং বিজাতিকে পড়বার জন্য অনুবাদ করবে।' (স্বদেশ ও স /৯৩)

ঈদৃশ উক্তিতে 'সত্য থাকে' পদটি বুঝিবার, আমরা নিজে বুদ্ধদেব স্কলার নহি, যাহারা আমরা তদীয় লেখা পাঠ করিয়াছি মাত্র, আমাদের ভাবনাও আলগা, এমন অনেকেই আছেন, তাঁহারা, নিশ্চিত আমাদের ইহাই অবহিত দিবেন যে তাঁহার ধ্রুবজ্ঞান কি ছিল — শুধু যে কবিতাতে এমত না, গল্প উপন্যাস প্রবন্ধ ও শিশুগল্প — শেষের বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন : 'গল্পগুলো আবার পড়ে ধারণা হলো যে আমার বড়োদের আর ছোটদের লেখা মূলত ভিন্ন নয় একই ভাব একই চিন্তা, কখনো কখনো একই মেজাজ দুয়ের মধ্যে দিয়ে প্রকাশের জন্য প্রয়াসী....' এই সূত্রে দেখা যায়, কোনও পাশ্চাত্য লেখকও বলেন : ! '.....তদ্ব্যতীত, শিশুদের জন্য লেখা হইতে বড়দের নিমিত্ত লেখাতে খুব একটা বিশেষত্ব থাকা হইল নিরর্থক, যাহা শিশুদের উজ্জীবিত করিবে তাহা বালখিল্য পুস্তক নহে....।'

সত্যবাচক অন্বেষণ এই ধ্রুবজ্ঞান সংজ্ঞা বিশদিলে আমাদের দেখা হইবে এবম্প্রকার যে, তাঁহার আদত উপাখ্যান কি ছিল, সমাজ বলিতে সত্যই কি তিনি বুঝিতেন, বৃষ্টি কথাতে তাঁহার কিবা অনুভূতি আছে, কিম্বা ভালবাসা কি, অথবা বৃক্ষরাজি শুধুই কালিদাস-সুরই এমনই! এখন উল্লেখ্য যে প্রতিটি কবির এবং উপন্যাসকারের, তাহার নিজস্ব জাগরণ, প্রচলিত শব্দসমূহ হইতে আর একভাবে আইসে — প্রথমে তাহা একা আসিতে পারে না, সুললিত পদবন্ধে, যেমন আমরা পছন্দসই অন্যের উদ্ধৃতি গ্রহণ করি, ক্রমে এবং কালে তাহার শুধু একটি শব্দতে ঠেকে, ভর করে, ঐ অভিধা নিজেই বিচিত্রতা লাভ করে!

আঃ! কী মারাত্মক সংগ্রাম, এক শব্দকে কালিদাস, বৈষ্ণব কবি ভরতচন্দ্র হইতে বাছিয়া লওয়া শতধৌত করত, স্বীয় বুদ্ধিকে চরমে লইয়া, সাধনমার্গে যেরূপ, তাহারে স্বকীয় মানে রক্তস্পন্দন সম্পর্কে আনয়নে : কীদৃশী ধৈর্য্য তাহাতে আমরা দেখি!

এতদ্ব্যতীত উপাখ্যান মানে সমাজ — ইহা ১৮ শতাব্দীর পাশ্চাত্য লেখকদের মতিচ্ছন্ন সূত্র, যেখানে গৃহ হইতে চণ্ডীমণ্ডপকেই সব কিছু মানেই দলবদ্ধতা, তাহা একেবারেই নহে — ভাবিতে তাঁহার পন্থা কেমন হয়!

১॥ এখন বিদিতব্য ইহাও যে, আমরা সকল সময় বুদ্ধদেব বাবু বিষয়ে জিজ্ঞাসু রহিব, কিন্তু মান্যর বটেই, যে বুদ্ধদেববাবু বলিতে কল্লোল যুগ ও তদীয় সমসাময়িক লেখক, আধুনিকতা সম্পর্কে কৌতূহল সর্ব্বথাই পত্তনিয়াছি। আর যে, যে সময়ক্রম মান্য করা হয় নাই, হেতুবাদ যে বিতণ্ডা করিতেই যে উদ্দেশ্য এমত না।

২॥ যেমন নিজস্ব অভিজ্ঞতা ধারে বাস্তবতা নির্মাণে শব্দ সম্ভার রচনা হইল কবিদের অপরিহার্য্য, তেমনি আমাদের প্রতির নিকট বঙ্গ সাহিত্যের খেই বিশেষ গৌরবের, যাহা অতি প্রাচীন হইতে আছে, জ্ঞানগর্ভ মনের খবর থাকাই ভারী জোরের হয়; জানিয়াছি, যে

লেখকমাত্রকেই ঐতে তাহার আপন মর্য্যাদারূপ গঠন করিতেই হইবে, যদি না ঘটে তবে সেইজন তিলেক অগ্রসর হইতে পারিবে না।

বুদ্ধদেবের ন্যায় স্বনামধন্য যাহা প্রত্যক্ষ ভাবে কখনও পরোক্ষভাবেও বটে জানিতেন, তাঁহার সমসাময়িক অনেকের, মানে লেখক, মধ্যেই এই সৎ অ-দাস মনোভাব ছিল না, 'যে কোন ইংরেজ মাষ্টার মশাই যে কোন তৃতীয় শ্রেণীর ইংরেজ লেখক সম্বন্ধে আমাদের ভক্তি গদ গদ হতে এবং নিজের সাহিত্যকে অবজ্ঞা করতে শেখাতেন' পৃ ৯৭-স্ব ও স এবং ''ইংরেজি সাহিত্যের খবর খুব বেশি করে পৌঁছায় বলে কখনো-কখনো মাত্রা বোধ হারিয়ে ফেলি,একজন মাধ্যমিক ইংরেজ লেখকের সঙ্গে স্বদেশের বা অন্য দেশের একজন বড়ো লেখকের তুলনা করে বসি'' (৯৯) এমত বিশ্বাস সেই জোরেই অটুট যাহার বনিয়াদ আপনকার মধ্যেই আছে, তাহা হয় ভালবাসার সাধনা এবং ইহা হইতে গঠিত হয় তদীয় বিচার রীতি।

৩।। অন্বেষণ, সত্য থাকে, ১৯ শতাব্দী হইতে এই ভাবনা কেমন আছে তাহা কেরী, সংবাদ প্রভাকর, রেভঃ কৃষ্ণমোহনেতে এবং ভূদেববাবু হইতে শ্রীঅরবিন্দতে মানে বাঙালিত্ব হইতে হিন্দুত্বে! পূর্ব্বকীর্ত্তি স্মরণ ও বিচার বুদ্ধদেব বসুকে জানার একান্ত সাহায্যে লাগিবে; আমরা পর্য্যবেক্ষনিয়াছি, যে তিনি আপনকার, লেখার চরিত্র সকল যে জগতে সাঁদ করিয়াছিলেন, এবং সেই যোগ পরিবেশও, এই পরিবেশ মানে দেশের অবস্থা যারপরনাই অভিজাত বংশদেরই, হয় খুবই বজ্র যথার্থ রম্য সুষ্ঠ—আমরা-সাধারণ নির্দ্ধারণ করি উহা বৈ অন্য হয় না — কিন্তু তাঁহার মত আর কয়েকজনের উপস্থিতিতে স্বচ্ছ বুঝাইতেছিল যে তাহা সর্ব্বেব ঠাট্ হইয়া যাইতেছিল।

আমাদের এই সিদ্ধান্ত হয়, যে গত শতাব্দীতে সব কিছু গঠনের দিকে ভাবুকের মতি ছিল : ইতিহাস চাই, নারী চরিত্র চাই, লেখা কেমন হওয়া উচিত। অর্থাৎ সীতা সাবিত্রীতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই; আদর্শ জগতের গোড়াতে যে রমণী সেই রমণীকে লেখাতে জাগাইয়া দিতে হইবে।

ইতিপূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় দেশাচার, যাহা এতাবৎ নানারূপ লেখাতে প্রভাব বিস্তার করি, মিশাইয়াছিলেন যথা — লক্ষ্মণের ব্যাপারে যিনি সীতার চরণালঙ্কার ব্যতীত কিছুই সনাক্ত করিতে সক্ষম হয়েন নাই — সীতার সহিত মুখোমুখী বাক্যালাপ চিত্রদর্শনকালে, যে এবং রামচন্দ্র আপনারে চণ্ডাল কহিয়াছেন।

সূর্য্যমুখী যিনি বলিয়াছিলেন আমার গায়ে গা লাগিতেও বুঝিতে পার না অথচ তোমার গায়ে-লাগা হাওয়া যদি আমার গায়ে স্পর্শ করে আমি বুঝি (কথাটা রামচন্দ্রের, সীতার গাত্র স্পর্শিত বায়ু লইয়া আলোচনা) বটে ইহা উচ্চ জাতের, কিন্তু সমাজ যাহা এখানে উল্লেখের যে বীরাঙ্গনার অনেক ব্যঙ্গোক্তিতে দেখি, এবং তারার 'যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!' (সোমের প্রতি তারা) এইরূপে নারী চরিত্র আসিল।

কিন্তু রোহিণী মরিল না। প্রমীলার দম্ভে ও প্রফুল্ল দ্বারা মানে শরীরচর্চ্চায় এমনকি ত্রৈলোক্যবাবু 'বাঙাল নিধিরামে'র নারী চরিত্র বলেন, বাবার কোলে মাথা দেওয়া হয়েছে, অথবা হরিদাসের গুপ্ত কথা, কৃষ্ণভামিনী 'যদি আমি অসুখী হই' এবং চোখের বালিতে, যেখানে বিধবা রমণীর পত্রপাঠে গা গরম হইয়া উঠিল, (ইতিপূর্ব্বে গা-গরম পদটি মডেল ভগিনী'তে কদর্থ হয়) শরৎবাবুর বহু নারীচরিত্রও, অচলা, বিভিন্নতায় পরিস্ফুট হইল। (এমনকি মানিকবাবুতে পুতুল নাচের ইতিকথায় পরিলক্ষিত হয়।)

রাজা রামমোহন হইতে মধুসূদন বঙ্কিম যে এবং বিবেকানন্দ'র 'ভুলিও না তোমরা নারী জাতি' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কবিতা, নারীরে আপন ভাগ্য; শরৎবাবুর নারীর মূল্য, (অবশ্য শরৎবাবু মেয়েছেলেদের কলেজে যাওয়া পছন্দ করিতেন না।) অবশেষে নজরুলের 'দেখেছ কি তার প্রাণ অন্তরে তার মমতাজ নারী' সকলেই ভাবিতেছিলেন, আপন রীতিতে যে রমণীকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করা উচিত! — সমাজ ইতিহাসে দেখিব শিবনাথ শাস্ত্রী পর্য্যন্ত অনেকে প্রয়াসী হইয়াছেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের যে দিবস আরম্ভ হয়, সেই দিনকে, ঠাকুরও অনিমন্ত্রিত হয়েন! সেখানেতে অনেক ভদ্রমহিলাও আসিয়াছেন তদ্দর্শনে ঠাকুর উদ্যোক্তারে কহিলেন : 'ওগো বাবু শিবনাথ, এ যে দেখি চারা গাছ পুঁতেই ছাগল ছেড়ে দিয়েছে'।

কিন্তু, শৈবলিনী কোথায় গেল : প্রতাপ দর্শনে শৈবলিনী নখ পর্য্যন্ত কাঁপিতেছিল!

রমণী যাহাতে, কখনও কেন্দ্র, ক্রমে খুবই সূক্ষ্মভাবে এখানেতে, আধুনিকতাতে, এইভাবে গঠিত হইল যে, ডিটেকটিভ গল্পের নারী নহে, যাহা আমাদের পারিপার্শ্বিকতা হউক!

৪।। লেখার ভঙ্গী বা বস্তু আমরা দেখিয়া থাকি, বর্ত্তমানবৎ, বাস্তবতা নহে, লইয়া বেশ ব্যঙ্গ, যে এবং এই ধরণেতে লোকজন আবহাওয়া অত্যন্ত জীবন্ত! টেকচাঁদ কালীসিংহীতে ও ঈশ্বরগুপ্তে 'যে সকল বাঙালীর ইংলিস ফ্যাসান', এবং খবরের কাগজেতে; এহেন সমালোচনা টিট্রিকার দুই পক্ষের; ইংরাজ-পরিকরদিগের সিদ্ধান্ত যে, বাঙালী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ভূতপূজক; ইহাতে আমরা কিয়দংশ সজাগ হইলাম।

তামাসা হেতু রক্ষণশীলতা হইতেই দেশীয় ধারায় গভীর পর্য্যবেক্ষণ ক্ষমতা লভিয়াছি, এবং আশ্চর্য্যের যে হিন্দু যাহারা তাহারা নিজেদের ভুলভ্রান্তি বুজরুকি দেখিলেও, নব্যরা কিছুতেই নিজ ঘোর মুক্ত হইল না! এখন স্থূলভাবে ঐ বর্ত্তমানবৎ বা বর্তমানতা অবহিতি সাহিত্যে আসিয়াছে; এবং ভয়ঙ্কর সত্য ইশ্বরগুপ্ত লিখিলেন:

একদিকে কোশাকুশী আয়োজন নানা।
ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত
বুড়া পূজে ভূত নাথ ছোঁড়া পূজে ভূত।।

ইহা হইল তরাসে সত্য; নব্য আখ্যায় কিমবদন্তী হইতে আমাদের সোজা চোখের সমক্ষে বঙ্গীয় পরিবর্ত্তন বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যাতে.... 'ভরতচন্দ্রী ধরণ তাঁহার অনেক ছিল বটে....কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল কখনও যাহা বাঙ্গলা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙ্গলার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে : নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা এসকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকর প্রথম দেখায়, আজ শিখের যুদ্ধ, কাল পৌষ পার্ব্বন, আজ মিশনারি কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন' আমরা খবরের কাগজের কথা তুলিলাম না।

এই বর্ত্তমানবত্ত্ব বোধ (দীনবন্ধুর আর এক) নাটকে দারুণ খেলিয়া উঠিল; বিশেষত যেহেতু নাটক কোন চরিত্র লেখার বিশেষণগুলি অবশ্যই অন্য চরিত্র দ্বারা করা যায় — এবং তাহারই কার্য্যকলাপ বা কথাতে প্রকাশ হইয়া আরও তীক্ষ্ণ রূপে দেখা দিল : শ্লেষ, বিশুদ্ধ রসিকতা (বঙ্কিমবাবুর উক্তিতে) উদ্ভটতায় অর্দ্ধেন্দুবাবুর তামাসাকে ধরা যায়! কিছু ঘটিতেছে আমরা বাঙালীরা দেখি, কিছু সার আমরা মনেতে রাখিব!

৫।। এমনও সময় আসিয়াছিল যখন লেখার সমালোচনাতেও আইসে। যখন সব

উপন্যাসকে নাটক করার লক্ষ্য করা যায়, এমন কি বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ের* নাট্যরূপ লইয়া একটা ঠাট্টা আছে ....'সহরময় ড্রামাটাইজ'-এর ধূম লাগিয়া গেল দেবেন্দ্র সেনের 'জবাকুসুম' শীঘ্রই নাটকাকারে পরিণত হইবে, অনেকে এরূপ আশা করিতে লাগিলেন; এমনই সময়ে Gaiety theatre এই প্রহসন খানি অভিনয় করিয়াছিলেন। প্রহসনের এক দৃশ্যে নন্দী ভৃঙ্গী ও মহাদেব দর্শকগণের সমুখে উপস্থিত হইলেন।

মহাদেব অন্যান্য কথার পর নন্দীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নন্দী তোমরা নাকি একটা সখের থিয়েটার খুলিতেছ? মহাদেব গুরুলোক কাজেই নন্দী মাথা চুলকাইতে ২ বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। মহাদেব, তাই ত হে ভাল। তবে কি নাটক তোমরা অভিনয় করিতেছ? নন্দী, আজ্ঞে কোন নাটক এখনও আমরা পাই নাই, আমরা আপাতত বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ড্রামাটাইজ করিয়া অভিনয় করিব। মহাদেব, বটে ২ তা ভাল নন্দী তুমি কি পাট লইয়াছ? নন্দী, আজ্ঞে আমাকে উদ্ভিদের পাট অভিনয় করিতে হইবে। — দশ বৎসরের বাংলা সাহিত্য ২৪৯ পৃঃ

বর্ত্তমানবৎ বোধ, আমাদের রসিকতার বাসনাকে দারুণ ধারাল করিয়াছিল Did you ever see me in European clothes! I make passable tash Feringee 19/3/1849/L37....he writes Feringishly (L 81·Dt ?)

অমরত বসু'তে আছে, সাহেব বোনকে নিয়ে যাচ্ছ নিয়ে যাও আমরা লণ্ডনে গিয়ে সেনসেসন তুলব' অথবা...গ্লামর আছে ঐ মেয়েটির, তাই বিবাহ করতে চাও? সে ত দাদাভাই নৌরজীরও আছে তাকে বিয়ে কর না'।

নিজেদের মাপ করা হয় নাই, তেমন ইংরাজদের ইন্দ্রনারায়ণ বলিয়াছেন, সাহেব তুমি এপিক রচনা করিবে বলিয়াই আফগান যুদ্ধ হইতেছে(Sic); ইহা অতি কেতাদুরস্ত রসিকতা; আরও তেমন নহে তবু তদানীন্তন বাঙালীর পক্ষী কবিরা অত্যন্ত করিয়া নিজেদের বিচ্যুতি লইয়াই বাক্যশেলে বিদ্ধকরণে বড় সচকিত আছিল, যেমন অর্দ্ধেন্দুবাবুকৃত তামাসা ইংরাজদের করে।

৬।। পুনঃ, এই মীমাংসা সহজ হয় যে, দেশবাসীরা রাধাকান্ত দেব হইতে বঙ্কিম বিবেকানন্দ কেহই যাহা এড়াইতে প্রয়াস পান নাই এরূপ অনেকে ধারণা করেন: বিজাতীয় নব্যদের অবজ্ঞা বর হইল, তবে তাহারা রিফর্মড হিন্দু হন নাই, বরঞ্চ নূতন বিচার শিখাইলেন (যদিও আমরা চিরদিনই নৈয়ায়িক), ঈশ্বরের বৈসম্য দোষ! এবং সতীশ চক্রবর্ত্তীর লেখাতে আছে 'শিক্ষিত বাঙ্গালীরা হিউমের নিহিলিজম (এই নিহিলিজমের অর্থ আমরা বুঝিই না, ইহা তাত্ত্বিক বা রাজনৈতিক কোন্‌টি জানি না) ছেড়েই কম্‌তের পজিটিভিজমের কবলে পতিত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্ম্ম তো গীতার ব্যাখ্যা সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের মুখে আরোপিত পজেটিভেজম মাত্র!' অনেক বিষয়ে আমরা ভাবিলাম। (এখানে বলা ভাল আমাদের দেশে অগস্ত কোঁৎকে অনেকেই জড়বাদী বলিয়া নাস্তিকরূপে প্রত্যয়িত হয়েন, যাহাতে ঘাট হয়।)

তখন স্বভাবত এই তর্ক উপজিবে যে সকল, বৈখারী আছিল তাহা কতকখানি বস্তু নির্ণয়ে ও কি অংশ প্রকাশ গড়নেতে বর্ত্তাইল: কেন না এখন মধুসূদনের সর্ব্বত্র ব্যক্তিত্ব বিঘোষিত আছে। পয়ার হইতে ঐ আন্দোলন, একটি দুরন্ত সাংঘাতিক মুক্তি! যে সুবাদে আঙ্গিক লইয়া চিন্তার সূচনা পরিলক্ষিত হয়।

মধুসূদন দর্পভরে বিশ্বাস করিলেন যে I feel half tempted to use the words of Alfiery and say "nostre Divina Lingua" আমাদের ভাষা স্বর্গসুষমা এবং তৎসহ এই সাধনা ছিল যে কেমনে মানুষবৎ করা যায় — এখন তাঁহার পত্রে আছে সমালোচনা ক্ষেত্রে aesthetic storm would sink the ship of every dramatist in the world.

৭।। এখানে উল্লেখ্য মনুষ্যবৎ ইহা পাশ্চাত্য ১৮শ জর্ম্মন মতিত্ব। ফরাসীরাও তৎকালে মান্য করে একইভাবে। এখন এইক্ষেত্রে ইহা জানিতে হইবে যে মনুষ্যবৎ বলিতে আমরা কি বুঝি এতাবৎ। বর্ত্তমানবৎ এবং এখন মনুষ্যবৎ — মানুষ শব্দে তাহার অনুভূতি ও ব্যবহারিক জগৎ — তাহার সহজ বৃত্তি লইয়া পরিগণনার বিষয় হয় ঃ যদিও খুব বাজে হয় যদি বলি I shall embody my recollection of Bhoodeb's mother and my aunt into my next heroine (37-19/3/1849). আরও যে অভিনেতা বা অভিনেতৃ যদি পৌরাণিক চরিত্র করে তাহা হইলে নয়।

এই বিশ্বাস আর শক্তি আমাদের সাহিত্যকে কীদৃশী পন্থাতে আনিল; এই সম্পর্ক বঙ্কিমবাবুর মধ্যে ওই নৈসর্গিকতা, যদি অন্যায় না হয়, কোন চেহারা লইল, বঙ্কিমবাবুর ক্ষেত্রে নির্ঘাৎ বাস্তবতা! তিনি মানুষ চিত্র করেন, পাঠক এখন লক্ষ্যের যে বাস্তবতা ও বর্ত্তমানবৎ পৃথক সিদ্ধ হইবে, বর্ত্তমানবৎ নহে, যাহা অকাট্য প্রহেলিকার সত্য এক অন্ধকার, বঙ্কিমবাবুর এই ভাবনা বড় বিচিত্র! যেখানে কখনও একের সহিত অন্যের মীমাংসা হইতেছে!

অন্যদিকে কাব্যধারার আর এক বিরাট পরিবর্ত্তন আসিতে লাগিল ইহা কেশব সেন কথিত সুদারুণ মনোরমত্ব বুদ্ধির উৎপ্রেক্ষার পদবন্ধ যাহা ভগবৎ বিস্ময়ের!

ইহা ভগবান রামকৃষ্ণে কৃপাবশে, কেমনে উহা তাহা নববিধানের মতাবলম্বী বৈকুণ্ঠ সন্ন্যাল কর্ত্তৃক লেখা ১৮৮৫ প্রকাশিত 'কেশব চরিত' মধ্যে আছে, যে 'হিন্দু ধর্ম্মের শাখা প্রশাখার মধ্যে যে সকল আধ্যাত্মিক মধুর ভাব আছে তাহা বিধানবিশ্বাসীদিগের দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যে ধর্ম্ম এক সময় নিতান্ত কঠোর নীরস ছিল, এইরূপে তাহা সরস এবং অত্যন্ত সরল হইল। কোথায় বৈদান্তিক জ্ঞান বিচার আর কোথায় মাতার সঙ্গে শিশুর কথোপকথন আরাধনা প্রার্থনায় গ্রাম্য কথার চলন এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (১৩৩ পৃ) (পাঠক এখানে গ্রাম্য বলিতে 'কলিকাতার কথা' — কেন না ঠাকুর যে রকম ভাষা বলিতেন তাহা বাঁকুড়ার দিকেতে যেমনটি।) আর যে টেকচাঁদ ও কালী সিংহীর অপলাপ ইহাতে ঘটে না — কেন না ইহা তত্ত্ব কথাতে।

বুদ্ধদেব হইতে ইহার দূরত্ব, তৎবিষয়ক অভিজ্ঞতা, সময়ের দিক দিয়া বিশেষ, ফলে সমস্ত কিছু এই শতাব্দীতে অবয়বান্তর (metamorphosis) ঘটিল! ইতিমধ্যের যে মনুষ্যবৎ-এর নামে সমস্ত চিন্তাধারা : হিংসা, আত্মত্যাগ, প্রতিহিংসা, ধর্ম্ম, একান্নবর্ত্তী, বিলাতী শিক্ষা, সততা, সত্যের জয়, অনুতাপ, বৈরাগ্য, এবং যে লেখার সমালোচনায় মধ্যে, চিত্রাঙ্কন, ঘটনাচক্র, লিপিচাতুর্য্য, অস্বাভাবিক! শিক্ষার কিছুই নাই, ভাষার ছটা। ইত্যাদি আসিয়াছিল।

ইহার প্রথমেই আছে, কেশব সেনের বাচনিক অভিব্যক্তি, এবং তিনি ওই ধারার প্রবর্ত্তক, অনেকেই তবে তাহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই, তাহাতে আশ্চর্য্যের নাই; এইরূপ ঘটে, শুধু আমাদের দেশেই নহে সভ্য(!) দেশেও হইয়া আসিতেছে। মনুষ্যবৎ এখন মানুষও ঐ শেষোক্ত পদবন্ধ সকল একই যোগে এবং পৃথক ভাবে কিরূপ কাজ করিতেছিল, যেমন এই সূত্রে শিবনাথ শাস্ত্রী যখন লিখিলেন, মা হামলাইতেছিলেন!' যে এবং হামলাইতেছিলেন ক্রিয়ার

---

* ভিকতর আলফিয়েরী ইতালীর ট্র্যাজিক কবি (১৭৪৯-১৮০৩) মারি স্টুয়ার্ট, য়েরোপ, তিমেলিওঁ আদি গ্রন্থ আছে।

খেই রূপে তিনি গাভীর কথা বলিয়াছিলেন; যাহা না জানাইলেও বুঝিবার বাকী ছিল না। এইরূপ বহু আছে, তদীয়, বক্তৃতাতে মাঘোৎসব এবং অন্যত্রে কি ভাষায় কি মনোভাবে মানে মনোভাবের বর্ণনায়।

ক্রমে বাঙলা সাহিত্য বিশেষতে শরৎ বাবুতে রূপ পরিগ্রহ করিল। কল্লোলের আগে যে সকল পত্র পত্রিকা তাহা এমন কিছু রূপ আনে নাই, ভারতী, প্রবাসী বাদে ইহা আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত মত — কল্লোলেই আমরা আধুনিকতা দেখিলাম। এখানেতে আধুনিকশব্দটি নিজেই হইল তুফনিক, ইহা আমাদিগের লেখার হেতুবাদকে অসম্ভব নাড়া দিতে আছিল।

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক সন্তোষ ঘোষ মহাশয় (এখন 'অতএব' বলিয়া আরম্ভ করি না) — বলেন, কল্লোলের সঙ্গে তাঁর নাম উল্লেখিত হয় সে-টা নেহাতই সমসাময়িকতা বা একসিডেন্ট, এই আবহাওয়া তাঁর লেখকসত্তা-জাত কিন্তু ঐ মেজাজে লালিত নন' আমরা তাঁহার কথার অমান্য করিব না, জানি ইহা অতিবড় শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি, তবে সমসাময়িকতা বা একসিডেন্ট, ইহা লেখা ছিল।

এই যোগ, কল্লোল, তাঁহার জীবনে কম বড় কথা নয়; এইখানে আমরা দেখি অতি উগ্রতা হইতে অতি আধুনিকতার ছল সূত্র খালি যে সমাজকে ধাক্কা বা shock দিবার জন্য এমত মানা যায় না; 'শক' কথাটা সামাজিক ব্যাপারে খাটিত ইংরাজ লেখকের ধারণীতে আছে ও তৎপূর্ব্বে অন্য দেশে alarmer ব্যবহৃত হয় — কেমনে এক একজন সমস্ত আপন সম্প্রসারণকে সমন্বয়, হারমোনাইজ, করিতে সক্ষম বা হয়েন; একথা নির্ভুল যে বুদ্ধদেব তাঁহাদের মধ্যে অতীব নির্ভর করিতে পারা যায় এমন।

তাঁহার 'সরস্বতী প্রবন্ধ ও পরে তদীয় চিঠিতে বাংলাদেশের গৃহকোণে বাংলা রচনায় মন দিতে পারলেই ধন্য মানি জীবন' (৩।১২।৫২) নামের কাঙালপানা এমন সিদ্ধান্তে আসে না।

যেমন শরৎ বাবু লিখিয়াছেন, আমি আজন্মকাল সাহিত্য সেবা করে এসেছি যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়। এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে দেশের কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োগ করেছি। যথার্থ এই বোধেই আমাদিগের ধারণা বুদ্ধদেবের এহেন আত্মমর্য্যাদা ছিল। অতএব আধুনিকতা ক্রমশঃ উদ্ঘাটনের নামেই আসিল।

এই কর্ম্মে তিনি কখনই দোমনা নহেন প্রথমেই ইহা তাহার প্রবন্ধ পাঠে জানি, (হঠাৎ আলোর ঝলকানি) '....কবিতা লেখা হৃদয়াবেগের ব্যাপার যতটা, বুদ্ধিবৃত্তিরও ঠিক ততখানি। কারণ যতই আপনার মন আবেগে ভারাক্রান্ত হোক লেখার সময় আপনাকে নিবিষ্ট হতে হবে শব্দ যোজনায় এবং সেটা বুদ্ধিবৃত্তির কাজ।....স্মৃতি মানুষের বিরাট শক্তি...'(৩৫-৩৬ আ ক) ইত্যাকার রকমে জাগ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তিল, যাহার দ্বারা তিনি হারমোনাইজ করেন এবং এইটির বিষয়ও মানুষ যে তাহা এবং ইহাই আমরা প্রথমেই দর্শহিয়াছি। এখানে পাঠকবর্গদের আমরা সাবধান করিব মানবতা মনুষ্যত্ব যেসব বাজার চল রাজনৈতিক অভিধা আছে ইহা তাহা মোটেই নহে! এই মানুষ তাহাও নহে যাহা, যাহার রূপ, ছোটজাত একতারা বাদকদিগের কণ্ঠে শ্রুত হইয়া থাকে যাহারা মৎস্যেন্দ্র নাথ হইতে নানা সম্প্রদায়ের লোক।

আলগাভাবে নিশ্চয়ই ইহার বুনিয়াদ, সমন্বয় শব্দার্থের; পূর্ব্বাহ্নে গঠিতে আছিল; the Angio Saxon and the Hindu... আগাতেইজরিত হয় প্রত্যেকেই টপসির জন্য খেদ করিয়াছেন,

এই শতাব্দীতে যাঁহারা বিশ্বজগতের খবর রাখিতেন সেই সকলেই, কবি অজিত দত্তর

উক্তিতে যেমন প্রভু গুহঠাকুরতা, যেমন কিছু পূর্ব্বেতে ব্রজেন শীল ইত্যাদি অনেকে।

এখানে সমাজের (সমাজ শব্দটি রাজনীতিকারীদের দ্বারা অতীব পচিয়াছে) সহিত কোন রফা নাই, ইহারা এমন যে তখনকার সমাজকে রীতিনীতিকে পুরা শ্লেষ করিলেন না, তাহাতেই ব্যজস্তুতিই হয়, তাঁহারা পরিষ্কার তাহাকে বাদ দিলেন, যাহাতে কিছু সামান্যতম রেশ থাকিলেও, যেমন তাহা গণ্যের না, যেমন দেখা যায় আগেতে দেবী চৌধুরাণীতে মাষ্টার ঠাকুরের সমক্ষে ইহা পাঠ করিতেছিলেন '.....প্রফুল্ল যখন কৃষ্ণকে সব অর্পণ করিলেন তখন ভবানী কহিলেন, ঠিক তাহা হইলে কার্য্য অনাসক্ত হইবে না...ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে, অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহ রক্ষা করিবে। মাষ্টার, ঐটুকু পাটোয়ারী। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্যিলেন হাঁ এইটুকু পাটোয়ারী, ঐটুকু হিসাব বুদ্ধি, যে ভগবানকে চায়, সে একেবারে সঁপে দেয়, দেহরক্ষার জন্য এইটুকু থাকলো এসব হিসাব আসে না ''(কথামৃত ২য় ভাগ ২৫৫।২৫৮), এখানে আরও আছে পতিব্রতার ধর্ম্ম!

এই পাটোয়ারী আধুনিকরা বর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখানে জানান ভাল যে সংস্কার বশম্বদ কিছু প্রচলিত ভাব আসে, কখনই তাহা পাটোয়ারী নহে; লেখক আধুনিক কিন্তু চরিত্র আর এক — তবু উদ্ঘাটন প্রক্রিয়া, তখনকার এবং এখনও ধমনী সকলকে নাড়া দেয়। অবশ্য বুদ্ধদেববাবু কল্লোলের কথা লইয়া আলোচনায়, সামান্য উত্থাপনেতে, অত্যন্ত লাজুক — এখানে নৈতিকতা শব্দ অপাংক্তেয় — সাধক যেরূপ গোপনীয় তত্ত্বাদি বলিতে; কিন্তু দৃঢ়! তিনি বরাবরই অপরিমেয় সৎসাহসে আছিলেন, এখানেও নেহারি দশাসই '...তবু প্রথম যখন কল্লোলে আমার লেখা বেরোলো, তখন বিশেষভাবে সার্থক মনে হলো নিজেকে, তার কারণটা কী বলি। কল্লোলে যাদের লেখা পড়তুম গোকুলচন্দ্র নাগ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, নূতন নাম সব কিন্তু আমার মন তারের সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা......সেই কল্লোলে স্থান পাওয়া আমার পক্ষে অনিবার্য ছিলো, কল্লোলে প্রকাশিত হওয়া মানে নিজেকে আবিষ্কারের আনন্দ!....''

রামেন্দ্রসুন্দর, দিলীপ রায়, বিশেষত নলিনীগুপ্ত ইঁহাদের নিকট হইতে পাশ্চাত্যতত্ত্ব আমরা জানি মানে উপাদান পাই যেমন অজিত চক্রবর্ত্তী সুকুমার রায় অবধি — এমন অজস্র আমাদের পাশ্চাত্যের ভাবনার বিষয়ের, কাব্য ও আর্টের কথা জ্ঞাপনিয়াছেন, আমরা এতাবৎ ডারউইন গ্যেটে নাম শ্রুত আছি — এখন আরও এবং বেদম ধাক্কা আসিল রামেন্দ্রসুন্দর বের্গসন'এর, এলাঁ ভিতাল সম্পর্কে আলোচনা ও অনেক প্রবন্ধ লেখা হইল। ক্রমে ফ্রয়েড এবং তৎসহ অবচেতন!

পাঠক 'অবচেতন'এর বয়স অদ্য প্রায় পঞ্চাশেরও অধিক হইয়াছে! আমরা অবচেতনকে ক্রমে আর এক ইন্দ্রিয় বলিয়া মানিলাম, তত্ত্ব বৃত্তি নহে; ইহার কম্পন ত্বকগ্রাহ্য; আবার কেহ উহা পূর্ব্বজন্ম সংস্কারের পরিবর্ত্তে মানিয়া লইল; কেহ অনূঢ়া ও নবোঢ়া যুবতীর মধ্যেতেই আপন অধীর অবচেতন দেখিলেন।

আমাদের আজ মনে পড়ে, ইহা, এক এ্যাট-হোম'এর কথা, বহু গন্যমান্য স্ত্রীপুরুষ সমবেত; ইতিমধ্যে বিদেশ হইতে সদ্যপ্রত্যাগত কোন ছোকরা, এক রমণীকে স্তুতি করিলেন, আঃ মাই ডিয়ার আপনি হইলেন মদীয় অথৈ চেতনা! যতেক স্যার লেডীরা নিম্ন স্বরে ও! ও! প্রকাশিলেন।

ব্রজেনবাবুর অবজেকটিভ সমালোচনা বাস্তবতা dogmatic ইত্যাদি এবং কন্টিনেণ্টাল বিশ্লেষণ এখানে ছাপাইয়াছে, যাহা পাশ্চাত্য ঐখানেতে (১৮শ শতাব্দী) একজন বস্তুর রূপ সম্পর্কে বিশ্বাসী (পরে ১৯ শতাব্দীতেও) আর অন্যেদের বিশ্বাস, পারিপার্শ্বিকতা। একদল

ভবিষ্যতকে আজ্ঞাবহ করিতে চাহিল, অন্যপক্ষ মানুষকে জানিতেই আপনাকে নিয়োজিল।'

এই উক্তি যে ভদ্রমহিলার, তাঁহার মীমাংসা সাদা অন্তঃকরণে মানা যায় না, কেন না অন্তত ১৮ শতাব্দীর লেখকদের ব্যাপারে উহা তখনকার বিজ্ঞানের কথা — যেহেতু কানডিড (আদত নাম কান্‌দিদ য়ু'ল ওপতিমিজম) এখানে প্রচলিত লেইবনেৎসিয়ান আশাবাদকে জব্দ করা হইয়াছে।

সেখানে আর Humanise শব্দটা নাই — মনুষ্যবৎ হইতে ইহার অর্থ ভিন্ন ক্রমে রাজনৈতিক বা দার্শনিক — সোজা মানুষ। আমরা যাহাদের দ্বারা প্রভাবিত মুগ্ধ — তাহাদের মধ্যে মোপাসাঁর কীর্ত্তিকথাই অনেক। তাঁহার নির্ম্মাণ কৌশল হয় ভারী নির্ম্মম জৌলুষের : মাই ফাদার গ্রন্থে জাঁ হ্রনোয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যে তদীয় পিতার — বিখ্যাত শিল্পী অগস্ত পীয়ের হ্রনোয়া — সহিত মোপাসাঁর সাক্ষাৎ হইলেই পিতা কহিতেন, এই সেই যে অন্ধকার লইয়া লিখে। তাহাতে মোপাসাঁ উত্তর করিতেন, ইনি তিনি আলো যাঁহার বিষয়!

এই শুধু নহে পবিত্রবাবুর বুভুক্ষা, নীল পাখী, সত্যেন দত্তর নগুচীর পদ্য এইরূপ গোকুলবাবুর জাঁক্রিস্তফ এবং নানান বই্ নাটক বা উপন্যাসে এতাবৎ অবলম্বনে যাহাতে বাঙালী পাঠককুল তৈয়ারী হইয়াছে এবং ঐ সময়ে রমলা (মণীন্দ্র লাল বসু কৃত) — মনে হইল প্রভাতবাবু শরৎবাবুরে স্থূলভাবেই কিছুটা বাদ সাধিল — ক্রমে অ্যারিষ্টোক্রাসি, লেকরোড; পার্টি, দেখা দিল স্বর্ণময়ী দেবীর শিবনাথের anglo vernacular সমাজ এতদিন পরে আবার আসিতেছে; কালো মেয়ে হেরোইন ইহা একটি সাধারণ ব্যাপার (কালো মেয়ে ব্যাপারটি আমাদের মস্ত ছাড় রূপে লওয়া উচিত এখানে সাদাত এসথেটিকসের নিতান্ত প্রশ্নটি উঠিবে!) যে এবং এই সময় নিটশে'র superman,বাইওলজিকাল নিড ও বার্ণাড শ'র চাকচিক্য আমাদের ছাওয়াই ফেলিল, বিশেষতঃ বিবাহ হয় 'ইললিগাল প্রসটিটিউশন', এইকথা বেকনেও new atlantises ও আছে। আপ্তবাক্যটি বালজাকের উক্তির হেরফের করা যথা 'আঃ! অধুনা যে রূপ বিবাহ (দাম্পত্য) চলিয়াছে তদ্দর্শনে মনে হয় ইহা একটা আইন মাফিক বেশ্যাবৃত্তি — পৃঃ ৯১ লা ফাম দ্য তারাতঁ জা। আবার পরিলক্ষ্যের ঠাকুর বলিয়াছেন, লীলা প্রসঙ্গে আছে, 'একটা ফুল ফেলেই সেটা করলেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল — তার দোষ কেটে গেল! তৃতীয় খণ্ড ১৫ পৃঃ। এই সময় অজস্র পরিবর্ত্তন ঘটিল! কালে অবচেতন একটি নির্মোহ বিচার বলিতে সকলেই বাধ্য হইল, উহা বড় ডাগর যুক্তি।

অচিন্ত্যবাবু বলিয়াছেন, 'রজনী হ'ল উতলা আজকের তুলনায় অনেক ফিকে। এই 'ফিকে' শব্দটি আমাদের সায় নাই, তখনকার কালে তাঁহারা সকলেই বুদ্ধদেব ত বটেই লেখার আর্ট লইয়া চিন্তা যে পর্য্যন্ত করিয়াছেন তাহার তুলনা ইদানীং কালেতে নাই; উহার জন্য, গল্পটির, মনেতে অবসর চাই, নিশ্চয়ই ট্রামে বাসে পড়িবার নহে। একটি বিদ্রোহের রোক কখনই ফিকে হইতে পারে না — এই গল্পটিতে কলিকাতা তথা বঙ্গদেশে অস্বস্তি বোধ করে। আমাদের রক্ষণশীলতায় আঘাত লাগিল আমরা দাস, আমরা দরিদ্র, রক্ষণশীলতাই হয় একমাত্র অভিমান; মনুষ্য সমাজই এই! ইংরাজ সমাজ লেডী চ্যাটারলীজ ল্যভ সহিতে পারে না। অতএব নিরুপমবাবু ও সন্তোষবাবু স্মরিয়া যে এবং ইহাতে অধোবদন হইবার কিছু নাই।

তখনই সজনীবাবু পত্র হইতে দেখিব, '.....কবিতা ও বাক্যের যে প্রচলিত রীতি আমরা এতাবৎকাল দেখে আসছিলাম লেখাগুলি সেই রীতি অনুসরণ করে চলে না। কবিতা stanza

অক্ষরমাত্রা অথবা মিলের কোন বাঁধন মানে না। গল্প form সম্পূর্ণ আধুনিক, লেখার বাইরেকার চেহারা যেমন বাঁধা বাঁধন হারা, ভেতরের ভাবও তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। যৌনতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব অথবা ঐ ধরনের কিছু নিয়েই এগুলি লিখিত হচ্ছে। যারা লেখেন তারা continental literature এর দোহাই পাড়েন শ্রীযুক্ত নরেশ সেনগুপ্ত এই শ্রেণীর লেখকদের অগ্রণী, realistic নাম দিয়ে এগুলিকে সাহিত্যের একটা বিশেষ অঙ্গ বলে চালাবার চেষ্টা হচ্ছে।....'

ইহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছিলেন, '....আধুনিক সাহিত্য আমার চোখে পড়ে না। দৈবাৎ কখনো যেটুকু দেখি, দেখতে পাই হঠাৎ কলমের আব্রু ঘুচে গেছে, আমি সেটাকে সুশ্রী বলি এমন ভুল করো না, কেন করিনে তার সাহিত্যিক কারণ আছে, নৈতিকতা এস্থলে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। আলোচনা করতে হলে সাহিত্য ও আর্টের মূল তত্ত্বে নিয়ে পড়তে হবে।... ২৫।১১।১৩৩৩ এখন মন্তব্যের এই যে সজনীবাবু পরোক্ষে লেখার রীতিবিরুদ্ধতা স্বীকার করিলেন; আশ্চর্য্যের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের চিঠিতে কেন শুধু আব্রু ঘুচে গেছে, আর্টের মূল তত্ত্ব বলিলেন। (প্রশ্ন রজনী হল উতলা কি ১৯২৬-এ প্রকাশিত হয়!)

তাহারা, কল্লোল যুগ কি আর্টের মূল তত্ত্ব রমণী দেহ ও তাহার বিশেষ প্রত্যঙ্গকেই জানিত — আর খুলিয়া যে এবং ওই হেন বাস্তবতাই কি মানবের, সত্যেনবাবুতে সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা অবশ্য সজনীবাবুর চিঠিতে ইহা সমাজতত্ত্ব — কিম্বা তাহা নহে আর অন্য কিছু, এই দোরখা প্রশ্ন স্বতঃই আইসে।

অশ্লীলতা লইয়া দীর্ঘ আলোচনা হইতে পারে:ঠাকুর বলেন, শরীরের সকল অঙ্গই সমান তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে? এবং এখন আমরা শুধু কিছু পঙক্তি উদ্ধৃত করিব, মধুসূদন রাজনারায়ণকে, এখানে প্রকাশি, ইনি নীতিবাগীশ ব্রাহ্ম, লেখা পত্রে জানাইয়াছেন you censure the erotic character of some of the allusions 311 এবং যে....in the recent work you will see nothing in the shape of Erotic similes....not a single reference to the incestuous love of Radha. (চিঠি ৬৯) এই ইনশেসটুয়াস লাভ অফ রাধা লইয়া তর্ক এখন থাকুক; এই সময়তে, এক্ষেত্রে, জ্ঞাত করি যে, বিধর্ম্মীরা পঞ্চসতী লইয়া টিট্‌কিার দিতে আরম্ভিয়াছিল।

হিউমানাইজ বা মনুষ্যবৎ, পরম্পরা আমরা দেখি মানুষকেই মানে র‍্যাশানালাইজ করার কি বিকৃত চেহারা! এমনি 'বঙ্গের বিচিত্র কথা' ভ্রূণহত্যা; গোস্বামীর সাগর যাত্রা'তে incest! মডেলভগিনীতে খানসামার বডিস উন্মোচন; হরিদাসের গুপ্ত কথাতে কি পর্য্যন্ত কামাশক্ত; অজস্র গ্রন্থে হিন্দু ঘরের মেয়েদের কোর্টশিপ চুম্বন গর্ভদান আকছার; এমন কি শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিত এ্যাঙ্গলোভানাকুলার সমাজের কিস দেওয়া মানে চুম্বন, ইনসেষ্ট বিশদিয়া আছে। মধুসূদনকে বাদ দেওয়া অন্যায় হইবে।

শরৎবাবু লিখিয়াছেন, দেবদাস নিও না নেবার চেষ্টা কর না। ওটার জন্য আমি নিজেও লজ্জিত। ওটাতে immoral বেশ্যা চরিত্র তো আছেই তাছাড়া আরও কি কি আছে বলে মনে হয় যেন। ৩৭৪ পৃঃ (১৩ খণ্ড)।

এ বিষয়তে লীলা প্রসঙ্গতে খ পৃঃ ১১৮ বিবেকানন্দ ও তদীয় বন্ধুর দীর্ঘ আলোচনা আছে; যুবক নরেন্দ্র ব্যাখাইয়াছেন,.'.....সু বা কু যে কোন প্রকার ভাব যথাযথ প্রকাশ করিলেও রচনা বিশেষ যদি সুরুচি সম্পন্ন এবং কোন প্রকার উচ্চাদর্শের প্রতিষ্ঠাপক না হয় তাহা হইলে

উহাকে কখনই উচ্চাঙ্গের সাহিত্য শ্রেণী মধ্যে পরিগণিত করা যায় না...।'

এই সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রায় চল্লিশ বৎসরের কিছু পূর্ব্বে বলেন, ইহা কলিকাতা'তে মুদ্রিত '....কাব্যে অশ্লীলতা, কাব্য সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে ছিল, আছে ও থাকিবে....এক অতুলনীয় কবি প্রতিভার প্রভাবে বাংলার কাব্য সাহিত্য যখন আধ্যাত্মিকতার আকাশে অস্পষ্টতার জাল বুনিবার উপক্রম করিতেছিল, তখন যে কয়েকজন কবি উহাকে মর্ত মানবের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ফিরাইয়া আনিয়াছেন, বুদ্ধদেব্ তাঁহাদেরই অন্যতম!.....(৬৪/৬৬) এই প্রবন্ধে সত্যেনবাবু বহু শতাব্দী পিছনে, অন্বেষণে জয়দেব প্রাপ্ত হইলেন, ঘরের কাছে ভারতচন্দ্র, যাঁহার বিপরীত বিহার সকল রসিককে মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা উদ্ধৃত করিলে আরও লাগসই হইত। আর বটে ইহা গদ্যে, যে বিদ্যাসাগরের গুরুপ্রসাদীও, পরোক্ষে যাহা, দর্শাইতে পারিতেন। এবং যাহা আমাদের মনে হয় নিশ্চয় লেখার গুণে, রেখাপাত করে না।

মিস মেও লিখিত মাদার ইণ্ডিয়া যে কোন গৃহস্তকে যারপরনাই ক্ষুব্ধ করে, ইংরাজরা খুবই অশ্লীল জাতি, ভারতীয় মেয়েদের লইয়া কুৎসিত ইঙ্গিত করিল! এই হেতুবাদে দেশে তখন নৈতিক বোধ আলোড়িত; অন্তত কাগজে পত্রে, ইহা ব্যতীত হিন্দু ছুৎমার্গ ত ছিলই অধিকন্তু ব্রাহ্মদের দ্বারা আরও বেশী নৈতিকতা ও পাপ বোধ, এই সূত্রে হেরম্ব মৈত্র মহাশয়ের শেলীর 'লাভস ফিলজফি' পড়াইবার কথা স্মরণ করি। তাহার কিস শব্দটি তিনি বাদ দিতেন।

এরূপ মনোবৃত্তি প্রভাবে দেশ আছিল এবং বুদ্ধদেব বসুকে খুব অস্বস্তিকর বদনাম লইতে হয়, এরূপ আমাদের দেশেই নহে ফ্লোবেয়ারকে লরেন্সকে নিজ দেশে যারপরনাই হেয় করা হয়। এবং পাঠ্য যে তাঁহাতে আছে 'ইউলিসিস প্রকাশ করার অপরাধে যে পত্রিকা আদালতে সোপার্দ্দ হয়েছিল' (স্ব ও স — ৪৯) অপ্রাসঙ্গিক হইবে না, বাঙলার ব্রত! রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর যাহা অপূর্ব্ব তাহা পুলিশ বাজেয়াপ্ত করে।

অশ্লীলতা সূত্রে অনেকের বহুতর বিদেশী ধারণা নজরাইতে পারিতেন, কিন্তু বৃথা হইত, দেশের ধারণাই আদত — বুদ্ধদেব নিজের লেখা সম্পর্কে : '.....গ্রীষ্মের দুপুরে দরজা জানালা বন্ধ ক'রে, পাখা খুলে দিয়ে শ্রীমতী ডেপুটি গৃহিনী পালঙ্কে শোন আমার বই হাতে নিয়ে [যদি না সেই ডেপুটির নষ্ট হবার উপযুক্ত বয়সের পুত্র বা কন্যা থাকে]; তারপর, দুপাতা পড়া হতেই ছাপার অক্ষরগুলো ঝাপসা হয়ে আসে,....'

'....আর পাব্লিক লাইব্রেরীতে ছোকরারা মারামারি করে আমার বইয়ের জন্য; ভাগ্যবান পুরস্কার বগল-দাবা ক'রে লাফাতে-লাফাতে বাড়ি ফেরে,....পাগলের মত উলটিয়ে যায়, সে যা চায়, সে যা বোঝে, যার জন্য সে তার অনেক কষ্টে বাঁচানো সিকিগুলো ফিল্মের দেবদেবীদের শ্রীচরণে ঢেলে দেয় — আমার বইয়ের পাতা উর্দ্ধশ্বাসে উলটিয়ে যায় তারই সন্ধানে, তারপর হতাশ হ'য়ে আমার সম্বন্ধে নানা রকম রসালো গল্প উদ্ভাবন ও রটনা করে প্রতিশোধ নেয় আমার উপর। হ আ বা ৮০, ৮১ পৃ....এ-সব ছেলেদের দিন কাটে সিনেমা দেখে,....যাতে প্রচুর কুৎসা কি বিবস্ত্রত্বের বিভিন্ন অবস্থায় বহু স্ত্রীলোকের ছবি বেরোয় এমন কাগজ প'ড়ে (৯২) এবং যে আরও পরে এই, 'জাঁ পল সার্ৎ, অরাজকতার প্রচারক — যার রচনায় অবিরাম যৌনসংগমের বর্ণনা প'ড়ে, নর-নারীর দেহকে মৃত পশুর মাংস পিণ্ড বলে মনে হয়' (স্ব ও স — ৫৫ পৃ)

'....আমি বিশুদ্ধীকৃত; আমি, সব অবান্তর — তার থেকে মুক্ত দেহগত দুর্বলতার উর্দ্ধে

উত্থিত — অমরত্বে রূপান্তরিত। হ আ ঝ — (৯৭)'

এখানে ধর্ত্তব্যের যে, বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্ত তাঁহারে, বুদ্ধদেবরে অভয় দিলেও, তর্ক সুবাদেই, যে কাপড়ের ভিতর সবাই ন্যাংটো (Sic) আর এইটি যে, আহার নিদ্রা মৈথুন'ই লইয়া মনুষ্য বাঁচিয়া থাকে; তথাপি, আদতে তাহার লেখার বীজ কোন খানে আছে, তাহা অনেকেই জানিতে সচেষ্ট, তিনি মানুষের কোন রূপত্ব, কেননা অনেক মতে অশ্লীলতাই বাজে কথা, জন্য অত্যন্ত কাতর ছিলেন; যে তাঁহাতে আছে, '....কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ প্রেমের শেষ পরিচ্ছেদের মতো, প্রনয়ী যুগল যখন পরস্পরের চোখে তাকাতে সাহস পায় না, পাছে সেখানে তাদের ভালবাসার মৃত্যুশয্যা দেখতে পায়। প্রেম যখন মরে গেছে অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে, অতীতের স্মৃতি সম্মানে দুজনকে অভিনয় করে যেতে হচ্ছে, সেই ক্লান্তি, মিলিয়ে যাবার সেই আকাঙ্ক্ষা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের মুখে (৩৪ ছাদ) এখানে সিদ্ধান্তের ইহা দোহাই, এই পদ তত্ত্বগত মুমূর্ষুর জীবের এক রচিত পালন রক্ষা হইয়াছে নৈতিকতা।

এখন বলি যে আমরা শুধু পাঠক বটে এবং তন্নিমিত্ত ইহাতে এক নির্দ্দিষ্ট আজ্ঞা আছে, হইলেও এমন যে উজাইয়া যাওয়া চলে, এই বিশ্বাসই আমাদের বিস্তৃতি হয়; এখন ঐ দুঃখ ব্যবহারিকভাবে মনুষ্যবৎ হয় যাহা, তাঁহাকে নিপীড়িত করিতে আছিল, প্রায়টি গ্রন্থে এই আতঙ্ক দ্বারা জরিত, এই বিষাদময় ঘটন তথাহি ট্রাজিডি কেমন রূপের পর্য্যন্ত লইয়া সাজান, মীমাংসা করিবার; তিনি নিজে চিঠিতে ব্যক্ত করিয়াছেন নিয়তি! এখানে নিয়তি ও নৈতিকতা চিরচরিত হেলেনিক মেল পাইল না! অর্থ, সামাজিক কাঠামো পোক্ত করাতে নহে।

এই সংসারে তিনি সবই দেখিয়াছেন। নির্ঘাৎ, যে হায়! প্রেমের মৃত্যু হইতেছে : কিন্তু লোকে ভাবিল, বাঙলা দেশের উপর এই সকল অভিধা হয় নিরর্থক; ভাষা কখনই এহেন ভাব বহিতে সক্ষম না! যে ইহাতে দমকা তোড় রহে! ইহা ১৯ শতাব্দী হইতেই ঈদৃশী প্রচার আছে — তদীয় ব্যাখ্যাকারগণ ক্ষুব্ধ আছেন, কেন পাঠকরা মান্য করিল না — আবার মানিয়া লইলেই যে করিলেই যেমন বুদ্ধদেব দোল দুর্গোৎসব করিতে পারিতেন এমন কখনই না; কাহারও সম্ভবত এই প্রথম, তাঁহার পুস্তকে ও তাঁহাদের, কল্লোল যুগীয় লেখাতে, শেষ পৃষ্ঠা সান্ত্বনা বহনে কাজের হইল না!

আমরা পাশ্চাত্যমুখী অপবাদ লইলাম, এখন আলোচ্য কোন দেশেই সাহিত্য একেবারে তাহার নিজস্ব।

এরূপ বক্তব্য কোন ১৯ শতাব্দীর খ্যাতনামা কবি তুলিয়াছেন যথা:—
বটে, তাহার পর, শুনি দিদেরো ত এইভাবে একটি কাহিনী লিখিয়াছেন।
বল,...
তুমি দিদেরো হইতে নকল করিয়াছ....
যিনি স্টার্ণকে অনুকরণ করেন...
তিনি ত সুইফট'কে নকল করিয়াছেন...
উনি র‍্যাবেলে হইতে হুবাহু লইয়াছেন....*
তিনি ত মেরলাঁ কোকেঁই হইতে উদ্বুদ্ধ...
যিনি পেতরো হইতে...

যিনি লুসিয়া হইতে তিনি আবার আর আর অন্যদের নিকট হইতে...

* (মন্তব্য : ভোলতেয়র তাঁহার ল্যু সিএকল দ্য লুই কাতজ-এ বলেন, সুইফট হয়েন র‍্যাবেলে পারফেক্‌সিঅনে...)

কুসুম বৃক্ষ যেমন এদেশ হইতে ঈজিপ্তে যায়, বঙ্গের গোলাপ যদ্রূপে ইউরোপ খণ্ডে বিস্তারিয়াছে; এবং বাঁশী যেমন, তেমনি গল্পও বটেই বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছে; অন্যপক্ষে ঐ দেশ হইতে এখানেও আসিল : বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভুবন ও তাহার মাসীর গল্পেতে আছে : না বলিয়া পরের দ্রব্য লইলে চুরি করা হয় — এ নীতি বোধ সুদারুণ! কিন্তু বিদ্যাসাগর ও ফিলিপ নাভার-এর গল্প কি বিচিত্র যে প্রায় এক। কোথায় ১৫ শতাব্দী! কোথায় ১৯ শতাব্দী, এমন সম্ভব এখান হইতে উহা যায় ঃ আমরা জাতক, কথা সরিৎ সাগর আদি যেটুকু মুদ্রিত বা অন্যত্র, ঐ আখ্যান পড়ি নাই; নিশ্চিত আমাদের সীমা আছে; আবার, হোপমানের বিখ্যাত সেই হানাবাড়ী, সাতো, যেখানে গীত নৃত্যাদি হইত, একটি পাগল, সরিয়া যাও বলিয়া ছুটিত, তাহাও ভারতীয় পোষাকে শুনিয়াছি, ওয়ালটার স্কটের প্রভাবের খবর সবাই জানে।

বিখ্যাত সাহিত্যিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, 'আমরা প্লটের পিত্তেশে পরদেশী!'

অজস্র অনুকরণ, মোপাসাঁ চেকভ এমন কি জন গলসওয়ার্দি সিলভার স্পুন ইত্যাদি; ভারতী ইত্যাদিতে লেখা হইত, বিলেতী হইতে চুরি, ছায়া অবলম্বনে, এই বিষয় কিয়দংশে বটে যে, বুদ্ধদেব বাবু তদীয় 'বাংলা কবিতা'তে (পৃ ৭০ স্ব ও স) অভিমত প্রকাশিয়াছেন। দেখা যাইবে কোথাও প্লট কোথাও সূত্র; সূত্র, যেমন ইমপরটান্সে এফ বিং আরনেষ্ট'র মতন, যতদূর মনে পড়ে, স্বর্ণময়ী দেবীতে এক যোড়শী নায়িকার পাত্রের নাম লইয়া ছুৎমার্গ। সুবলমিত্তিরের অভিধানে এমন অনুকরণের খবর প্রতি পদে আছে ও আমাদের নাটকে বিশেষ প্রভাবিত।

মধুসূদন লিখিয়াছেন, some thing of a foreign air about my drama গৌরদাস বসাককে লিখিত, পৃ ৩০২; অন্যত্র রাজনারায়ণকে লিখিত you will no doubt be reminded of the fourteenth Iliad and I am not ashamed to say that I have intentionally imitated it.

পাশ্চাত্যে একে অন্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন কখনও হুবাহু যেমন, স্তাঁদাল নামে যিনি বিখ্যাত, তদীয় ইতালী ভ্রমণ, আসলতো অন্য লেখকের, এমন যে, ঐ লেখকের যে তিন দিন জ্বর হয় — যাহার জন্য ওপেরা গান শোনা হয় নাই, ঠিক স্তঁদালেরও সেই তিন দিন জ্বর হয় ওপেরা বাদ পড়ে! এখন কথা এই যে, সকলে যা করিয়াছে তাহাতে আপত্তি থাকা মেয়েলী এমত অভিপ্রায়েতে নহে ঐ ঐ উত্থাপন!

আমাদের যুবা বয়সে বহু লেখাই কিছু ন্যাস আরগসী লিসনার (বিবিসি) মারফৎ, এমনও যে মাইকেল আরলেন পর্য্যন্ত ভারী নাম লভিয়াছিল! it গার্ল সংজ্ঞা, কাহার লেখা মনে নাই, য়ুইলা ক্যাথার, গার্ডিনার ইত্যাদি খুব প্রিয় ছিল।

এখন বিচারে আইসে যে, ১৮ শতাব্দীতে(২) কি ফরাসীতে ও ইংরাজীতে প্রাচ্য আকর্ষণ দেখা যায়, ইহা প্রথমে, অভিজ্ঞতা পরে স্বদেশ সমালোচনা — যে এবং পরে শুধুমাত্র exotic হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নহে; কেন নহে সেই সিদ্ধান্ত মনতেসকিওতে আছে (৩) এবং ইংরাজদের নিকট নবাব আমাদের কাছে ফিরিঙ্গী, স্থূলভাবে উহাদের কাঁচা অর্থ এবং আমাদের জানিবার

ইচ্ছা বটে! এইভাবে আমরা আকর্ষিত হইয়া থাকি।

উল্লেখিত যে এ্যাঙ্গলো সাকসন এণ্ড দি হিন্দু'তে মিলিবার প্রকরণ ছকা হইয়াছে; এখানেও, বুদ্ধদেবের মধ্যে উহা দারুণ ভাবে রহে, মানে গোলামী বোধ নয়, 'ইংরাজি সাহিত্য ও আমরা' পড়িলে এই সার বুঝিব; এবং তাঁহার তীব্র অভিমান যে ওউট লাইন অফ ওয়ার্লড লিটারেচার গোছের গ্রন্থে আমাদের দেশীয় মানে বাঙালী লেখক নাই, বরঞ্চ 'যদিও কানাডা কিংবা নিউজীল্যাণ্ডের নাম মাত্র (ভদ্র ভাবে) সাহিত্যের অনেক সময় স্বতন্ত্র পরিচ্ছদের প্রবর্তন করা হয়'' ৯৩ পৃ; যে এবং নিজে ইংরাজী সাহিত্যের কৃতি ছাত্র হইয়াও আমাদের দোষারোপ করেন 'এখন পর্যন্ত আমাদের দেশের থেকে এ ধারণা একেবারে দূর হয়নি যে ইংরেজি জানে না সে-ই অশিক্ষিত!'

বুদ্ধদেবের তুলনায়, ঐ বিষয়, বাঙলা লেখা যদি পর্য্যবেক্ষনি, তবে জ্ঞাত হই যে বহুদিন ধরিয়া আমাদের গঠনের আদর্শের বিচাল্যমান অনেকে করিতে আছে, কেহ ব্যারিষ্টার, কেহ অধ্যাপক, সুরেশ সমাজপতি রমাপ্রসাদ চন্দ'র সমালোচনা কোন কিছু রুখিলে না, কেন না উহাদের বল ছিল। সেদিনও 'পরিচয়' ও বড় কম ক্ষতি করে নাই। বুদ্ধদেব বাবু ইহার প্রশংসা করিয়াছেন তাহা খানিক বন্ধুবাৎসল্যে, ইহা তাঁহার স্বাভাবিকতা! এই সকলের পাণ্ডিত্য, এখানে প্রকাশ থাক্‌, তখনকার জিজ্ঞাসু প্রিয় কাগজ যেমন হোরাইজন, নিউ ষ্টেটসম্যান এণ্ড দি নেশন, টাইম লিটেরারী সাপ্লিমেণ্ট, লিসনার এবং অনেক প্রবন্ধ লেখক (যতদূর মনে পড়ে মার্কস ইষ্টমান আদি) হইতে নকল এখানে স্থান লাভ করিত! এখানে যে কোন বিষয় আলোচনায় — চাইকোভোস্কী, ইম্প্রেশানিষ্ট ইত্যাদির উল্লেখ পরিলক্ষিত হইবে; কেহই বুদ্ধদেব বাবুর মতন করিয়া রুখেন নাই যে, বিশ্বের গল্প বা কবিতা সঙ্কলনে আমাদের নাম নাই কেন। যেহেতু বাঙালী লেখক সম্পর্ক তদীয় বিশ্বাস অটল থাকে।

পরিচয় কাগজে, এখন দেশীয় ভাব, একদা রেনে গ্রুসে ও ক্বচিৎ চারুবাবু প্রায়ই বেদান্তারি তত্ত্বালোচনা যাহা আমরা উদ্বোধন, ভারতের সাধনা, বসুমতী আদিতে পড়ি, তাহা হইতে সাদা প্রবন্ধ, আমরা ইহা কোন গেঁও জ্বালাতে যে লিখি, ঈদৃশী বুঝিয়া থাকা পাঠকের যুক্তির কথা নহে : ইহারা যেটুকু জানিতেন তাহা, ইহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইত, আমাদের জানাইতে পারিতেন; হায় আমরা অনেক আশা করিয়াছিলাম : যে সকল বৃত্তি ইংরেজ সাধনায় (বৈজ্ঞানিকতা, মূঢ়তা, নির্ণয়ে, ধর্ম্মান্ধতা পর্য্যালোচনায় ব্যয়িত হয়) যায় ও তৎপরে আমাদের কি রহিল আমরা কোন পন্থা অবলম্বন করিব! শ্রীঅরবিন্দর পর আরও মানুষের দরকার ছিল। যদিও সুধীনবাবু আমাদের একমাত্র মহৎ কবি, আমাদের শান্ত ও গর্ব্বিত করিয়াছে। কিন্তু আমাদের তেমন উদ্বুদ্ধ করিলেন না।

'অনিত্যের দায়ভাগ রেখে যায় রজনীগন্ধায়' শুধুই কিবা চালিয়াতি (শরৎবাবু দিলীপ রায়কে অনামীতে আছে?) এক চিঠি লেখিয়াছিলেন, দেখ গো দেখ গো আমি কত পড়িয়াছি মানে সাহিত্যে শুধু এই আছে; কখনই ইহারা মধুসূদনের মতন পাঠার্থী না, এখানে উল্লেখ করি, আমাদের একজন পরিচিত ইঁহাদের অনেকেরেই চিনিতেন, কাছে যখন প্রশ্ন বিনীত তুলিয়াছিলেন, কেন মহাশয় জর্মন উক্তি দিয়া পদ্যর আরম্ভ, সুদর্শন দশাসই ভদ্রলোক হাহা শব্দে অন্যকথা পড়িয়াছেন! কখনও মধ্যযুগ বা হেলেনিক পুরাণ কোথাও ইঁহাদের চিন্তায় পুনরুল্লেখিত, আমরা গ্রাম্য স্বভাবে স্তম্ভিত!

বড় করুণায় ইঁহারা দেশের দিকে চাহিতেন, ভাব, এই দেশ তাহাকে বুঝিল না! আমরা

ভাবি যে দেশ ভগবান শঙ্করাচার্য্য মহাপ্রভু রামকৃষ্ণকে বুঝিল রামায়ণ বুঝিল সে দেশ এতই দুর্ভাগা যে ইঁহাদের বুঝিল না! স্ব-মাহাত্ম্যে ইঁহাদের প্রত্যেকেই জরিয়া ছিলেন, তবে নিশ্চয়ই ইঁহাদের প্রয়োজন ছিল!

বুদ্ধদেব নিশ্চয়পক্ষে এমত নহেন — এমন অনেক তাহাতে বিশ্বাস ছিল, যাহা ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্ন তুলিতে পারি, যেমত যে, 'মধুসূদন মর্ম্মস্থলে পৌছান নাই, অমুক শ্রেষ্ঠ কবি, দেশীয় নাটক ভাল নয়' — যদিও, পরিচয়ের সকলের প্রতি তাহার মায়া ছিল — অথচ কেহই যে তাহার মত সরল এহেন প্রমাণ করা হইবে জেদের, তৎসহ মান্যের যে তাঁহাতেও নির্ঘাত আমিত্ব ছিল; এখন উহা হয় লেখার আমিত্বই, প্রায়ই নিরপেক্ষতার সহিত, এতাদৃশ আমিত্ব সরলতাতে বটেই যাহা কিছু প্রকাশের তাহা বর্ণিত থাকে প্রায়ই তাঁহার লেখাতে আমরা সাক্ষাৎ করি এমত পদ সকল : টিনের চালার বাড়ী, যে কুকুরটি বই ছিঁড়িতে কেয়াবাতের যখন বৌদি আর একটি বই নিক্ষেপিলেন তখন ছেলেটি চীৎ-করিয়াছে, ও বৌদি ঐটি রামায়ণ! রামকৃষ্ণের উল্লেখ, তোমার জানলায় তুলসী গাছের একটা পাতা; গঙ্গার কথা; এমন কি দেবেন সেনের 'ছাদ' কবিতা উল্লেখ (এখানে অবশ্য সুধীনবাবু এক আধটি লাইন যথা কজ্জল ব্যথিত নভোজল...সন্ধ্যার তন্দ্রার মুরতি ধরি আজ মন্থর বচন কহ। যে তেমনই অন্য এক প্রখ্যাত ছন্দকার, ১৯ শতকের কবি সম্পর্কে আপন মনস্বিনী দীপ্তি প্রকাশ করেন) বা ইংরেজি সাহিত্য ও আমরা বা ভাষা ও রাষ্ট্র। অথবা লক্ষ্মী সরস্বতীর বৈপরীত্য! এমনধারা শয়ের অধিক সূত্র টানা যাইতে আমাদের বিলম্ব ঘটিবে না। যেখানে তিনি বিদেশী পদে যোজনা করিতে পারিতেন, পূর্ব্বকথিত যে আতসবাজিত্ব, তাহাতে অল্প তর্কের শেষেই আর নাই!

আমরা ১৯ শতাব্দীতে লক্ষিয়াছি I don't car-a pin's head for Hinduism. I love the grand mythology, পুরাণ যে হিন্দুত্বকে বনেদ, বলা ভাল বীজ করত উদ্ভুত, তাহা খেয়াল নাই! অবশ্য লেখকের ইহা মুখের রচনা মাত্র। তবুও 'পরিচয়'তে ইহা সংশোধিত হইল না। এই সুবাদে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও বিবৃতির যে রাজনারায়ণ বাবুকে, ইনি কঠিন ব্রাহ্ম, মধুসূদন লিখলেন, 'যখন কবিতা পাঠ করিবে তখন সব রকম ধর্ম্ম গোঁড়ামী (bias) ত্যাগ করিও...।'

যথা শিবের গীতে মিসটিফিকেশন — তাহা সত্যেন মজুমদার মহাশয় অনুভবিয়াছেন, কিন্তু তৎপরিবর্তে ইঁহারা দুর্ব্বোধ্যতার সৃষ্টি করিলেন (সান্ধ্যভাষা বা এক চন্দ্র দুয়ে পক্ষ দ্বারা সময় নির্দ্ধারণ ও বাউলিয়া দুর্ব্বোধ্যতা ইতিপূর্ব্ব হইতে ছিল যেমন, চুল ভিজাব না, ধরি মাছ না ছুঁই পানি, যাহা হয় তাত্ত্বিক, একদা দ্ব্যর্থ প্রয়াস ছিল বা ধাঁধাঁতে, মেয়েলী চিব চিলি চিতে চিছি — অর্থাৎ চি আদ্য কথা বা পাশ্চাত্য এক কবির বালখিল্যতা এমন যে ঠিকানা লেখাতেও) যে এবং কোন স্বার্থে তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছুক। বুদ্ধদেববিদগণ যেন এই সম্পর্কে নিরপেক্ষ বিচার করেন আদতে ঐ ঐ কতখানি কবিতা হইল — তাঁহার মতেও শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্র নাথ দত্তের '....কবিতায় দেশ-বিদেশের বহু রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ থাকতে পারতো, কিন্তু তার চিত্র বলাবহুল নিবিড় বাক্যবন্ধ থেকে অভিপ্রায়টাকে শোনামাত্র উদ্ধার করা অসম্ভব হ'তো (স্ব ও স ২ পৃ) যে কি বা কেমন বিশেষে লইয়া তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লভিয়াছেন — যেহেতু আমাদের আগুয়ান হইতে হইবে, বুদ্ধদেবের কল্পনা সংসাধন করিতে লাগিবার তাহা বটেই, যে কেবল নস্যাতিতে মোটেই না! (ভাল যদি তবে ঐ পন্থী হইব)

আসলেতে 'পরিচয়' কোনরূপ ধ্যানেতে রহে, তাহার নিকাশ অবধারিতেই কিছু সময় দেওয়া উচিত — কিন্তু ইদানীং মানে সুধীনবাবুর পরতে ঐ পরিচয় আর এক চেহারা লইয়াছে — আমাদের পাটে নেহারিব কতিপয় অপ্রচলিত সংস্কৃত বিশেষ্য যে বিশেষণ, তাঁহারা ফরাসী হইতে, শুনিয়াছি ভুল খবর হইতে পারে, মানে সিরিল কেনেলীর কাগজ হইতে রজার ফ্রেই এর মালার্মে অনুবাদ হইতে সিদ্ধান্তিয়াছিলেন, মো জুস্ত! এমনই যেমন ঐ পদবন্ধটি নূতন!

পাশ্চাত্যে কেন প্রত্যেক দেশে ত বটেই শব্দবিচার তর্ক বা ন্যায় শাস্ত্র অন্তর্গত, উহা লইয়া বিশ্লেষণ বহু প্রাচীন দিন যাবৎ উপস্থিত, গীতে বটেই, তাহা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু ইঁহাদের ক্ষেত্রে; শব্দ যে কিছুর জন্য এখানে উহা জ্ঞাত করা হয় নাই, শব্দ কোন ধাচ বহন করে; ঠাকুর বলিয়াছেন, কথা ইশারা বটে; মানে বিধিকার কহেন, pour l'effet!

তাঁহারা সংস্কৃত প্রতিশব্দ অন্বেষী — যেমন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাগলকে অজ লিখেন — আমাদের তর্কে হারান যাইতে পারে কিন্তু তাহা ত আমাদের জ্ঞান দেওয়া যাইবে না; তবু শব্দ বাছাই ঠিক কিন্তু তাহার জন্যত্ব কেমন? বিদেশে কেহ কেহ দুর্ব্বোধ্য লিখিয়া তাহার অর্থ স্বীয় বন্ধুদের বলিতেন। তবু, এখানেতে, তাঁহারা সাঁবলিস্ত বা প্রতীকমন্য!

কিয়দংশে নিঃসন্দেহ হইলেন; এবং তাহাতে, আমাদের কবিতা কতটা অথৈতে বটে যাইল, প্রেম সেখানে বিষয়, যে এবং disillusion, প্রেম আছে, আবার ঐ তত্ত্বও আছে! ইহা কিন্তু নিছক লেখার সাট বৈ অন্য কিছু না, ঐ কাঁটা প্রকাশিয়া প্রত্যেকেই কি অবধি খুসী! (কাঁটা আছে জানিতে পারিয়া) অথচ ইঁহারা প্রত্যেকে মহা উচ্চবর্ণের কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ এবং নিশ্চয়ই শ্রী ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন সামন্ত তান্ত্রিক অভিজাত ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন!

আমাদের আগ্রহ কেমনে উঁহারা ঐ ডিসইলুউসন বুঝিলেন! তখন হইতে, ইহা ঠিকঅর্থান্তর খেয়াল আসিল; ইহা, ঐ ডিসইলুশান এখন, এই তত্ত্বের জড় প্রাচীন আর দেশভেদে নামও বিভিন্ন আছে, নিছক খেই হয় সাম্যতত্ত্বর কাব্যগত প্রয়োগের।

বঙ্কিম বাবু বাঙালীর ইতিহাস চাহিলেন ইঁহারা চাহিলেন কিছু বুর্জোয়া!

এবং যে যাহাতে, সমাজেরে, ঐ ভাবালুতা বশে, আশ মিটাইয়া ভর্ৎসনা করা সহজেই যায়, অতএব খবর যে, নিজেরা বাদে সকলেই উহাই, এবং মানে উইগ ফেলিতেও হয় নাই, ইঁহারা Byronic! একদিকে নেপোলিয়ান অন্য দিকে the king-times are fast finishing, there will be blood shed like water, tears like mists; but the peoples will conquer in the end — কি বাইবেলী আজ্ঞায় ধমকানি! ইহাতে বড় আত্মসুখ, সপ্তমের আনন্দ! ইঁহারা আপেল ভক্ষণের পূর্ব্বের আহ্লাদে রমতিয়া ফিরিলেন; আরও খবর যে তাহারা মুখরা দল মাত্র, তৎসুবাদে যথাক্রমে (ক্রম শব্দটি!) সাম্যবাদ সঙ্ঘ জাতীয়করণ হইল!

এবম্প্রকার কি বা মঙ্গলজনক জাতীয় করণেতে, পাঠক ইহাদের যোগ্যতা আছে, ইহারা গত যুদ্ধকে পিপিলস ওয়ার ঘোষিয়াছেন। এবং গাহিয়াছেন —

'অশ্বথ কেটে বসত করি
জাপানি কেটে আলতা পরি।' (সুবোধ ঘোষ — তিলাঞ্জলি)

এহেন গীতে দিক মথিত হইয়াছে : সুভাষবাবুকে যাচ্ছেতাই অখ্যায়িত করণে ইঁহাদের বিপ্লব সফল হইল, ইঁহাদের অধঃস্তনরাও অদ্য বুর্জোয়া হইল, কমুনিজমের লক্ষ্য ভেদ হয় — তত্ত্ব বলে কমুনিজমের লক্ষ্যই, মাস বুর্জওয়াজী! ইহাই সিনতেসিস্! সাহিত্যে ডাইলেক্ট সাঁদ করিয়া অপূর্ব্বতা ঘোষিল দীনেশবাবুর 'আকাশে চাঁদ হল কাস্তে' এইপদ দলপতি সুধীনবাবু হইতে ছোটদের এস্তক মনোরমিয়া থাকে। সোসাল কনটেন্ট সাহিত্যকে বানচাল করিতে চাহিল।

বুদ্ধদেববাবু তখন এই সকল বিপ্লবীদের জানলা হইতে — দেখিলেন, আ লা ল্যাম্প পোষ্ট, নিপাত যাক্, মুরদা বাদ শুনিলেন, পৈশাচিক সেমেটিক আকোচে সহর গঞ্জ অত্রাহি হইল; ১৯ শতকের সব-ভাঙার-দল তথা সর্ব্ব-বিধ্বংসী প্রারদ্ধ পুনরপি ফুঁসিয়াছে! ইহা সমাজতন্ত্রবিদ'রা রসাইয়া বলিতে পারে! ইহাতে তাঁহাদের আখের রাজসিক হইল, বড় নামী হৌসে কাজ লভিলেন, প্রাইজ, উচ্চপদ সবই মিলিল।

লণ্ডনেতে কোন বাঙালী বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেকটর জিজ্ঞাসিত হইলেন, যে তাঁহার ছবিতে সাম্যবাদ কৈ? তিনি উত্তর করেন, সাম্যবাদ করিতে ফিল্ম করিতাম না, এতদিনে কোন হৌসের কর্ত্তা হইতাম!

ইদানীং তাহাদের বিষয় সম্পূর্ণ নাটকের তত্ত্ব, থেমেটিক পারসেপ্ট হইয়াছে, ইহা গাহিতে পারিলে পয়সা আসে। এবং তাহাদের অনেকে নেতৃস্থানীয় উপনিষদ ব্যাখ্যাতে লাগিয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তখন যাহাতে বিশ্বাসী — তাহাতেই আছেন, 'ইহার জড় বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলন ও শুধু একটা রাজনৈতিক হৈ হৈ মাত্র ছিল না' পৃ ৯২! যে বটে আরও, তিনি আর্টের (এই সূত্রে একজনের নাম করিতেই হয় তিনি সুবোধ ঘোষ যিনি 'ফসিল' গল্প লেখাতে তখন পরিচয়ের হীয়েরো তিনি তিলাঞ্জলীতে আঘাত দিলেন।) বদলে ইতিহাস সাধেন নাই, যাহা পাশ্চাত্যে ঠিক একশো বছর আগে বিশেষরূপে সুরু হয়।

তিনি, বুদ্ধদেব আপনকার মধ্যেই স্থির আছেন, ভয়াবহ অন্ধকারে সমক্ষে দাঁড়াইতে চাহেন, যে এবং আরও '....অসংখ্য কবিতা ভাবি, লিখেও হয় কতটুকু আর তারই বা কতটুকু অংশ বেঁচে থাকে। যার আদেশের জোর সবচেয়ে বড় সেইটাই প্রেতলোক থেকে প্রাণলোক উত্তীর্ণ হয়, যার দাপট কম, যে দুর্ব্বল, সেই বেচারারা দরজার ধারেই পৌছতে পারে না কিংবা বেরিয়ে এসেও অকালে মারা পড়ে! এই ব্যাপারটাকে সৃষ্টির মূলতত্ত্ব পর্য্যন্ত প্রসারিত করে দেখতে পারো। নারীর গর্ভে পুরুষের প্রাণবীজ এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ যাত্রা করে কিন্তু সেটা যাত্রা নয় পাল্লা-দৌড় তাতে প্রবলতম একটি মাত্রই শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্যভেদ করতে পারে অন্যগুলি ক্ষীণ প্রাণ পথে পথেই অবসিত হয়....' চিঠি 24/4/53 এখানে মীমাংসার যে, ভাব নয়, শব্দ পরম্পরাতে স্পেনসরিয় প্রতিক্রিয়াশীলতা (!) লাগিতেছে অথচ খাটে না, তবে, প্রথমেতেই 'যার আদেশের আছে — এই যার নিশ্চয়ই সগুণ বা নির্গুণ — ব্যক্তি। সত্য! যেমন বহু রকমের প্রাকৃতিক বিধানই আমাদের বুদ্ধি, তেমনধারা এই জীবতত্ত্ব সত্য! এবং কেমনে উহা, বুদ্ধদেব বসু বিদগণের, ইহার মীমাংসা করিতে আজ্ঞা হয়। যেহেতু ইহার গভীরতা আছে। আশ্চর্য্য তিনি বলিয়াছেন, 'আমি, ঠিক তত্ত্বদর্শী নই (২২।১২।৪৮)

'....প্রত্যেক মানুষকে অ আ ক খ থেকে আরম্ভ করে নিজেকে সমস্তটা করে নিতে হবে নয়তো কিছুই হল না' (চিঠি ২২।১২।৪৮) আমাদের উদ্দেশ্য এহেন তৈয়ারীতে তাঁহার কি কষ্ট করিতে হয় — অনবরত পাট করা ছাড়া অন্য পথ নাই, এবং মাটি ব্যতীত, যদিও একদা ভারী অভিমানে তিনি প্রকাশিয়াছেন, '.....নিজের প্রতি নিষ্ঠার চেয়ে বড়ো কিছু নেই। আমাকে আমি প্রকাশ করবো, তারপরে তোমরা যদি বলো এতে মাটির গন্ধ নাই আমি বলবো নাই বা থাকলো....

আমাদের ধারণাতে বঙ্কিম বাবু যেমন ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বলিয়াছেন, খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাই না.....তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি! এখানে খাঁটি সব বাঙ্গলা।

চিত্তরঞ্জন দাস ও বিপিন পাল রামপ্রসাদ লইয়া তর্ক হয় এখানে উল্লেখ করি, বিপিনবাবুর ধারণা রামপ্রসাদে বাঙালিত্ব ছিল না।

এখানেতে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে সবই বাঙ্গালী। অজিতবাবুর লেখাতে আছে প্রথমেতে যখন বুদ্ধদেব বাবু ওস্কার ওয়াইল্ডের উপন্যাস পাঠ করেন উহার আমার প্রিয়, mon cher পদটি, এতেক তাঁহার মন ধরে, যে পাঠান্তরে, চিঠিতে অজিত বাবুকে ঐ সম্বোধনিতেন। এবম্বিধ উদ্দীপনা থাকা বাদেও তিনি হয়েন বটেই ঐ।

আবার বলা যায়, ইহাই বাঙালীর আবেগ! বঙ্গীয় এই রকমটি হয় যৎপরনাস্তি ঠাট্টার, জাতির অখ্যাতি চিরদিন যে খুব অনুকরণ প্রিয়, — কিন্তু তাঁহাতে এ রীতি কয়েক ক্ষেত্রের বিশেষ, অথচ প্রতিটি বৃত্তির খেই হইতে, চালিয়াতি খাতে আলোচিত, তিনিই বাঙ্গালিত্ব 'ইংরাজী সাহিত্য ও আমরা', বিশেষত, 'ভাষা ও রাষ্ট্র' যে এবং 'কিন্তু আমাদের সমালোচনায় আমরা ইংরেজী সাহিত্যের আদর্শই মোটামুটি প্রয়োগ করে থাকি। ইংরেজ লেখকদের নামই বারবার ঘুরে আসে, আর নয়তো সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র হয় আমাদের অবলম্বন কিন্তু সংস্কৃত বা ইংরেজী, কোনো আদর্শই বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে খাপ খায় না, খানিকটা জোড়াতালি দিতে হয়।'

[অথচ অন্যত্র আছে 'বাংলা কবিতা'তেই '.....যদি দেশের মধ্যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রভাব থাকতো, তাহলে এ রকম হ'তে পারতো না যদি আজ সাহিত্য সমাজে সংস্কৃত চর্চা পুনরুজ্জীবিত হয়, তাহলে বাংলা কবিতা অতি লালিত্য থেকে মুক্তি পেয়ে কঠিন মেরুদণ্ডের উপর দাঁড়াতে পারতো...']

ইহার পর আরও খেদ আছে, 'প্রত্যেক পরিণত সাহিত্যেরই আপন স্বভাব অনুসারে স্বকীয় সমালোচনার ধারা গড়ে ওঠে, আমাদের সাহিত্যে এখনো তা গড়ে ওঠে নি' শেষটুকু পঙ্‌ক্তি সম্বন্ধে প্রস্তাব হইবে এই যে, সমালোচনা গড়িয়া তুলিতে সংকল্প কেহ করেন নাই এমত যথার্থ নয়; ও বলা সমীচীন হয় আমরা জানিতে চাই না; যদিও বঙ্কিম বাবু তাঁহার ছক ও আমরা কেমনটি মানিব তাঁহা, যে এবং মহান গিরিশবাবু তদীয় অর্দ্ধেন্দুবাবু সম্পর্কেও লেখাতে, সাইন অফ দি ক্রশ আলোচনায় বলিয়াছেন — পরে সুবলমিত্র রামেন্দ্র সুন্দর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুরেশবাবু দীনেশ সেন ইঁহারা, কেমন হওয়া উচিত, তৎসম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন।'

এখন কেহ সেই ভার লইল না যাহাতে একটা সাক্ষাৎ বুদ্ধি পাওয়া ঘটে, অবশ্য ইংরেজী মাপকাঠিও ইদানীং অধিক বিকৃত হইয়াছে — প্রমথ বিশী মহাশয়ের মতন লোক ত্রৈলোক্যবাবুর আলোচনায় ভোলতেয়র সুইফট দিদেরো আনিলেন; যেমন মধুসূদনের মানে তদীয় চরিত্র সূত্রে — সাহিত্য নয় বটে, একজন ডক্টরেট লিখিলেন 'শেলীর ভাবশিষ্য....'

এ বিষয় কিন্তু আরও বিশদিব যে তাঁহাতে যেখানেতেই কলিকাতা বা বাঙলা দেশের উল্লেখ থাকে, যে বলা যায় রূপ সজ্জা decor সুবাদে উহা আসে নাই, ইহা তাঁহার নাড়ীতে, আঃ কলিকাতারে তিনি কি পর্য্যন্ত ভালবাসিতেন! ইহা অনেকে কহিবেন, পাশ্চাত্য উদ্বুদ্ধ, প্রবন্ধ প্রমাণও দিবে — ঈশ্বর গুপ্ত কালী সিংহী মহাশয় ইঁহারা কলিকাতারে তেমন স্নেহের চক্ষে দেখেন নাই। — আঃ বেচারী! 'কোলকাতারে যেরূপ আমি চোখ দিয়ে, মন দিয়ে দেখছি তা বৃথাই অন্বেষণ করেছি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠায়। এই শহরের কোন বর্ণনা আমাকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারেনি (আমার নিজের প্রচেষ্টাগুলোকে বাদ দিয়ে বলছি না)... ''প্রত্যেক বড়ো

শহরের নিজস্ব একটা আত্মা আছে লেখকরা তার রহস্যের মর্ম্মে প্রবেশ করেন দুরূহ সাধনায়,'' এবং বুদ্ধদেব বাবুও অতীব কষ্ট পাইতেন : 'গদ্য বা পদ্য লিখিলেই পল্লীর স্তব....।'

আমাদের মাকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ এঁদো ডোবা বটগাছ, চণ্ডীমণ্ডপ লিখিলেই গ্রাম হল! তবেই হল।

এখন সেই রহস্যের মর্ম্মে, ইহাও একটি অভিনব ছক প্রবেশ করিয়াছিলেন কিম্বা নহে, আমাদের জানা নিতান্ত প্রয়োজন ও কেমন সূক্ষ্মভাবেও এখানে তদীয় অন্বেষণ কিবা রূপ হয়। '...নিঃসঙ্গতায় এই শহর যেন প্রত্যক্ষ চির-উপস্থিত সঙ্গী। সন্ধ্যেবেলার চৌরঙ্গির মোড়ে দাঁড়িয়ে — চারিদিক থেকে যখন জ্বলে উঠতে থাকে আলো; ট্রাফিকের চীৎকার, নিরবচ্ছিন্ন জনস্রোত, উজ্জ্বলতায় উন্মত্ততায় শহর যেন নিজেকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়তে চায়। ....আবার বর্ষার সন্ধ্যায় মুক্তোর মত স্বচ্ছ....রাত তিনটের সময়কার আশ্চর্য শান্তির মোহ অন্ধকার রাত্রে জাহাজগুলোর অদ্ভুত আকৃতির মধ্যে দিয়ে গঙ্গার কালো জল রহস্যময় শব্দ, কোন দূর সমুদ্রের গন্ধ! এসব কি কেউ দেখবে না, কেউ আঁকবে না ....যাতে পরবর্তীকালে আরো ঐশ্বর্যময় কলকাতার অধিবাসী তা পড়ে বলতে পারে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে 'বাঃ আগেকার দিনে কী সুন্দর ছিলো কলকাতা...'

এখন তিনি বাহ্যিক রূপ সম্পর্কেই আপাতভাবে জোর দিয়াছেন, তদীয় নাটক আমাদের উচ্চারণ লইয়া রগড় করিয়াছেন; পূর্ব্ববঙ্গীয়দের কানে লাগে যেমন আমাদের অনেক ব্যবহার, সুকুমার বাবুকেও আপনারা আপনারা ইদিকে, এয়ার্কি, এমনধারা কিছু প্রয়োগ, মজা দিয়াছে। তবুও, পাশ্চাত্যে কোন ঔপন্যাসিক কোন কবি, সব নামই উল্লেখিত, যেমনটি করিয়া ভালবাসিলেন সেই রকমে এবং অধিকন্তু যে পুরাণা পল্টন-এর মনকেমন দিয়া ১) খৃষ্টান ভালবাসা (ক্যাথলিক ও উইক্লিফ হইতে প্রটেস্‌টান্ট সংজ্ঞা) এক আর বাঙালীর মন কেমন আর এক! আমরা তাহার লেখায় পাঠ করি; যে তদীয় মন নূতন অথচ যেমনকার তেমনি, কিছু মাত্র বিভ্রান্ত ঘটিল না, সমস্ত সম্পর্কবোধ আবহমান যাহা সদ্য আছে, (লেখাতে অনেক স্মৃতি) তাহার কারণ এই এক বিপুল সহর যাহা ধার্ম্মিক, বহুদিন ধরিয়া অগন্তি ম্লেচ্ছ ইহার হিন্দুত্ব নষ্ট করিতে পারে নাই।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ নাগ মহাশয় বলিয়াছেন, এখানে গঙ্গা আছেন, গঙ্গার কূলে ভক্তি জন্মায়। এবং এখানে চতুরঙ্গিনী শ্রীশ্রীঅম্বিকার অধিষ্ঠান — ইহার মৃত্তিকা [বুদ্ধদেববাবু কৃত পর্য্যবেক্ষণে — 'শহরের মাটি দুর্লভ বলে কি রসের জগৎ থেকেও তাকে দিতে হবে নির্বাসন'] বড় পুণ্যের যে এখানে মহাপ্রভুর পদ রেণু আছে! রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ যে এবং অজস্র মহাপুরুষ যে এবং যাঁহারা সাগর সঙ্গমে যান — ও ইহা, আধা বৈদিক কলিকাতা, যে এবং কেশব সেন আদি ভক্তদের! এই সকল পুণ্য কিভাবে কলিকাতার রহস্য হইয়াছে তাহা আমরা সাধনার বলে কখনও নিশ্চয় উদ্‌ঘাটনিতে যে ক্ষণ পাইব। এখনও আমাদের ধর্ম্মোন্মাদনা রহে, ভাবাবেগ আছেই — তত্ত্বসূত্রে পৌঁছাইব।

এখন বুঝা সাহিত্যের খাত হইতে নির্ঘাত দরকার — তাঁহার কাব্যে উপন্যাসে গল্পে শিশুদের লেখায় কেমন পন্থা লইয়াছে। কবি তারাপদ রায় আমাদের সাবধান করত বলেন, 'তদীয় গদ্য তুমুল ব্যাপার লিখিতে খুবই বিচক্ষণতার প্রয়োজন!' ইহা বটেই! প্রথমত তাহার লেখাতে যে ধাক্কা তাহা দৃষ্টিকোণ, প্রেম; এবং পরে বিদেশি বাক্‌বিন্যাস কোথাও পদকল্পে উপবাক্য সাজান, অনেকে ভুল নির্দ্ধারিতে পারেন সে আর এক। এবং নিজস্ব ভাবের জন্য

অচিন্ত্যবাবু আদি অন্য সকলের মতনই সজ্ঞান মুন্সীয়ানা যাহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাব অনেকেই প্রশংসা করেন। বলা বাহুল্য ক্রিয়াপদের বিচার লইয়া বচন তাহাতে তেমন নাই।

তখনকার কোন কেহ, সটেশন বা সমার্ট বা কিছু ইংরাজী কথাফের (idiom) — অথচ এমন সংখ্যায় কতগুলি তাহা উহাদের নির্দ্ধারণ উচিত — দেখিয়া পরমাদ গনিলেন; রামায়ণের মহাভারতের যুগ হইতে ম্লেচ্ছ শব্দ গৃহীত হইয়া আসিতেছে, ইহাতে ভাষা অনেক মীমাংসা করেন ভারী খেলা পায়; মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশকৃত 'প্রচ্ছন্ন ম্লেচ্ছভাষা' নামক প্রবন্ধে আছে, 'আর্য্যদিগের সহিত তাৎকালিক ম্লেচ্ছদিগের এমনকি সংস্রব সংঘটন হইয়াছিল যে আর্যভাষায় অনুপ্রবিষ্ট হইবে? আমরা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের সম্বোধনে 'অয়ি তামরসেক্ষণ' অবলোকন করিতেছি....' এই 'তামরস' প্রয়োগ বুঝিয়া রাখিয়াছিলাম, তামরস শব্দ আর্য্যদিগের বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ। আবার মীমাংসা দর্শন পাঠে উহা বুঝিতেছি উহা ম্লেচ্ছ শব্দ। (ইত্যাকার বহু শব্দ এই প্রবন্ধে আছে মহাভারতও আলোচিত হইয়াছে।)

সংস্কৃত সাহিত্য যেমন, তেমন বাঙলাতে, বৈষ্ণব কাব্যে ও পরে ভারতচন্দ্রে বহু অন্য ভাষার শব্দ আসে ১৯ শতাব্দীতে ইংরাজী যেমন মধুসূদনে ঢাকিকে বলা হইতেছে 'চেঁচিয়ে বাজাও' ও পরে প্রমথবাবু 'অনেক অনেক ধন্যবাদ' এবং বুদ্ধদেব বসুতে, শব্দ শব্দানুবাদ আছে এবং ইডিয়মও আছে; যেমন আত্মার এট্রফি; টুপিতে একটা বাড়তি পালক, শ্বাসহর !) যা কিনা প্রিটি প্রিটি মিঠি মিঠি; সবুজ চোখ(১০) চাঁদ চ্যাপ্টা; তাহা বাদে, একটি 'বাঙালী রুডিন' গল্প, ইহা ব্যতীত ধূসর, ধূসর নীল ধোঁয়া ইত্যাদি অনবরত ব্যবহার এবং নাটকের নাম মনে নাই তাহাতে আছে হীউমার হীনতা ইত্যাদি যে এবং ছোটদের গল্পে আছে নীল চোখ, টিনের মত গলা (এইটি যে আরও মজা লাগিবে, যে অশরীরীকে বুঝান হইতেছে কম্পারেটিভ লিটরেচার কি।)

যাহারা বুদ্ধদেববিদ তাঁহারা যেন বাঙলা ভাষার সহিত খতাইয়া দেখেন — (এই সঙ্গেতে উল্লেখি যে লাঠি বিস্কুট ম্যাকাসার ওয়েল, হরির লুঠ হরির নুট। সাঙ্গুভেলী বিষয়ের খবর দেন।)

আরও ধাক্কা দিবে যেমন, দান্তে, কোন বাচ্চা 'হে মোর চিত্ত' পড়ে, যে এবং তেমনি অনেক পূর্ব্ববঙ্গীয় টান সে মুচকে হাসছে (১৭), মামা বাড়ী, থাকগে আর না পড়লাম, করিস না, এতদ্ব্যতীত নিরুপমবাবুর লিষ্ট আছে! যেমন অচিন্ত্যবাবুতে সরাসরি' কথাটা ভুবনবাবুতে সরাসরি ছিল। তাহার উপরে দেখা যায় ইনিও বেশ সংস্কৃত বিলাসী! যেমন স্বর্ণিল; অনৈচ্ছিক কণ্ঠবেদনা; শোকান্তিক, হসন্তিক, মর্ম্মান্তিক! আবার দুএকটা পদ বাঙলা যেমন বাঁচোয়া, ফেল, আছে।

কোন সময়তে তাঁহার আর এক ধরণের প্রবন্ধে ও বিশেষত উপন্যাসে বিশেষ গড়নের দিকে যায়, আমাদের ইতিপূর্ব্বে সন্তোষবাবু, নিরুপম চাটুজ্যে অরুণ সরকার মহাশয়গণ দারুণ চমৎকার ভাবে বুদ্ধদেববাবুকে, তথা কহা যায়, বঙ্গ সাহিত্যে ভাল মন্দ লাগারই বিচারিয়াছেন, কিন্তু কতটা উনি অশ্লীল নহেন তাহা সাধারণ পাঠকের মনে হইবে, যাহা লোক মুখে প্রচার আছে মানে শনিবারের চিঠির জন্য — কাজিন কম্‌প্লেক্‌স ও নরেন দে cousins are always the best targets — তাহারই নির্ণয় করণে, অরুণবাবু বাদে, পঙ্‌ক্তি বেশী দিয়াছেন, নিশ্চয় ইহার প্রয়োজন আছে, বিশেষত ইদানীংকার মনোভাব স্মরণে; আমাদের কথা তাহা

হয় না, কিন্তু প্রত্যক্ষত অবশ্যই তাঁহাদেরও নহে!

বটেই আমরা এখানে হলফ করি যে একজনকে বুঝিতে আরজনাদের যেমন, মহৎ মণীন্দ্রলাল, কেদারবাবু নিরুপমা দেবী রাজশেখরবাবু নরেশচন্দ্র কেদারবাবু জগদীশ গুপ্ত সুধীনবাবু মানিকবাবু বনফুল শৈলজাবাবু গোকুলবাবু দিলীপ রায় অচিন্ত্যবাবু তারাশঙ্কর বিভূতিবাবু সকলে, তাহাদের এতটুকু অনাদরে উল্লেখিতেছি যে না তাহা বুঝা উচিত! বরং ইহাদের লইয়া এই বিচার, তাহারা যেন নিশ্চয় করিবেন, কেননা ইঁহারাও, প্রতিটি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাঙলা সাহিত্যের দিক পাল, কতক অংশে তাহারা আরও মহৎ! ইঁহারা সকলেই আপন মনোরমত্ব বুদ্ধি অনুপাতে বিরাট তত্ত্ব ডিটারমিনিজম যাহাতে প্রয়োজন ও মুক্তি বোধিত হয় এবং যাহা — ইঁহাদের মধ্যে অতীব আপাতভাবে আছে! — রামেন্দ্রবাবুতে ব্রহ্মবান্ধবেতে এবং বিপিনবাবুর ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখাতে আছে শুনিয়াছি, আমাদের বুঝিবার যোগ্যতা এখন নাই মহাশয়গণ ইহার পর্য্যালোচনা করিবেন ....নানা ছলেই ব্যাপ্তিয়াছেন।

যে পটভূমিকা সমক্ষে বুদ্ধদেববাবু আছেন তাহা আমাদের জানাও কর্ত্তব্য; ১৯২৪। ২৫ হইতে কলিকাতার এক অভিনব জীবন ঘটিল; ক্রমে ১৯৩০ সাল হইতে ত বটেই প্রায় ৪০ অবধি, এই সময় আমরা বীর হিন্দু কুলতিলক সভারকরকে দেখিলাম, সুভাষবাবুকে মন করিলেই দেখা যাইত। ফিরিঙ্গীরা শালারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ক্রমে মেড়ো আধিপত্য আনিল, এনারকিস্ট আদতে যাহারা ভারতের স্বাধীনতা আনিয়াছে, তাহাদের শেষ! অনেকের এখন ফাঁসির, তখন কারাবাস, খবর আসিত, রিট্রেঞ্চমেণ্ট, স্বর্ণমান হস্তান্তর, নেমন্তন্ন বাড়ীতে চেয়ার টেবিল, সেকুরবিয়ার ছ'আনা; এখানে সেখানে এ্যাট হোম, অদ্য আনা পাবলুভা [১৯২৮!] শিশিরবাবুর নূতন ধাঁচ [রীতিমত নাটক] শিশিরবাবুকে আমেরিকানরা লইয়া যায়, কেশববাবুর সেণ্টেনারী, রবিবাবুর জয়ন্তী, কাল ক্রাইসলার, গালি কুর্চ্চি, ফৈয়জ খান আব্দুল করিম; অর্দ্ধোদয় যোগ ভগবান রামকৃষ্ণ সেণ্টেনারি এই সময় উদয় শঙ্কর এই সময় হোয়াইটওয়েস সুররিয়ালিসম সজ্জা, অবনী বাবুদের হিন্দুস্থান বিল্ডিঙে স্কুল স্থাপন; ফোক আর্ট, এই সময় মহৎ গায়ক ভীষ্মদেব; সুরকার হিমাংশু দত্ত শচীন কর্ত্তা নজরুলের গজল কমলা ঝরিয়া হরিমতী, লর্ড ব্রাবোনের মৃত্যুর শোভাযাত্রা; সেভরলে গাড়ীর কসরত; ডগ রেস, শীরিষ বাবুর ভারতীয় architecture যাঁহারা প্রতিটি বিষয়ে আর্টের প্রবক্তা রামেন্দ্র সুন্দর রামানন্দ বাবুর কল্প উদ্‌যাপন হইতেছিল।

১৯ শতাব্দীর ভূয়া-শিষ্যত্ব প্রকৃতি যাহার ক্ষয় ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভিল — ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় বলেন 'রাজা রামমোহন ও কেশব চন্দ্র সমন্বয়বাদী ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের ব্রহ্ম বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা ছিল না। তাই তাহারা পরস্ব আহরণ করিতে গিয়া কতকটা নিজস্ব হারাইয়াছেন। কর্ণধারের অভাবে অনেকেই নূতন ভাবের তরঙ্গে পড়িয়া হাবডুব খাইতেছেন। এই বিপ্লবে সমাজ ভঙ্গ রোধ করিবার জন্য ভগবান রামকৃষ্ণর আবির্ভাব — স্বরাজ ১০ই চৈত্র ১৩১৩। সমকালীন সাময়িক পত্রে রামকৃষ্ণ এবং কথা পৃঃ ১২৩ হইতে উদ্ধৃত।

চিকাগো লেকচারে উহার শেষ ক্রমে আপন ঘরের নির্ম্মাণে, এখন বিশ্বাসে পরিণত। আমরা স্বায়ত্তে আসিলাম। এবং বুদ্ধদেববাবুও এই আনন্দময় সময়ের এ্যাবট্রাক্‌শন (হা প্রগতিশীলতা!) যে আমাদের মধ্যে কিছু দুঃখের তবে অতি মাত্রায় তারিফ ক্ষমতা সুউচ্চ হইল এই সময়েতেই কল্লোল তাহাদের প্রত্যেকের দেখার সহজতা লাভ হয়।

বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাস বা মঙ্গল কাব্যে গল্প করার রকম বড় নিজস্ব; বুনট ফের হয় আশ্চর্য্য বটে! [কবি কঙ্কণ, ধর্ম্মমঙ্গল] সঞ্জীববাবু আমাদের নিকট, তাঁহার এসথেটিক বৃত্তি, আর এক বিস্ময়; (বুদ্ধদেববাবু, এই সময় স্যানিটি অফ আর্টস প্রচারিত হয়, 'সুন্দরের সীমানায়' ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার মত দিয়াছেন, তবে তাহা পণ্ডিচেরির সহিত সহযোগিতা মাত্র এবং অন্যত্র, তদীয় ভেনাসে'র ব্যাখ্যা আমাদের মনোমত নহে) এ বিষয়ে বঙ্কিমবাবু অবশ্যই হয়েন দ্রষ্টা, এমন নিছক বাঙালী মহা উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশমর্য্যাদার চিন্তা আর দেখা যায় নাই যেখানে সমস্তটাই ধর্ম্মজ্ঞান পরিপূর্ণ তদীয় উপন্যাস ইহাই হিন্দু ষ্টাইল।

আর একটি ছাঁচ দেখা যায় অবশ্য এসথেটিকস জন্যত্ব নহে, স্থূল আঙ্গিকে অনামা নভেলে, যেমন 'বঙ্গের বিচিত্র কথা' কোথাও গদ্য কখনও পয়ারে উল্লেখ্য যে ইহার খেই পূর্ব্বে আছে। যেমন ইহার পরে লিখিত চালে হরিদাসের গুপ্ত কথা'তে গায়কি চাল খুবই চমকপ্রদ। অবশ্য বিমান সিংহ শেযোক্তকে মানে না। কিন্তু পাকা সৌন্দর্য্যতত্ত্ব বা এসথেটিকস এখানে, মৌখিক ধরণে, যাহা ব্রতকথাতে কখনও উপকথায় রামেন্দ্রবাবু, ও দক্ষিণারঞ্জন'তে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম গ্রন্থেও;

বুদ্ধদেব বসুতে তেমন ধারা, অনেক প্রগতিশীল সমালোচক বলেন, কোন বিশেষত্ব বোধে রেখাপাত করে নাই, অবশ্য আঙ্গিক যে আলাদা, জিরোদু আরাগঁর তর্ক, এমন কথা কেই বলে না, যেমন কাব্যবীজ সেই অনুপাতে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা আমাদের বলিবেন — অনেকে দায় সারিতে বলিয়া যায় তদীয় তিথিডোর এবং আকছার পুরাবৃত্তি; কিন্তু যেখানে গল্পের বাস্তবতা কেমনে গঠন করিতেছে এবং ইহাই তত্ত্বের প্রয়োজন।

কিন্তু যাঁহারা তাঁহার পুস্তকাদি সত্যই মনোনিবেশে পাঠ করেন যেমত হয়েন স্বনামধন্য কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ইঁহার মীমাংসাতে হয় এই, 'মৌলিনাথ....পরবর্তী কালে কারুর কারুর মুখে শুনেছি' ওটা উপন্যাসই নয়। বুদ্ধদেব বসুর প্রায় সমস্ত উপন্যাস সম্পর্কেই এরকম মন্তব্য করেছেন কোনো কোনো সমালোচক ....বুদ্ধদেব বসু যে জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন তা আমাদের বুদ্ধি নির্ভর এক স্বপ্নের জগত সেখানে উদ্ভাসিত হয় সুন্দরের এক একটি আর্শি — হয়তো খুব রোমাণ্টিক কিন্তু ভাষা শিল্পের যে এক একটি সুন্দর প্রতিমা, তাতে কোন সন্দেহ নেই....৭৬৬ অনেক স্বার্থক উপন্যাস পড়বে ভবিষ্যত বাহবাও দেবে, কিন্তু ঐ সৌন্দর্যের স্বাদ আর কোথায় পাব কি!' তাঁহার এই কথা খণ্ডন বুদ্ধি হয় বৃথা। ইহা হয় যথার্থ।

এই সত্যের পক্ষে খুব সঙ্কোচে, উল্লেখ করা যায় যে, পাশ্চাত্যের কোন বিরাট কবির নববিধিতে এই হয় যে '....সকল বস্তু বা বিষয় স্বভাবত চাঞ্চল্যকর তাহা ব্যবহারে নির্মিত ভাবধারা কখনই মহান শিল্পের কাজ করে না। মৃত্যু বেদনা মমত্ব খেলাইয়া পাঠককে নাড়া দেওয়ার চাইতে আর কি বা সহজ হইতে পারে। এগুলি সৃষ্টিই করিতে হয় না....আমারে, ইহার ন্যায় যারপরনাই কিছুই কাবু করে না যে, যখনই প্রত্যক্ষি যে, আমার মনোবৃত্তিকে নাড়া দিবার জন্যই সাট-রচা ও খুবই সাদা তরিখা পাতা হইয়াছে, উহাতে, দেখি। কিন্তু বিষয় ও আঙ্গিক দ্বারা সিঞ্চিড়া, নাড়া দেওয়াই, যাহার ক্রিয়া, আসলেতে আর্টেরই। যাহা অনেক রূপ ছলাকলা উজাইয়া যাইবে; যাহা বনেদ করিবে না সাধারণ সংস্কার প্রত্যয়েতে, এমনও নহে নির্ব্বুদ্ধিতাতে এবং সম্ভাব্য কিছুর প্রতিক্রিয়া ধরিয়া বাকজাল বিস্তারিবে; খুব কঠোর অতি গভীর লক্ষ্য যাহা শিল্পীর ধ্যান জ্ঞান হওয়া উচিত। যাহা অশ্রু আনিবে, আনন্দ বিশ্বাস দিবে; অথচ যাহার কার্য্য জীবনের অভিজ্ঞতাতে নাই....।'

পাঠক ঐ উক্তির মধ্যে সবটাই মান্য করিবার নহে; কেন না ইহা বিধি হয় না, তাঁহার মত;

ইহা সঙ্গীতের কাঠামো; তবে কোন চিন্তাকে organic কাঠামো করা বড় গলদঘর্ম্ম ব্যাপার।

বুদ্ধদেব নিশ্চয় ইহা জানিতেন, যেমন, কোন ঔপন্যাসিক নির্দ্দেশ করিয়াছেন উপন্যাসের একান্ত প্রাথমিক প্রয়োজন যে — বর্ণনা, narration, বিশ্লেষণ, কথাবার্ত্তা। ইহা ব্যতীত আঙ্গিক বহু ধরণ আছে, মোনলগ বা স্ব-উক্তি, কনফেসন বা আত্মকথা পত্র, আদি কোনটি কিরূপ ধাঁচের। এই সম্পর্কে বিশেষত চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় এবং অনিরুদ্ধ লাহিড়ীও অভাবনীয় স্বধ্যায়ী, অজস্র পুস্তকের মর্ম্মর্থ জানেন, তাহারা আরও বলিতে পারেন, তবু আর একজন পাশ্চাত্যের ধারণা '...অনেকের ধারণা নাই প্রতীকবাদ, অতীব সহজ ব্যাপার, জীবনের সহিত কোন যোগ নাই, প্রতীকবাদী তাহা বুঝিতে প্রয়াসই পায় না, বরঞ্চ তাঁহারা অস্বীকার করে মুখ পর্য্যন্ত ফিরাইয়া লয়, ইহা অসহ্য নয়...।

পুনঃ

'....আমি এমন উপন্যাস লিখিতে চাই যাহা একাধারে সত্য যেমন হইবে তেমনি বাস্তবতা হইতে অনেক তফাৎ থাকিবে যেমন বিশিষ্ট ও তেমন সাধারণ, খুবই মনুষোচিত, আথালি তারতুফ বা সিনা হইতেও fictif হইবে।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু?

কিছুই না।

হ্যাঁ বুঝিলাম, উহা বলাতে আমার বড় বেয়াকুফি রহিল, আমি যাহা বলিতে চাহি, ধর যদি তুমি চাহ বিষয় না থাকা ব্যাপারে প্রকৃতিবাদীরা যেমন বলিয়া থাকে এক ছত্তর জীবন যাহা তাহাদের ঐ ক্ষেত্রেই কসুর। (এইখানে তাঁহার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধ ১৩৩ দ্রষ্টব্য)

ইতঃপূর্ব্বে 'ভাবের উপন্যাস' নামে এক তারিখার সুরু হয় (১৮ শতাব্দীতে)। ঐ সূত্রে পরে প্রতীকীবাদ ও প্রকৃতিবাদ, উনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে লিখিয়াছেন '...বাস্তবের অন্তরালবর্ত্তী স্বপ্ন বা সত্য সন্ধানী....।' এবং রূপ ও স্বরূপও বিভিন্ন প্রবন্ধে তিনি অনেক তত্ত্বও দিয়াছেন।

যাঁহারা মানে দু'একজন এ পর্য্যন্ত বুদ্ধদেব সম্পর্কে লিখিয়াছেন, প্রমথবাবু অতুলবাবু ইত্যাদি বাদ দিয়া আমাদের সকলকেই বাঙলা সাহিত্য লক্ষ্য রাখিয়া কষিতে হইবে, এমন দায়িত্ব থাকাই সত্য; কেহ কহিল বুদ্ধদেবের গদ্য হইতে পদ্য টানে — কেন তাহার উত্তর নাই; কেহ লিখিলাম, ইয়েটস যাহা ভাবেন গ্যেটে যাহা ধারণা করেন [আমাদের উপর ক্ষুব্ধ হইবেন না] কি যে ভাবেন তাহার খোঁজ নাই! কেহ আর সুমতিসম্পন্ন 'ইনি মুক্তি খুঁজেছিলেন নির্ব্বাণে নয় শিল্পে' এখন মুক্তি বলিতে কি বুঝেন তাহা স্থূলশব্দ আছে, শিল্পটা কি খোঁজ নাই। [আর্ট বলিতে তিনি কি বুঝেন আমাদের মত সরল জিজ্ঞাসুদের বুঝানো উচিত] তাহাতে আছে 'প্রকৃতির বিশ্বাস ঘাতকতা' — কথার এ ধরণের লাগসই কোন দায়িত্ব মানুষ লইতে চাহিবে না; আর্টের যে মরণ নাই কোনরূপে আমরা বুঝিব। যেহেতু (এখানে প্রকাশ থাক; হিপ্‌পোক্রাট'র উক্তি আছে! এনড্রুমারভেল, গ্যেটেতেও ঐ উদ্ধৃতি এবং অন্যত্রে আছে) আরও যে ইনি কোন বিষয়ে রাজনীতিকারীকের (!) সহিত বুদ্ধদেবকে মিলাইয়াছেন। এইখানে আর একজন ব্যাখাকার বলিতেছেন....বুদ্ধদেব বাবুর রচনায় জীবনস্মৃতি আর বানানো গল্প এমন পাশাপাশি রয়েছে। ....আত্মবিলাস থেকে মুক্তিই শিল্পীর কাম্য।

কিন্তু তাঁহার সাহিত্য মত 'আনন্দ সাহিত্য' আছে [পূর্ব্বে ফরাসী বিপ্লবের পর ইহাই

enthusiasm ছিল, যতদূর শুনিয়াছি। আমাদের মনে বিশ্বাস তিনি নিজে একজন নীতিবিদ ছিলেন। অন্তত আমাদের গ্রাম্য ধারণায়, যেমন মানিকবাবুর 'বিবেক' গল্প উল্লেখে দুই চুরি (বাস্তব নিষ্ঠা) আবার, ...বাইরের উপায় দুঃখ দূর করতে গেলে দুঃখ আরও পীড়া দেয়।.... এইরূপ তাঁহার গল্প উপন্যাস প্রবন্ধর বইতে গোড়ার দিকের ও পরেও অনেক হইবে, তখন নীতি বলিত না মাক্সিম এই শব্দটির চলন হয়, তাহার ক্রম বলিতে কি আজ্ঞা হয়;

অবশ্য তদীয় প্রিয় লেখক মান এক স্থানে বলিয়াছেন 'ভারটিব্রেট মরালিটি' — পদটি শ্রুতিমধুর ও জৌলষের ব্যতীত আর কেমন ভাবে লইবার — তাহা উজাইয়া যাওয়া কাজের (এখানে অনেকেই তর্ক করিবেন কেননা পূর্ব্বে আছে tribal and social ethic দ্বারা চালিত) ইহা নিশ্চয় হয় খুবই বিভ্রান্তকারী; তিনি নিঃসন্দেহে যাহার বশে প্রথমেই ইংরাজ অনেক লেখককে বিচার করিলেন, মান তাহার ভাল লাগিল কোন সৌন্দর্য্যে! লিখিয়াছেন; 'শ্রেষ্ঠ জর্মন মানসের প্রতিভূ তিনি' এখানেতে জানিবার 'মানস' বলিতে যে এবং প্রতিভূ বলিতে কি বুঝায়; ইনি কি লুথার হইতে লাইবনীৎস ও স্পীনোজার তর্ক ঘটিত কিছু (এবিষয়ে বিদেশীরা যে রূপে লইয়াছেন সেই ভাবে আমরা জানিয়াছি) যে এবং বা নীটসের কল্পনা, তাহার ব্যাখ্যা নাই; আছে 'বিস্তীর্ণ রূপে গুরুভার, ক্লান্তিহীন রূপে গম্ভীর, নির্ভীক ভাবে ক্লান্তিকর।'

নিশ্চয় আমাদের বুঝিবার দোষ থাকে। এবং পুনরায় 'যাকে আমরা সাধারণত 'সাসপেন্স' বলি ঘটনার পরিনতি জানবার সেই আগ্রহের কোনো অবকাশ নেই এখানে, অথচ কোনো দুর্বার আকর্ষণ আছে....আর যত আমরা অগ্রসর হই, উপসংহার যত এগিয়ে আসে...." এখানে উপসংহার কোন বিচারের?

এতাবৎ যাহা লিখিত হইতে আছে তাহা খবর চাওয়ার নিবন্ধে এবং বটে যে যেহেতু তিনি 'এন একার অফ গ্রীণ গ্রাস' লিখেন। অল্পবয়সীদের মধ্যে সুব্রত চক্রবর্ত্তী ইহা পড়িয়াছে; এখন এই বাক্য (!) নাম ডবলু বি ইয়েটসের এক কবিতা হইতে গৃহীত — কি তাহার আদত মানে, সেখানে ফ্রেনজী, সত্য ইত্যাদি আছে, অবশ্য বিশেষ্যই তাহার অর্থ নয়, অনেকে আশা করিয়াছিলেন বাঙলাতে তেমন একখানি বই লিখিবেন — কিন্তু ছোট প্রবন্ধ ব্যতীত মীমাংসা আমরা আর কিছু পাই না।

জানি, তিনি অন্বেষণকারী, ইহা আমাদের বারম্বার মনে পড়িয়াছে। যে এবং যদ্দ্বারা, তিনি কবিতায়, উপন্যাসে, গল্পে হিন্দুত্বের, প্রবণতা বৃত্তি, সকলের অতলে যে মানুষটি রহে তাহারই খেই লভিতে সংসাধন করিয়াছেন ইহাই তদীয় সরলতা।

এখন তাহার মরদেহ যেখানে, ঐ কক্ষ জীবন্ত, আত্মপর অনেকের বুক ফাটা ক্রন্দনে উহারে জীবন্ত করিয়াছে — নিজেদের এত জীবন্ত ভাবার বিষক্রিয়া আছে, যাহা না নৈতিক, না ধ্যানের! (হায় এত বড় দেহ এখনও আমরা বহন করি তাহা শেষে মাত্র।) পাশে হতাদরে যে বাগান তাহা পার হইয়া আসিলাম; লাইন বাধিয়া স্কুলের মেয়েরা তাঁহারে দেখার নিমিত্ত যায়, সিদ্ধার্থ, নানু, টটু ও অতনু ইহারা পর্য্যাঙ্ক আনিয়াছে, আমরা একে অন্যরে সনাক্ত করিলাম কি শুদ্ধভাবে আমাদের হিন্দু মতিত্ব ইহা সহ্য করিবারে সংস্কার দিয়াছে; হে ভগবদ্ভক্ত পূর্ব্বপুরুষগণ! তোমরা সত্য!

কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, ইহা কেওড়াতলা মহাশ্মশানে ইলেকট্রিক চুল্লীর অংশে, আমাদের কহিলেন, তিনি গাড়ীতে তাহার মরদেহ বহন করে ইহা চাহিতেন না, তজ্জন্য, ২০২ অবধি

তাঁহারে, নাকতলা হইতে গাড়ীতে দূরত্ববিধায়, আনা হইল, এবং সেই স্থান হইতে, সনাতন প্রথায় মহাশ্মশানে লওয়া হয়!

পাঠক ইনি সেই যিনি বলিয়াছেন 'কিন্তু আমাদের মতে সার্থক সাহিত্য মাত্রই ধর্মের কথা, ভগবানের বন্দনা।'

আমাদের এই জপ তিনি দিয়াছেন — সেই আশ্রম 'হরিষতৈকশ্রুতঃ শ্রুতঃ পুরুষোত্তম স্মৃতঃ।

[অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিত পুরুষোত্তমৎ]
জয় মাধব! জয় রামকৃষ্ণ! তারাব্রহ্মময়ী মাগো!
এখানে যাহা কিছু ব্যক্ত তাহা খ্যাতনামা লেখক

শ্রীঅজিত দত্ত, সন্তোষ ঘোষ, শ্রীঅরুণ কুমার সরকার, শ্রীনিরুপম চাটুজ্জো ও শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লেখা সহায় লিখিত হয়।

১। যাহা কিছু লিখিত তাহা অগোছাল আলোচনা জাতের প্রশ্ন।
২। এখানে যে সকল উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হইল, তাহার হদিশ সকল এখানে দিলাম না।
৩। কবিতা সম্পর্কে আলোচনার ক্ষমতা নাই!
৪। তদীয় মহাভারত লইয়া কথা এখানে নাই।

কৃত্তিবাস
বিশেষ যুগ্মসংখ্যা
একবিংশতিবর্ষ ১৩৮১

কমলকুমার মজুমদারের গদ্যরীতি একেবারেই অন্যদের থেকে পৃথক। বানানের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী যা একান্তভাবেই তাঁর 'বিশেষ গদ্যরীতির' পক্ষে প্রয়োজনীয়।

তাই আমাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু মুদ্রণ প্রমাদ থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পাঠকদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন তাঁরা যেন এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করেন।

নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সার্বিক
উন্নয়ন ২১ শতকের
মহাসড়কে যোগ্য পথিক
পশ্চিমবঙ্গ

- গঙ্গার পাড়ে মিলেনিয়াম পার্ক, কলকাতা
- মেগাসিটি প্রকল্প
- শহরের জঞ্জাল পুনর্ব্যবহারকরণ প্রকল্প
- কোনা এক্সপ্রেসওয়ে
- গঙ্গার দু'পাড়ের সৌন্দর্যকরণ
- কলকাতা-হলদিয়া এক্সপ্রেসওয়ে
- পূর্বাঞ্চলীয় এক্সপ্রেসওয়ে
- পানাগড়-মেচেদা এক্সপ্রেসওয়ে
- কলকাতা শহরে ৬টি নতুন উড়ালপুল
- রাজ্যের কলকাতা সহ বড় শহরের সবুজায়ন

কাজের আনন্দে
সাফল্যের ছন্দে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই.সি.এ —৩৬৩১/২০০০

Price : Rs. 50
Vol. 22 No.1
BIVAV
Special Autumn Issue
July-Sept. '2000
Reg No : 30017/76
80th issue
INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NO ISSN 0970-1885

SPACE DONATED
by

A WELL WISHER